সবুজ পত্র

বৈশাখ ও আশ্বিন।

১৩২৭

সম্পাদক

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

বার্ষিক মূল্য তিন টাকা ছয় আনা

'সবুজ পত্র' কার্য্যালয়, ৩ হেষ্টিংস ষ্ট্রীট,

কলিকাতা

প্রকাশক,
শ্রীপ্রমথ চৌধুরী এম, এ, বার-য়্যাট-ল
৩ হেষ্টিংস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কলিকাতা
উইক্‌লী নোট্‌স প্রিণ্টিং ওয়ার্কস,
৩ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট
শ্রীসারদাপ্রসাদ দাস দ্বারা মুদ্রিত

বর্ণানুক্রমিক সূচী।

(বৈশাখ—আশ্বিন)

১৩২৫ সন।

বর্ণানুক্রমিক সূচী

(বৈশাখ—আশ্বিন)

১৩২৭

সবুজ পত্র

কার্ত্তিক ও চৈত্র

১৩২৭

সম্পাদক

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

বার্ষিক মূল্য তিন টাকা ছয় আনা।

'সবুজ পত্র' কার্য্যালয়, ৩ হেষ্টিংস ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

প্রকাশক,
শ্রীপ্রমথ চৌধুরী এম, এ. বার-য়্যাট-ল
৩ হেষ্টিংস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কলিকাতা
উইক্‌লী নোট্‌স প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
৩ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট
শ্রীসারদাপ্রসাদ দাস দ্বারা মুদ্রিত

বর্ণানুক্রমিক সূচী

(কার্ত্তিক—চৈত্র)

১৩২৭

সম্পাদকের নিবেদন।

—:*:—

সবুজপত্র যেমন করেই হোক্ আরো এক বৎসর বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করতে আমরা বাধ্য।

একটা নবযুগ তার আনুসঙ্গিক নানারূপ আশা বিভীষিকা সঙ্গে নিয়ে আমাদের দুয়োরে এসে দাঁড়িয়েছে, তাকে কি ভাবে আমরা ঘরে তুলে নিই—আদরে না অবহেলায়, আনন্দে না আশঙ্কায়, তার উপর আমাদের জাতীয় ভবিষ্যৎ অনেকটা নির্ভর করবে। আমাদের মত যারা এই নবযুগের উদ্গাতা তাদের পক্ষে এ সময়ে নীরব থাকা অসম্ভব।

অতঃপর এ দেশে যে ডিমোক্রাসির সূত্রপাত হল, সে বিষয়ে আমার মনে তিলমাত্র সন্দেহ নেই। যাঁর আছে, হয় তিনি ডিমো-ক্রাসির অর্থ বোঝেন না, নয় তাঁর দূরদৃষ্টি নেই। এর উত্তরে পূর্ব্ব পক্ষ নিশ্চয়ই বলবেন যে আমরা চোখ-চেয়ে স্বপ্ন দেখছি। এ উত্তরের প্রত্যুত্তরে কিছু বলা অনাবশ্যক। এক পক্ষের কাছে যা অস্তি আর এক পক্ষের কাছে যদি তা নাস্তি হয় তাহলে হাজার তর্কে সে দু'পক্ষের মতের মিল কিছুতেই হতে পারে না। শুধু ধর্ম্মে নয়, জীবনের সকল ক্ষেত্রেই আস্তিক ও নাস্তিক, দুটি বিভিন্ন জাতের লোক। এদের পরস্পরের মূল প্রভেদ হচ্ছে প্রকৃতিগত।

স্বজাতির পলিটিক্যাল-ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমি আস্তিক। আমি

স্বজাতির মনুষ্যত্বে বিশ্বাস করি এবং বিজাতির মনুষ্যত্বে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করি নে। এইজন্যে আমি তাঁদের বলি নাস্তিক, যাঁরা স্বজাতির মনুষ্যত্বে বিশ্বাস করেন না, এবং বিজাতির মনুষ্যত্বে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করেন। আমাদের এই বিশ্বাস ও তাঁদের এই অবিশ্বাস কোন পক্ষই তর্কের দ্বারা প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন না, কেননা এ ক্ষেত্রে উভয় পক্ষই দুটি অজানা জিনিষ নিয়ে কারবার করছেন, প্রথম জাতীয় আত্মা, দ্বিতীয় ভবিষ্যৎ কাল।

আমাদের কথা হচ্ছে এই যে উক্ত বিশ্বাসই হচ্ছে আমাদের সকল বলা-কওয়ার আসল ভিত্তি। ও-বিশ্বাস ত্যাগ করলে আমাদের পক্ষে মৌনব্রত অবলম্বন করে নির্ব্বাণমুক্তির জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া উপায়ান্তর নেই।

আমাকে অনেকে জিজ্ঞাসা করেন, এই ডিমোক্রাসি শব্দের অর্থ কি?—

একটা জাতির ভিতর এক এক যুগে এক একটি কথা ওঠে বা হাওয়ায় উড়ে আসে, যা সকলের মুখেই শোনা যায়, আর যা সকলের মনকেই আকৃষ্ট করে, সে সব কথার স্পষ্ট অর্থ বোঝানো অসম্ভব। আমার দার্শনিক গুরু Bergson বলেন, সে অর্থ বোঝানো যেমন অসম্ভব, জনগণের পক্ষে তা বোঝাও তেমনি অনাবশ্যক। কেননা সে সব কথার প্রকৃত অর্থ অভিধানের মধ্যে নেই, আছে জীবনের অভিব্যক্তির মধ্যে। এ জাতীয় কথা যে ধাতু থেকে উৎপন্ন হয় সে ধাতু হচ্ছে প্রাণ। লোকের যদি বিশ্বাস থাকে যে ডিমোক্রাসির অর্থ তারা বোঝে ও সে পদার্থে তাদের আস্থা থাকে তাহলেই তারা ডিমোক্রাসি গড়ে তুলতে পারবে। এ আস্থাই হচ্ছে মানুষের মনুষ্যত্বের

উপর বিশ্বাস। তার পর ডিমোক্রাসি কোনো দেশেই পড়ে-পাওয়ার জিনিষ নয়, সব দেশেই গড়ে তোলবার জিনিষ। এবং সেই জন্যই ডিমোক্রাসি শব্দের প্রতি ভাষায় অর্থ স্বতন্ত্র, কেননা প্রতি জাতি ও-বস্তু নিজের মন ও প্রাণ দিয়ে গড়ে তোলে। আর যেমন ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে তেমনি জাতিতে জাতিতেও মনপ্রাণের অল্প বিস্তর পার্থক্য আছে। যেদিন আমরা ডিমোক্রাসি গড়ে তুলতে পারব সেই দিন ও-শব্দ বাঙলা হয়ে উঠবে, তখন তার মানে জানবার জন্যে আমাদের ইংরাজি অভিধানের আর সাহায্যে নিতে হবে না। ডিমোক্রাসির অর্থ একটা বিশেষ রকমের শাসনতন্ত্র মাত্র নয়, ও-বস্তু হচ্ছে একটা জাতির আধ্যাত্মিক ও ব্যবহারিক জীবনের একটা পরিণত রূপ।

আমরা এই স্বদেশী ডিমোক্রাসির গঠনকার্য্যে নিজ শক্তি নিয়োজিত করব, অবশ্য একমাত্র কথা কয়ে। কিন্তু কারো ভোলা উচিত নয় যে কথাও হচ্ছে এক রকম কাজ—অবশ্য সে কথার ভিতর যদি আন্তরিকতা থাকে।

বিলেতি ডিমোক্রাসির যে-সকল নমুনা আমাদের চোখের সুমুখে রয়েছে তা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরও নয়, সর্ব্বগুণে গুণান্বিতও নয়। স্বরাজ্য কোনো দেশেই স্বর্গরাজ্য নয়। শাসনতন্ত্র হিসেবে ডিমোক্রাসি হচ্ছে প্রথমত কথার রাজ্য। সংবাদ-পত্র ও বক্তৃতা এ তন্ত্রের দুটি শক্তিশালী অঙ্গ। যে দেশে এ তন্ত্র আছে সে দেশে কথার আর অন্ত নেই। "সে কহে বিস্তর মিছা যে কহে বিস্তর"—ভারতচন্দ্রের এ উক্তি, ব্যক্তির পক্ষে যেমন সত্য, জাতির পক্ষেও তেমনি সত্য। সুতরাং দুদিন পরে দেখা যাবে যে, দেশের আকাশ মিছে কথার কুয়াসায় ঢাকা পড়ে গিয়েছে। তার পর

ডিমোক্রাসি সম্প্রদায়িক দ্বেষহিংসার অত্যন্ত প্রশ্রয় দেয়। কিন্তু ডিমোক্রাসির সব চাইতে সর্ব্বনেশে দোষ এই যে, এ তন্ত্রে বৈশ্যবুদ্ধি ব্রাহ্মণবুদ্ধির স্থানকে অধিকার করে। কেননা শূদ্রের পক্ষে ব্রাহ্মণ হওয়ার চাইতে বৈশ্য হওয়া ঢের বেশি সহজ। শুধু তাই নয়, এ তন্ত্রে বৈশ্যেরাই শূদ্রের বেনামিতে দেশের লোকের উপর প্রভুত্ব করে। ফলে ভাবে ও ভাষায়, ধর্ম্মে ও কর্ম্মে এ তন্ত্রের সহজ ঝোঁক ইতরতার দিকে। সুতরাং একদিকে ডিমোক্রাসি গড়ে তোলবার সাহায্য করা যেমন আমাদের পক্ষে কর্ত্তব্য আর একদিকে এই মিছে কথা, এই দ্বেষহিংসা এই বৈশ্যবুদ্ধি এই ইতরতার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করাও আমাদের পক্ষে তেমনি কর্ত্তব্য এবং সে অস্ত্র হচ্ছে সাহিত্য। রূপ-লোকের সন্ধান না পেলে মানুষে কামলোকের মায়া কাটাতে পারে না। সাহিত্য অবশ্য এই রূপলোকের কথাই মানুষকে শোনাতে চায়।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

অশান্তের দল।

—:০:—

পূর্ব্বাচল হ'তে আজি এসো নিয়ে এসো
স্বর্ণ রশ্মি-জাল,
ভূষিত করিয়া দাও কনকভূষণে
লজ্জা-নত ভাল।
স্কন্ধে লয়ে কে ফিরিবে দ্বারে দ্বারে দ্বারে
ভিক্ষা-করা ঝুলি ?
করুণার সুরে বাঁধা লজ্জাহীন মুখে
কাতরতা-বুলি ?
পূর্ব্বাচল হ'তে নিয়ে স্বর্ণ রশ্মিমালা
কর কর ভূষা,
আঁধারের শেষে আজি সাগরের নীরে
ওই জাগে ঊষা !

উদয় অচলে আজি ওই জাগে ঊষা ;
অশান্তের দল,
কোন্ বেশ পরি' তোরা বিশ্বরাজ-পথে
বাহিরিবি বল্ ?
বক্ষপাশে জাগিবে কি অদম্য উল্লাসে
জীবনের সুখ ?

সীমাহীন দিগন্তের আলো স্বপ্ন দিয়া
ভরিবে কি বুক ?
সপ্তসিন্ধু-বুকে-ফেরা এনো যে বাতাস
অশান্তের দল !
তারে কি ধরিবি আজি তোর বক্ষপুটে
বল্ ওরে বল্ ?

কে রহিবে ওরে আজি কে রহিবে ঘরে
শান্ত অন্ধ মূক !
আজি যে এ ধরিত্রীর প্রতি রন্ধ্রে জাগে
অদম্য কৌতুক !
দিগন্তের কোণে কোণে নিমেষে নিমেষে
ওঠে তার হাসি,
সপ্তসিন্ধু বুকে বুকে কার বাজে ওই
আমন্ত্রণ বাঁশী !
চরণ রহে না আর—অশান্ত চরণ
রুদ্ধ দ্বার ঘরে,
আজি যে বিশ্বের রাজা ডাকে বাহিরিতে
বরাভয় করে !
আয় আজি আয় ওরে অশান্তের দল
ছাড়ি মিথ্যা ভয়,
সপ্তসিন্ধু-কূলে কূলে গাব জীবনের
জয় জয় জয় !

অনন্ত গগন পানে দিব দিব মেলি
এই ক্ষুদ্র হাত,
পারি না পারি না আজি করিব রে ভয়
বজ্র অকস্মাৎ—
আকাশের তারা ছিঁড়ি কণ্ঠহার গাঁথি
পরিব গলায়,
ভয় যে লাগে না প্রাণে উল্কা হ'য়ে যদি
ভস্ম করি যায়,—
চাঁদিমার রৌপ্য কাড়ি' গড়িয়া কিরীট
দিব শিরোপরি,
অদম্য পুলক বুকে কেমনে বাঁধিব
শঙ্কা ছল করি' ?
উদয়-অচলে আজি জাগে স্বর্ণ উষা
জীবন মোহন,
রে অশান্ত আয় ছুটি বিশ্বপথে পরি'
বীরের ভূষণ।

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

পত্র।
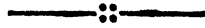
শ্রীযুক্ত "সবুজপত্র" সম্পাদক মহাশয়

শ্রীশ্রীচরণকমলেষু—

আমার বড় অহঙ্কার যে সবুজ-পত্রের মধ্যে আমিও একটি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বহুদিন আপনি এই পত্রটির কোন খোঁজ নেন নাই। আমিও আপনার কোন খোঁজ নিতে পারি নাই; কেননা আমার এতদিন 'নিজের খোঁজই কে-নেয়' এই অবস্থা ছিল। এই অবস্থার শেষে এবং বসন্তের প্রথমে আপনার খোঁজ নেবার কথা প্রাণে প্রাণে বোধ করিলাম।

আমাদের দুই ভাইয়ের, প্রথমটির নাম তুলসী পত্র বা তুলসী পাতা, দ্বিতীয়টির নাম বিল্বপত্র বা বেলের পাতা। দ্বিতীয়টি আমি, আমিই বিল্বপত্র। দুইটি ভগ্নাও—করবী ও অতসি। শক্তি-উপাসক-দম্পতীর, আদরের নামই পাইয়াছিল। কিন্তু আমার কথাটাই আমি বলিব।

বিল্বপত্র বা বেলের পাতার তিনটি অংশ,—একটি সাম্য, একটি মৈত্রী আর মধ্যেরটি উচ্চশির সুতরাং স্বাধীনতা; একটি সত্ত্ব, একটি তমঃ, মধ্যেরটি একই কারণে রজঃ; একটি সৃষ্টি, একটি লয় মধ্যেরটি মধ্যাবস্থা সুতরাং স্থিতি ইত্যাদি বহুপ্রকারে ঐ তিন অংশের

বা দলের আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক বা আধিভৌতিক ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। কিন্তু তৎসত্বেও আমার দুর্দ্দশার সীমা নাই। ব্যাপারটা শুনুন।

উচ্চকুলে জন্ম, দেবতার পূজায় লাগি,—কাজেই মধ্যের দলটি অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া উঠিয়াছিল। ভাবিয়াছিলাম আমার সঙ্গে তুলনা কার? শৈশবের কচি রঙ কচি বয়স, নব বসন্তের মধুর বাতাস—প্রাণ উল্লাসে অধীর করিয়া তুলিয়াছিল। কুক্ষণেই স্খলিত বা স্খলিতপ্রায় পাণ্ডু-পত্রদিগকে উপহাস করিয়াছিলাম! একটা ঘুর্ণিবায়ুতে কতকগুলি ধূলি বালির সহিত মিশিয়া উড়িয়া যাইতে যাইতে তাহারা আমাকে অভিশাপ দিয়া গেল। তখন তাহা গ্রাহ্য করি নাই, ক্রমে দেখি তাহা ফলিল।

একদিন একজন আমাকে তুলিতে আসিল। শিহরিয়া উঠিলাম, হায়! পরের পূজা পরাধীনতা"! মধ্যের পাতাটি নম্র হইয়া আসিল। সাম্য ও মৈত্রী বলিল "দোষ কি? সবাই সমান, সবাই পূজার পাত্র"। যে আসিয়াছিল সে ছাড়িল না। তুলিয়া লইল। স্বাধীনতা আশ্বাস মানিল যে স্বেচ্ছায় পরের পূজা করায় পরাধীনতা নাই, অনিচ্ছায় পরসেবাতেই পরাধীনতা।

পূজার আয়োজন হইল। পূজা সরস্বতীর। আমাকে তুলিয়াছিল স্কুলের ছেলেরা। বেলের পাতার ডালায় চোখ মেলিয়া দেখি সাম্য ও মৈত্রী মলিন মুখ। স্বাধীনতা অভিমানে গর গর করিতেছে। সাম্য ও মৈত্রী সমস্বরে বলিল, "এ'ত সরস্বতীর পূজা নয়, দুষ্টা সরস্বতীর পূজা। কেননা যাহারা পূজা করিতেছে তাহারা বাহিরে জাতিভেদ ধর্ম্মভেদ লইয়া বিষম তর্ক জুড়িয়া দিয়াছে, মারামারি বুঝি একটা হয়।

ব্রাহ্মণ কায়স্থেতর জাতিরা মণ্ডপে প্রবেশ করিতে পারিবে না, আর, একটি মুসলমান মণ্ডপের কাছে আসিয়াছিল বলিয়া গলাধাক্কা খাইয়াছে।" স্বাধীনতা বলিল "এ পূজায় আমি থাকিব না"! সাম্য ও মৈত্রী বলিল "এখন ছাড়ে কে"? হঠাৎ দেখি ডালা উল্টাইয়া মেজেতে পড়িয়া গিয়াছি। ভাবিলাম ভালই হইল। তখনই একটি বালক শশব্যস্তে আসিয়া আমাকে ডালায় তুলিয়া দিল। বিরক্ত হইলাম। কিন্তু ঠাণ্ডা হইলাম বালকটির ঐ স্পর্শে। সে স্পর্শে কত যত্ন কত আগ্রহ।

পূজা চলিতেছিল। ফুলগুলি আমার মনের কথা জানিয়া থাকিবে। তাহারা বলিল "এখানে আর স্বাধীনতার বড়াই খাটে না, সাম্য মৈত্রীর বড়াই খাটে না। পরাধীনতা যখন স্বীকার করিয়াছ তাহার শেষ অবস্থার জন্য প্রস্তুত হও"। পুরোহিত কি যেন মন্ত্র পড়িয়া বড় বড় গাঁদা ফুল গুলিকে ছিন্নভিন্ন করিয়া দেবীর পায়ে দিতে লাগিল। ঘণ্টা বাজিতে লাগিল ধূপ ধূনা জ্বলিতে লাগিল। আমার কেবলই মনে হইতে লাগিল এ'ত পূজা নয়, এ আমাদের বলি। ইতিমধ্যে কে যেন আমার গায়ে চন্দন মাখাইয়া দিল। চন্দনের মাধুর্য্য বিশেষ কিছু বোধ করিতে পারিলাম না,—একটা শীতল কম্পন শিরায় উপশিরায় বহিয়া গেল। যখন কয়েকটি বালক আমাকে ছিন্ন ভিন্ন ফুলের দলের সহিত অঞ্জলির মধ্যে পূরিল তখন আমি অবসন্ন, দুঃখ বেদনা তখন আর নাই। তাহারা মন্ত্র পড়িয়া আমাকে প্রতিমার দিকে নিক্ষেপ করিল। আমি কাঠামের একটি বাঁশের গায়ে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেলাম। কোথায় বা দেবী, কোথায় বা পূজা। বুঝিতেও

পারিলাম না। দুই দিন পর মূর্চ্ছা ভাঙ্গিলে দেখিতে পাইলাম কয়েকটি ফুলের দল, একটু ভস্ম, একটু কাদা, একটু ধূনা, এই সবের মাঝে পড়িয়া আছি। সে সাম্যও নাই, সে মৈত্রীও নাই, সে স্বাধীনতাও নাই; সে পুরোহিতও নাই, সে প্রতিমাও নাই, সে বালক দলও নাই। অনতি দূরে শব্দ শুনিতে পাইলাম সপ্ সপ্ সপ্; চকিতে একটি সম্মার্জ্জনী শলাকায় তাড়িত হইয়া একটি স্তূপে অধিষ্ঠিত হইলাম। সেখানেও নিস্তার নাই একটি ঝুড়িতে বাহিত হইয়া নদীতীরে নীত হইলাম। আমার সহযাত্রীরা নদী জলে নিক্ষিপ্ত হইল, যে নিক্ষেপ করিতেছিল তাহার অসাবধানতায় আমি সে পরিণাম হইতে নিষ্কৃতি পাইলাম—নদীতীরেই পড়িয়া রহিলাম। এমন সময় একটি গরু আসিয়া সুদীর্ঘ রসনা বেষ্টনে আমাকে তদীয় উদরাভ্যন্তরে প্রেরণ করিল। দুই দিন পর আবার দেখি আমি এক গৃহস্থের গৃহ পার্শ্বে গোময়ের মধ্যে অবলুপ্ত থাকিয়া নূতন প্রভাত কিরণে ঝক্ ঝক্ করিতেছি। শেষ পর্য্যন্ত কয়েকটি স্থল-পথের ছিন্ন শাখাগ্রে স্থান প্রাপ্ত হইয়া তাহাদের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছি। শাখাগুলিরও কচি কচি পাতা গজাইয়াছে।

এইরূপ নানা দুর্দ্দশার পর নূতন চেহারা লইয়া আজ আপনার কথাই মনে পড়িল। আপনি সবুজপত্রের রক্ষক; দেখিতেছেন, আপনি বর্ত্তমান থাকিতেই আমার কি দুর্দ্দশা। তবে আর আমরা কাহার অহঙ্কার করিব, কাহার ভরসা করিব! আমরা ত সবুজ থাকিতেই চাই। পোড়া সংসার বাদ সাধে। সংসার বলে দেশ কাল পাত্র বুঝিয়া চলিতে হয়। যদি না চলিতে চাই, সে জোর করিয়া চালাইয়া লয়। বয়সের অহঙ্কার, রঙের অহঙ্কার, তেজের

অহঙ্কার, রসের অহঙ্কার, কোন অহঙ্কারই কিছুতে রক্ষা করিতে পারি না।

আপনি যে পত্রের নিশান উড়াইয়া থাকেন, তাহা উচ্চ বৃক্ষশীর্ষবাসী, কিন্তু তাহার অবস্থাও নিরাপদ নহে। সংসার তাহা দিয়া আরামে বাতাস খাইবার জন্য পাখা তৈয়ারী করে, অথবা তাহাতে পুঁথি লেখে, কিন্তু এ দুই অবস্থায়েই তাহার সজীব বর্ণ সে রক্ষা করিতে পারে না।

যদি ইহার একটা প্রতিকারের পথ না করিতে পারিলেন, তবে মিছাই আপনি সবুজ গৌরব করেন। আশা করি, আমি যে অব-অবস্থাতেই থাকি, আপনি বেশ খোস মেজাজে ও বাহাল তবিয়তে আছেন। নিবেদন ইতি—

৺বিল্বপত্র বা বেলের পাতা,

হাল সাকিম—শ্রীঅরবিন্দ সেনের আঁস্তাকুড়,

ঠাকুরগাঁও।

৪ঠা চৈত্র, ১৩২৬।

শাস্ত্র ও স্বাধীনতা।

——:০:——

শাস্ত্র জিনিষটা হচ্ছে মানবজীবনের ব্যাকরণ। আর ব্যাকরণ জিনিষটা আর যাই হোক সেটা যে কোন রকমের axiom নয় এটা সেকালের গ্রীসের পিথাগোরাস্ থেকে আরম্ভ করে' একালের মাদ্রা-জের রামানুজ পর্য্যন্ত সবাই সাক্ষী দেবেন। কিন্তু ওই যে বলেছি শাস্ত্র জিনিষটা ব্যাকরণ আমার বোধ হয় ঐ কারণেই টুলো-পণ্ডিতদের কাছে ওর একটার আদর যতখানি আর একটার আদরও ততখানি, অর্থাৎ—তাঁদের কাছে যেমন সংস্কৃত-কাব্যের আগে সংস্কৃত ব্যাকরণ, তেমনি মানুষের জীবনের আগে মনুর শাস্ত্র। তাঁরা যেমন সূত্র শিখে কাব্য পড়েন তেমনি শাস্ত্র শিখে জীবন গড়েন, অর্থাৎ—গড়তে চান। কিন্তু তা ত চলে না—তাই জগতের পনের আনা তিন পাই লোকের পথ ঠিক তাঁদের পথের উল্টো।

ব্যাকরণের আধিপত্য কোথায়? ব্যাকরণ না হ'লে এক পা অগ্রসর হবার উপায় নেই কোথায়? এ আধিপত্য কেবল মৃত ভাষা সম্বন্ধে—ইংরেজিতে যাকে বলে dead language, অর্থাৎ—যে-ভাষা কারোও মুখে নেই কিন্তু বইয়ের পাতায় আছে। যে-ভাষা কারো মুখে নেই অথচ একদিন ছিল, সে-ভাষা বুঝতে হ'লে ব্যাকরণ ছাড়া উপায় নেই। তেমনি শাস্ত্রের আধিপত্য কোথায়?—সেইখানে, যেখানে সমাজ মৃত। যে-সমাজ একটুকুও চলে না অথচ একদিন

চলত—সেই চলা যে কেমন চলা তা জানতে হ'লে শাস্ত্র ছাড়া উপায় নেই। যে-সমাজ আজ চলবার শক্তি হারিয়েছে তাকে চলতে হ'লে প্রতি পদে পিছন থেকে শাস্ত্রের শ্লোকের ধাক্কা খেয়ে খেয়ে চলতে হয়। যখন নিজের চলবার উপায় নেই অথচ চলতেই হবে তখন আর কারো বা আর কিছুর ধাক্কা খেয়ে খেয়ে চলি তাতে আপত্তি নেই; কিন্তু আপত্তি করি তখন যখন শুনি যে ঐ যে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে চলা ঐ-ই হচ্ছে পরম সুন্দর চলা—কেবল পরম সুন্দরই নয়, সেই সঙ্গে সঙ্গে তা পরম মঙ্গল।

কিন্তু সত্য, সুন্দর ও মঙ্গল যদি পরস্পর বিরোধী কথা না হয় তবে ঐ চলা সুন্দরও নয় মঙ্গলও নয়, কেননা ঐ ধাক্কা খেয়ে খেয়ে চলা মানুষের সত্য নয়, কারণ মানুষের মধ্যে যে পরম দেবতা আছেন তিনি দাসও নন, জড়ও নন।

সুতরাং ঐ ধাক্কা খেয়ে চলার বিরুদ্ধে আপত্তির কারণ হচ্ছে এই যে—মানুষ নামক জীবটির মন বলে একটি পদার্থ আছে এবং এই মন জিনিসটির দুটি অভ্যাস আছে—সে হচ্ছে চিন্তা করা ও ইচ্ছা করা।

এই জন্যেই দেখতে পাই মানুষ নিয়তই নতুন পথে চলেছে—মাড়ান সহজ রাস্তা ছেড়ে যেদিকে রাস্তা নেই, হয় ত কেবল বন কেবল কাঁটা কেবল অন্ধকার, সেই দিকে ছুটে চলেছে। তাতে অনেক প্রাণ নষ্ট হয়েছে, অনেক মন দুঃখ পেয়েছে; কিন্তু মানুষের জীবনে ঐ ত সবার চাইতে ভগবানের বড় আশীর্ব্বাদ যে মৃত্যুর ভয় তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে নি, দুঃখের বেদনা তাকে দুর্ব্বল করে' ফেলতে পারে নি—তা যদি পারত তবে যে তাঁর লীলা দু'দিনে মিথ্যা

হ'য়ে উঠত, অর্থহীন হয়ে উঠত, বোঝার মত হয়ে উঠত। এই যে মানুষ নিত্য নব নব পথে চলেছে তাইতেই বিশ্বমানব সম্পদশালী হয়েছে। আর এই যে মানুষ নব নব পথে চলতে পেরেছে তার কারণ তার মন নামক পদার্থটি স্বীকৃত হয়েছে এবং সেই মনের চিন্তা করা censured হয় নি।

যেখানে এই মনের চিন্তা করা ও ইচ্ছা করা censured হয়েছে এবং মানুষ সেই censure-কে একান্ত করে মেনে নিয়েছে, সেখানেই বুঝতে হবে যে মানুষের মধ্যে পরবশ্যতাটাই বড় হ'য়ে উঠেছে, সত্য হ'য়ে উঠেছে।

কিন্তু পরবশ্যতাই ত মানুষের চিরন্তন নয়, তার গভীরতম সত্য নয়, তাই দেখতে পাই যেখানে শাস্ত্র আপনার অধিকার ছাড়িয়ে মানুষের শৃঙ্খল হ'য়ে উঠেছে, সূত্রকারের দর্ভ-আসনখানি ত্যাগ করে' প্রভুত্বের উচ্চ সিংহাসনে শস্ত্রধারী হয়ে বসেছে, সেখানে একদিন মানুষের অন্তরে অন্তরে রুদ্রের বিষাণ বেজে উঠেছে, ডমরুনিনাদ জেগে উঠেছে। মানুষ সেদিন আকুল কণ্ঠে বলেছে, আমার জানবার উপায় নেই গো, উপায় নেই। ঐ যে নিষেধের লম্বা তালিকা ঐ তালিকার তলে আমার বিচার বিবেচনাকে তলিয়ে দিতে পারব না গো পারব না। ঐ যে বিধির সংকীর্ণ লিষ্ট, ঐ লিষ্টের মাঝে আমার শক্তি গণ্ডীবদ্ধ হয়ে থাকবে না—থাকবে না—থাকবে না। মানুষ চিরদিন বলেছে-- শৃঙ্খলা আমি চাই-ই, কিন্তু শৃঙ্খল আমি চাই নে কিছুতেই।

এই যে মানুষের মনের স্বাধীনতা, যে স্বাধীনতা একমাত্র মানুষেরই অধিকার, এই স্বাধীনতা অস্বীকার করবে কারা ?—তারাই, যারা মর্ম্মে মর্ম্মে দাস, যারা মনে প্রাণে শূদ্র, স্বাধীনতা যাদের আন_

ন্দের সামগ্রী নয়, মঙ্গলের পথ নয়, স্বাধীনতা যাদের ভয়ের বস্তু। ঐ স্বাধীনতার পথ তার যার নিজের দায়িত্ব নিজে বয়ে চলতে হয়, নিজের দেবতাকে জাগ্রত ক'রে তুলতে হয়, নিজের মন বুদ্ধি দিয়ে চিন্তা করতে চায়। তাই ঐ স্বাধীনতার পথ শূদ্রের অসত্যের পথ; সুতরাং অমঙ্গলের পথ ধ্বংসের পথ, তার ভয়ের বস্তু—কারণ আত্মবশ্যতা যে শূদ্রের অধর্ম্ম।

এই যে দেশের চারিদিকে আজ এই মনের স্বাধীনতা প্রাণের মুক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা হয়েছে, সে ওই দেশের মুখবন্ধ শূদ্রান্তরাত্মার স্বাধীনতা-ভীতি থেকে উদ্ভূত করুণ আর্ত্তনাদ। কিন্তু মানুষের আত্মপ্রতারণার ত আর অন্ত নেই। তাই ঐ শূদ্র-সমষ্টির আর্ত্তনাদকে জড়িয়ে কতগুলো বড় বড় কথা আজ জেগে উঠল—কোনোখানে সনাতন ধর্ম্ম, কোনোখানে জাতীয় বৈশিষ্ট্য, কোনোখানে বাঙলার প্রাণ, কোনোখানে পেট্রিয়টিজ্‌ম্‌ বা অমনি আর কিছু। কিন্তু আসলে ভিতরের কথাটা হচ্ছে সবখানেই ঐ শূদ্র-অন্তরাত্মার স্বাধীনতা-ভীতি।

শূদ্র-অন্তরের এই স্বাধীনতা-ভীতিই আজ দেশের অন্তরে অন্তরে সত্য হয়ে উঠুক, দেশের বাল-বৃদ্ধ-যুবা বরণ করে নিক—এই দাসজনোচিত প্রার্থনা আজ আমরা করতে পারব না—বলাই বাহুল্য। মানুষের সকল অমঙ্গলের মূল যে তার স্বাধীনতা, এই এত বড় একটা প্রত্যক্ষ অসত্য স্বয়ং কৃষ্ণদ্বৈপায়ন এসে বললেও আজ আমরা মানতে পারব না। আমরা আজ শূদ্র গড়তে বসি নি। তাই আজ আমরা স্বাধীনতার বাণীই মানুষকে শোনাতে চাই। যে-স্বাধীনতার মাঝে শৃঙ্খলাই মানুষের আসল সত্য, যে-স্বাধীনতার মাঝে সংযমই মানুষের আসল অমৃত। আমরা আজ চাই প্রত্যেক মানুষটি তার আপনার

ভার নিক। কারণ দেখতে পাচ্ছি আমাদের সমাজ আমাদের প্রত্যেকের ভার নিয়েছে বলে' আমরা কেউ সমাজের ভার নিতে পারি নি। কেননা সমাজ কিছুই করতে পারে না যদি না সেই সমাজের লোকেদের কিছু করবার শক্তি থাকে। সমাজ এমন একটা ভেল্কি নয় যেখানে দুটো বোকারাম মিলে একটি বুদ্ধিমান হয় বা তিনটে "বিদ্যা দিগ্‌গজ" মিশিয়ে একজন এডিসন হয়। প্রত্যেক মানুষটাকে খাটো করলে অসত্য করে' তুললে সমাজকে একদিন না একদিন তার দাম কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়ে দিতে হবেই হবে।

(২)

এই যে আজ মানুষের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে দেশের চারিদিক থেকে শূদ্রান্তরাত্মার নানা তান জেগে উঠল—কোনোখানে বা দীপক কোনোখানে বা ভৈরবী কোনোখানে বা মিশ্রকানাড়া কোনোখানে বা লক্ষ্ণৌ ঠুংরী, এই সমস্ত এলোমেলো আর্তনাদের ভিতর থেকে আজ যে-কথাটা আমরা-কথঞ্চিৎ স্পষ্ট করে' শুনতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে বাঙালীর জাতীয়তা। আমরা আজ শুনতে পাচ্ছি যে বাঙলার মাটীর নাকি এমনি একটা গুণ আছে যে এখানে জন্মগ্রহণ করলে হয় শ্রীরাধা নয় চন্দ্রাবলী নেহাৎ পক্ষে নয় ত জটিলা কুটিলার কেউ একজন হতে হবেই হবে। বাঙালীর জাতীয়তার সূক্ষ্মদেহ যে দিব্য দৃষ্টিতে দেশের একদল লোকও দেখতে পেয়েছেন এতে বাঙালীর গৌরব নিশ্চয়ই—কিন্তু এ-দেখা যে আর কেউ মানছেন না, এমন কি যাঁরা মানছেন তাঁদের পর্য্যন্ত আচারে ব্যবহারে কথায় বার্ত্তায় চিন্তায় কর্ম্মে সেই সত্যই যে প্রকাশ হ'য়ে পড়ছে না সেটা নিশ্চয়ই একটা বিষাদ ব্যাথার অপেক্ষা রাখে।

আমাদের আশা আছে মহাপ্রলয়ের আগেই এ বিশদ ব্যাখ্যা একদিন না একদিন আমরা শুনতে পাব।

ইতিমধ্যে সপ্রতিভ ভাবেই এই কথাটা আজ আমরা স্বীকার করব যে একটা জাতির জাতীয়তাটা যে তার ঠিক কোন্‌খানটায়, তা স্পষ্ট করে দেখিয়ে দেবার সাহস আমাদের নেই। কেননা চোখে আমাদের দিব্যদৃষ্টি থাকলেও কপালে আমাদের দিব্যদৃষ্টির দাবী করতে পারি নে। অপর পক্ষে আমরা জ্যামিতি শাস্ত্রেও সুপণ্ডিত নই; সুতরাং আমাদের জাতীয়তাটা ঠিক রম্বস্‌, না রম্বোইড, না বিন্দু, অর্থাৎ—which has position but no magnitude—তা সঠিক বাৎলিয়ে দিতেও আমরা অক্ষম। কিন্তু এইটুকু বলবার সাহস আমাদের আছে যে, সমাজ যখনই কোনোখানে মাটা গেড়ে বসেছে তখনই মানুষ মিথ্যা হ'য়ে উঠেছে, কেননা মানুষের ধর্ম্ম বসে থাকবার ধর্ম্ম নয়, তা হচ্ছে সৃষ্টি করবার ধর্ম্ম, নব নব পথে নব নব জীবনের আশীর্ব্বাদ কুড়িয়ে।

তাই আজ আমরা বিনা দ্বিধায় এই কথাটা মনে করব যে যে-সত্যটা শাস্ত্রের কড়া শাসনে বজায় রাখতে হয় সেটা মোটেই সত্য নয়। কিন্তু আসল সত্য ঘটনা এই যে, শাস্ত্রের শাসনে কিছুই বজায় থাকে না—মনুসংহিতার পাতার সঙ্গে আজকার সমাজের দু' এক অধ্যায় মিলিয়ে দেখলেই তা ধরা পড়ে।

সুতরাং আজ আমরা জোর করেই বলব যে মানুষের মুক্তির দিকই বড় দিক, সেইটেই তার সত্যের দিক। মানুষের এই বড় দিকটায়, সত্যের দিকটায় এ পর্য্যন্ত কেউ এমন কোনো বাধা স্থাপন করতে পারে নি যাতে করে' মানুষের জীবন-স্রোত রুদ্ধ হয়ে গিয়েছে।

যখনই যেখানে এই জীবনস্রোত রুদ্ধ হবার জোগাড় হয়েছে তখনই সেখানে সমাজ-বুক থেকেই এক ক্রুদ্ধ ক্ষুব্ধ উদ্দাম উচ্ছল গতির বেগ ভীম গর্জ্জনে প্রলয় নিঃস্বনে সে জীবন-স্রোতের রুদ্ধ মোহনা উদ্‌ঘাটিত করে' দিয়েছে। তখন ভয়াতুরের ভীতি-কাতরকণ্ঠে করুণ আর্ত্তনাদ জেগে উঠেছে, আসন্ন মৃত্যুর বিভীষিকা দেখে তখন তাঁরা ইষ্টদেবতার নাম জপতে বসে গেছেন ; কিন্তু সেই গতির মাঝে, মুক্তির মাঝে জেগেছে নবীন প্রাণের তরুণ আনন্দ, তাদের উৎসাহ-ধারা, তাদের উৎসব-কাকলি এই তরুণ আনন্দ আবার চলেছে নব নব পথে নব নব আশীর্ব্বাদ কুড়িয়ে। আর এতেই বেড়েছে মানুষের গৌরব, সমাজের সম্পদ, বিশ্বমানবের নব নব কীর্ত্তি। এই হচ্ছে বিশ্বমানবের সনাতন ইতিহাস, সনাতন ধর্ম্ম।

বিশ্বমানবের এই সনাতন ইতিহাস সনাতন ধর্ম্ম অস্বীকার করে' কোনো সমাজ বা জাতিকে মন-গড়া জাতীয়তার প্লাস্‌তারা দিয়ে শক্ত করে' তুললে যে কি দুর্ঘটনা ঘটে তার সম্বন্ধে একটা গল্প আমার এক রসিক বন্ধু আমাদের শোনালেন। গল্পটা যে সত্যি তা ডাক্তার স্পুনারের মত প্রচণ্ড প্রত্নতাত্ত্বিকের পক্ষে পর্য্যন্ত মানা কঠিন। কিন্তু মিথ্যা গল্পের মধ্যেও যে অনেক সময় সত্য সিদ্ধান্ত সব থাকে তা, কি স্বদেশের বিষ্ণুশর্ম্মা, কি বিদেশের La Fontaine—দু'জনাই প্রমান করেছেন। সুতরাং গল্পটা বলছি।

(৩)

বন্ধুবর ফরাসের উপরে জোড়াসন হয়ে বসে কথকঠাকুরের মত হাত নেড়ে নেড়ে বলতে লাগলেন—"ওই যে তোমরা শোন

গ্রীন্‌ল্যাণ্ড, গ্রীন্‌ল্যাণ্ড—যেখানে সূর্য্যদেব নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও কচিৎ কদাচিৎ উঠে নিদ্রাতুর চোখে বরফের আয়নায় মুখ দেখেন, যেখানে দু'মাইলের মধ্যে তিন জন মানুষ পাওয়া যায় কি না সন্দেহ, যেখানে চারিদিকে কেবল বরফ, আর বরফ, আর বরফ, চারিদিকে কেবল সাদা আর সাদা আর সাদা, সেই যে গ্রীন্‌ল্যাণ্ড তা চিরকাল এমন ছিল না। ন' লক্ষ একানব্বুই হাজার বছর পূর্ব্বে ঐ দেশটা ছিল গ্রীষ্মপ্রধান দেশ—এই ঠিক বাঙলা দেশেরই মত। তখন ও-দেশ ছিল শস্যশ্যামলা, "নির্ম্মল-সূর্য্য-করোজ্জ্বল ধরণী," "শুভ্র জ্যোৎস্না পুলকিত যামিনীম, ফুল্ল কুসুমিত দ্রুমদল শোভিনীম্"—চারিদিকে গাছ পাতা লতা-গুল্ম ফুল ফল—কেবল সবুজ আর সবুজ আর সবুজ। তোমরা হয়ত বিশ্বাস করছ না, কিন্তু প্রমাণ শোন। আবহাওয়ার পরিবর্ত্তনে দেশের সব পরিবর্ত্তন হ'য়ে গেল কিন্তু দেশের নামটার গায়ে সে-যুগের ছাপ রয়েই গেল, ঐ কারণেই ও-দেশের নাম গ্রীনল্যাণ্ড।

সে যাই হোক, সেই ন' লক্ষ একানব্বুই হাজার বছর পূর্ব্বে সেই গ্রীন্‌ল্যাণ্ডে এমন এক সভ্যতা গড়ে উঠেছিল যে সে-সভ্যতা অর্ব্বাচীন ইউরোপীয় সভ্যতা বা অতি প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার চাইতে কোন অংশে হীন নয়। তোমরা দক্ষিণ আমেরিকার চিলি সভ্যতা বা Peruvian civilisation-এর কথা শোন, উত্তর আমেরিকার গ্রীন্‌ল্যাণ্ডে তেমনি এক সভ্যতা ছিল ন' লক্ষ একানব্বুই হাজার বছর আগে। গ্রীনল্যাণ্ডের সে-সভ্যতা যে কত উঁচুতে উঠেছিল সে সম্বন্ধে এইটুকু বললেই বোধ হয় যথেষ্ট হবে যে তারা তিন শ' তেষট্টি রকমের মানুষ-মারা কল আবিষ্কার করেছিল।

এইখানে আর একটা মজার কথা শুনে তোমরা নিশ্চয়ই আশ্চর্য্য হবে ও গৌরব বোধ করবে যে, সেই তখনকার গ্রীনল্যাণ্ডবাসীরা সবাই পোষাক পরত ঠিক আজকার বাঙালীর মত। মিহি তাঁতের ধূতি, আদ্দির পাঞ্জাবী, সূক্ষ্ম উড়ানি, বার্ণিশ করা লপেটা—একেবারে ফুল-বাবু। কিন্তু তারা ছিল যেমনি বলিষ্ঠ তেমনি সুন্দর—কি দেহে কি মনে। দেশে ঐশ্বর্য্য সম্পদ রাখবার আর স্থান নেই, চারিদিকে নগর নগরী জনপদ, সমুদ্রোপকূলে বিশাল বিশাল বন্দর, কত হর্ম্ম্য কত মন্দির কত স্মৃতি-সৌধ, কত প্রমোদ উদ্যান কত দীর্ঘিকা। দেশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত ছিল শুধু একটা জিনিস—জীবনের আনন্দ। জীবনের আনন্দ যেন শত ধারে সহস্র ধারে লক্ষ ধারে দুর্ব্বার হ'য়ে বিচ্ছুরিত উচ্ছ্বসিত হ'য়ে পড়ছিল—কোথাও ভয় নেই, কোথাও সীমা নেই, কোথাও দ্বিধা নেই—চারি-দিকে কেবল সাহস আর সাহস আর সাহস। এই সাহসকে আশ্রয় করে' গ্রীনল্যাণ্ডে যে সভ্যতা গড়ে উঠল সে এক অদ্ভুত ব্যাপার—সেই ন' লক্ষ একনব্বুই হাজার বছর পূর্ব্বে।

এমনি করে গ্রীনল্যাণ্ডের সেই সভ্যতা যে কত হাজার বৎসর চলে' এল তার ঠিক নেই। এমন সময় ঘটল এক পরিবর্ত্তন। খৃষ্ট পূর্ব্ব ঠিক ছ' লক্ষ সাড়ে সাইত্রিশ অব্দে হঠাৎ দেশের আবহাওয়ার পরিবর্ত্তন দেখা গেল। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ধীরে ধীরে শৈত্য অনুভূত হ'তে লাগল। নির্ম্মল সূর্য্য ক্রমে মলিন হ'তে লাগল। গাছপালা ক্রমে কঙ্কাল বের করতে লাগল। দেশের লোকে দেখলে মিহি সূতোর ধূতি চাদর পাঞ্জাবীতে আর চলে না। রেশম পশমের আমদানী হ'ল। তাঁতিদের তাঁতে মোটা মোটা গরম কাপড় বুনোনো হ'তে

লাগল। কিন্তু পশমের মোটা কাপড় ত আর ধুতির মত করে' পরা চলে না। সুতরাং কাটা কাপড় গ্রীন্‌ল্যাণ্ডবাসীরা পরতে সুরু করলে—সেই শীত থেকে বাঁচবার জন্যে।

এই রকম ত অবস্থা এমন সময় দেশের সাতখানি সংবাদপত্র সমস্বরে চীৎকার করে' উঠল—গেল গেল গেল! কি গেল?—গেল গ্রীনল্যাণ্ডবাসীর এতদিনকার জাতীয়তা। সাতাত্তর হাজার বছর ধরে তিরাশি হাজার পুরুষ যে মিহি ধুতি চাদর পাঞ্জাবী লপেটা ব্যবহার করে' এসেছে, তাই যদি গেল তবে আর গ্রীনল্যাণ্ডবাসীর জাতীয়তার রইল কি? চারিদিকে মহা আন্দোলন উপস্থিত হ'ল। সংবাদপত্রের পাতায় কলম ছুটতে লাগল, বড় বড় সভাগৃহে বক্তাদের কড়া গলা ফুটতে লাগল! কি সে কলমের জোর! কি সে গলার তোড়! অতিরিক্ত উৎসাহী যারা তারা বলতে লাগল ঐ যে অধ্যাপক হুৎস্কিমো আবিষ্কার করলেন যে, মানুষ বাঁচতে চাইলে তার খাওয়া দরকার, সে ত তিনি ধুতি চাদর পরতেন বলে'। ঐ যে নৌ-সেনাপতি ফারুৎমিরি অসাধারণ শৌর্য্যে Iceland-এর বিরাট নৌ-বাহিনীর জন্মের মত মাথা নীচু করিয়ে দিলেন সে ত ঐ ধুতি চাদরের জোরে। পণ্ডিতেরা সব বড় বড় মোটা নিত্য-কর্ম্ম-কুঞ্চিকা সনাতন-ধর্ম্ম-পঞ্জিকা ইত্যাদি খুলে স্পষ্ট করে দেখিয়ে দিলেন যে সেখানে পশমী কাপড়ের কোনো উল্লেখ মাত্র নেই। দেশের লোক সকল শুনে ত একেবারে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়। দিকে দিকে সভাসমিতি স্থাপিত হ'তে লাগল। যেমন করে' হোক গ্রীনল্যাণ্ডবাসীর জাতীয়তা বজায় রাখতেই হবে—যেমন করে' হোক। কড়া আইন তৈরী হ'ল—শাস্ত্রের সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে। আইন হ'ল যে তাঁতী পশমী

কাপড় বুন্‌বে তার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর, আর যে তা পরবে তার প্রাণদণ্ড। রাজা শীতে হি হি করে' কাঁপতে কাঁপতে আইনে সহি দিলেন, পুলিশ হি হি করে' কাঁপতে কাঁপতে ব্যাটন উঁচিয়ে তাঁতী-দের বাড়ী বাড়ী সন্ধান নিতে লাগল, আর দেশের তিন পোয়া লোক হি হি করে কাঁপতে কাঁপতে মরে' গেল। এক পোয়া লোক তাদের রক্তের তেজে কোন রকমে বেঁচে রইল। শীত ক্রমে বেড়েই চলল। কি রকম প্রকৃতির নিয়ম, দেখা গেল এই এক পোয়া লোকের সর্ব্বাঙ্গে বড় বড় লোম গজাচ্ছে। ক' হাজার বছর কেটে গেছে। একদিন দেখা গেল যে গ্রীনল্যাণ্ডবাসী সবাই বড় বড় রোঁয়াওয়ালা শিম্পাঞ্জি হ'য়ে উঠেছে। তারপর যখন একবার ভীষণ বরফ পড়তে সুরু করল তখন তারা সব ঠায় দাঁড়িয়ে মরল। গ্রীনল্যাণ্ডের সেই প্রাচীন সভ্যতার ও গ্রীনল্যাণ্ড বাসীর সেই প্রাচীনতর জাতীয়তার এইখানেই যবনিকা পতন।"

বন্ধুবর কথা শেষ করে' তাঁর পকেট থেকে সাজসরঞ্জাম বের করে' এমনি ভাবে একটি সিগারেট পাকাতে লেগে গেলেন যেন তিনি এতক্ষণ ধরে' যা বল্‌লেন সে-সব তাঁর নিজের চোখে দেখা ঘটনা।

বন্ধুবরের ঐ গল্পটা ডাহা মিথ্যে হোক, কিন্তু ওর পিছনে একটা সত্য আছে। সেটা হচ্ছে এই যে যখনই একটা সমাজের অচলতাকে সত্য ও বড় করে' তুলি তখন সেই সমাজের মানুষদের দ্বারা ডারউইন সাহেবের থিওরির উল্টো দিকটা হাতে কলমে প্রমাণ হবার সম্ভাবনা দাঁড়িয়ে যায়।

(৪)

আমরা মানুষের ব্যক্তিগত মুক্তির দিকটা, তার স্বাধীনতার দিকটা যতদূর সম্ভব প্রশস্ত করে' দিতে চাই—সমাজ-সঙ্ঘকে অসম্ভব করে' না তুলে। কেননা সঙ্ঘেই যে শক্তি, তা কে অস্বীকার করবে? কিন্তু কোন্ সঙ্ঘ শক্তিমান?—সেই সঙ্ঘ যে সঙ্ঘের প্রত্যেক অংশটি সামর্থ্যবান। অর্থাৎ—সমাজের যে শক্তি তা প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তি-ত্বের উচ্ছেদে নয়, তা হচ্ছে প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের বিকাশে ও তাদেরই মিলনে, অর্থাৎ—প্রত্যেক ব্যষ্টির annihilation-এ নয়, সমস্ত ব্যষ্টির co-operation-এ।

এই কথাটাই আমরা ভুলে যাই যে মাতৃভূমির মূর্ত্তি গড়িয়ে পুজোই করি আর যাই করি যেমন দেশের লোকের শক্তি ছাড়া আর কোথায়ও শক্তি নেই, তেমনি সমাজের গায়ে যত তেল সিঁদুরই লেপি না কেন সেই সমাজের সভ্যদের অন্তরে ব্যতীত আর কোনোখানে দেবতা নেই। সেই দেবতাদের শক্তিই শক্তি এবং সেই শক্তির মিলনই আসল শক্তি-ভাণ্ডার। কিন্তু প্রত্যেক মানুষের সমাজের এই দেবতা জাগ্রত হবে না যদি না তার মুক্তির দিক থাকে। সুতরাং এই মুক্তির দিকটাকেই আজ মুক্ত করতে হবে।

এতে সমাজপতিদের ভয় করবার কিছু নেই। মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার দিকটা যত প্রশস্তই হোক না কেন, তারা দলবদ্ধ হবেই, সমাজ তাদের মধ্যে গড়ে' উঠবেই, কেননা দলবদ্ধ হ'য়ে বাস করবার ইচ্ছা মানুষের এমনি একটা সত্য যা শাস্ত্রের শ্লোকে শ্লোকে গড়ে' ওঠে নি। সুতরাং ব্যক্তিগত মুক্তির দিক প্রশস্ততর করার মানেই

যে সমাজ-বন্ধন শিথিল হওয়া তা নয়। জগতের ভিন্ন ভিন্ন দেশ ও সমাজের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেই এ-সত্য ধরা পড়ে।

সকল প্রকার শাস্ত্রের মোহভার থেকে আমরা মানুষকে মুক্ত করতে চাই, কেননা একাল পর্য্যন্ত কি কর্ম্ম-জগতে কি ধর্ম্ম-জগতে মানুষের যে সম্পদ জন্মেছে তা মানুষের ব্যক্তিগত মুক্তির দিক খোলা ছিল বলে'। হিসেব নিলে দেখা যাবে যে প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক জাতি তাদের যা কিছু নিয়ে আজ গৌরব করছে তার অধিকাংশই লব্ধ হয়েছে দশজনের পরামর্শ সভা বসিয়ে নয়—কিন্তু এক এক জনের আনন্দের ভিতর দিয়ে, যে আনন্দ কোনো শাস্ত্রীয়-শ্লোকের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় নি। এই বাঙলা দেশেই আজ আমরা সাহিত্য-ক্ষেত্রে যে তিনজনকে নিয়ে সবার চাইতে বেশি গৌরব করি—মধুসূদন, বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথ—এই তিন জনাই তাঁদের কীর্ত্তি স্থাপন করেছেন তাঁদের ব্যক্তিগত মনের মুক্তির দিক দিয়ে। তা যদি না হত তাঁরা যদি পদে পদে বাঙলা গদ্য পদ্যের শাস্ত্র মেনে চলতেন তবে আজ বাঙলা সাহিত্য তাঁদের বিচিত্র সৃষ্টি দিয়ে যে সম্পদশালী হয়ে চলত না তা নিশ্চয়। বাঙলা পদ্যের পয়ারের বেড়ী যদি রবীন্দ্রনাথের মনের কঠিন শৃঙ্খল হ'য়ে থাকত তবে বাঙলা সাহিত্যে তাঁর দান আজ কি দাঁড়াত কে জানে। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় তাঁর মনের মুক্তির দিকটা তাঁর পক্ষে অস্বীকার করা অসম্ভব ছিল।

এইখানে কেউ বা বলে উঠতে পারেন যে সবাই ত আর রবীন্দ্রনাথ নয়। রবীন্দ্রনাথ তার মুক্তির ভিতর দিয়ে যে সম্পদ ব'য়ে এনেছেন অন্য কেউ এই মুক্তিকে আশ্রয় করলে হয়ত কেলেঙ্কারি করে বসবে।

কিন্তু তাতে সমাজের ভয় করবার কোনো প্রয়োজন নেই। কেননা ঐ কেলেঙ্কারি যে করবে সে নিজেই ঠকবে, ঠেকে শিখবে।

কিন্তু সবাই রবীন্দ্রনাথ নন। এর একটা অন্য দিকও দেখবার আছে। সমাজের সবাই যদি রবীন্দ্রনাথ হতেন তবে এতে করে' মুক্তির পতাকা সমাজের বুকে তুলে রাখবার কোনই দরকার হত না। কেননা রবীন্দ্রনাথের মত ব্যক্তিদের অন্তরে এমন একটা দীপ্ত সত্য থাকে যা সকল বাধা বিঘ্ন সত্ত্বেও আপনাকে সার্থক করে তোলে। এঁদের কানের কাছে মুক্তি মুক্তি বলে' জপ করবার কোনই দরকার নেই, এঁরা নিজেরাই নিজের পথ করে' নেন।

আগেই বলেছি, সবাই রবীন্দ্রনাথ নয়। প্রত্যেক সমাজে তিন রকমের লোক আছেন। এক রবীন্দ্রনাথের মত যাঁরা অসাধারণ, যাঁদের সাক্ষাৎ ক্বচিৎ কদাচিৎ মেলে। আর এক রকম অতি সাধারণ, যাঁরা হাজার বক্তৃতা হাজার উৎসাহ হাজার উদ্দীপনার মাঝেও বাঁধা পথে পাকা হয়েই থাকবেন। শালগ্রামের মত এঁদের শোয়া বসা সমান। তমের টানই এঁদের মধ্যে প্রবল। আর এই অসাধারণ ও অতিসাধারণের মাঝে আর এক রকমের লোকআছেন যাঁরা এমনি একটা আলগা সাম্য অবস্থায় এমনি একটা equllibrium অবস্থায় আছেন যে এঁদের একটু ঠেলে দিলে উপরে উঠতে পারেন আবার একটু টিপে দিলে নীচে নেমে পড়বেন। এঁরা একটা কিছু হলেও হতে পারেন, একটা কিছু করলেও করতে পারেন—যদি থাকে তাঁদের পিছনে সমস্ত সমাজের অনুমতি সমস্ত সমাজের উৎসাহ ও উদ্যম। এঁদের জন্যেই চাই সকল অতীতের শাসন-ভীতি থেকে, শাস্ত্রীয় শৃঙ্খল থেকে সমাজের মাঝে মুক্তির বাতাস, কেননা

অসাধারণরা যদি সমাজের মাথা হন তবে এঁরাই হচ্ছেন তার মেরুদণ্ড। মাথা যে সম্ভারই ব'য়ে আনুক মেরুদণ্ডের যদি তা গ্রহণ করবার ও বহন করবার শক্তি ও প্রবৃত্তি না থাকে তবে সে অসাধারণের দানের মূল্য সমাজের কাছে হ'য়ে থাকবে কেবল শূন্য।

তাই আজ আমাদের স্পষ্ট করে' বলতেই হবে যে—চাই মুক্তি। মুক্তি—সকল প্রকার বন্ধন থেকে, অর্থাৎ—সকল প্রকার মিথ্যা থেকে। কেননা মিথ্যাই বন্ধন। চাই মুক্তি সেই শাস্ত্র থেকে যে শাস্ত্রে আমাদের মনের ছাপ নেই, প্রাণের ছাপ নেই, বুদ্ধির ছাপ নেই, আমাদের কালের ছাপ নেই। আমরা আমাদের একালের জীবনকে মুক্ত করতে চাই সেকালের শাস্ত্র থেকে। কেননা জীবন হচ্ছে কাব্য আর শাস্ত্র হচ্ছে ব্যাকরণ। কিন্তু আজ আমাদের মুখের বাঙলা ভাষার গায়ে সংস্কৃতের স্পর্শ থাকলেও যেমন তা সংস্কৃত নয়, তেমনি আমরা সে কালের লোকের বংশধর হলেও আমাদের মন ঠিক তাঁদের মন নয়। সুতরাং আমাদের মন তাঁদের শাস্ত্র দিয়ে একেবারে প্রতি পদে চালিত হতে পারে না। আমরা যেন আজ মনে করতে পারি যে আমরা গরুও নই গাধাও নই—আমরা মানুষ। এই নতুন কালের মাঝে নতুন অবস্থা নতুন পারিপার্শ্বিকের মধ্যে নতুন প্রশ্ন নতুন সমস্যার সাম্‌না সাম্‌নি দাঁড়িয়ে জীবনকে মঙ্গলের পথে জয়ের পথে গৌরবের পথে নিয়ে যাবার ক্ষমতা আমাদের স্বাধীনতার মধ্যেই আছে, অতীতের শাস্ত্রের মধ্যে নেই।

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

ফাঁকা।

—:*:—

বাড়ীর উঠানে একটা মস্ত জামগাছ ছিল। জাম সে বছর বছর দিত না—তবু তার বয়স পঞ্চাশ বছর। জন্মে অবধি তাকে দেখছি। শুনেছি সে বাবার নিজের হাতে পোঁতা। আমার বেশ মনে আছে, পেরেক ফুটবে বলে বাবা তার গায়ে বাড়ীর নম্বর-আলা টিনের চাক্তি মারতে দেন নি।

কতজনে তার কত নিন্দা করতে লাগলো। কেউ এসে বললে "জামগাছের হাওয়া ভাল নয়", কেউ বললে "ঐ জন্যেই তোমাদের বাড়ীর অসুখ ছাড়ায় না", কেউ বললে "তা না হোক্ বাড়ীটাকে আওতা করে রেখেছে", কেউ বললে "রাত্রে মাথা-ঠুকে যাওয়া সম্ভব", কেউ বললে "জামের ডাল বড় পল্‌কা—ছেলেপিলে না পড়ে যায়", কেউ বললে "কাটলে অনেক তক্তা বেরোবে—বাড়ী মেরামত করছো, কাজে লাগবে।"

দশের কথায় কান ভারী হল—তবলদার ডেকে আনালুম। তারা এসেই কোপ জুড়ে দিলে। আমি আড়ালে বসে কাজ করতে লাগলুম কিন্তু কোপের আওয়াজ কেমন ভাল লাগলো না—উঠে তফাতে চলে গেলুম; কিন্তু কেন জানি না তখনি আবার উঠানে এসে দাঁড়াতে হল।

দেখি, গাছকে তখন নেড়া করে ফেলেছে। কোথায় গেছে তার

সেই সবুজ ছাতি যা সে এতদিন ধরে মাথায় দিয়ে ছিল। আমি বাড়ীর ভিতর গেলুম একটা পান খেয়ে আসতে।

এসে দেখি, তার গোড়ার বাঁধন ঢিল হয়ে এসেছে। কোপের মুখে সে থেকে থেকে কেঁপে উঠছে; তবু প্রাণপণে মাটী কামড়ে আছে—তার অনেক দিনকার মাটী। চাকরকে "তামাক সাজ" বলে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লুম।

ফিরে এসে দেখি যে টলমল করে ছুলচে—দুজনে দড়ি দিয়ে তাকে টানচে, আর একজন তখনো গোড়ায় কোপ মারচে। তবু সে পড়তে চায় না। তার দু'চারটা শির-বেরোনো আঙুল তখনো মাটীকে মুঠো করে ধরে রয়েছে, আর গোড়া দিয়ে হুহু করে লালচে রস বেরোচ্ছে—সে রস, না রক্ত!

আছে—এখনো আছে। এখনো যদি তার গোড়ায় মাটী চাপা দেওয়া যায়, হয়ত সে সামলে ওঠে। কিন্তু কেউ তা দিলে না। সে চিড় চিড় করে শব্দ করে উঠলো—আমি খুব জোরে গড়গড়ার নল টানলুম।

'মিড়—মিড়—মিড়—মড়—মড়—মড়—মড়—ধড়াম্'। সব শেষ। নীচের দিকে চেয়ে দেখি সে পড়ে রয়েছে, উপর দিকে চেয়ে দেখি খোলা আকাশ হাঁ করে আমার দিকে চেয়ে।

সকলে এসে বললে—"বাঃ বাড়ীময় আলো—কেমন ফাঁকা দেখাচ্ছে।"

আমি উত্তর দিলুম—"সবই ফাঁকা।"

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক।

প্রজাস্বত্বের কথা।

—৹৹৹—

বীরবলজী,

আর একটু হলেই আপনাকে 'বীরবল বাবু' বলে ফেলেছিলাম। হঠাৎ স্মরণ হল আপনি আকবর শাহের দরবারের "দরবারী" ছিলেন। এ দেশে তখনো "বাবু" কথাটা চলতি হয় নি। অতএব আপনাকে "জী" বলেই সম্ভাষণ করতে সাহস করছি, "মিষ্টার" বললেও হয় ত হত, কিন্তু দেশী লোকের নামের সঙ্গে ঐ শব্দটার প্রয়োগ আমি এখনও ঠিক বুঝতে পারি নে। আগে মনে করতাম বিলেত-ফেরত ব্যক্তিদের নামের আগেই ও-টার ব্যবহার হয়। যাঁরা কখনো বিলেত যান নি, এখন দেখছি তাদের নামকেও ঐ শব্দটি অলঙ্কৃত করেছে। যা হোক, "জী" সম্বোধনে ভরসা করি, আপনার কোনো আপত্তি হবে না, কারণ ওটা সনাতন সম্বোধন।

আপনাকে এই পত্রখানা লেখবার আবশ্যক হচ্ছে এই যে, শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় এবারকার (গত বৎসরের ফাল্গুন চৈত্র মাসের) সবুজপত্রে "রায়তের কথা" লিখেছেন, আর আমি হচ্ছি একজন রায়ত ও কৃষক, সুতরাং আমার ও-সম্বন্ধে কিছু বলবার আছে। আর শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ও, যাঁকে চৌধুরী মহাশয় "রায়তের কথা" লিখেছেন, আমার বক্তব্যটা ইচ্ছা করলে শুনতে পারবেন। তাঁকে শোনাবার কারণ এই যে, কৃষ্ণনগরের রায়ত সভায় এবং মেদিনীপুরের

প্রাদেশিক সমিতিতে কৃষকের হিতের জন্য তিনি দুটো ভাল কথা বলেছেন। মানুষের স্বভাবই এই যে, যেখানে মানুষ দুটো মিষ্ট কথা শুনতে পায়, সেইখানেই আর দুটো কথা বলতে চায়। তাই আমি আপনার কাছে, তথা রায় মহাশয়ের কাছে, দুটো কথা বলতে সাহস করেছি। আপনি ঠিকই বলেছেন যে অবস্থা বুঝলে ব্যবস্থা করবার সুবিধা হবে। এ পর্য্যন্ত আমাদের ব্যবস্থাপক সভায় যাঁরা আমাদের প্রতিনিধিত্ব করতে গিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে কৃষকের অবস্থাটা বেশ ভাল করে বোঝেন এমন লোকের সংখ্যা খুব বেশি নয়। তার উপর ব্যবসাদার সম্প্রদায়ের, মিউনিসিপালিটির, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের, যেমন নির্ব্বাচিত নিজস্ব প্রতিনিধি আছেন, কৃষক সম্প্রদায়ের তেমন নির্ব্বাচিত নিজস্ব প্রতিনিধি নেই। কিন্তু জমিদারদের সে রকম প্রতিনিধি আছেন। তা' ছাড়াও অন্য রকমে নির্ব্বাচিত হয়ে, জমিদার স্বয়ং এবং প্রতিনিধি দ্বারা ব্যবস্থাপক সভায় তাঁদের প্রভাব বিস্তার করেন। এখন শুনছি সে অবস্থাটা থাকবে না। এর নিয়মগুলি এখনও প্রকাশিত হয় নি। এখন চাই কৃষকের যিনি প্রতিনিধিত্ব করতে চাইবেন তাঁকে কৃষকের কাছে জবাবদিহি করতে হবে আর প্রতিনিধির কর্ত্তব্যপালনে ত্রুটি করলে, পরে আর প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হতে পারবেন না। এই প্রজাস্বত্ববিষয়ক আইন সম্বন্ধেই ব্যবস্থাপক সভায় একবার কি হয়েছিল, তা' বোধহয় আপনি জানেন। ওয়ারেন হেষ্টিংসের পাঁচ শালা বন্দোবস্ত, তারপর শাল শাল বন্দোবস্ত, তারপর দশ শালা বন্দোবস্ত, তারপর দশ শালের দু'শাল না যেতে যেতেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত; তারপর ১৮৫৯ শালের দশ আইন, তার পর ১৮৬৯ শালের আট আইন প্রভৃতি সব করেও যখন কৃষকের দুঃখ

ঘুচল না, তার প্রতি অত্যাচার কমল না, তখন ১৮৭৬ সালে এই আইন-সাগর মন্থন করে একটা নতুন আইন করবার জন্য এক পাণ্ডু-লিপি ব্যবস্থাপক সভায় পেশ হল। উদ্দেশ্য, কৃষকের স্বত্বটা সুনির্দ্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। স্মরণ রাখবেন প্রজাস্বত্ববিষয়ক এতগুলি আইন হয়ে গিয়েছে, কিন্তু প্রজাস্বত্ব পদার্থটিই অনির্দ্দিষ্ট থেকে গিয়েছে! যাক্ তিন বৎসরব্যাপী বাদানুবাদের পর এর ফল হল এক কমিশনের নিয়োগ! একটা Rent Law commission নিযুক্ত হল, আর তার সাহায্যের জন্য নিযুক্ত হ'ল এক কমিটি, যার সদস্য হলেন অভিজ্ঞ রাজকর্ম্মচারী, নীলকর সাহেব ও জমিদার!! আর প্রজা বা তার প্রতিনিধি?—নাদারৎ। কৃষকের পিতৃ-পুরুষের পুণ্যফলে এঁদের প্রস্তাবিত আইনের পাণ্ডুলিপিটি গভর্ণমেণ্ট গ্রহণ করেন নি। এবারেও শোনা যাচ্ছে যে, বিহারের নীলকর ও জমিদার জোট বেঁধেছেন। প্রজার হিতে না কি এঁদের অহিত হয়। আর এঁরাই জগৎকে বোঝাতে চান যে এঁরাই প্রজার স্বাভাবিক নেতা! এই জন্যই এবার কৃষকের অকৃত্রিম নেতা চাই।

আপনার কথায় বোধ হয় যে পাছে জমিদারেরা মনে করেন যে, আপনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তটা উঠিয়ে দেবার পক্ষপাতী সেই জন্য আপনি শঙ্কিত। কিন্তু আপনি জানেন যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তটা যে প্রকৃতই চিরস্থায়ী হবে এমন কেউ-ই মনে করেন নি। কারণ, বন্দোবস্তটা করবার আগে কোনো অনুসন্ধানই করা হয় নি। আপনি ত আকবরের দরবারের অন্যতম রত্ন। আকবর টোডরমলের সাহায্যে কেমন করে দেশটাকে পরগণায় পরগণায় ভাগ করে জমির গুণাগুণ অনুসারে শ্রেণী বিভাগ করে, আর নিরিখ বেঁধে দিয়ে কানুন-গো

পাটোয়ারি নিযুক্ত করে সমস্ত ব্যাপারটা শৃঙ্খলাবদ্ধ করে দিয়েছিলেন। তারপর মুরশিদকুলী খাঁও বাঙলা দেশে ঐ রকম করে খাজানা নির্দ্ধারিত করে দিয়েছিলেন। লর্ড কর্ণওয়ালিস এসব বিষয়ের কোনো অনুসন্ধানই করলেন না। স্থানীয় রীতি কি, তারও অনুসন্ধান করলেন না। এই অনুসন্ধানটা না কি কোম্পানীর ডিরেক্টারেরা নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন। কোম্পানীর রিপোর্টে উল্লিখিত আছে—"the lights formerly derivable from the Kanungo's office were no longer to be depended on, and a minute scrutiny into the value of lands by measurements and comparison of the village accounts, if sufficient for the purpose, *was prohibited from home* (Fifth Report on the affairs of the East India Company to the House of Commons vol. I, page 23). অনুসন্ধান ত হলই না, তাঁর পরিষদবর্গের মতামতও নেওয়া হল না। শোর প্রভৃতি মন্ত্রিরা যখন ত্রুটি দেখিয়ে দিলেন তখন লর্ড কর্ণওয়ালিস যেন একটু বিরক্ত হয়েই বলেছিলেন—"I think it unnecessary to enter into any discussion of the grounds on which their (Zamindars') right appears to be founded. It is the most effectual mode for promoting the general improvement that I look upon as the important object for our present consideration, (Lord Cornwallis, in the Fifth Report vol. I, page 591). গবর্ণর জেনারেল যখন এ বিষয়ে তর্কবিতর্ক অনাবশ্যক মনে করলেন তখন আর তর্কবিতর্ক অবশ্যই হল না।

১৭৯৩ সালের ২২ মার্চের সুপ্রভাতে লর্ড কর্ণওয়ালিস ঘোষণা করলেন —"The Governor General in council accordingly declares to the Zamindars, independent Taluqdars and other actual proprietors of land, with or on behalf of whom a settlement has been completed that at the expiration of the term of the settlement (ten years) no alteration will be made in the assessment which they have respectively engaged to pay, but that they and their heirs and lawful successors will be allowed to hold their estates at such assessments *for ever*. Land systems in British India, by Baden-Powell. vol. I, p. 400, foot note,). এখন দেখুন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মূলভিত্তি যে ঘোষণা, তাতে কৃষকের নামমাত্র নাই, আছে জমিদার তালুকদার এবং অন্যান্য জমির অধিকারী! কৃষকের অস্তিত্বই স্বীকার করা হয় নি। তার স্বত্ব ত পরের কথা। এ সম্বন্ধে একজন অজ্ঞাতনামা সিভিলিয়ান তার "Land Tenures" নামক গ্রন্থে বলেন, "In point of law and fact, the raiyats can claim (that is ordinary raiyats can claim) under the provisions of Lord Cornwallis' Code, NO RIHTS at all. (Land Tenures, by a Civilian. page 104).

কিন্তু যাক স্বত্ব অধিকারের কথা। চৌধুরী মহাশয় বলেছেন ও কথাগুলো আমরা বুঝি না। কিন্তু আমরা যা বুঝি, হাড়ে হাড়ে বুঝি, তারই একটা প্রতিকার হোক। এই সে দিন পর পর দু'বৎসর

অনাবৃষ্টি হওয়ায়, দেশে হাহাকার পড়ে গেল, লোকের পেটে অন্ন নাই, পরিধানে বস্ত্র নাই। কৃষক ভিক্ষা করে' কর্জ্জ করে' চুরি করে' প্রাণ পাখীটিকে কোনো রকমে দেহ-পিঞ্জরের মধ্যে রাখলে। জমিদার ও মহাজন তাঁদের প্রাপ্যের জন্য নালিশ করলেন, জমি বিক্রী হয়ে গেল, আর যা-কিছু ছিল, তাও তাই হল। কৃষক দিন-মজুরী করতে আরম্ভ করলে। এটা যে কৃষক বুঝেছে, সে বিষয়ে বোধ করি কারো কোনো সন্দেহ নেই। অনাবৃষ্টিটা ভারতবর্ষের একচেটে সম্পত্তি কি না জানি নে, কিন্তু অনাবৃষ্টির ফল দুর্ভিক্ষ যে ভারতবর্ষের একচেটে তা বেশ জানি। সেটা আর অন্য কোনো দেশে হয় না। কিন্তু কৃষকের জমিটুকু যদি বাস্তবিকই কৃষকের হত, বাকী খাজনার জন্য যদি নিলাম বিক্রী হয়ে না যেত ত কৃষককে কুলী হতে হত না। কথা উঠতে পারে তা হলে জমিদারের বাকী খাজনা কি করে আদায় হবে? এর উত্তর এক কথায় দেওয়া যায় না। নানা উপায়ে তা হতে পারে। তার মধ্যে একটা উপায় হচ্ছে এই যে, শস্য উৎপন্ন হলে কৃষকের খরচের মত রেখে, বাকীটা ক্রোক করে, বিক্রী করে নেওয়া যেতে পারে। জমিদারকেও সতর্ক হতে হবে, তিনি ঘুমিয়ে থাকবেন আর যখন ইচ্ছা নালিশ করে কৃষকের জমিটুকু কেড়ে নেবেন, তা হতে পারবে না। এ সম্বন্ধে বর্ত্তমান আইনটিও বড় চমৎকার। কৃষির লাঙ্গল, গোরু, বীজ প্রভৃতি বিক্রী হতে পারে না, কিন্তু যাতে লাঙ্গল, গোরু, বীজের ব্যবহার হবে, সে জমিটা বিক্রী হতে পারে! এই ক্রোক বিক্রীটা এ দেশে সম্পূর্ণ নতুন। হিন্দুদের রাজত্বেই বলুন, আর মুসলমানদের রাজত্বেই বলুন এটা ছিল না। এটি সম্পূর্ণ বিলিতি আমদানী। কোম্পানীর বিলিতি কর্ম্মচারীরা এ দেশের জমিদারকে তাঁদের দেশের

land lord বলে যেমন ভ্রম করলেন, প্রজাকেও তেমনি tenant বলে ভ্রম করলেন। আর সেই ভ্রমের বশেই সেখানকার ক্রোকের আইনটা এ দেশে আমদানী করে ১৭৯৩ শালের ২২ রেগুলেশন দ্বারা এ দেশে জারি করলেন। Rent Law Commissioner-দের রিপোর্টে প্রকাশ যে—"distraint is an off set of English Law, which was originaly introduced into this country by Regulation xxii of 1793, which empowered certain specified landlords to distrain and sell the crops and products of the earth of every description the grain, cattle, and all other personal property) whether found in the house or on the premises of the defaulter or any other person) belonging to the tenants. This continued to be the law until 1859 when the power of distraint was limited to the produce of the land on account of which the rent was due. এর থেকে স্পষ্টই বুঝা যায় যে জমিদারের সুবিধার জন্য যা-কিছু আবশ্যক সবই করা হয়েছিল, প্রজার জন্য কিছুই করা হয় নি। এর পূর্ব্বের রেগুলেশন, অর্থাৎ—১৭৯৩ সালের ৭ রেগুলেশনটি আরও ভয়ানক—তার দ্বারা আদালতের সাহায্য না নিয়েই জমিদার প্রজার সম্পত্তি ক্রোক করতে পারতেন এবং প্রজাকেও গ্রেফ্তার করতে পারতেন। প্রায় বিশ বৎসর প্রজা এই উৎকট আইনের যন্ত্রণা ভোগ করেছিল। তারপর ১৮১২ সালের ৫ রেগুলেশনের দ্বারা গ্রেফ্তারের ক্ষমতা উঠিয়ে দেওয়া হল, কিন্তু সম্পত্তি ক্রোকের ক্ষমতা পূর্ব্ববৎ থাকল। রেণ্ট-ল-কমিশনারগণ

ক্রোকের ক্ষমতাটাও সম্পূর্ণরূপে উঠিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু প্রবল জমিদারেরা প্রবল আপত্তি করলেন। আর প্রজার পক্ষে কথা কইবার একটি লোকও ছিল না। সে প্রস্তাব গ্রাহ্যই হল না। কমিশনের রিপোর্টে আছে—"The Rent Law Commission proposed to abolish the law of distraint altogether but to this strong objections were taken (Rent Law Commissioner's Report. Vol 1. p. 6).

চৌধুরী মহাশয় বলেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তটা emergency আইন। কিন্তু সে সময়ে কোন emergency ত দেখতে পাওয়া যায় না। ১৭৬৫ শালে কোম্পানী বাঙ্‌লা-বিহার-ওড়িষ্যার দেওয়ানী পান। সেই সময় থেকেই কিসে সহজে বিনা আয়াসে এই বিস্তীর্ণ দেশটার খাজানাটা কোম্পানীর ধনাগারে এসে পৌঁছয়, এই ছিল কোম্পানীর চিন্তার বিষয়। আটাশটি সুদীর্ঘ বৎসর এই চিন্তায় কেটে গেল। তারপর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জারি হল। আর যিনি জারি করলেন তিনি বললেন যে এ নিয়ে আর তর্কবিতর্ক তিনি চান না, অনুসন্ধানও চান না। Energency আইন হোক আর নাই হোক, আইনটি আর এ অবস্থায় থাকতে পারে না, এর আমূল পরিবর্ত্তন ও সংশোধন দরকার, তাতে লোকে Bolshevism ই বলুক আর যাই বলুক। সময় মত এই পরিবর্ত্তন ও সংশোধন হয় নি বলেই ত আজ রাশিয়ার দুর্ব্বল প্রজা বলসেবী হয়ে উঠেছে। যে সময়ে এদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ঘোষিত হল সেই সময়ে ফ্রান্সের দুর্ব্বল প্রজারাও বলসেবী হয়েছিল, তখন অবশ্য বলসেবী কথাটা জন্মায় নি। কিন্তু Bolshevic কথার উৎপত্তি হোক আর নাই হোক, সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার

নামে অনেক অত্যাচার অনাচারই অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু তা হলেও ফরাসীবিপ্লবকে আজ আর কেউ অবিমিশ্র অমঙ্গলের হেতু মনে করে না। কিন্তু এদেশে কৃষকদের মধ্যে তার কোনো সম্ভাবনাই নাই। সে অর্দ্ধাশন ও রোগকে জীবনের চিরসহচর করে নিয়ে সমস্ত শরীর মনের বল হারিয়ে দারিদ্র্য-দুঃখকে অদৃষ্ট-দেবতার্পিত করে বসে আছে। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় এবং তাঁর মত কৃষক-হিতৈষী যদি এই শাসন-প্রণালীর পুনর্গঠনের দিনে তার পক্ষ হয়ে দাঁড়ান, তা'হলে কৃষক কৃত-কৃতার্থ হবে। আরম্ভেই বলেছি, আমি কৃষক, আমার অভাব অভিযোগ দুঃখ ক্লেশ অনেক। আপনার যদি শোনবার সহিষ্ণুতা থাকে ত আরো ক্রমে বলব।

চাতরা, হাজারিবাগ,
১০ই বৈশাখ, ১৩২৭।

শ্রীহৃষীকেশ সেন।

আর্য্য অনার্য্য।

—:•:—

১৩২৫ সনের কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ সংখ্যার সবুজপত্রে "বাঙলা ভাষার কুলজী" ব'লে আমার এক প্রবন্ধ বা'র হয়। এই বছরের জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়ের "প্রতিভা"তে শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় তাঁর এক সমালোচনা ক'রে আমায় সম্মানিত ক'রেছেন। দেশে আর এখানে নানা কাজে ব্যস্ত থাকায় এতদিন চন্দ মহাশয়ের সমালোচনা-টির উপর আমার বক্তব্য লিখে উঠ্‌তে পারি নি, তবে "Better late than never"—এ প্রবাদের নজীরে অল্প কিছু লিখে পাঠাচ্ছি। আমার প্রবন্ধে প্রকাশিত মতের সঙ্গে চন্দ মহাশয়ের মতের মিল নেই। তিনি মনে ক'রেছেন, তাঁর প্রতি আমি 'ঠেস দিয়ে কথা ব'লেছি,' তাঁকে উদ্দেশ ক'রে আমি শ্লেষ-বিদ্রূপ ক'রেছি, তাই তিনি একটু অসহিষ্ণু হ'য়েছেন মনে হয়। কিন্তু আমি কৈফিয়ৎ হিসেবে বল্‌ছি, প্রবন্ধ লেখবার সময় তাঁর কথা আমার আদৌ মনে হয় নি—তাঁর সমালোচনা পড়ে তিনি এইরূপ ভাব প্রকাশ ক'রেছেন

দেখে আমি বিশেষ অশ্চর্য্যান্বিত হ'য়েছি। জাতিতত্ব বিষয়ে তাঁর সিদ্ধান্ত-গুলি আমি নিতে পারি নে, কিন্তু "গৌড়রাজমালা" ও "Indo-Aryan Races"-এর লেখককে আমি যথোচিত শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখি। আমার প্রবন্ধ আমি কোনও ব্যক্তিবিশেষকে উদ্দেশ ক'রে লিখি নি; চন্দ মহাশয় আমার মন্তব্যগুলিতে ক্ষুণ্ণ হওয়ায় আমি দুঃখিত।

কিন্তু ব্যক্তিগত ব্যাপারটা কিছুই নয়। বাঙালী জাতির আর আর বাঙলা ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে আমরা বিভিন্ন মত পোষণ করি। আমি আমার প্রবন্ধে ব'লেছি, বাঙালী জাতি হচ্ছে মূলত মিশ্র অন্-আর্য্য জাতি, আর্য্যভাষা আর আর্য্য সভ্যতা নিয়েছে মাত্র; তাও খুব প্রাচীন কালে নয়। বাঙলাভাষার রীতিনীতি হচ্ছে আর্য্যেতর; উপাদান, অর্থাৎ—ধাতু শব্দ প্রভৃতি আর্য্যভাষার, কাঠাম বা রূপ হচ্ছে অনার্য্য। বাঙলা ভাষার ঠিক ইতিহাসটি বা'র হ'লে যে-জাতের মধ্যে এ ভাষার উদ্ভব সেই বাঙালী জাতের সম্বন্ধে অনেক গুপ্ত রহস্য প্রকাশিত হবে। বাঙলার অনার্য্য ভাষীর মুখে মাগধী অপভ্রংশ ব'দলে বাঙলা ভাষায় পরিবর্ত্তিত হ'য়েছে। বাঙলা ভাষার চর্চ্চায় প্রাকৃত সংস্কৃত পড়া দরকার, কিন্তু কোল-দ্রাবিড়-বোড়োর চর্চ্চাও বাঙালীর ভাষার আর জাতীয় উৎপত্তির আলোচনার পক্ষে খুব বিশেষ ভাবে উপযোগী, এই হচ্ছে আমার মূল বক্তব্য। চন্দ মহাশয় এই মতের ঘোরতর বিরোধী। তাঁর মত হচ্ছে এই যে, ভারতের আর্য্যভাষীরা দু'দলের লোক ছিল, একদলের মধ্যে বৈদিক ভাষা আর সভ্যতার বিকাশ, এরা হ'চ্ছে "ভিতরী" দল, মধ্যদেশের অধিবাসী; আর একদল অবৈদিক আর্য্য-

ভাষী, এরা "বাইরী"-দল, মধ্যদেশের অধিবাসীদের চারদিকে উপনিবিষ্ট হয়। গুজরাত হ'য়ে মধ্যভারতের জঙ্গল দিয়ে 'দলে দলে' বাঙলায় আসে ;—জাতি, অর্থাৎ—race হিসেবে বৈদিক আর্য্য থেকে দ্বিতীয় দল আলাদা। বাঙালীর উৎপত্তি এই অবৈদিক আর্য্য থেকে, বাঙলা ভাষার মূলে এই অবৈদিক আর্য্য-ভাষা ;—অবৈদিক আর্য্যদের মধ্যে শাক্ত বৈষ্ণব ধর্ম্মের উৎপত্তি ; এরা বর্ণাশ্রমের ধার ধারত না, পরে মধ্যদেশ থেকে ব্রাহ্মণ্য বা বৈদিক ধর্ম্ম এসে এই অবৈদিক বাঙালী প্রভৃতি বাইরী-দলের আর্য্যদের বংশধরদের উপর প্রাধান্য স্থাপন করে। বাঙলার অনার্য্য প্রভাবকে তিনি যেন আমল দিতে চান না।

চন্দ মহাশয় যে "ভিতরী-বাইরী" দুই প্রশাখার আর্য্য জাতি ও ভাষায় আস্থাবান, সেই দুই শাখার কল্পনা প্রথম করেন পরলোকগত পণ্ডিত হর্‌নলে। ভারতের অধুনিক আর্য্য-ভাষাবিদ্‌গণের অগ্রণী স্যর জ্যর্‌জ্‌ গ্রিয়ার্সনও এই দুই শাখার আর্য্যের তথা আর্য্যভাষার অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন। তিনি মনে করেন, ভাষা হিসেবে হিন্দী আর মধ্য-দেশের অন্য উপভাষাগুলি একদিকে, আর অন্যদিকে পঞ্জাবী সিন্ধী গুজরাতী বিহারী বাঙলা মারাঠী ; অর্থাৎ—বাইরী-দলের ভাষাগুলির মধ্যে কতকগুলি ধ্বনি আর নাম ও ধাতুরূপ ঘটিত বিশেষত্ব সমভাবে বর্ত্তমান, যেগুলি লুপ্ত অবৈদিক আর্য্য থেকে পাওয়া, আর যেগুলি ভিতরী-দলের সংস্কৃতজ ভাষা হিন্দীতে মেলে না ; আর বাইরের ভাষাগুলির প্রকৃতি আর আচরণ, মধ্যদেশের হিন্দীর থেকে, মৌলিক পার্থক্য থাকার দরুণ, একেবারে পৃথক। এই মত অনুসারে ভারতের আর্য্যভাষার বংশতালিকা এই রকম দাঁড়ায় ঃ—

আদি আর্য্য
ঈরাণী
দরদী বা পিশাচ শ্রেণীর ভাষা
অবৈদিক আর্য্য ('বাইরী')
?
কথিত বৈদিক ('ভিতরী')
পশ্চিম
পারসীক
ফারসী
আবস্তিক
পূর্ব্ব
উত্তর
প্রাচীন খোটানী
মধ্য এশিয়ার
ঘল্‌চা ভাষা
পশ্‌তো
বলোচী
চিত্রালী কাশ্মিরী
প্রভৃতি
উত্তর পশ্চিমের
প্রাকৃত,
টক্কী, মাদ্রী, ব্রাচড
ইত্যাদি
পঞ্জাবী, লহন্দী,
সিন্ধী
উত্তরের
প্রাকৃত
খশ
পাহাড়ী+
আবন্তিকা,
সৌরাষ্ট্রী
ইত্যাদি
রাজস্থানী,
গুজরাতী
মাহারাষ্ট্রী
মারাঠী
সংস্কৃত
মধ্যদেশের
প্রাকৃত,
শৌরসেনী
পশ্চিমা হিন্দী
পূবের প্রাকৃত
মাগধী
বাঙলা, ওড়িয়া,
বিহারী
অর্দ্ধমাগধী
পূর্ব্বী হিন্দী
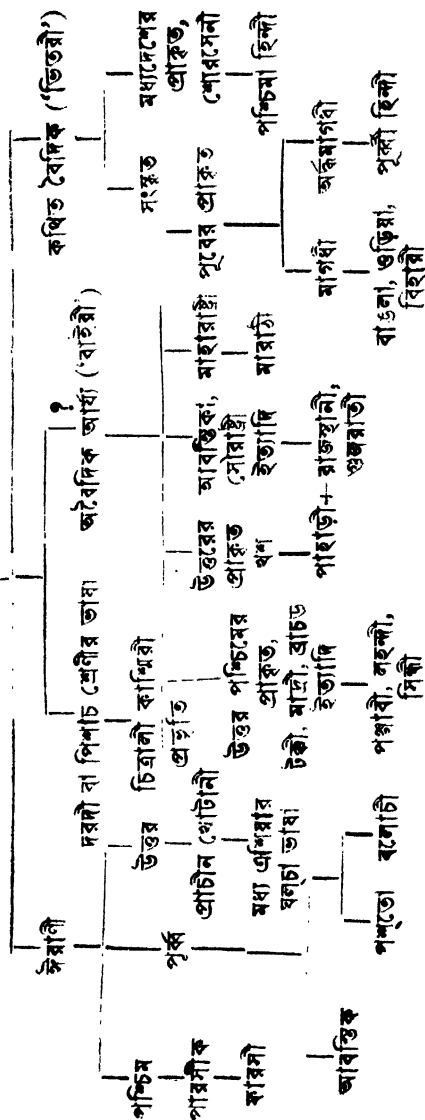
এই বংশলতিকায় দেখা যাচ্ছে যে, বাঙলা সিন্ধী মারাঠী, এরা হচ্ছে এক পুরুষ অন্তরিত—হিন্দী এদের থেকে আলাদা। সংস্কৃত ভাষা হচ্ছে হিন্দীর মাতৃস্বস্-সম্পর্কের, বাঙলার সঙ্গে সে সম্পর্কটা অত ঘনিষ্ঠ নয়। এ ছাড়া, দরদী-ভাষার প্রভাব নোতুন ক'রে লহন্দী সিন্ধী রাজস্থানী গুজরাতীর উপর প'ড়েছে, অনুমান করা হয়। আবার কাশ্মিরী মূলে হচ্ছে 'বাইরী' শ্রেণীর দরদ-ভাষা, কিন্তু সংস্কৃতের আর প্রাকৃতগুলির প্রভাবে কাশ্মিরী অন্যরূপ ধ'রে ব'সেছে। মধ্যযুগে বৈদিক আর অবৈদিক বা 'ভিতর-বাইরী' বিভাগের প্রাকৃতগুলির মধ্যে পরস্পর খুব প্রভাব পড়ে; বিশেষত শৌরসেনী আশ-পাশের বাইরী-প্রাকৃতের উপর এমনই প্রভাব বিস্তার করে যে তাদের রূপ একেবারেই ব'দলে দেয়। আর তা ছাড়া, 'ভিতরী'-আর্য্যদের মধ্যে উৎপন্ন সংস্কৃতভাষার প্রভাব, "ভিতরী-বাইরী" দু'দলের চেহারা অনেকটা ব'দলে দিয়েছে—বাইরী-দলের ভাষাকে যেন ভিতরীর সামিল ক'রে ফে'লেছে।

বিলেতে এসে গ্রিয়ার্সন সাহেবের সঙ্গে এই 'ভিতরী-বাইরী' বিষয়ে আলাপ হয়, কিছু পত্রব্যবহারও চলে। তিনি বলেন যে এই 'ভিতরী-বাইরী' মতটা একটা থিওরি বা অনুমান মাত্র; জোর ক'রে কিছু বলা চলে না। কখন, কিভাবে এই দু'দলে ভারতে আর্য্যভাষার প্রসার ক'রেছিল, আর পরস্পর সংঘাতে বা সম্মিলনে এসেছিল, সে সম্বন্ধে

কিছুই বলা যায় না। আর বাঙালী, কাশ্মিরী বা গুজরাতী একজাতির কিনা, সে সম্বন্ধে তিনি কিছু ব'লতে পারেন না; তবে তাঁর মনে হয়, এরা এক জাতের নয়, যদিও খুব সম্ভব একই মূল থেকে এদের ভাষার পত্তন।

এই 'ভিতরী-বাইরী' থিওরি ভারতের আর্য্যভাষার ইতিহাসে একটা নোতুন সমস্যা এনে দিয়েছে। সকলেই জানে যে বেদের ভাষা হ'চ্ছে সাহিত্যের ভাষা—সাধু ভাষা; প্রাচীনকালে অনেক লৌকিক 'ভাখা' ছিল, যাদের থেকে প্রাকৃত ও আধুনিক ভাষাগুলির উৎপত্তি। এই সব লৌকিক ভাখায় এমন ধরণ কতকগুলি বিশেষত্ব ছিল নিশ্চয়ই, যেগুলি আর্য আর শিষ্ট ভাষা, বৈদিক আর সংস্কৃতে ঠাঁই পায় নি। এখন লৌকিক বা প্রাকৃত বা কথ্য বৈদিক ভাখাগুলি কতটা একই গোষ্ঠীতে প'ড়ত, আর কতটাই বা একেবারে ভিন্ন গোষ্ঠীতে প'ড়তে পা'রত, তা নির্দ্ধারণ করা কঠিন। অর্থাৎ—'ভিতরী-বাইরী' মতের অনুকূল বংশকল্পনা না হ'য়ে, এই রকমটা যে ছিল না, তা কেউ জোর ক'রে ব'লতে পারে না। পাঞ্জাব, মধ্যদেশ, প্রাচ্য—এইরূপে আর্য্য-ভাষার প্রসার; কাজেই যখন হয় ত মধ্যদেশে প্রাকৃতের কাছাকাছি ভাষা চ'লছে, তখন প্রাচ্যে আর্য্যভাষা আসেই নি, বা এসেছে মাত্র। সুতরাং সব জায়গায় প্রাকৃতের উৎপত্তি এক সময়ে হয় নি অনুমান করা যায়।
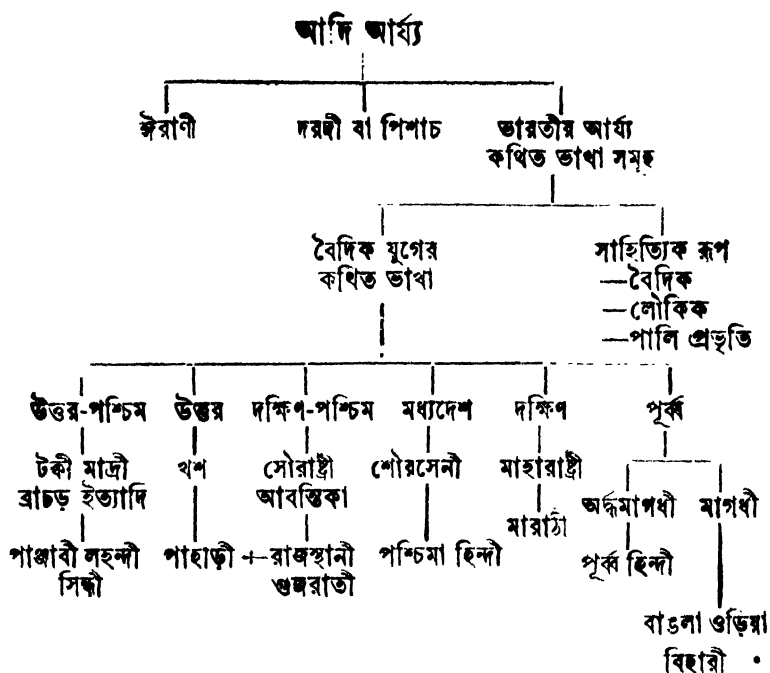
শ্রীযুক্ত চন্দ মহাশয়ের জাতি তত্ত্ব-বিষয়ক গবেষণার আলোচনা করবার শক্তি আমার নেই, কারণ আমি ও-বিদ্যার ব্যবসায়ী নই। যদিও তাঁর বাঙালীর উৎপত্তি সম্বন্ধে অনুমান, আর হিন্দু শাক্ত বৈষ্ণব মতের ইতিহাস নির্ণয়ের চেষ্টা আমার, আর আরও অনেকের কাছে বিশেষ কাল্পনিক ব'লেই মনে হয়। তিনি আমাকে দুটো মস্ত অপ-সিদ্ধান্ত প্রচার করার জন্য দায়ী ক'রেছেন। একটা এই যে আমি মনে করি ভাষার দ্বারা জাতের পরিচয় পাওয়া যায়। কথাটা আমি যে ভাবে ব'লেছি তা যিনি আমার প্রবন্ধ প'ড়েছেন তিনিই সহজে ধ'রতে পেরেছেন। মুস্কিল হ'য়েছে, এক 'জাতি' শব্দে বাঙলায় caste,

tribe, nation, race, সবই বোঝায়। আমি ব'লেছি, জাতীয় জীবনে, অর্থাৎ—national life-এ, ভাষাই প্রধান; এর মানে এ নয় যে, ভাষা আর race একই জিনিস। কিন্তু এটা মানি যে ভাষার ইতিহাসে জাতের, অর্থাৎ—nation-এর সভ্যতার চিন্তার ইতিহাস নিহিত। যদি বাঙালীর ভাষার দ্রাবিড়-বোডোর ছাপ থাকে, তা হ'লে দ্রাবিড়-বোডোর প্রভাবের কথা মনে করা অসঙ্গত কি? বাঙলা-ভাষার উৎপত্তির পূর্ব্বেই উত্তর ভারতে প্রাকৃত ভাষাতে দ্রাবিড় প্রভাব প'ড়ে তার আর্য্য বিশুদ্ধি নষ্ট ক'রে দিয়েছিল; বৈদিকেও দ্রাবিড়-প্রভাব স্পষ্ট। উত্তর ভারত থেকেই আর্য্যভাষা আর আর্য্য-দ্রাবিড়-সভ্যতা গঙ্গা ব'য়ে বাঙলায় আসে—মধ্যভারতের জঙ্গল দিয়ে আসার কথা আমরা জানি নে। আর্য্যভাষী লোক বাঙলায় আসবার আগে এদেশে যে মানুষ ছিল তার প্রমাণ আছে। 'দলে দলে' লোক না এলেও, অল্প দু'চারিটি লোকের দ্বারা যে একটা ভাষার প্রচার হয় তার দৃষ্টান্ত বিরল নয়। আমাদের চোখের সামনে মধ্যভারতে, নেপালে এ ব্যাপার ঘট্‌ছে। মুষ্টিমেয় রোমান ঔপনিবেশিকদের ল্যাটিন ভাষা স্পেন, ফ্রান্স ডেশিয়ার প্রাচীন ভাষাগুলিকে লুপ্ত ক'রে দিয়েছে। দক্ষিণ পশ্চিম আয়র্লাণ্ডে ইংরাজির প্রসার, পরাক্রান্ত জাতির ভাষা ব'লে, সভ্যজাতির ভাষা ব'লে, আইরিশদের মধ্যে সংহতিশক্তির অভাব ছিল ব'লে হয়েছে—'দলে দলে' ইংরেজ গিয়ে কখন ও-দেশ ছেয়ে ফেলে নি। কাগজের এককোণে আগুন ধরার মত এদেশে আর্য্যভাষার প্রচার; 'জাত' আর্য্য বিজেতার আগমনে পাঞ্জাবে আর্য্যভাষার স্থাপন, তারপর মধ্যদেশে প্রচার; সুদূর অতীতের অন্ধকারে বৈদিক যুগ বা তার পূর্ব্ব থেকেই উত্তর ভারতে আর্য্য দ্রাবিড়ের সংঘাত ও সম্মিলন। যেখানে

আর্য্যভাষা আর গাঙ্গ আর্য্যদ্রাবিড় সভ্যতার সামনে একটা সাত্ত্বাভিমান কিছু খাড়া হ'য়েছে, সেখানেই আর্য্যভাষার অপ্রতিহত গতি খর্ব্ব হ'য়েছে ; সুসভ্য কন্নাড়ী, দ্রাবিড় আর অন্ধ্র জাতির ভাষার মূলোৎপাটন ক'রতে আর্য্য ভাষা সক্ষম হয় নি। যদিও অপেক্ষাকৃত সভ্য আর্য্য-দ্রাবিড় উত্তর ভারতের শিক্ষার ভাষা ও সভ্যতার বাহন ব'লে সংস্কৃতের প্রভাব প্রাচীন কাল থেকেই কন্নাড়া, তেলুগু তামিলে পড়ে। অনার্য্যভাষী জাত যে বাঙলাময় ছিল, তা বাঙলা দেশের স্থানীয় নামে বেশ বোঝা যায়। আজকালকার বাঙলায় অনেক নাম আর্য্যরূপ নিয়েছে, অনেক নামের চেহারা ব'দলে গেছে ; কিন্তু খ্রীষ্টীয় প্রথম সহস্রকের মাঝেও যদি কেউ বাঙলার পরগণার, গাঁয়ের আর নদী প্রভৃতির নামের তালিকা ক'রত, তা হ'লে "আডড়হাগন্তি," 'নাড্ডিনা,' 'মোলাড়ন্দী,' 'বাল্লহিট্টা,' 'সোববড়ি,' খগ্গালি চম্যলা-জোলী,' জোগল্ল,' 'থৈসাডোব্ভিচাক্কোজান,' 'দিজমক্কাজোলী,' 'লচ্ছুবড়া,' 'কোণ্টোহাড়া,' 'উনৈপোলা,' 'অঝড়াচোবোল' 'নামুণ্ডিকা,' 'নেক্কা-ডেববরী,' 'পিণ্ডারবিটি-জোটি(লি)কা,' প্রভৃতি নাম, যার কতকগুলি মাত্র বাঙলার পুরাতন তাম্রশাসন থেকে তুলে দিলুম। শত শত পাওয়া যেত। এরূপ নামগুলি যে কোনও আর্য্যভাষার, আর্য্যভাষী জাতের মধ্যে উদ্ভূত, তা প্রমাণ করা কঠিন মনে হয়। আর্য্যভাষী বাঙালীকে আমি অনার্য্য ব'লছি ; ভাষা আর জাতি race এক—এই অপসিদ্ধান্ত কি যুক্তিতে চন্দ মহাশয় আমার ঘাড়ে চাপাচ্ছেন, বুঝতে পারছি নে।

দ্বিতীয় অপসিদ্ধান্ত যা আমি প্রচার ক'রেছি ব'লে চন্দ মহাশয় গম্ভীরভাবে সংশোধন করবার চেষ্টা ক'রেছেন, সেটা হচ্ছে এই যে,

আমি ব'লেছি 'বৈদিক থেকে প্রাকৃত, আর প্রাকৃত থেকে বাঙলা'। এখন আমার বলা উচিত ছিল যে 'বৈদিক যুগের কথিত ভাষা'—তা সেই কথিত ভাষা ভিতরীই হোক্ আর বাইরীই হোক্। আজকালকার চল্‌তি কথিত আর্য্যভাষা যে ধারাবাহিক ভাবে প্রাচীনকালের কথিত ভাষা থেকে উৎপন্ন, এ তথ্য নোতুন ক'রে প্রতি-পদে বুঝিয়ে দেবার আবশ্যকতা রাখে না। ভাষা বহতা স্রোত; আর্য্যভাষার নদী থেকে খাল কেটে সংস্কৃত আর তার পূর্ব্বের আর পরের সাহিত্যের ভাষা। আর্য্য ভাষার বহতা স্রোত অনার্য্যভাষার মরা গাঙের খাত দিয়ে চ'ল্‌ছে। ভারতের আর্য্যভাষার ইতিহাস আলোচনার সুবিধার জন্য তিনটি স্তরে ভাগ করা হয়:—'প্রাচীন আর্য্য' Old Indo-Aryan; 'মধ্য আর্য্য' Middle Indo-Aryan; 'নবীন আর্য্য' New or Modern Indo-Aryan. সাধারণত এই তিনটি স্তর যথাক্রমে 'বৈদিক' বা 'সংস্কৃত,' 'প্রাকৃত,' আর 'ভাষা'—এই তিন সংক্ষিপ্ত ও বিশিষ্ট নামে উল্লিখিত হ'য়ে থাকে, সুতরাং আমি বৈদিক থেকে প্রাকৃত বলায় যে ভয়ানক অপসিদ্ধান্ত প্রকাশ করেছি তা মনে হয় না। যদিও ঋগ্‌বেদের ভাষা বা পাণিনীর সংস্কৃত থেকে আধুনিক ভাষা বা প্রাচীন প্রাকৃতের উদ্ভব ব'ললে ঠিক অবস্থাটি বলা হয় না। আর আমি সে কথা কোথায়ও বলি নি।

আমার "বাঙলা ভাষার কুলজী" প্রবন্ধে আমি মিটানীয় ঈরাণী কুচারীর কথা, ভিতরী-বাইরী থিওরির কথা আনি নি; আর আমি ও-থিওরিতে বিশ্বাস করবার মত কোনও প্রমাণ এখনও পেয়েছি বলে মনে হয় না। প্রসঙ্গত ব'লে রাখি, ডক্টর সটেন্ কনোউ প্রমুখ দুই চারিজন, যাঁরা এ বিষয়ে গবেষণাকারিদের মধ্যে অন্যতম, দরদী

প্রশাখার পৃথকত্বে বিশ্বাস করেনা ; ডক্টর কনোউ মনে করেন পিশাচ বা দরদীশ্রেণী ঈরাণীর প্রশাখা মাত্র। বাঙলা (গুজরাতী, সিন্ধী, লহন্দার কথা আনতে চাই নে—কারণ ওই পশ্চিমা ভাষাগুলির ইতিহাস একটু অন্য ধরণের) ভাষাকে আমরা সরাসরি মাগধী-প্রাকৃতের মধ্য দিয়ে 'বৈদিক' বা কথিত Old Indo-Aryan-এ নিয়ে যেতে পারি। মাঝে থেকে কোনও বাইরী শ্রেণীর প্রাকৃতকে কল্পনা ক'রে আনবার কারণ দেখি নে। হয়ত যে ভাখা থেকে বাঙলার উৎপত্তি, তার দু'চারিটা বিশেষত্ব পশ্চিমের আর্য্য ভাষাগুলির মূল যে ভাখা তাতেও মেলে। কিন্তু বাঙলার উৎপত্তি, শৌরসেনীসম্ভূত পশ্চিমা হিন্দীর সঙ্গে এক গোষ্ঠিতে বলেই মনে হয়। সম্প্রতি লণ্ডনের "বুলেটিন অভ্ দি স্কুল অভ্ ওরিএণ্টাল ষ্টাডীজে" স্যর জ্যর্জ্ গ্রিয়ার্সন ভিতরী বাইরী দুই শ্রেণীর অস্তিত্ব প্রমাণ ক'রবার জন্য কতকগুলি ভাষাগত বস্তু বা fact এনেছেন ; কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই তার অন্য, এবং সহজ ব্যাখ্যা হয়। স্যর জ্যর্জ্‌কে এ বিষয়ে চিঠি লেখায় তার উত্তরে তিনি ব'লেছেন যে বাঙলা কাশ্মিরী প্রভৃতির যে মিল, সেটা অনেক ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে ঘটলেও, এই মিল হ'চ্ছে, তাঁর মতে, আদি বাইরী ভাষার থেকে কুলগত উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত প্রবণতার (inherited tendency-র) ফল। তাঁর ব্যাখ্যা মোটেই সন্দেহ-নিরাসক নয়। কিন্তু ভাষাতত্ত্বের কচকচি এনে সবুজপত্রের পাঠকদের উপর এখন উৎপীড়ন করতে চাই নে।

বাঙলাভাষা যে আর্য্যশ্রেণীর ভাষা, একথা সকলেই জানে ; ভারতের আর্য্যভাষীরা যে দু'দলের দুই জাতের লোক ছিল, সে অনুমান এখনও সুদৃঢ় হয় নি—অন্তত পূর্ব্ব ভারতের পক্ষে সে

অনুমানের পক্ষে দৃঢ় প্রমাণ কিছুই নেই—অথর্ব্ব বেদের "ব্রাত্য", আর ব্রাহ্মণের "ব্রাত্য স্তোম", আর "দীক্ষিত বাক্", আর "হে অলব হে অলব" প্রভৃতি বচন নিয়ে খালি speculation বা জল্পনা চ'ল্‌ছে মাত্র। হ'তে পারে 'ভিতরী-বাইরী' মতই ঠিক—অবৈদিক আর্য্য-ভাষীর ভাষা থেকে বাঙলার উৎপত্তি—সংস্কৃতের সঙ্গে, হিন্দীর সঙ্গে বাঙলার সম্পর্ক এক-পুরুষে' সম্পর্ক নয়—দু-তিন-পুরুষে'; হ'তে পারে প্রাচীন ভারতে বেদবহির্ভূত আর্য্যেরা দলে বেশই ভারী ছিল, আর বেদ-স্রষ্টা আর্য্যের আগেই তারা পূর্ব্বভারতে এসেছিল। কিন্তু বাঙলার পক্ষে ব্যাপারটা দাঁড়ায় "আর্য্য-বনাম-অনার্য্য"—তা আর্য্যদের ভিতরী-বাইরী দু'ঘরে ফেলাই হোক বা 'বৈদিক' বা Old Indo-Aryan ব'লে এক কোঠায় ফেলাই হোক।

যুক্তিতর্কের উপর বিচার ক'রে যা সম্ভবপর ব'লে মনে হয় সেই মত সকলের নেওয়া উচিত। 'আর্য্যামি' বা 'দ্রাবিড়ামি' বা অন্য কোনও গোঁড়ামির বশীভূত হ'য়ে বিশেষ এক মত খাড়া করবার চেষ্টা টিঁকবে না। আমাদের দেশের একটি বিশিষ্ট মত যা শিক্ষিত অর্দ্ধশিক্ষিত অধিকাংশ লোককে অভিভূত ক'রে আছে সেটার নাম দেওয়া হ'য়েছে "আর্য্যামি"; এই জিনিসটি অতি হালের, গত শতাব্দীর ভাষাতত্ত্ব আর প্রত্নতত্ত্ব আলোচনায় এর উদ্ভব, রাজার জাতের সঙ্গে জ্ঞাতিত্ব কল্পনার পুলকে, পাশ্চাত্য জগতের সঙ্গে সাকুল্যলাভের আশায় এর প্রসার। আমাদের দেশের লোকের মনে আর্য্যামির যে কল্পনা বিদ্যমান, যথার্থ ঐতিহাসিক অনুসন্ধিৎসার দ্বারা প্রেরিত হওয়ায় চন্দ মহাশয় তার ঊর্দ্ধে উঠেছেন; তাঁর Indo-Aryan Races বই তার প্রমাণ। তাঁর বেদ-বহির্ভূত বাইরী-আর্য্যকে বাঙালীর পূর্ব্ব-

পুরুষ হিসেবে খাড়া ক'রলে দেশের প্রচলিত 'সনাতন' আর্য্যামি খুশী হবে না, এটা তিনি নিশ্চয়ই জানেন। চন্দ মহাশয় সত্যের অনুসন্ধিৎসু ; তিনি যা লক্ষ্য ক'রে চ'লেছেন, তা আরও অনেকের লক্ষ্যস্থল। প্রাচীন ইতিহাসের সবই অন্ধতমসাচ্ছন্ন। নৃ-তত্ত্ব, নৃজাতি-তত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব, কেউ আলাদা আলাদা চ'লতে পারে না : অন্যথা প্রাচীনের স্বরূপ জানবার চেষ্টা অন্ধের হাতী দেখার মত ব্যাপার হ'য়ে প'ড়বে। আমাদের হিন্দু সভ্যতাটা যে একটা মিশ্র ব্যাপার, তা সর্ব্ববাদিসম্মত। নামের মোহে প'ড়ে হিন্দু সভ্যতা গ'ড়তে অনার্য্যের সাহায্যকে অস্বীকার বা উপেক্ষা ক'রলে চ'লবে না। ৺রামেন্দ্রসুন্দর, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ মনীষীরা এই প্রকার বিচারের সারবত্তা যথার্থ উপলব্ধি ক'রেছেন। ভারতের ইতিহাসের আরম্ভ আর্য্যভাষী লোকের আগমন থেকে, সত্যি ; কিন্তু তার ইমারতের বুনিয়াদ হ'চ্ছে প্রাগ্-আর্য্য যুগে, ভারতের নিজস্ব দ্রাবিড়ের সভ্যতায় আদিকালের আর্য্য কখন কোন্ সময়ে নিজের ভাষা আর বিশিষ্ট সভ্যতা গ'ড়ে তোলে তা জানা যায় না। এই ভাষা, সভ্যতার স্রষ্টা ব'লে Proto-nordic, অর্থাৎ—আদি-উদীচ্য নাম দিয়ে একটা জাতির অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনেকে বিশ্বাস করেন। আদি আর্য্যসভ্যতা যা এদের মধ্যে বিকশিত হ'য়েছিল, তা সমসাময়িক মিসর, বাবিলান, এজিয়ান সভ্যতার কাছে দাঁড়াতেই পারে না ; অনার্য্য জাতির সংস্পর্শে আর সাহচর্য্যে অর্দ্ধবর্ব্বর, খুব সম্ভব মিশ্র আর্য্য,—গ্রীক, পারসীক, হিন্দু সভ্যতা গঠনে নিজের ভাষা দান ক'রে ধর্ম্মের কবিতার সূত্র কতকগুলি দিয়ে অংশ গ্রহণ করে। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস, হিন্দুধর্ম্ম, চিন্তা ও সভ্যতার ইতিহাস, ভারতের আর্য্য ও দ্রাবিড় ভাষার

মুখ্যত এই আৰ্য্য অনার্য্যের সম্মিলনের ইতিহাস। সব বিষয়েই 'অতি'র দিক আছে ; চন্দ মহাশয়ের মতে 'দলে দলে' আৰ্য্যভাষীর প্রসারের সঙ্গে আর্য্যভাষার প্রচার ; ওদিকে দক্ষিণী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পি, টি শ্রীনিবাসিয়েঙ্গার তাঁর "Life in Ancient India in the Age of the Mantras" নামক অতি উপাদেয় বইয়ে ব'লেছেন—The Aryan invasion of India is a theory invented by scholars to account for the existence of an Indo-Germanic language in North India In tracing the history of India after this theoretical event, scholars treat of India as if the previous inhabitants were so few and so devoid of stamina or of culture as to be practically effaced by the invaders or steadily driven to the east." তাঁর মনে হয় যে ভারতে আর্য্যভাষা আর্য্যসভ্যতা বাইরে থেকে এসেছিল peaceful overflow of language and culture হিসেবে।

উত্তর ভারতে আর্য্যভাষা প্রচলিত হ'য়েছে অতি প্রাচীন কাল থেকে, এটা একটা বাস্তব কথা ; আর ভারতের চলতি আর্য্যভাষার সঙ্গে দেশের অনার্য্যভাষার, বিশেষ দ্রাবিড়, যতটা মিল—ধাতু বা শব্দগত নয়, অন্তর্নিহিত চিন্তা প্রণালীগত,—ততটা মিল বাইরের অন্য দেশের আর্য্যভাষার সঙ্গে নয়, এও একটা প্রমাণ-করা বাস্তব কথা। অনার্য্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ, আর তার গভীর প্রভাব ছাড়া এই সাদৃশ্যের কারণান্তর দেখা যায় না। আর্য্যভাষা বাঙলা দেশে আসবার আগে এদেশে দ্রাবিড়, কোল, মোন-খ্মের জাতের বাস ছিল, ভোট-

ব্রহ্ম জাতের শাখা বোড়ো জাতি উত্তর পূর্ব্বে ছিল। কোন্ সময়ে আর্য্যভাষা বাঙলা দেশে আসে তা নির্ণয় করা কঠিন। মগহী মৈথিলের সঙ্গে বাঙলা ওড়িয়ার মিল এত বেশি যে এই চার ভাষা একই মাগধী অপভ্রংশ থেকে উৎপন্ন ব'লে মনে করা হয়। এই মাগধী অপভ্রংশ বড় প্রাচীন যুগের ভাষা নয়, বুদ্ধদেবের আগে বাঙলায় আর্য্যভাষী জাতি ছিল কিনা প্রমাণ নেই। সিংহলজয়ী বিজয় সিংহকে বাঙলার অধিবাসী মনে ক'রে আমরা গৌরব করি, কিন্তু পালি বইয়ের "লাট" রাজ্য যে "রাঢ়" নয়, পশ্চিম ভারতের "লাট", সে পক্ষে যুক্তি আরও বেশি। মহারাজা অশোকের আগে এদেশে আর্য্যভাষী বড় একটা যে ছিল তার পক্ষে প্রমাণ নেই। অশোকের অনুশাসন পাওয়া গেছে উড়িষ্যায় পুরীজেলায় আর গঞ্জামে; তা থেকে প্রমাণ হয় না যে উড়িষ্যায় আর্য্যভাষা চ'লত; কারণ অনার্য্য-ভাষীর দেশে অশোকের অনুশাসন পাওয়া গেছে, আর উড়িষ্যা অশোকের বহু শতাব্দী পরে আর্য্যভাষা ও সভ্যতা পায়। হিউএনত্‌সাঙ্-এর সময়েও হয় ত সমস্ত বাঙলাদেশ আর্য্যভাষী হয় নি। বাঙলার অনার্য্যকে ভাষায় (আর সভ্যতায়) আর্য্যীকরণের প্রক্রিয়া এখনও চ'লছে, তবে খৃষ্টান মিশনারির আগমনে সে প্রক্রিয়া অনেকটা রুদ্ধ হ'য়ে আসছে; পশ্চিম বাঙলার আদি অনার্য্য রাঢ় চুহাড় জাতি, আর ছোটনাগপুর অঞ্চল থেকে নবাগত বহু সাওতাঁল, ভূমিজ—উত্তর বাঙলার নানা ভোট ব্রহ্মজাতি, এখন ত পূরো বাঙলাভাষী হিন্দু হ'য়ে গেছে, বোড়োভাষীরা অনেকেই ক্রমে বাঙালী বা আসামী ব'নে যাচ্ছে। এসব বিষয়ের দিকে না তাকালে বা এসব কথা ভুলে গেলে ত চ'লবে না; কারণ এ যে আমাদের জাতীয়

ইতিহাসের অংশ। চন্দ মহাশয় এসব কথা বিলক্ষণই জানেন; তিনিই ত উত্তর বঙ্গের কাম্বোজ বা ভোট-ব্রহ্ম রাজাদের রাজত্বের লুপ্ত ইতিহাসের কথার পুনরুদ্ধার ক'রেছেন। বাঙালীর মধ্যে অনার্য্য-উপাদানের কথায় তাঁর এতটা রাগের কারণ কি বুঝতে পারি নে। তিনি মাথা মাপামাপি নিয়ে ব্যস্ত। কিন্তু দীর্ঘকপাল, কি মধ্যকপাল, কি হ্রস্বকপালের বিচার কি অভ্রান্ত? নৃ-তত্ত্বের আলোক কি একেবারে স্থির আলোক? একাধিক ভিন্ন type থেকে কি একটা নোতুন type বিশিষ্টতা পেয়ে দাঁড়ায় না? নৃ-তত্ত্বের মত নৃজাতি-তত্ত্বের রীতি নীতি সভ্য সমাজের চর্চ্চাও কি জাতীয় ইতিহাসের পক্ষে উপযোগী নয়? খালি বেদ-ব্রাহ্মণ-সূত্র-পুরাণ পিটক-তন্ত্র চর্চ্চা ক'রলে ত চ'লবে না; তার সঙ্গে জনসাধারণের বিশ্বাস আর আচার, জঙ্গলী সাওতাল ধাঙড় গারোর ধর্ম্মের আচারেরও চর্চ্চা দরকার। এক কথায়, ভারত খালি আর্য্যের নয়; আর্য্যের দম্ভ ভাষার গৌরবে পারিপার্শ্বিকের জ্ঞান হারা'লে, কি ভাষাতত্ত্ব, কি ইতিহাস, সমস্তরই আলোচনা অসম্পূর্ণ হবে—সত্যনির্দ্ধারণের প্রধান এক পথ রুদ্ধ হ'য়ে যাবে।

'ভিতরী-বাইরী' সম্বন্ধে ভবিষ্যতে আলোচনা করবার বাসনা রইল।

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

লণ্ডন,

২৯ ফেব্রুয়ারী, ১৯২০।

পাগল।

—*—

পাগল চলিল পথে !
সূর্য্য যখন বিদায় লভিল অস্তাচলের রথে।
অন্ধকারের ঘনঘোর কায়া
ছাইল নিখিল ভুবনের মায়া,
শ্রাবণ ধারার বন্যা ছুটিল অন্ধ আকাশ হ'তে,
পাগল চলিল পথে।

গুরু দেয়া গরজনে,
স্তব্ধ মেদিনী শিহরি উঠিল সহসা আপন মনে।
চপলা হাসিল চঞ্চল হাসি,
অসীমের পথে পবন উদাসী,
সৃষ্টিছাড়া সে পাগল মাতিল ধ্বংসের আগমনে
গুরু দেয়া গরজনে।

বিজন মাঠের মাঝে,
সর্ব্বনাশের পথে সে ধাইল সর্ব্বহারার সাজে !
জটাজাল উড়ে পবনের আগে
অগ্নির শিখা নয়নেতে জাগে
বিকট হাস্যে কাঁপাইল ধরা সেদিন প্রলয় সাঁঝে
বিজন মাঠের মাঝে।

অদূরে শ্মশান ঘাট,
ভূতভৈরব নর্ত্তন রত গৃধিনী শিবার হাট।
ক্ষুধাতুর চিতা অনল উগারি
নিবিড় শূন্য ফেলিছে বিদারি,
চারিদিকে ঘন, ধ্যান পরায়ণ তরুপ্রান্তর মাঠ,
অদূরে শ্মশান ঘাট।

আসিল আপনা হ'তে,
প্রকৃতি তখন উজলি উঠেছে সুধাকর-সুধা-স্রোতে,
শ্মশান মেলায় নির্জ্জন কোণে
দাঁড়াইল আসি পুলকিত মনে
একটি বিন্দু ঝরিল কেবল অশ্রুধারার পথে,
আসিল আপনা হ'তে।

দাহনকারীর দল
উন্মাদলীলা চাহিয়া দেখিল—বিস্মিত, অচপল।
সম্ভ্রমে ক্ষ্যাপা নোয়াইল শির,
স্পর্শিল ধূলি মৃত্যু ভূমির,
নির্ব্বাক সবে দাঁড়ায়ে রহিল—শান্ত অচঞ্চল
দাহনকারীর দল।

উঠিল সে সোজাসুজি,
বক্ষ তাহার ভাসিয়া গিয়াছে অশ্রুপ্লাবনে বুঝি !
গর্জ্জন-গানে ভরিল বিমান
ত্রস্ত, ব্যস্ত বিশ্ব-পরাণ
"রুদ্রের মাঝে মঙ্গল যিনি—তাঁহারেই আমি পূজি" ?
উঠিল সে সোজাসুজি।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ রায়।

পত্র।
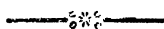
শ্রীযুক্ত 'সবুজপত্র' সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু।

চাতরা (হাজারিবাগ) হ'তে শ্রীহৃষীকেশ সেন নামধেয় জনৈক ভদ্রলোক আমাকে যে পত্র লিখেছেন, সেখানি আপনার নিকট পাঠিয়ে দিচ্ছি। আপনি "রায়তের কথা" লিখে যে হুজুগের সৃষ্টি করেছেন, পত্রলেখক তারই জের টেনে এনেছেন। আশা করি এ পত্র সবুজপত্রে স্থানলাভ ক'রবে। পত্র-লেখক মহাশয় দুটি জিনিস করতে জানেন এক পড়তে আর এক লিখতে। বইয়ের সঙ্গে যে তাঁর পরিচয় আছে তার প্রমাণ তাঁর লেখার পত্রে পত্রে পাবেন, আর তিনি যে লিখতে জানেন তার প্রমাণ ছত্রে ছত্রে পাবেন। এ বাজারে ও-দুটি গুণের একাধারে সাক্ষাৎ লাভ নিত্য ঘটে না। নিত্য যা দেখা যায় সে হচ্ছে এই যে যিনি লেখেন তিনি পড়েন না, আর যিনি পড়েন তিনি লেখেন না। পত্রলেখক নিজেকে কৃষক বলে পরিচয় দিয়েছেন। এ হেন কৃষক-সংখ্যা বাঙলায় যদি বেশি থাকত তাহলে, আপনার স্থাপিত রায়তের মামলার একতরফা ডিক্রী হয়ে যেত,—কেননা ও-অবস্থায় জমিদার প্রতিবাদী কোনো জবাব দাখিল করতে সাহসী হতেন না।

এখন নিজের কথায় আসা যাক্। ও-পত্র কেন যে আমাকে পাঠান হয়েছে তা ঠিক বুঝতে পারলুম না। কোনো কোনো সমালোচক আমার লেখার ভিতর শিক্ষানবীশের হাত দেখতে পান, কিন্তু কোনো কোনো পাঠক তার ভিতর যে জমানবীশেরও হাত দেখতে পান, এ সন্দেহ ইতিপূর্ব্বে আমার মনে কখনো উদয় হয় নি। লেখকের বিশ্বাস আকবর বাদশার কার্য্যকলাপ আমার কাছে অবিদিত নয়, অতএব তাঁর কৃত বাঙলার জমিজমার বন্দোবস্তের খবর আমি নিশ্চয়ই রাখি। আকবর সাহেবের আমলের বিষয়ে যে আমি ওয়াকিবহাল এ কথা অস্বীকার করা আমার মুখে শোভা পায় না। যদি সে আমলের ইতিহাস শুনতে বাঙালীপাঠকের কৌতূহল থাকে ত আমি সে কৌতূহল চরিতার্থ করতে পারি। যে রাজসভার সেক্রেটারি ছিলেন আবুল্ ফজল্, সভাকবি ছিলেন ফৈজী, বিদূষক ছিলেন, বীরবল, গায়ক ছিলেন তানসেন, চিত্রকর ছিলেন, আবদাস সামেদ, আকবর শাহের সে দরবারকে মোগল-বিক্রমাদিত্যের সভা বললেও অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং এ সভার বাক্যচিত্র আঁকতে যার হাতে কলম আছে তার লোভ হওয়াও অত্যন্ত স্বাভাবিক। পাঠকসমাজ ফরমায়েস করলেই সে ছবি আমি আঁক্তে বসে যাব। ইতিমধ্যে আমার বক্তব্য এই যে, সে যুগের জমিজমার বন্দোবস্তের সঙ্গে বীরবলের কোনোরূপ সংশ্রব ছিল না। বীরবল ছিলেন, আলোর উপাসক। আলো দেখলেই তিনি প্রণাম করতেন, তা সে আলো সূর্য্যেরই হোক্ আর প্রদীপেই হোক্। মাটি নিয়ে যে তিনি কখনো মাথা বকিয়েছেন, তার প্রমাণ নাদারৎ। ক্ষিতি আর তেজ এ দুটি সম্পূর্ণ পৃথক ধাতু, এর একটির মায়ায় যিনি আবদ্ধ অপরটির দিকে তিনি দৃকপাতই

করেন না। আকবর শাহের দরবারীদের মধ্যে মাটি নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করেছিলেন টোডরমল, বীরবল নয়। বীরবল জানতেন আর যে কোনো বস্তু নিয়েই হোক্ না কেন, মাটি নিয়ে রসিকতা করা চলে না। জন্মভূমি মানুষের শুধু জননী নয়, আমরণ ক্ষীরধাত্রীও বটে। বীরবল যে কথাটা বুঝতেন সে কথা বাঙলার পলিটিসিয়ানরা বুঝলে আজকের দিনে জমিজমা নিয়ে দেশের লোকের সঙ্গে তাঁরা ইয়ারকি করতে উদ্যত হতেন না।

সে যাই হোক, পত্রলেখক মহাশয় তাঁর পত্রখানা যখন আমার বরাবর পাঠিয়েছেন তখন এ বিষয়ে দু'চার কথা বলতে আমি বাধ্য। এখন শুনুন আমার মত।

পত্রলেখক মহাশয় টোডরমলের বন্দোবস্ত সম্বন্ধে যা বলেছেন তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। এ কালের ভাষায় এবং এক কথায় বলতে হলে, সে বন্দোবস্ত ছিল "রায়ত-ওয়ারি", অর্থাৎ—উপরে রাজা ও নীচে রায়ত এই দুজনেই ছিল জমির সত্ত্ব এবং উপসত্ত্বের অধিকারী, মধ্যে কোনো নতুন মধ্যসত্ত্বওয়ালাকে ঢুকতে দেওয়া দূরে থাক, যারা আগে ঢুকে গিয়েছিল তাদেরও বহিস্কৃত করে দেওয়া হয়েছিল। একমাত্র বীরবলের খাতিরে আকবর বাদশাহ এ নিয়ম ভঙ্গ করেন। বীরবল জায়গির পেয়েছিলেন তিন পরগণার, তার মধ্যে তিনি যেটি আমলে এনেছিলেন তার নাম কালঞ্জর। আকবরের পূর্ব্বের আমলে দিল্লীর বাদশাহরা আমির-ওম্‌রা চাকর-নফরকে মাইনে না দিয়ে জায়গির দিতেন, এবং সেই জায়গিরদারেরা ছিল একালের জমিদারদের প্রথম সংস্করণ। আকবর শাহ্ পাঠান বাদশাহ্‌দের কৃত এ বন্দোবস্ত উল্টে ফেলে সনাতন হিন্দু প্রথাকে পুনঃ প্রতিষ্ঠ করলেন, যেমন তিনি আরো অনেক বিষয়ে করেছিলেন।

ভারতবর্ষের ইতিহাসকে মোটামুটি তিন যুগে বিভক্ত করা যায়, প্রথম হিন্দুযুগ, দ্বিতীয় মুসলমানযুগ, তৃতীয় ইংরেজযুগ। জমির সত্ত্ব সম্বন্ধে এ তিন যুগের তিন ধারণা।

হিন্দুযুগে জমি ছিল তার, যে তা চষে, অর্থাৎ—প্রজার। সে যুগে "ক্ষেত্রকর্ষক" এবং "ক্ষেত্রস্বামী" ছিল একই ব্যক্তি। এ সত্ত্বের মূলে ছিল লাঙ্গল।

মুসলমানযুগের সার কথা এই যে, জোর যার মুলুক তার। যে বাহুবলে দেশ জয় করে সেই তার মালিক, অর্থাৎ—রাজা। এ সত্ত্বের মূলে ছিল তলওয়ার।

ইংরাজযুগে জমির মালিক হচ্ছে সে, যে তার রাজস্ব আদায় করে, হয় দাখিলা দিয়ে, নয় নালিশ করে, অর্থাৎ—রাজাও নয় প্রজাও নয়—টেক্স কলেক্টর। এ সত্ত্বের মূলে লাঙ্গলও নেই তলওয়ারও নেই, আছে শুধু কাগজ।

জমির সত্ত্ব-স্বামীত্ব সম্বন্ধে এই তিনটি মূলসূত্র ধরিয়ে দিয়ে আমি খালাস। তারপর আপনারা যত পারেন এর টীকাভাষ্যকরুন। আপনাদের এই সব তর্ক বিতর্কের ফলে শেষটা এর একটা উত্তর মীমাংসা দাঁড়িয়ে যাবেই। দেখতে পাচ্ছি আপনি চেষ্টাকরেছেন এই তিন সূত্রের একটি সমন্বয় করা, ফলে কোনো পক্ষেই ষোলআনা আপনার স্বপক্ষ হবে না।

প্রজাপক্ষ বলবে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত যখন অনাদি নয়, তখন অনন্ত হতে পারে না।

জমিদার পক্ষ বলবেন, যার বিষয়ে কেতাবে লেখা আছে চিরস্থায়ী, বস্তুগত্যা তা অচিরস্থায়ী হতে পারে না।

মডারেট দল জমিদারের কথায় সায় দেবেন।

স্যাসানালিষ্ট দল বলবেন, এখন ও-সব কথা তুলে কাজ নেই। এখন আমাদের কর্ত্তব্য হচ্ছে প্রজার আত্মাকে উদ্বোধিত করা, তার জীবন-মরণের ভাবনা পরে ভাবা যাবে। দেশের লোকের যাতে পিঠে আর কিছু না সয় তার জন্য যা কিছু বলা-কওয়া দরকার সেই সব করা যাক, তাদের পেটে খাবার কথাটা লক্ষ্মী ভাই আমার, এ সময় আর তুলো না। আগে আমরা দেশউদ্ধার করি, পরে তোমরা পতিত উদ্ধার করো।

এ সব কথার উত্তরে আপনি অবশ্য সকল পক্ষকে পর পর এই সব কথা বলতে পারেন, যথা—

প্রজাপক্ষকে—চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অনন্ত না হলেও কল্যান্ত হবে না। অনেক বস্তু চিরস্থায়ী না হলেও সুচিরস্থায়ী হতে পারে।

জমিদারকে—ইংরেজদের আইনের কেতাব আমাদের কোরাণ নয়; সুতরাং আমাদের হাতে পড়লে সে কেতাব আমরা আবার নতুন করে লিখতে পারি, অতএব চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অক্ষরে আ'ছে বলে যে তা অক্ষয় হবে, তার কোনই সম্ভাবনা নেই।

মডারেটদের—কোনো বিষয়ে সায় দেওয়া আর রায় দেওয়া এক জিনিস নয়। আর আমরা যা চাই সে হচ্ছে মায় ফয়শালা রায়।

স্যাসানালিষ্টদের—জনসাধারণের জীবনের অবস্থা যেমন আছে তেমনি রেখে তাদের মনের অবস্থা একদম বদলে দেওয়া অসম্ভব। তারা জীবনে থাকবে "দাস" আর মনে হবে "স্বরাট্", একথায় যে বিশ্বাস করতে পারে তার কোনো কথাতেই বিশ্বাস হয় না। পতিত-উদ্ধার না করতে পারলে দেশউদ্ধার কিছুতেই হবে না, কেন না দেশ হচ্ছে জড়পদার্থ আর দেশের লোক প্রাণী।

আপনি এই রকম অনেক কথা বলতে পারেন কিন্তু শোনে কে ? সে যাইহোক আপনার বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ এই যে, আগে আমাদের দেশ ছিল "সোনার বাঙলা", আপনি চেষ্টায় আছেন তাকে মাটী করতে। ধরুন আপনার সে চেষ্টা সফল হোল, তাহলে বলুন ত আমরা সাহিত্যিকরা—

কি করব ?

কি দেশ ধরব ?

কি ছাই লিখব ?

বাঁচব কি মরব দুঃখে ?

বীরবল।

নব-রূপকথা।*

—ঃ-ঃ—
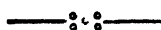
বীরবল বলেছেন—

"আমরা রূপকথা লিখতে বসলে, হয় তা কিছুই হবে না, নয় রূপক হবে; কেননা রূপকথার জন্ম সত্যযুগে, আর রূপকের জন্ম সভ্যযুগে।" (শিশু সাহিত্য)

বীরবলের এমত গ্রাহ্য করতে আমাদের তিলমাত্র দ্বিধা হবে না, যদি রূপক বলতে কি বোঝায় সে বিষয়ে আমাদের মনে কোনো স্পষ্ট ধারণা থাকে।

কোনো একটি ভাব, আইডিয়া কিম্বা দার্শনিক মতকে শরীরী করে তোলা, যা কেবল মনের পদার্থ, তাকে বস্তুর রূপ দিয়ে ইন্দ্রিয়গোচর করা, ভাষান্তরে যা abstract তাকে Concrete করাই হচ্ছে রূপকের উদ্দেশ্য। কতকগুলি ভাবের সমষ্টিকে অঙ্গপ্রত্যঙ্গবিশিষ্ট করে আমরা যেমন জড়পদার্থ দিয়ে দেব-দেবীর প্রতিমা গড়ি, সাহিত্যের জগতেও আমরা তেমনি আমাদের একটি বিশেষ মনোভাবকে তার বিভাব অনুভাব দিয়ে সাঙ্গোপাঙ্গ করে রূপক গড়ি। প্রতিক ও রূপক এ দু'য়েরই মূলে আছে মানুষের একই প্রবৃত্তি যার শুধু নাম আছে,

---

* শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত, চন্দননগর 'প্রবর্ত্তক' কার্য্যালয় হইতে-"নব-রূপকথা" নামক সদ্য প্রকাশিত গ্রন্থের ভূমিকাস্বরূপে লিখিত—সম্পাদক।

তাকে রূপ দেবার, যা অমূর্ত্ত তাকে মূর্ত্ত করবার প্রবৃত্তি। অতএব প্রতিকের সত্য যেমন তার দেহে নেই, আছে তার অন্তরে—রূপকের সত্যও তেমনি তার পদার্থে নেই, আছে তার অর্থে। রূপকের সঙ্গে রূপ কথার মূল প্রভেদ এই যে, এর প্রথমটির পদার্থ হচ্ছে কৃত্রিম, দ্বিতীয়টির অলৌকিক।

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী যে দুটি রূপকথা লিখেছেন, সে দু'টিই হচ্ছে মূলত রূপক। এ দু'টি কথার কথাবস্তু উপলক্ষ্য মাত্র, বক্তার আসল লক্ষ্য হচ্ছে তর্কযুক্তির বলে নয়, গল্পচ্ছলে একটি বিশেষ মনোভাবকে সাকার করা এবং সেই সাকার ভাবকে শ্রোতার হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা করা। বীরবল ঠিকই বলেছেন, "সভ্যযুগে রূপকথা জন্মায় না, জন্মায় শুধু রূপক"।

(২)

এখন দেখা যাক, তথাকথিত এই রূপকথা দুটির মনের গুপ্ত কথা কি? লেখকের আসল বক্তব্য এই যে, "জগৎ মিথ্যা"—এ কথাটা মিথ্যা কথা। সকলেই জানেন যে, জগৎ যে মিথ্যা এটি হচ্ছে একটি দার্শনিক মত, অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিকের মত। আমি এস্থলে অদ্বৈতবাদীর নাম বিশেষ করে উল্লেখ করলুম এইজন্য যে, শঙ্করমত ও বেদান্তমত একবস্তু নয়। বেদান্তের বহুভাষ্যকার এবং বেশির ভাগ ভাষ্যকার শঙ্করমত খণ্ডন করে গেছেন। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীও মায়াবাদ ওরফে বিবর্ত্তবাদের বিরুদ্ধেই প্রতিবাদ করেছেন; কিন্তু তা দার্শনিক হিসেবে নয়। তিনি শঙ্করের লজিকের ভুল ধরতে বসেন নি। তাঁর অন্তরাত্মা মায়াবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে,

কেননা তাঁর বিশ্বাস জীবনের উপর উক্ত দর্শনের প্রভাব অতি মারাত্মক। তিনি বিশ্বাস করেন যে, এই মায়াবাদ মনের ভিতর একবার শিকড় গাড়লে মানুষকে অশক্ত অকর্ম্মণ্য নিরানন্দ ও নির্জ্জীব করে ফেলে। মানুষ তখন একেবারে জড়ভরত হয়ে পড়ে। লেখকের কল্পিত বৃদ্ধগৃধ্র হচ্ছে একটি আদর্শ, অর্থাৎ—চূড়ান্ত মায়াবাদী। তিনি ক্ষুদ্র দোয়েলকে বলেছিলেন—

"মনে রাখিও বৎস, ভগবান নিরাকারেই সত্য সাকারে ভুল; নিরাকারে তিনি আনন্দময়, সাকারে তিনি দুঃখময়।... ... ... আরো জানিও বৎস, জীবনে যাহা সহজ, যাহা সরল, যাহা স্বত তাহাই ভগবানের পথে অন্তরায়! জীবনে যাহা প্রেয় বলিয়া মনে হইবে তাহাকেই বিষবৎ পরিত্যাগ করিবে, কারণ ভগবান যিনি তিনি শ্রেয়, প্রেয় নহেন।"

এরূপ দার্শনিক মত সেই গ্রাহ্য করতে পারে, যার বুকের রক্ত একেবারে জল হয়ে গিয়েছে। কেননা দার্শনিক-চিন্তা জীবনের সকল সত্য থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন না হলে এহেন সিদ্ধান্তে গিয়ে পৌঁছতে পারে না। মানুষের প্রকৃতিতে যা সহজ, যা সরল, যা স্বত তাকে অগ্রাহ্য করায় মানুষ তার মনুষ্যত্বকে অস্বীকার করে। সুতরাং যার অন্তরে প্রাণের শক্তি আছে, অস্তিত্বের আনন্দ আছে, সে যদি তার অন্তর্নিহিত শক্তিকে ফুটিয়ে তোলবার আনন্দলাভ করতে চায় তাহলে "জগৎ মিথ্যা" এ কথাটা সে প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য। মানবাত্মা সহজভাবে সরলভাবে স্বতপ্রণোদিত হয়ে ও-কথায় কখনই সায় দিতে পারে না, কেন না ও-মত গ্রাহ্য করা আর আত্মহত্যা করা একই কথা। আর এক কথা, জগৎকে মিথ্যা বললে সে মিথ্যা ত হয়ে যায়ই

না বরং উল্টে সাংঘাতিক সত্য হয়ে দাঁড়ায়। প্রকৃতির উপর আত্মশক্তির বলে আমরা যদি প্রভুত্ব না করি তাহলে আমরা প্রকৃতির দাস হয়ে পড়ি—বস্তুগত্যা আজকের দিনে আমরা যা হয়ে পড়েছি।

এস্থলে যদি কেউ প্রশ্ন করেন যে, মানব জীবনের অনুকূল কি প্রতিকূল, সেই হিসেবেই কি সত্যকে জানতে হবে, না মানতে হবে? আমাদের জ্ঞানচক্ষুতে যদি ধরা পড়ে যে, এ জগৎ যথার্থই মিথ্যা তাহলেও কি মানুষের সুখলোভী মনকে প্রবোধ দেবার জন্য বলতে হবে, এ জগত সত্য? এ প্রশ্নের উত্তরে সুরেশচন্দ্র বলবেন যে, এ সৃষ্টি যদি সত্য সত্যই একটি রূপকথা হয় তাহলেও সে রূপ আমরা চোখ ভরে দেখব, সে কথা আমরা কান ভরে শুনব, কেন না এই রূপকথার রস উপভোগ করবার জন্যই আমরা হয়েছি ও আছি। এই Concrete জগতের প্রতি লেখকের স্বভাবজ নাড়ীর টান আছে।

(৬)

একদল লোকের বিশ্বাস যে, বাঙলা হচ্ছে সংস্কৃতের অপভ্রংশ অতএব বাঙলা, ভাষা হিসেবে ইতর। এ অপবাদ অমূলক। অপভ্রষ্ট হলে অনেক সময়ে যে ভাষার মর্য্যাদা বাড়ে তার প্রমাণ সংস্কৃতের উপকথা বাঙালীর মুখে হয়ে উঠেছে রূপকথা। উপকথা রূপহীন হতে পারে, কিন্তু রূপকথার বিশেষত্বই এই যে, সে কথার গায়ে রূপ আছে।

রূপকথা আর রূপক যে এক বস্তু নয়, সে বিষয়ে বীরবলের মত পূর্ব্বে উদ্ধৃত করেছি। তিনি আরো বলেন—

"এই রূপকের মধ্যেই হাজারে একখানা ছেলেদের কাছে নব রূপকথা হয়ে দাঁড়ায়, যথা—Don Quixote, Gulliver's Travels ইত্যাদি।"—

এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে বীরবলের মতে রূপকের মধ্যে হাজারে ন'শ নিরানব্বইখানা রূপকথা নয়। আমি তাঁর চেয়ে একটু বেশি যাই। আমার মতে রূপকের মধ্যে হাজারে ন'শ নিরানব্বইখানা অতি বিরূপকথা। পূর্ব্বেই বলেছি যে, মনোভাবকে ইন্দ্রিয় গোচর, দেহী করে তোলাই হচ্ছে রূপকের উদ্দেশ্য। এ চেষ্টা অধিকাংশ ক্ষেত্রে যেমন অযথা, তেমনি নিস্ফল।

ভাবেরও একটা দেহ আছে এবং সে দেহ গড়ে তুলতে হয়, ভাবের সঙ্গে ভাব যোগ করে। নানারূপ আইডিয়ার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে আমরা একটা দার্শনিক মতেরও পরিচ্ছিন্ন মূর্ত্তি গড়ে তুলতে পারি, যদি আমরা জানি কোন্ ভাবের সঙ্গে কোন্ ভাব খাপ খায়, আর যদি আমরা নানা ভাবকে একত্রে করে তাদের যথাযথ বিন্যাস করে পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরকে খাপে খাপে মিলিয়ে গেঁথে এক করে দিতে পারি। শঙ্করদর্শন লোককে এত যে মুগ্ধ করে তার কারণ, তিনি দর্শনের রাজ্যে লজিকের সব চাইতে বড় কারিগর। দার্শনিক তিনি মোটেই ছিলেন না কেননা প্রকৃতির, কি বাইরের কি অন্তরের, কোনো সত্যের তিনি যে কখনো দর্শন লাভ করেছিলেন তাঁর লেখায় তার কোনো পরিচয় নেই। এ সত্ত্বেও তিনি যে বড় দার্শনিক বলে

গণ্য, তার একমাত্র কারণ, তাঁর লজিকের হাত ছিল অসাধারণ তৈরী। বাজিকর যখন তার মুঠোর ভিতর থেকে টাকা বেমালুম উড়িয়ে দেয় তখন কি আমরা সে টাকার শোকে অভিভূত হই, না তার হাত সাফাই দেখে অবাক হই এবং সেই সঙ্গে মহা আনন্দ অনুভব করি? টাকার ভাবনা যে তখন আমরা ভাবি নে, তার কারণ আমরা জানি সে টাকা আছে, পরে আবার ফিরে পাব। তেমনি শঙ্কর যখন এ জগৎটাকে মুঠোর মধ্যে নিয়ে বেমালুম উড়িয়ে দেন তখন আমরা তাঁর হাত সাফাই দেখে অবাক হই এবং সেই সঙ্গে মহা আনন্দ অনুভব করি, জগৎ খোয়া গেল বলে কাঁদতে বসিনে, কারণ মনে মনে জানি জগৎটা আছে; বই বন্ধ করলেই আবার সেটি ফিরে পাব। সে যাই হোক, ভাবের দেহ বস্তু দিয়ে গড়বার চেষ্টায় তার ধর্ম্ম নষ্ট করা হয়, অতএব ও চেষ্টা অযথা।

তারপর এ চেষ্টা হাজারে ন'শ' নিরানব্বই ক্ষেত্রে নিস্ফল। রূপক যদি ভাবের তর্ক দেহকে রেখায় রেখায় অনুসরণ করে তাহলে যা সৃষ্ট হয়, তা একটা কিম্ভূত-কিমাকার কঙ্কাল মাত্র। সে বস্তু জীবন্ত ত নয়ই, তার গায়ে রক্তমাংসের সম্পর্ক পর্য্যন্তও থাকে না। মূর্ত্তি গড়তে গিয়ে তার কঙ্কাল গড়ায় মানুষে কৃতিত্বের পরিচয় দেয় না, আর দ্রষ্টার চোখে সে কীর্ত্তি হয় অসহ্য। এক জ্ঞানী ছাড়া অপর সকলের চোখেই কঙ্কাল হচ্ছে একটি বিশ্রী জিনিস; এই কারণেই সাহিত্য জগতে রূপক হচ্ছে একটি বিশ্রী জিনিস।

তবে বীরবল বলেছেন যে, রূপকের মধ্যে হাজারে একখানা যথার্থ রূপকথা হয়ে দাঁড়ায়। সুরেশচন্দ্রের হাতে দুটি রূপকই রূপ-

কথা হয়ে উঠেছে। এ দুটির ভিতর আর যে বস্তুর অভাব থাক, রূপের অভাব নেই।

(৪)

রূপক তাঁর হাতেই রূপকথা হয়ে ওঠে, যাঁর কাছে তার ভাববস্তুটা গৌণ হয়ে কথাবস্তুটা মুখ্য হয়ে ওঠে, যিনি ভাবের মূর্ত্তি গড়তে বসে কিসের মূর্ত্তি গড়তে বসেছেন সে কথা ভুলে গিয়ে মূর্ত্তি গড়বার আনন্দে মত্ত হয়ে ওঠেন। তিনিই তাঁর রচনাকে অপরের ইন্দ্রিয়গোচর করতে পারেন, যাঁর সকল ইন্দ্রিয় সজীব ও সজাগ। আর তিনিই কল্পনাকে জীবন্ত করে তুলতে পারেন যাঁর জীবজগতের সঙ্গে পরিচয় আছে, আর যিনি জীবনকে সকল মন-প্রাণ দিয়ে সানন্দে আঁকড়ে ধরতে পারেন। এই রূপকথার লেখক এই রূপরসগন্ধস্পর্শময় জগতের ঐশ্বর্য্যে ও সৌন্দর্য্যে বিভোর। তারপর জীবের অন্তরে যে-আশা-আকাঙ্খা, যে-আনন্দ, যে-উদ্যম, যে-শক্তি ও যে-গতি আছে, লেখকের কাছে সেই সবই হচ্ছে মানবপ্রকৃতির সার সত্য। এই কারণেই তিনি মায়াবাদের প্রতিবাদী এবং এই কারণেই তিনি তাঁর প্রতিবাদকে রক্ত-মাংসের দেহ দিতে এবং তার অন্তরে প্রাণসঞ্চার করতে কৃতকার্য্য হয়েছেন। সুরেশচন্দ্র লিখতে বসেছিলেন রূপক; কিন্তু লিখে উঠেছেন রূপকথা।

আমি পূর্ব্বেই বলেছি যে, রূপকথা অলৌকিক কথা। সুরেশচন্দ্র "নব রূপকথায়" ভারতের অতীত সভ্যতার যে ছবি এঁকেছেন, সে ছবি খুব সম্ভবত প্রকৃত নয়। তাতে কিছু আসে যায় না। তিনি আমাদের ইতিহাস শেখাতে বসেন নি, তিনি কল্পনার চক্ষে যে ছবি

দেখেছেন সেই ছবিই আমাদের চোখের সুমুখে ধরে দিতে চেয়েছেন এবং তাতে যে কৃতকার্য্য হয়েছেন তার কারণ তাঁর কল্পনা ঐতিহাসিকের নয়, চিত্রকরের কল্পনা। ভারতবর্ষের ইতিহাস তাঁর কাছে হচ্ছে একটি বিরাট চিত্রশালা। সাহিত্যে তিনি সেই চিত্রশালারই বর্ণনা করতে ব্রতী হয়েছেন। সুরেশচন্দ্রের কল্পনার বিশেষত্বটুকু তুলনার সাহায্যে বোঝাতে চেষ্টা করব। Venice-এর চিত্রকরগণ যে চোখ দিয়ে তাঁদের সমসাময়িক স্বনগরীকে দেখেছিলেন, সুরেশচন্দ্র সেই চোখ দিয়েই স্বদেশের অতীতকে দেখেছেন। ভাসের নাটকে পড়েছি, একব্যক্তি একটি ছবি দেখে আনন্দে এই বলে চীৎকার করে উঠেছিলেন—"অহো কি বর্ণাঢ্যতা!" Venetian চিত্রকরদের আঁকা-ছবি দেখলে সকলের মুখ দিয়েই স্বতই উচ্চারিত হয়, "অহো কি বর্ণাঢ্যতা!" তাদের আর্টের সমস্ত ঝোঁকটা ছিল বর্ণের উপর, আকারের উপর নয়। যা-কিছু উজ্জ্বল, যা-বর্ণাঢ্য তাঁদের চোখ স্বভাবতই তার উপরে পড়েছে, আর তাঁদের রঙের তুলি তাই চির-দিনের জন্য পটস্থ করে রেখেছে! সুরেশচন্দ্রের রূপকথা পড়বার সময় আমার চোখের সুমুখে Tintoretto-র এক একখানি ছবি ফুটে ওঠে। এ চিত্রকরের কাছে মানুষের জীবনযাত্রা হচ্ছে আদ্যোপান্ত একটি শোভাযাত্রা, তাই তিনি Venice-এর উৎসবের ছবি সব এঁকে গিয়েছেন, এবং সে সব ছবি মানবের নয়নের চির-উৎসব। নরনারীর উন্নত পরিণত দেহ, উজ্জ্বল রূপ, প্রফুল্ল যৌবন, নানাবর্ণের বিচিত্র বেশ, দীপ্ত রত্ন-আভরণ, এই সকলের একত্র সমাবেশে সে চিত্র ঐশ্বর্য্যবান। তার উপর Venetian চিত্রকরেরা আলো ভালবাসতেন তাই সুরেশচন্দ্রের ভাষায় বলা চলে যে, সে চিত্র "আলোর স্পর্শে

আনন্দের আতিশয্য সহ্য করিতে না পারিয়া গালভরা হাসি লইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।” সুরেশচন্দ্রের চোখে আমাদের অতীতের যে মূর্ত্তি ধরা পড়েছে সে মূর্ত্তিও উৎসবের ঐশ্বর্য্যময় আনন্দময় মূর্ত্তি। তাঁর কল্পনা পুষ্টিমার্গের পথিক।

সুরেশচন্দ্রের আত্মা হচ্ছে ঐশ্বর্য্যভক্ত। এস্থলে “ঐশ্বর্য্য” শব্দ আমি তার সংস্কৃত অর্থে ব্যবহার করছি। যে-কর্ম্ম, যে-ব্যবহার, যে-কীর্ত্তির ভিতর মানুষ এই সত্যের পরিচয় দেয়, যে তার অন্তরে ঈশ্বরের বিভূতি আছে, সুরেশচন্দ্রের মন-প্রাণ তাতেই মেতে ওঠে। যার ভিতর দীনতা, হীনতা, কৃপণতা, কাপুরুষতার পরিচয় পাওয়া যায় সুরেশচন্দ্রের আত্মা তার প্রতি স্বতই বিমুখ। আমাদের এই বর্ত্তমান বিরাট জাতীয় দৈন্যের মধ্যে যদি কোনো স্বপ্ন দেখতে হয় ত এই ঐশ্বর্য্যের স্বপ্নই দেখা কর্ত্তব্য। যিনি সে স্বপ্ন দেখতে পারেন তিনি ত আমাদের সুমুখে জীবনের নতুন আদর্শ খাড়া করে দেন এবং সেই সঙ্গে আমাদের অন্তর্নিহিত মনুষ্যত্ব জাগিয়ে তোলেন। এ আদর্শকে আমি নূতন আদর্শ বলছি এই কারণে যে মানুষে অতীতের মায়াদর্পণে অধিকাংশ সময়ে শুধু ভবিষ্যতেরি চেহারা দেখে।

(৫)

যাঁর মনে যে-ভাবই থাক, সে তা প্রকাশ করতে না পারলে তার কথা সাহিত্য হয় না। সাহিত্যের গুণ ভাষার রূপের উপরই প্রধানত নির্ভর করে। সুতরাং এখন সুরেশচন্দ্রের ভাষার বিশেষত্বের পরিচয়

নেবার চেষ্টা করা যাক। সুরেশচন্দ্রের ভাষা বর্ণাঢ্য। তিনি বাক্যের গঠনের উপর ততটা ঝোঁক দেন না, যতটা দেন শব্দের বর্ণের উপর। তিনি সেই শব্দ বেশি ব্যবহার করেন, যা শুনলে আমাদের চোখের সুমুখে ছবি ফুটে ওঠে। তাঁর ভাষার দ্বিতীয় গুণ, তার ঐশ্বর্য্য। ভাষা প্রয়োগে তাঁর কোনোরূপ কার্পণ্য নেই। তাঁর রচনার ভিতর কথা সব ভিড় করে আসে, পরস্পর ঠেলাঠেলি করে গায়ে গায়ে ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে যায়। কিন্তু তাঁর লেখা পড়ে স্পষ্টই বোঝা যায় যে তিনি ইচ্ছা করে এতকথা জড় করেন না। তাঁর ভাষার এই আতিশয্যের মূল হচ্ছে তাঁর মন। ভাব তাঁর মনের ভিতর টগবগ করে, তারপর সেই ভাব শব্দের আকার ধরে উছলে পড়ে। তাই তাঁর সকল লেখার মধ্যেই আত্মপ্রকাশের আনন্দ-ব্যাকুলতার পরিচয় পাওয়া যায়। শব্দের দ্বিত্ব তাঁর অতিশয় প্রিয়। "পত্রে পত্রে" এমন কি "ছত্রে ছত্রে," "বনে বনে," "ফুলে ফুলে," "গাছে গাছে," "কুলে কুলে" প্রভৃতি ডবল শব্দ আমাদের চোখে পড়ে। প্রথমে মনে হয়, এ হচ্ছে তাঁর রচনারীতির একটা মুদ্রাদোষ, ইংরেজীতে যাকে বলে mannerism. তবে একটু নিরীক্ষণ করে দেখলেই দেখা যায় যে, এ দ্বিত্ব তাঁর ভাষার একটা কৃত্রিম অলঙ্কার নয়। অলঙ্কারের নিয়মভঙ্গ করেই তিনি এই দ্বিত্বের সৃষ্টি করেন। এর কারণ, এক কথায় একটা ভাব প্রকাশ করায় তাঁর মনস্তুষ্টি হয় না, কেননা তাঁর মনের আবেগ তিনি কিছুতেই স্বল্প কথার গণ্ডীতে আবদ্ধ করতে চানও না, পারেনও না। তাঁর ভয় যে, বেশি চাপাচাপি করলে তাঁর ভাষা হয়ত প্রাণহীন হয়ে পড়বে; কিন্তু তিনি চান যে তাঁর ভাষা সর্ব্বাগ্রে প্রাণবন্ত হোক। তাঁর এ ইচ্ছাও পূর্ণ হয়েছে। তাঁর ভাষা সাবেগ

কিন্তু অসংযত নয়, প্রচুর কিন্তু প্রগল্‌ভ নয়। তাঁর লেখার ভিতর প্রাণের উচ্ছ্বাস, গতি, লীলা ভঙ্গী সবই আছে। এই রূপ কথা দুটি, একটি জ্যান্ত মানুষের জ্যান্ত মনের জ্যান্ত ভাষায় আত্মপ্রকাশ অতএব যথার্থ সাহিত্য।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

ওমর খৈয়াম।

—:•:—

["সওগাত" নামক যে একখানি বাঙলা মাসিক পত্র আছে এ কথা সম্ভবত অধিকাংশ বাঙালা পাঠকই জানেন না ; অন্তত দু'দিন আগে আমি যে জানতুম না একথা নিশ্চয়। আমার কোনো বন্ধুর প্রসাদে এ পত্রের সঙ্গে হালে আমার পরিচয় ঘটেছে। উক্ত পত্র হতে ওমর খৈয়াম সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ সবুজপত্রে পুন প্রকাশিত করবার লোভ আমি সম্বরণ করতে পারলুম না। এই প্রবন্ধটি যিনি পাঠ করবেন তিনিই প্রমাণ পাবেন যে বাঙলা ভাষা শুধু আমাদের নয়, বাঙলার মুসলমানদেরও মাতৃভাষা। এ শ্রেণীর লেখা দেখে মনে হয় যে, বাঙলা সাহিত্যের ভাণ্ডারে হিন্দুর অপেক্ষা মুসলমানের দানের মূল্য কোনো অংশে কম হবে না। উদ্ধৃত প্রবন্ধের বিশেষ মর্য্যাদা এই যে, এর লেখক একজন ফারসি-নবীশ। ওমরের কবিতার সঙ্গে আমাদের পরিচয় ইংরাজি-অনুবাদের মারফৎ। মূলের সঙ্গে অনুবাদের যে সম্পূর্ণ মিল নেই—ফিট্‌জ্-জেরাল্ডের হাতে পড়ে ওমর যে শুধু ইংরাজি পোষাক নয় সেই সঙ্গে বিলেতি মূর্ত্তিও ধারণ করেছেন, এ গুজব আমরা বহুদিন থেকে শুনে আসছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ফারসি ভাষা না জানার দরুণ ইংরাজি অনুবাদে ওমরের কবিতা যে কতদূর রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছে তা বলা আমাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল। বহু ইংরাজ সমালোচকের মতে ওমরের কবিতা মূলে কাচ, ফিট্‌জ্-জেরাল্ডের স্পর্শে তা মণি হয়ে উঠেছে। এ মত যে কতদূর সঙ্গত তার প্রমাণ পাঠকমাত্রেই উদ্ধৃত প্রবন্ধ হতে পাবেন।

আমি পূর্ব্বে আভাস দিয়েছি যে, এই মুসলমান লেখকের বাঙলা খাঁটি-বাঙলা। কিন্তু তাঁর ভাষার এই একমাত্র গুণ নয়। তাঁর লেখা পড়ে মনে

হয় যে সংস্কৃত ভাষার সঙ্গেও তাঁর যথেষ্ট পরিচয় আছে, কেননা তাঁর রচনার ভিতর ঠিক ঠিক সংস্কৃত কথাগুলি ঠিক ঠিক জায়গায় বসে গিয়েছে। আর এ কথাও অস্বীকার করবার জো নেই যে, সংস্কৃত শব্দের অযথা প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগ থেকে রচনাকে মুক্ত রাখতে হলে সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে লেখকের পরিচয় থাকা আবশ্যক। এই লেখা পড়ে আমার আর একটি কথা মনে হয়েছে যে, এ প্রবন্ধ বাঙালী ছাড়া আর কোনো ভারতবাসী লিখতে পারত না। আমাদের বাঙলা সাহিত্যের একটা বিশেষত্ব আছে, যা পরকে বোঝানো কঠিন কিন্তু নিজে বোঝা শক্ত নয়। যদিও লেখক ধর্ম্মে মুসলমান তবুও তিনি যে জাতিতে বাঙালী তার পরিচয় তাঁর লেখায় আগাগোড়া পাওয়া যায়। আজকাল এ দেশের রাজনীতির ক্ষেত্রে হিন্দু মুসলমানের মিলনের কথা নিত্য শোনা যায়। কিন্তু আমাদের পরস্পরের যথার্থ মিলন হবে সাহিত্যের ক্ষেত্রে। কেননা মনোজগতের মিলই হচ্ছে মনের মিল, সে মিল কোনো সাংসারিক উদ্দেশ্য-মূলক নয়, অতএব তার আর কোনো মার নেই। আমার আশা, বাঙলা সাহিত্যই হিন্দু মুসলমান নির্ব্বিচারে বাঙলার লোককে একজাত করে তুলবে।

সম্পাদক।

*   *   *   *

সত্য বটে ওমর খৈয়ামের কবিতা পারস্যদেশে অথবা ভারতবর্ষে সমাদরে গৃহীত হয় নাই এবং ওমর খৈয়ামের যে আজ বিশ্বব্যাপী খ্যাতি তাহা যে ইউরোপের অনুগ্রহে ইহাও সত্য। ওমরের সহিত আমাদের প্রথম ঘনিষ্ঠ পরিচয় ফিজ্ জিরেল্ডের দৌত্যের গুণে। কিন্তু মূল পারশী পড়িয়া আমার মনে হয় যে, ফিজ্‌জিরেল্ড এই দৌত্য কার্য্যে প্রকৃত ওমর খৈয়ামের মনের ভাবের উপর নিজের মনের ভাবের ছাপটা দিয়াছেন, এত অধিক পরিমাণে আজ যে ওমর আমাদের

নিকট পরিচিত—সে প্রকৃত ওমর নহে,—ওমরের ছদ্মবেশধারী ফিজ্‌-জিরেল্ড। কান্তি বাবু মূলের সহিত পরিচিত কিনা আমি সঠিক জানিনা, কিন্তু তাঁহার অনুবাদ পড়িয়া মনে হয় যে তিনি ফিজ্‌-জিরেল্ডকেই মূল ধরিয়া অনুবাদ করিয়াছেন এবং সেই জন্য তাঁহার প্রদর্শিত ওমর খৈয়ামও প্রকৃত ওমর খৈয়াম নহে।

কান্তি বাবুর পুস্তকের ভূমিকা লিখিয়াছেন শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী। তিনি 'ফার্সি আমরা জানি নে' বলিয়া আরম্ভ করিয়াছেন। অগ্রহায়ণের ভারতবর্ষে শ্রীযুক্ত জলধর সেন কান্তি বাবুর পুস্তকের সমালোচনা করিয়াছেন। তিনিও লিখিয়াছেন 'মূল ফরাসীতে (ফার্সিতে?) কি আছে জানি না'। তাঁহারা উভয়েই খৈয়ামের কবিতার দর্শনের আলোচনা করিয়াছেন এবং মূলের সহিত পরিচিত না থাকায় তাঁহারা উভয়েই ভ্রান্তিতে পড়িয়াছেন।

শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী লিখিয়াছেন,—

"ওমারের সকল কবিতার ভিতর দিয়ে যা ফুটে উঠছে, সে হচ্ছে মানুষের মনের চিরন্তন এবং সব চাইতে বড় প্রশ্ন :—

"কোথায় ছিলাম, কেনই আসা, এই কথাটা জান্‌তে চাই"

* * * *

যাত্রা পুনঃ কোন লোকেতে? * *

এ প্রশ্নের জবাবে ওমর খৈয়াম বলেন :—

"সব ক্ষণিকের, আসল ফাঁকি, সত্য-মিথ্যা কিছুই নাই।"—

ওমর যে সেকালের মুসলমানসমাজে উপেক্ষিত হয়েছিলেন, এবং

একালের ইউরোপীয় সমাজে আদৃত হয়েছেন, তার কারণ তাঁর এই জবাব। যাঁরা মুসলমানধর্ম্মে বিশ্বাস করেন, তাঁদের এ মত শুধু অগ্রাহ্য নয়—একেবারে অসহ্য; কেননা এ কথা ধর্ম্মমাত্রেরই মূলে কুঠারাঘাত করে। অপর পক্ষে এ বাণী মেনে নেবার জন্য এ যুগের ইউরোপের মন সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিল। ইউরোপের মন একান্ত বিজ্ঞান-চর্চ্চার ফলে, খ্রীষ্টধর্ম্মের উপর তার প্রাচীন বিশ্বাস হারিয়ে বসেছিল; কিন্তু তার পরিবর্ত্তে কোনো নূতন বিশ্বাস খুঁজে পায় নি। সুতরাং ওমরের কবিতায় বর্ত্তমান ইউরোপ তার নিজের মনের ছবিই দেখতে পেয়েছিল। এই হচ্ছে প্রথম কারণ—যার দরুণ ওমরের বাণী ইউরোপের মনকে এতটা চঞ্চল করে তুলেছিল।

* * * *

তিনি আবিষ্কার করেছেন যে—

"সত্য ফলের আশায় মোরা মরছি খেটে রাত্রি দিন
মরণ-পারের ভাবনা ভেবে আঁখির পাতা পলকহীন।
মৃত্যু-আঁধার মিনার হতে মুয়েজ্জিনের কণ্ঠ পাই—
মূর্খ তোরা, কাম্য তোদের হেথায় হোথায় কোথাও নাই।"

* * * *

ওমর খৈয়ামের মতে······আসল সত্য এই যে, জগৎও মিথ্যা, ব্রহ্মও মিথ্যা।"

* * * *

শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী এক্ষেত্রে ভ্রান্তিতে পড়িয়াছেন। * * ব্রহ্ম মিথ্যা একথা ওমর কখনই বলেন নাই। একমাত্র ব্রহ্মই সত্য,

এবং আর সমস্তই মিথ্যা, এই কথাই তিনি বারম্বার তাঁহার কবিতায় লিখিয়া গিয়াছেন। ব্রহ্ম আছে; নিশ্চয় আছে; ইহাতে বিন্দুমাত্রও সংশয় নাই। যত সংশয়, যত প্রশ্ন, যত কলহ এই ব্রহ্মের স্বরূপ লইয়া মাত্র। ওমর লিখিয়াছেন,—

কত্‌রা বেগ্‌রিস্ত কে আজ বহর জুদায়েম হামা।
বহর বর্ কত্‌রা বেখন্দিদ কে মায়েম হামা।
দর হকিকৎ দিগরে নিস্ত—খোদায়েম হামা।
লায়েক আজ গরদশে এক নোক্তা জুদায়েম হামা॥

বিন্দু কাঁদিয়া কহিল, "হায়! আমি জলধি হইতে পৃথক হইলাম"। জলধি হাসিয়া কহিল, "আমি সর্ব্বব্যাপি"॥ সত্যই আর কিছুই নাই—শুধু আছেন খোদা। ঠিক যেন একটী বিন্দু বৃত্তাকারে ঘুরিতেছে এবং বস্তুতঃ বিন্দুর ন্যায় দেখাইতেছে॥

গাহ্ গশ্‌তা নেহাঁ রু বাকসে না মুমায়ী।
গাহ্ দর সুরে কৌন ও মকান পয়দায়ী॥
ইঁ জলওয়াগরী বা খেশতন বেনমায়ী।
খুদ্ আইনে আইয়ানী ওখুদ্ বিনায়ী॥

মাঝে মাঝে তুমি বদনমণ্ডল সকল-চক্ষুর অন্তরাল কর। মাঝে মাঝে তুমি বিশ্বরূপে আপনাকে প্রকাশ কর॥ এই রহস্যের দ্রষ্টাও তুমি স্রষ্টাও তুমি। তুমিই দৃষ্টবস্তু, তুমিই দর্শন॥

ওমরের এইরূপ আরও অনেক রোবাইয়াৎ* আছে—যাহা হইতে

* হুইনফিল্ডের ওমর খৈয়ামের দ্বিতীয় সংস্করণের ২৬১, ২৮৪, ৩৮৫, ৩৯৫, ৪০২ প্রভৃতি সংখ্যক দ্রষ্টব্য।

স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে ব্রহ্মের সত্বা সম্বন্ধে ওমরের মনে কখনও কোন প্রশ্নের উদয় হয় নাই। তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য এই যে ওমর খৈয়ামের কবিতা পারস্যে এবং ভারতবর্ষে অনাদৃত হওয়ার কারণ কি এবং তাঁহার কবিতার প্রতি অক্ষরে যে প্রশ্ন ফুটিয়া উঠিতেছে সে প্রশ্ন কি? উত্তর হইতেছে এই যে, ওমর খৈয়াম জন্মিয়াছিলেন একাদশ শতাব্দীতে কিন্তু মনটী ছিল তাঁহার বিংশ শতাব্দীর। সেই জন্যই তিনি সেকালের লোকের নিকট উপযুক্ত সম্মান পান নাই। এরূপ দৃষ্টান্ত আমরা প্রত্যহ আমাদের চক্ষের সমক্ষে দেখিতে পাইতেছি। যাহারা আপনাদের সমসাময়িক সকলকে পশ্চাতে ফেলিয়া দূর ভবিষ্যতের দিকে দ্রুত ধাবিত হয় তাহাদিগকে হয় সমসাময়িকেরা পশ্চাতে টানিয়া ধরিয়া রাখে, না হয় তাহাদিগকে দলছাড়া একঘরে করিয়া নিজেদের আত্মসম্মান বজায় রাখে। ওমর খৈয়াম বাস করিতেন নিশাপুরে। তথায় শাস্ত্রকারদিগের অসীম প্রতিপত্তি ছিল এবং তাঁহাদের অনুগ্রহে অনেককেই শাস্ত্রবিরুদ্ধ আচরণ করিবার অভিযোগে দণ্ডগ্রহণ করিতে হইত। ৪৮৯ হিজরিতে নিশাপুরে ধর্ম্ম লইয়া একটী ভীষণ অন্তর্বিগ্রহ হয়। বলা বাহুল্য যে যাঁহারা লোকের অন্ধ বিশ্বাস লইয়া ব্যবসা করেন, তাঁহারা খৈয়ামের মত অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিকে আমল দিবেন না ইহা সুনিশ্চিত। ফলে ঘটিয়াও ছিল তাহাই। স্বল্প সংখ্যক গুণগ্রাহী সুধীজন ব্যতীত ওমরের কবিতাকে কেহ পছন্দ করিত না। এবং পরবর্ত্তী যুগ সমূহে এসিয়ার রাজনৈতিক গগন অন্ধকারাচ্ছন্ন হইবার সঙ্গে সঙ্গে ইহার সাহিত্য-জগতও ঘোর ঘনঘটায় আবৃত হইয়াছিল; কাজেই এসিয়াবাসী কেহ সাহিত্য-গগনের এই লুপ্ত তারকাটীকে খুঁজিয়া বাহির করে নাই—ইহাকে আবিষ্কার করিবার

গৌরব, অন্যান্য গৌরবের সহিত ইউরোপের ভাগ্যেই পড়িয়াছে। এই স্থলে ন্যায়ের অনুরোধে ইহাও বলা আবশ্যক যে, এক পক্ষে শাস্ত্রকারগণ যেরূপ ওমরের প্রতি বিরাগী ছিলেন, ওমরও তাহাদিগকে তেমনি অশ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া ওমর অনেক কবিতা লিখিয়াছেন। নমুনা স্বরূপ একটী উদ্ধৃত করা গেল :—

শেখে বা জনে ফাহেশা গোফ্‌তা—মস্তী।
হরলহজা বা দামে দীগর পা বস্তি ॥
গোফতা, শেখা হর্ আঁচে গোফতি হস্তম্।
আম্মা তু চুঁনাঁকে মি নোমায়ী হস্তী ?

বারনারীকে দেখিয়া শেখ বলিলেন, "তুই মাতাল। অনুক্ষণ তুই পরপুরুষ সহবাস করিস" ॥ উত্তর করিল। হে শেখ! তুমি যাহা কিছু বলিলে সমস্তই সত্য। কিন্তু তুমি বাহিরে দেখিতে যেরূপ অন্তরেও কি তদ্রূপ ?" ধর্ম্মের পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া অনেক ভণ্ডই এ পৃথিবীতে যশঃ মান খ্যাতি এবং প্রতিপত্তি লাভ করে।

এই শ্রেণীর আর একটী কবিতা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"আয় রফ্‌তা ও বাজ আমদা ও খম্ গশ্‌তা।
নামৎ জে মিয়ানে মর্দ্দমান গুম্ গশ্‌তা ॥
নাখুন হামা জমা আমদা ও স্থুম্ গশ্‌তা।
রেশ আজ পসে কৌন আমদা ও দুম্ গশ্‌তা ॥

তুমি প্রস্থান করিয়াছিলে এবং পুনরায় আসিয়াছ—চতুষ্পদ রূপ ধারণ করিয়া। মানব জাতির মধ্য হইতে তোমার নাম লুপ্ত হইয়াছে।

তোমার নখ জমাট হইয়া খুর হইয়াছে। তোমার শ্মশ্রু পশ্চাতে গিয়া লাঙ্গুলের আকার ধারণ করিয়াছে।

কথিত আছে খৈয়াম একটী গর্দ্দভ দেখিয়া এই কবিতাটী আবৃত্তি করিয়াছিলেন। গর্দ্দভ নাকি পূর্ব্বজন্মে একটা মোল্লা ছিল—খৈয়াম তাহাকে চিনিতে পারিয়াছিলেন।

আমাদের দ্বিতীয় প্রশ্ন হইতেছে, ওমর কোন্ সমস্যার অর্থ বোধ করিতে গিয়া মাথা খুঁড়িয়া মরিয়াছিলেন? পূর্ব্বেই বলিয়াছি ব্রহ্মের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাঁহার চিত্তে সংশয়ের লেশমাত্রও ছিল না। কিন্তু এই ব্রহ্মের স্বরূপ কি; এই জগৎ-সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি; আমরা কোথা হইতে আসি; কোথায় যাই; কেনই বা আসি; কেনই বা যাই; কেহ বা ভাগ্যবান হয় কেন; কেহ চোখের জলে বসন ভিতাইয়া একটা দীর্ঘ হতাশের বোঝা বহিতে বহিতে মরে কেন, এ দু'দণ্ডের জীবনের অর্থ কি; ইহার মূল কি?—এই সকল প্রশ্ন ওমরের চিত্তে সর্ব্বদা জাগিত। এবং এই সকল প্রশ্নের কোন সন্তোষজনক উত্তর না পাইয়া তাঁহার কবিচিত্ত তাঁহার বক্ষপঞ্জর চূর্ণ করিয়া বাহির হইবার জন্য সর্ব্বদা আকুলি বিকুলি করিত।

> সয়ের আমদম্ আয় খোদা আজ পস্তিয়ে খেশ।
> আজ তঙ্গ্ দেলি ও আজ তিহি দস্তিয়ে খেশ॥
> আজ নিস্ত্ চুঁহস্ত্ মিকুনি বেরুঁ আর।
> জিঁ নীস্তেম বা-হুর্মতে হস্তিয়ে খেশ।

"হে প্রভু! আমার এই হীন অবস্থায় আমি শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি। আমার এই দুর্ভাগ্য, এই দারিদ্র্য॥ তুমি নাস্তি হইতে অস্তি সৃষ্টি

কর। তুমি আমাকে আনয়ন কর,—এই মায়াময় নাস্তি হইতে তোমার সত্য অস্তির মধ্যে॥”

ব্রহ্মের স্বরূপ কি, ওমর কেন, সকল জিজ্ঞাসু হৃদয়েই এই প্রশ্নের উদয় হয়। আমাদের সৌভাগ্যই হউক, আর দুর্ভাগ্যই হউক আমরা সকলেই জন্মগ্রহণ করি হয় মুসলমান, না হয় খৃষ্টান, না হয় হিন্দু, না হয় বৌদ্ধ, না হয় আর কোন ধর্ম্মাবলম্বী হইয়া; অর্থাৎ আমাদের জন্মগত সংস্কারের সহিত কোন না কোন ধর্ম্ম সংশ্লিষ্ট থাকে।

তাহার পর আসে পারিবারিক এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষাগত সংস্কার। এবং এই সকলের সহিত থাকে ব্যবহারগত সংস্কার। এই সমস্ত সংস্কার মিলিয়া আমাদিগকে এক রকম করিয়া গড়িয়া তোলে। যাহারা দ্বিধাশূন্য হৃদয়ে এই সকল সংস্কারকে গ্রহণ করিতে পারে তাহারা শান্তিতে জীবন অতিবাহিত করে; আর যাহারা তাহা পারে না তাহাদের ওমরের মত দুর্গতি হয়। তাহাদের মনের মানুষটী বাহিরের মামুলি পরিচ্ছদে সন্তুষ্ট না হইয়া জগতের অন্তরের প্রকৃত রহস্যের নগ্ন মূর্ত্তিটীর অনুসন্ধানে বহির্গত হয় এবং তাহাদের লাভ হয় শুধু ব্যর্থ প্রয়াসের তপ্ত দীর্ঘশ্বাস। আর ওমরের মত কবির সেই শ্বাস বাহির হয় করুণ মর্ম্মভেদী কবিতার আকারে। ব্রহ্মের স্বরূপ কি? তিনি কি কোরাণবর্ণিত আল্লা, না বাইবেল বর্ণিত গড, না ইহুদি-ধর্ম্মগ্রন্থ বর্ণিত জিহোভা? কবি লিখিতেছেন :—

বুৎখানা ও কাবা খানায়ে বন্দগীস্ত।
নাকুস জদন্ তরানায়ে বন্দগীস্ত॥
জন্নার ও কলীসায় ও তসবিহ্ ও সলিব।
হক্কা কে হামা নেশানায়ে বন্দগীস্ত॥

মন্দির এবং মস্‌জিদ উভয় উপাসনা গৃহ, গির্জ্জার ঘণ্টার শব্দ উপাসনা করিতেই আহ্বান করে, গির্জ্জা এবং মস্‌জিদ, তস্‌বি এবং জপমালা, প্রকৃতপক্ষে সমস্তই তাঁহারি আরাধনার জন্য।

সত্য সত্যই কি পাপী নরক ভোগ করিবে এবং পুণ্যাত্মা স্বর্গবাসী হইবে?

দর স্‌মা' ও মাদ্রাসা ও দায়ের ও কনিশ্‌ত।
তরসন্দা জে দোজখন্দ ও জোয়েয়ায়ে বেহিশ্‌ত॥
আঁকস্‌ কে জে আসরারে খোদা বা খবর আস্ত্‌।
জিঁ তোখম দর আন্দরুণে খুদ হিচ নাকিশ্‌ত॥

ইহুদি, খৃষ্টান এবং মুসলমান ধর্ম্মমন্দিরে ও বিদ্যালয়ে, মানুষ স্বর্গের সুখ লাভ এবং নরক-যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণের পন্থা অন্বেষণ করে। কিন্তু যে খোদার রহস্য ভেদ করিয়াছে, সে এই সকল মূর্খতা হইতে আপনাকে রক্ষা করে।

মুসলমানধর্ম্ম বলিতেছে এই ধর্ম্ম সত্য অন্য ধর্ম্ম মিথ্যা। আবার খৃষ্টানেরা বলিতেছে খৃষ্টধর্ম্ম একমাত্র সত্য ধর্ম্ম, অন্য ধর্ম্ম নরকের পথ প্রদর্শন করে। যাঁহারা অগ্নি উপাসক তাহাদের ব্রহ্মই বা কিরূপ? আবার যাহারা পুতুল পূজা করে তাহাদের ব্রহ্মের সহিতই বা সত্য পরমব্রহ্মের সম্পর্ক কি? ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ব্যর্থ, তাহা আদিমকাল হইতে মানুষ মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছে। ওমর সে কথা জানিতেন।

দর্‌ পর্দ্দায়ে আস্‌রার কসে রা রাহ্‌ নিস্ত্‌।
জীঁ তা'বিয়া জানে হিচ কস্‌ আগা নিস্ত্‌॥
জুজ্‌ দর দেলে খাকে তিরা মনজেল গাহ্‌ নিস্ত্‌।
আফসোস্‌ কে ইঁ কসনহা কোতা নিস্ত্‌॥

এই পর্দ্দার অন্তরালে কাহারও গতিবিধি নাই। মর্ত্ত্য মানব কেহই এই রহস্য অবগত নহে॥ মৃত্তিকার নিম্নে অন্ধকার গৃহে মানবের শেষ গতি।—হায়! হায়! এই দুঃখের কাহিনীর অন্ত নাই॥

কিন্তু এ জ্ঞান থাকিয়াও মানব অজ্ঞান। ভালবাসা যেমন মানুষের মনের স্বাভাবিক ধর্ম্ম, ব্রহ্মজিজ্ঞাসাও তেমনি। ভালবাসিয়া নিরাশার ফসল অর্জ্জন ব্যতীত আর কিছু লাভ হইবে না জানিয়াও যেমন শত শত গুণী, জ্ঞানী, বুদ্ধিমান ব্যক্তি ভালবাসায় পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছেন, তেমনি ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ব্যর্থ জানিয়াও সহস্র সহস্র মানব এই চিন্তায় অহরহ জর্জ্জরিত ও ক্লিষ্ট হইয়াও এই চিন্তা হইতে বিরত হইতেছে না। ব্রহ্মজিজ্ঞাসার আর এক নাম হইতেছে বিশ্বসৃষ্টির গূঢ় রহস্য কি তাহা উদ্ঘাটিত করিবার চেষ্টা। এই রহস্য যুগে যুগে, সকল জাতির, সকল মানবের মনকে আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। এই দুটী প্রশ্ন যেমন একাদশ শতাব্দীর মুসলমান কবি ওমরের মনে জাগিত, তেমনি বিংশ শতাব্দীর ইংরাজ কবি টেনিসনের মনেও উদয় হইয়াছিল। টেনিসন তাঁহার In Memoriam-এ লিখিয়াছেন:—

O life as futile then, as frail;
O for thy voice to soothe and bless!
What hope of answer or redress?
Behind the veil, behind the veil,

ওমর লিখিয়াছেন:—

আস্‌রারে আজল রা না তু দানি ও না মন্।
ও ইঁ হর্‌ফে মোয়েম্মা না তু খানি ও না মন্॥

হস্ত আজ পসে পর্দা গোফ্‌তো গুয়ে মন ও তূ।
চু পর্দা বেরাফ্‌তন্দ না তু মানিও ন মন ॥

ফিজ্‌ জিরেল্ড অনুবাদ করিতেছেন :—

There was a door to which
I found no key
There was a veil past which
I could not see !
Some little talk awhile
of Me and Thee
Thou seemest —and then no
more of thee and me,

কান্তি বাবু অনুবাদ করিয়াছেন :—

রুদ্ধ-দুয়ার জীবন-ঘরের কুঞ্জিকাটির নাইকো খোঁজ,
দেখ্‌তে না পাই ভাগ্য-বধূর ঘোমটা-ঢাকা মুখ-সরোজ ;
বারেক দুবার কণ্ঠে কাহার শুনছি শুধু নামটা মোর—
কয়দিনই বা ?—সাঙ্গ তো হয় সর্ব্বনামের নেশার ঘোর !

কিন্তু টেনিসন এই behind the veil এই পর্দার অন্তরালটাকে settled fact চূড়ান্ত নিষ্পত্তি স্বরূপ গ্রহণ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে রাশি রাশি কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন। আর ওমর ইহাকে সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করিতে পারেন নাই বলিয়াই তাঁহার হতাশ রোদনধ্বনি এখনও মানবের কর্ণে পশিয়া তাহার হৃদয়কে বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিতেছে।

ওমরের কবিতায় কেহ কেহ কেবল মদিরার গন্ধ আর রূপসীর পাৎলা ঠোঁটের জিয়ান-রসের স্বাদ পাইয়াছেন, কিন্তু ওমর খৈয়াম যেমন 'ব্রহ্ম মিথ্যা' কখনও বলেন নাই, তেমন শুধু নাচ, গান, পান করার তথ্য প্রচার করার জন্য লেখনী ধারণ করেন নাই। যদি বাস্তবিক পক্ষে তাহাই হইত তাহা হইলে তাঁহার কবিতা ব্যর্থ হইত ও নিকৃষ্টতর হইত। প্রকৃত পক্ষে এ কবিতাগুলি অভিমানের ও বিদ্রোহের কবিতা। কবি বলিতেছেন, "হে শাস্ত্রকার, তুমি আমাকে প্রকৃত সত্যের সন্ধান দিতে পারিবেনা অথচ আমাকে শত সহস্র 'না'র মধ্যে জড়াইয়া আমার জীবনটাকে বিষাক্ত করিয়া তুলিবে—তাহা হইবে না। আমি তোমার কথা মানিব না। হে আমার চিত্ত! তুমি কেন বৃথা অসম্ভবকে সম্ভব করিবার প্রয়াস পাইয়া কষ্ট পাইতেছ? এস বিশ্রাম কর। অর্থহীন তর্ক ছাড়িয়া দিয়া চল আমরা নিভৃতে গিয়া কোনও তরুণীর অধর সুধা পান করিয়া শ্রান্তি দূর করি।"

কিন্তু ওমরের চিত্ত কি এই আহ্বান শুনিয়াছিল? ওমর কি আপন ইন্দ্রিয়ের সেবায় মগ্ন হইয়া ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা বিস্মরণ হইয়াছিলেন?—না, তাহা নহে। এ ক্ষণিকের বিদ্রোহের পরেই আবার মন সেই পুরাতন চিন্তা লইয়া ব্যস্ত হইত। মাঝে মাঝে যখন অবসাদ আসিত তখন এক একবার হৃদয়ে বিরক্তির উদয় হইত এবং তখনই এই শ্রেণীর কবিতার জন্ম হইত।

পূর্ব্ববর্ত্তী বিভিন্ন ধর্ম্মমতের বিরোধী ওমরের জীবনের প্রধানতম সমস্যা ছিল। এই বিরোধের মধ্যে সত্যিকার ব্রহ্মের স্থান কোথায়? এক স্থানে কবি লিখিতেছেন :—

বুৎ গোফ্‌ত বা বুৎ পরস্ত্‌ কা'য়ে আবেদে মা।
দানি জে চেরুয়ে গশ্‌তাই সাজেদে মা ॥
বর মা বাজমালে খুদ্‌ তজল্লি করদস্ত্‌।
আঁকস্‌কে জে তুস্ত নাজের আয় সাহেদেমা ॥

মূর্ত্তি তাহার উপাসককে জিজ্ঞাসা করিল, "হে আমার উপাসক! তুমি জান কি, কেমন করিয়া তুমি আমার উপাসক হইলে? ইহার রহস্য হইতেছে এই যে যিনি তোমার নয়নের ভিতর দিয়া আমায় দেখিতেছেন, একদিন তিনি আমায় তাঁহার সৌন্দর্য্যের ছটায় উজ্জ্বল করিয়াছিলেন।

অপর এক স্থানে কবি লিখিতেছেন,—

"বাতু বাখারাবাত আগর গোয়েম রাজ।
বেহ্‌ জাঁকে কুনম্‌ বেতু বামেহ্‌রাব নমাজ ॥
আয় আউয়াল ও আখেরে হামা খলকান তু।
খাহি তু মরা বেসোজ ও খাহি বেনওয়াজ্‌।

"এই তো জানি বন্ধু আমার—সত্য জ্যোতির প্রকাশটুক্‌
—রাগেই কিম্বা প্রেমেই ফুটে—ভরায় যা মোর আঁধার বুক,
নিমেষ তরে পাই যদি তার আভাসটা মোর পান্‌শালায়
আঁধার-ঘেরা মন্দিরেতে কেনই যাব—কোন্‌ জ্বালায়!"

ওমর চাহিয়াছিলেন ধর্ম্মের আবরণ ভেদ করিয়া প্রকৃত সত্যের সাক্ষাৎ পাইতে। সে সাক্ষাৎকার লাভ তাঁহার ঘটে নাই;—ঘটা সম্ভবও ছিল না, কেননা সে সত্য এতই উজ্জ্বল এতই তেজোময় যে

পয়গম্বর মুসার চক্ষুও উহা দেখিতে গিয়া অন্ধ হইয়া গিয়াছিল এবং তূর পর্ব্বতও উহাকে সহ্য করিতে না পারিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

নিয়তি এবং মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার চিরন্তন দ্বন্দ্বও ওমরকে সতত ত্যক্ত করিত। তিনি লিখিতেছেন ;—

আয় রফ্‌তা বাচৌগানে কজা হামচূঁ গো।
চপ্‌ মি খুরদ্‌ ও রাস্ত রও হিচ মগো॥
কাঁকস্‌কে তোরা আফগন্দ আন্দর-তগ্‌ ও পো।
উদানদ্‌ উদানদ্‌ উদানদ্‌ উ॥

"নাইকো পাশার ইচ্ছাস্বাধীন—যেই নিয়েছে খেলায় তার,
ডাইনে বাঁয়ে ফেলছে তারে, যখন যেমন ইচ্ছা তার।
মানুষ নিয়ে ভাগ্য-খেলায় করেন যিনি কিস্তিমাৎ—
সবটা জানেন তিনিই শুধু,—জয় পরাজয় তাঁরই হাত।"

তবে স্বর্গ নরক কেন? তবে তিরস্কার পুরস্কার কেন? তবে মানুষকে কৃতকর্ম্মের জন্য বিচারের কষ্টভোগ করিতে হইবে কেন?

বস্তুতঃ ওমরের দর্শন—ব্রহ্মমিথ্যা, ইন্দ্রিয়গোচর অনিত্যকে যথাসম্ভব উপভোগ করাই প্রকৃত বুদ্ধিমানের কার্য্য—এই শিক্ষা দিবার জন্য সৃষ্ট হয় নাই। ওমর কোনও মত প্রচার করিবার জন্য কবিতা লিখেন নাই। তাঁহার কবিতা তাঁহার হৃদয়ের আকুল ক্রন্দনের অভিব্যক্তি মাত্র। এই সকল কবিতা তাঁহার ব্যর্থ ব্রহ্মজিজ্ঞাসার তপ্ত-দীর্ঘশ্বাস মাত্র। কিন্তু এ জিজ্ঞাসা ব্রহ্মের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নহে, এ জিজ্ঞাসা ব্রহ্মের স্বরূপ সম্বন্ধে।

উপসংহারে আমি সাহিত্যামোদী সকলকে অনুরোধ করিতেছি তাঁহারা যেন ওমরের এই অমর কবিতাবলী একবার পাঠ করেন। যাঁহারা মূল পার্‌শি পাঠে অপারগ তাঁহারা যেন কান্তি বাবুর অনুবাদ-খানি পড়েন। যাঁহারা মূল পার্‌শি পড়িতে পারেন তাঁহারাও যেন কান্তি বাবুর অনুবাদখানি পড়িতে না ভুলেন। এবং যাঁহারা মূল না পড়িয়াও ওমরের কবিতা সম্বন্ধে প্রকৃত কথা জানিতে চাহেন তাঁহারা যেন ই, এইচ হুইনফিল্ডের ওমর খৈয়ামের ভূমিকা পড়িয়া দেখেন।

তরিকুল আলম।

টীকা ও টিপ্পনি।

—————ঃ০ঃ—————

আমার লেখার সঙ্গে যাঁর পরিচয় আছে তিনিই জানেন যে তথা-কথিত সাধুভাষার বিরুদ্ধে আমার একটি বিশেষ অভিযোগ এই যে, সে ভাষা অশুদ্ধ। সাধু লেখনীর দৌরাত্ম্যে সংস্কৃত শব্দসকল এত পীড়িত হয় যে সে সকল শব্দ যদি মৃত না হত ত পাঠকেরা এ অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠতেন। সংস্কৃত শব্দের অপ-প্রয়োগ ও দুষ্ট-প্রয়োগ আমার কাছে এতই বিরক্তিকর যে এ বিষয়ে স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রমপ্রমাদও আমি আর্ষপ্রয়োগ বলে শিরোধার্য্য করে নিতে পারি নি। ভাষা সম্বন্ধে আমি একজন শুচিবাতিক গ্রস্ত লোক।

সমাজের পক্ষে কোনোরূপ বাতিকেরই প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। কেননা বাতিকগ্রস্ত লোক প্রায়ই একদেশদর্শী হয়ে ওঠেন। যে বিষয়ে মানুষের বাতিক আছে সে বিষয়ের একটা দিকে তার চোখ এত বেশি করে পড়ে যে তার যে আর একটা দিক আছে তা সে দেখতেই পায় না। যাকে আমরা তীক্ষ্ণদৃষ্টি বলি আসলে তা সঙ্কীর্ণ-দৃষ্টি। অতএব যিনি আমাদের এ বিষয়ে চোখ ফুটিয়ে দিতে পারেন, তাঁকে ধন্যবাদ দিতে আমরা বাধ্য।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত গুপ্ত কবিরত্ন মহাশয় এ বিষয়ে যা লিখেছেন তা এখানে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি। তিনি বলেন :—

"যখন কেহ বলে 'সংস্কৃতভাষায় এরূপ প্রয়োগ কখনো দেখি নাই' তখন সে 'সংস্কৃত সাহিত্য' অর্থেই 'সংস্কৃতভাষা' প্রয়োগ করে। এরূপ প্রয়োগ যে খুব সাধু নহে তাহা বলা বাহুল্য, কিন্তু কোনও সজীব ভাষায় বহুলোক যদি পুনঃ পুনঃ একটি শব্দ এক অর্থে ব্যবহার করে তবে ক্রমশঃ ঐ অর্থে উক্ত শব্দের সহিতে প্রয়োগের অধিকার লব্ধ হয়। কথাটা শুনিতে হয়ত হেঁয়ালির মত শুনাইবে, তথাপি ইহা ঠিক যে, ভ্রম, প্রমাদ ও আলস্যেও ভাষার পুষ্টি হয়।"

(ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন, মাঘ—১৩২৬ পৃ, ১৬৬)।

* * * * *

উপরোক্ত কথা কটি যে সত্য সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। একই শব্দের যে বাঙলা ও সংস্কৃত অর্থ বিভিন্ন, এর ঝুড়ি ঝুড়ি উদাহরণ দেখানো যায়। এবং এর মধ্যে বহু শব্দ যে তাদের সংস্কৃত অর্থ বর্জ্জন করে বাঙলা অর্থ অর্জ্জন করেছে তার মূলে আছে ভ্রম, প্রমাদ ও আলস্য। চরিত্র না বদলালে চেহারা বজায় রেখে সে সকল সংস্কৃত শব্দ বাঙলাভাষায় স্থান পেত না। এক ভাষার পক্ষে অপর ভাষার কথা ধার করা যত সহজ, এক জাতির পক্ষে আর জাতির মনোভাব চুরি করা তত সহজ নয়। এবং এ কথাও সম্পূর্ণ সত্য যে পরভাষার শব্দের অর্থ আপনার মনের মত করে বদলে নিতে না পারলে সে শব্দ কোনোজাতিই আত্মসাৎ করতে পারেন না। আর যা আমরা আত্মসাৎ করতে পারি নে তা নিজস্ব হয় না, পরস্বই থেকে যায়।

কবিরত্ন মহাশয়ের মত গ্রাহ্য করি বলে আমি আমার নিজের মত ত্যাগ করতে বাধ্য নই। কেন?—তা বোঝাবার চেষ্টা করছি।

কবিরত্ন মহাশয় বলেছেন যে "সাহিত্য" অর্থে "ভাষা" ও "ভাষা" অর্থে "সাহিত্য" শব্দের প্রয়োগ সাধু নয়। তাঁর এই মতের উপরই তাঁর সঙ্গে আমার মতভেদের প্রতিষ্ঠা করছি। স্বীকার করলুম যে ভ্রম প্রমাদ ও আলস্যেও ভাষার পুষ্টি হয়; কিন্তু তাই বলে এ কথা স্বীকার করতে পারি নে যে ভ্রম প্রমাদ ও আলস্যে সাহিত্যের পুষ্ট হয়। ভাষা গড়ে ওঠে বহুযুগ ধরে বহুলোকের মুখে, কিন্তু সাহিত্য গড়ে তোলে একটি সময়ে একটি লোকে। ভাষাসৃষ্টি করে জাতি আর সাহিত্যসৃষ্টি করে ব্যক্তি। এ দুই সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও উপায় বিভিন্ন। সকলের কাছে ভাষা জীবনযাত্রার সহায় বলেই মূল্যবান, সাহিত্যে তা ভাবের প্রকাশক বলেই মূল্যবান। লৌকিকভাষা কর্ম্মকাণ্ডের, আর সাহিত্যের ভাষা জ্ঞানকাণ্ডের অন্তর্ভূত। সাহিত্য রচনা করতে হয় সজ্ঞানে, ভ্রম প্রমাদ আলস্য সে রচনার পুষ্টি সাধন করতে পারে না। সুতরাং সংস্কৃত শব্দের অপ-প্রয়োগ দুষ্ট-প্রয়োগ প্রভৃতি বাঙলা সাহিত্যে অমার্জ্জনীয়। এ উপায়ে কোনো লেখক সাহিত্যের ভাষার কিছুতেই পুষ্টিসাধন করতে পারেন না, কেননা তাঁর ভ্রম অপরে আত্মসাৎ করবে না। মেধাতিথি ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে কথা বলেছেন, সাহিত্য সম্বন্ধেও সে কথা খাটে। তাঁর মতে—"একের ভ্রান্তি জগৎভ্রান্ত করতে পারে না"। সাধুভাষার লেখকেরা এই বাক্যটি স্মরণ রাখলে বাঙলা সাহিত্য পড়ে আমাদের আর খুঁত খুঁত করতে হবে না।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

উপকথা।

—:*:—

বৃদ্ধ জেলে আর তার ছোট্ট ছেলে ভেলায় চড়ে' রোজ রাত্তিরে সমুদ্রে যায় মাছ ধরতে। ভেলার গলুয়ের কাছে বসে' জেলে তার জাল ফেলে আর মনে মনে ভাবে—কত না মাছ আজ সে ধরবে—কত রকমের—আর তাই সে বাজারে বেচ্‌বে কত চড়া দামে। ছেলেটা ভেলার পিছনে বসে' থাকে হাল ধরে'—আর তার দৃষ্টি থাকে সেখানে যেখানে ঢেউগুলো উঠছে পড়ছে এঁক্‌ছে বেঁক্‌ছে—আঁধার রাতে যখন পুঞ্জ ফেনার লম্বা রেখা উজ্জ্বল নীল আলো গায়ে জড়িয়ে অনেক দূর থেকে ছল্‌ ছল্‌ ছল্‌ ছল্‌ করে' দৌড়ে এসে ভেলার গায়ে ছনাৎ করে' ভেঙে পড়ে'—যেন রাশি রাশি চূর্ণ হীরা চারিদিকে ছড়িয়ে যায়, তখন সে ভাবে এসব কি? যখন চাঁদ্‌নী রাতে ফণার মত ঢেউয়ের মাথাগুলো চিকমিকিয়ে ওঠে—যেন ছোট ছোট পরীর মেয়েরা রূপোলি আঁচলে বুক ঢেকে হেসে কুটি কুটি হ'য়ে এ ওর গায়ে ঢলে পড়ে, তখন ছোট ছেলেটা ভাবে, এই ত আসল।

এমনি ক'রে দিন কাটে। ছোট্ট ছেলেটি বড় হ'তে থাকে আর সেই সঙ্গে তার নিজের চোখের আলোও নিভে আসতে থাকে। চাঁদ্‌নী রাতে সে ঝাপসা দেখতে সুরু করে, আঁধার রাত তার কাছে

কেবল নিবিড় কালো হ'য়ে ধরা দেয়। দিনের আলো ছাড়া আর তার কাছে আলো নেই। সেই দিনের আলোর মাঝে সমস্ত বস্তু তার বস্তুত্বের পরিসমাপ্তি নিয়ে তার চোখের আগে ধরা দেয়। ছোট্ট ছেলেটি কেমন একটা অস্বস্তি ভোগ করতে থাকে, মনে করে' কি যেন সে হারাতে হারাতে অগ্রসর হ'য়ে চলেছে। এই হারানো থেকে কি কেউ তাকে বাঁচাতে পারে না? ক্রমে ক্রমে সে আরও বড় হয়ে ওঠে, হাল ছেড়ে সে জাল ফেলতে লেগে যায়, আবার সেও তেমনি করে ভাবতে সুরু করে—কত মাছই না সে ধরবে—কত রকমের, আর তাই সে বাজারে বেচবে কত চড়া দামে। তার চোখের সামনে সব কেমন বাস্তব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তখন সে ভাবে ছেলে বেলায় সে কি স্বপ্ন দেখেই না সময় নষ্ট করেছে। ধীরে ধীরে তার মনে মাছের হিসেবই বেশি চলে, তার মনের এপিঠ-ওপিঠ আনাচে-কানাচে কড়ির হিসেব দিয়ে ভরে যায়, তখন আর তার সে ছেলেবেলাকার স্বপ্নের কথা মনেই আসে না।

কিন্তু ঐ যে তার নিজের ছোট্ট ছেলেটি আবার আজ ভেলার পিছনে হাল ধরে বসে' তার নতুন চোখের তরুণ দৃষ্টির সামনে সাগরের নীল জল শাঁদা ফেনা চাঁদ্‌নী রাতের সোহাগ আবার তেমনি স্বপ্নের জাল মেলে দিয়েছে। ভেলার সামনে কড়ির হিসেব, ভেলার পিছনে বে-হিসেবী স্বপ্ন।

আবার এই ছোট্ট ছেলেটিও বড় হ'য়ে মাছের হিসেব করতে বসে যায়। আবার তার ছোট্ট ছেলেটি স্বপ্নের উদ্দেশ করতে জেগে ওঠে। ভেলার সামনেকার কড়ির হিসেব থামে না, তার পিছনের বে-হিসেবী স্বপ্নের জালেরও শেষ পাওয়া যায় না।

সাগরবুকে আবহমানকাল এমনি খেলা চলছে। আর তীরের ঝাপসা গাছেরা তাদের মাথা হেলিয়ে আবহমানকাল ডেকে ডেকে জিজ্ঞেস করছে, ওগো কোন্‌টা সত্যি—এ দু'য়ের কোন্‌টা অশান্ত সাগর আবহমানকাল পৃথিবীর পায়ে মাথা খুঁড়ে খুঁড়ে বলছে—সত্যি! ওগো ও-দুই-ই সত্যি—ও-দুই-ই!

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

মন বদলানো।

—•:•—

বীরবল উপদেশ দিয়াছেন—"আমরা যদি সত্য সত্যই স্বজাতিকে "স্বরাট" করতে চাই তাহলে সব আগে আমাদের কর্ত্তব্য হবে নিজের নিজের মন বদলানো, চরিত্র বদলানো এবং তার জন্য চাই বহু পূর্ব্ব-সংস্কার, বহু অভ্যস্ত মত, বহু সঙ্কীর্ণ ধারণা বর্জ্জন করা"।

তা যদি হয় তাহলে বাঙলা মাসিকপত্রে হালে যে একটা ফ্যাশান দাঁড়াইয়াছে, সময়ে অসময়ে "East is east" কোট করিয়া কিপ্‌লিং-কে গালমন্দ বলা, সেই অভ্যাসটিও আমাদের বদলাতে হয়।

কারণ কিপ্‌লিং কি কেবলমাত্র Rudyard Kipling? ইংরাজ নামক যে এক আশ্চর্য্য মানবসংঘ কোন্ তিমির হইতে ধীরে ধীরে মাথা তুলিয়া শতাব্দীতে শতাব্দীতে আপনার পাপ্‌ড়িগুলি দিকে দিগন্তে ছড়াইয়া দিল, যার হৃন্মর্ম্ম হইতে বাহির হইয়া এক বিশেষ সৌগন্ধ মানবের চিরন্তন ভাণ্ডারে জমা হইয়া গেল, বিশ্বমানবের দরবারে যার বক্তব্য শেষ হইতে হয় ত এখনো বাকী আছে। হইতে পারে অদ্য তার মঙ্গলশঙ্খ "ধূলায় পড়ে," এবং বীণা নীরব হইয়া গেছে, হইতে পারে কিপ্‌লিং তার জয়ঢাক—কিন্তু যে বাঁচিয়া আছে তার হাতে জয়ঢাকে কি করিয়া মৃদঙ্গের বোল উঠিতে পার তার প্রমাণ "Recessoinal"

*　　*　　*　　*

"If drunk with sight of power, we loose
Wild tongues that have not thee in awe,—
Such boasting as the gentiles use,
Or lesser breeds within the Law,—
Lord God of Hosts, be with us yet,
Lest we forget—lest we forget!

For heathen heart that puts her trust
In reeking tube and iron shard,—
All valiant dust that builds on dust,
And guarding, calls not thee to guard,—
For frantic boast and foolish word,
Thy mercy on thy people, Lord!

Amen."

(২)

আসল কথা যে-মন জীবিত, সে যেমন বলের সঙ্গে কাড়ে, তেমনি বলের সঙ্গে ছাড়ে। শান্ত নির্ম্মল ঊষা যেমন করিয়া ধীরে রৌদ্র-করোজ্জ্বল মধ্যাহ্নের মধ্যে পরিণতি লাভ করে, সত্ব তেমনি অলক্ষিতে রজে স্ফূর্ত্তিলাভ করে। আকাশের বিপুল অবকাশের মধ্যে যে রশ্মি স্নিগ্ধ জ্বালাহীন, তা-ই ধরণীতে নামিয়া খরতাপ শোষক। জীবিত ভারতবর্ষে তাই ত্যাগ সত্য, রাজ্যেশ্বর যার পদানত সে বসনহীন

সন্ন্যাসী। তামসিকতার রিক্ততা লুব্ধ কুণ্ঠিত, "কণাটুকু যদি হারায় তা লয়ে প্রাণ করে হায় হায়"; শাকান্নের জন্য দ্বার হইতে দ্বারে বিতাড়িত, দারিদ্র্য ও অপমান স্বেচ্ছাবৃত নয়, ঊর্দ্ধ হইতে নিক্ষিপ্ত ও পুঞ্জে পুঞ্জে স্তূপীকৃত। তার প্রণিপাত একদিকে Lord of Ghosts-কে, অপরদিকে host of পাইক-বরকন্দাজকে। সে যেমন একদিকে আধ্যাত্মিকতার মদে মত্ত, অপরদিকে সব-চেয়ে দেহাত্মবাদী; "কামান-ধূম্র এবং রাষ্ট্র গৌরবের" পরে তার শ্রদ্ধা সব চেয়ে বেশি।

মনোরাজ্যে সমুদয় আবর্জ্জনাকে পরম সম্পত্তি বলিয়া ধারণা ও ধারণ করিবার যে প্রবৃত্তি তাই হচ্ছে চরম conservatism—এবং বীরবল ইহারই বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিয়াছেন।

(৬)

"Vested Interest" হইতেছে নবীনের প্রধান ও প্রথম বাধা।

সেদিন শোনা গেল একদল রায়ত তাদের জমিদারকে যাইয়া বলিল, সদর-খাজনা যা পাঠান তা আমরাই নিজ হাতে সরকারকে দিচ্ছি। কি ধর্ম্মে কি রাষ্ট্রে সর্ব্বত্রই মধ্যবর্ত্তী জনগণ মনঃপরিবর্ত্তনের প্রবল বিরোধী। কেননা তারও ত বাঁচা চাই—অনধিকারীর অনধিকার ও নাবালকের বয়ঃকনিষ্ঠতা তার অস্তিত্বের ওজর। পুরুত আসলে জমিদারের প্রধান পাইক—কেননা পুরুতের রাজ্য মানুষের মনে। এই কারণে সব দেশে সব কালে জমিদার পুরুতকে হাতে রাখিয়াছে। এবং বৈদেশিক ব্যুরোক্রাসি তাজমহলে হস্তক্ষেপ করিলেও কালীঘাটে করে নাই—কেননা কালীঘাট ফোর্ট উইলিয়মের

চেয়ে তার কম বড় দুর্গ নয়। Toleration নাস্তিকেও করে, এবং শ্রদ্ধা ও অবজ্ঞা দুই-ই সমভাবেই তার কারণ হইতে পারে, এবং ও হচ্ছে পলিশির সেরা পলিশি।

এখন অদৃষ্টের বিধানে এই মধ্যবর্ত্তীদের হাতে সমুদয় ক্ষমতা রহিয়াছে—এবং তাদের প্রধান খুঁটা রহিয়াছে মানবমনের একটি অতি সাধারণ সত্যের উপর—সে হচ্ছে নতুনের প্রতি একটা সংস্কার-গত অবিশ্বাস। শিশুটি অপরিচিতের কোলে যাইবে না। যুগে যুগে বহু মানবের পায়ে পায়ে, "line of least resistance" ধরিয়া, যে পথ তৈরি হইয়াছে তাই সব চেয়ে সুবিধাজনক পথ হইবার সম্ভব, তাকে ত্যাগ করিবার প্রয়োজন কি? নিজেকে সে পথে খাপ খাওয়াইতে না পারিলে কেবল আপনারই অক্ষমতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা প্রমাণ করা হয়। এবং সে অবস্থাতে দশজনের মত হইয়া চলিতে শেখা-ই জীবনের সাধনা হওয়া উচিত। অনেক লোকে যেখানে একমত সেখানেই ত বিজ্ঞতা।

(৪)

এদেশে অদ্য যদি কোনো একটা সত্যকে আর একটার চেয়ে বেশি করিয়া প্রচার করিবার দরকার উপস্থিত হইয়া থাকে তবে তা এই যে, wisdom আর truth আলাহিদা পদার্থ, এবং আয়তন ও সংখ্যার হিসাবে সত্যের মাপ হয় না। সত্য হচ্ছে একটি স্ফুলিঙ্গ যার কার্য্যাবলী আদপেই বুদ্ধিমানের মত নয়, এবং যার চেহারাও নেহাইৎ-ই দোহারা। তবু,

"মরে না মরে না কভু সত্য যাহা শত শতাব্দীর
বিস্মৃতির তলে,
নাহি মরে উপেক্ষায়, অপমানে না হয় অস্থির,
আঘাতে না টলে।"

"ন যদিদম্ ইমে উপাসতে," জনবর্গের সুমুখে যা বাস্তবিকরূপে গোচর, তা-ই সত্য না-ও হইতে পারে। সত্য দিনের আলোর মত স্পষ্ট হইয়াও আরব্য উপন্যাসের "সাগরের বুড়ো"। তাকে মুষ্টির মধ্যে বদ্ধ করা চলিবে না। সে জীবনের মত নমনীয় ও স্থিতিস্থাপক। সে ভিতর হইতে আপনার জড়-কায়াকে চিরকাল নির্ম্মাণ করিতে করিতে চলিয়াছে—সে এক মুহূর্ত্ত থামিলে "উচ্ছ্রিয়া উঠিবে বিশ্ব পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুর" ভারে। এদেশে সেই বস্তুপুঞ্জই পর্ব্বতপ্রমাণ হইয়া উঠিয়াছে। কে না জানে ভারতবর্ষের সভ্যতা আজ এক সুবিপুল debris—সে তার ঐতিহাসিকতাতে চমৎকারী হইতে পারে, আসলে কিন্তু প্রাণহীন আচারপরম্পরা।

(৫)

"অনেকদিন পরাণহীন ধরণী"। ফাল্গুনে সত্যের আগমনে যদি ধরণীর নাড়ীর মধ্যে জীবনের স্পন্দন সুরু হইতে পারে, তবে এ জাতের Inertia কি ভাঙিবে না? চাই গতির প্রেরণা। কিন্তু ধাক্কা কোথায় প্রথম পড়িবে, সেই হচ্ছে প্রশ্ন।

ব্যক্তির বিচারবুদ্ধির পিঞ্জর-মুক্তি যেন ঘটিল এবং সকলেই জানেন intellectual awakening এদেশে ঘটিয়াছে। এবং সম্ভবত এদেশের

বুদ্ধি কোনো কালেই অসাড় হইয়া ঘুমাইয়া ছিল না। আসল ব্যাধি মনের নয়, চরিত্রের। "ন চ মে প্রবৃত্তিঃ"-ই যে এ-দেশের ইতিহাসের ট্র্যাজেডি-র গোড়া, এ-সম্বন্ধে আর সন্দেহমাত্র নাই। "প্রবৃত্তি"-র গোড়ায় আছে "নিবৃত্তিঃ"—সংহতি এবং প্রসার যেমন জড়িত—এবং নিবৃত্ত হইতে চাহিলেও কেন যে নিবৃত্ত হইতে আসলে পারা যায় না, সেটা হচ্ছে মানুষের নৈতিক জীবনের প্রশ্ন। অন্য সকল প্রশ্নের সার প্রশ্ন এই যে, মানবজীবনের ও-প্রশ্ন কেবলমাত্র destructive উপায়ে, কেবলমাত্র সংস্কারবর্জ্জন করিয়া সমাহিত হইবে কি না? কোনো নব সংস্কার অর্জ্জনের দরকার আছে কি না? এদেশের রাজনীতির হিসাবে অগ্রগামী-দলের কার্য্যকলাপের সম্বন্ধে অপবাদ এই যে তাঁরা রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে চলেন সুমুখের পানে, সমাজের ক্ষেত্রে বিদেহী আত্মাদের মত উল্‌টা দিকে, পিছনে। আকর্ষণ এবং বিপ্রকর্ষণ আসলে বই-এর একই পাতারই দুই পৃষ্ঠা, ঠেলা-ই কি প্রকারে টানার চেহারা লয় তা জড় বিজ্ঞানের এক মূলসূত্র। সমাজের মন্দিরে ব্যক্তিকে বলি দেওয়ার মনোভাব, এবং India—Right or wrong এর মটো'র প্রেরণার মধ্যে তফাৎ কোনখানে? ভারতবর্ষ যদি বাঁচিয়া থাকে তবে মরিতে নয়, কিন্তু কোটী কল্প নরকে বাস করিতে প্রস্তুত। আর, হিন্দুসমাজ যদি বাঁচিয়া থাকে তবে বিধবা কাঁদুক, জ্ঞানের ক্ষুধায় অস্থির যুবক সমাজ কারাগারে আবদ্ধ থাকুক, জীবনের সকল প্রিয় ইচ্ছা গভীর কামনা রক্তজবার মত' শাস্ত্রের প্রস্তর বেদীর উপর অবলুণ্ঠিত হোক! মানুষকে নিষ্ঠাবান সমাজধর্ম্মপরায়ণ করিয়া দেখা আর পেট্রিয়ট্ করিয়া দেখা—এই উভয় দেখাই মানুষকে "উপায়" স্বরূপে দেখা। এই জন্যই এক জনের আয়োজন মানুষকে অতি-

বিশদজটিল তন্ত্রমন্ত্রের সুতায় পুঁৎলা নাচাইবার, আর এক জনের আয়োজন কুচ্‌কাওয়াজের গুঁতায় মানুষ-মারা যন্ত্র বানাইবার। নিষ্ঠার প্যারাডক্স্‌ এই যে তার সমুদয় দোহাই আধ্যাত্মিকতার, অথচ সে দাঁড়াইয়া আছে দেহাত্মবাদের উপরে, কেননা সত্যের প্রাণের সঙ্গে তার অপরিচয়, বস্তুর আয়তন লইয়াই তার যত কারবার।

এই সত্য জানাই সব চেয়ে বেশি দরকার হইয়াছে যে, মানুষ "উপায়" নয় কিন্তু নিজেই এক উদ্দেশ্য। "Know ye the truth, and the truth shall make you free." "আমায় নিয়ে মেলেছ এই মেলা।" যুগ-যুগান্তর হইতে লক্ষযোজন দূরের তারকা যে কিরণের দূত পাঠাইয়া দিয়াছে, সে এই মাটির পৃথিবীতে নামিবে আমারই চোখে অঞ্জন পরাইবে বলিয়া। "কত কালের সকাল সাঁঝে" লোকে লোকান্তরে কত সুখে দুঃখে, কত বেদনায় ভুবনপ্লাবী জীবধারায় প্রতি নিমিষের বক্ষঃস্পন্দনের মধ্যে যে "চরণ ধ্বনি" বাজিয়াছে সে আমারই "বিজন ঘরের" দিকে এক নিভৃত সমারোহের দীর্ঘ অভিযান। সমস্ত ইতিহাস কিসের শাঁখ বাজাইতেছে? সমস্ত মানবের পরম সুখের বেদনা ও পরম দুঃখের সাধনা যদি না আমার জন্যই সঞ্চিত হইয়া রহিল, তবে এই দু'দণ্ডের নাট্যলীলার নিজের মধ্যে নিজের কোনো মানে নাই।

ভারতবর্ষে এক সময়ে প্রতি-মানবের এই চরম destiny-র বোধ জাগ্রত হইল বলিয়া, জীবনী-শক্তি যেমন করিয়া দেহকে ভিতর হইতে অভিব্যক্ত করিয়া তোলে এক অবিভাক্ত সমগ্রতার মধ্যে, যেখানে—গানের মধ্যে সুরগুলি যেমন সমঞ্জসীকৃত, তেমনি—প্রত্যেক আলাদা অঙ্গ আপন আপন ক্রিয়াগুলিকে স্বত-ই এক অন্তর্নিহিত লক্ষ্যের দিকে

অভিমুখীন করিয়া রাখিয়াছে,—ঠিক তেমনি ভারত-মনীষার গর্ভের মধ্য হইতে, হঠাৎ একদিন নয় কিন্তু কালে কালে, এক বিচিত্র সমাজ-ব্যবস্থা জন্মলাভ করিল। বর্ণাশ্রম তাই তখন স্থিতিস্থাপক ছিল—উদ্দেশ্য তখন জাগ্রত ছিল বলিয়া উদ্দেশ্যে পেঁছানটাই সব চেয়ে বড় লক্ষ্য ছিল—মৃত্যুর লক্ষণই হইতেছে, অ-নমনীয়তা, rigidity.

অতএব যদি ব্যক্তিগত জীবনের সমস্যা ও জাতির জীবনের সমস্যা গোড়াতে এক হয়, তবে এমন একজন বা একদল ব্যক্তির দরকার যিনি বা যাঁরা, আমাদের নেতাদের মত' দোদুল্যমান pendant নন। কিম্বা ব্যক্তির জীবনের গভীরতর সমস্যা সম্বন্ধে সচেতনমাত্র নন, কিন্তু এ দুয়ের সমাধানের প্রয়াসে সমস্ত জীবন-মন নিয়োগ করিতে প্রস্তুত। ভারতবর্ষের আসল সমস্যা, বাঙলায় বলিতে গেলে, ধর্ম্মের সমস্যা। ও শব্দটি ব্যবহারের মুস্কিল এই যে বঙ্গভাষার অপর অনেক শব্দের মত ও-শব্দটিও অতিব্যবহারের দরুণ লুপ্তার্থ। অনন্তকোটী নক্ষত্রের মাঝখানে পর্য্যায়ক্রমে রৌদ্রে ছায়ায় ঘেরাও এক মৃৎ-গোলকের উপরে ও ইতর জন্তু-পুঞ্জের মাঝখানে মননশীল মানুষ অকস্মাৎ আপনাকে নিক্ষিপ্ত দেখিতে পাইল—এখন সে কি করিবে, এ সকলের সঙ্গে তার সম্বন্ধ কি? ক্ষুধা তৃষ্ণা এবং কামের তাগিদ মিটাইয়া দিয়াও জগৎ এবং মানবসমাজ ব্যক্তির মনের এই দুর্নিবার জিজ্ঞাসাকে নিরস্ত করিতে অপারগ হওয়াতে, জগৎ এবং মানব সম্বন্ধে সে থিওরি পাকাইতে বসিল। এবং মানবের সমুদয় ইতিহাস হইতেছে এই থিওরি পাকানোর ইতিহাস, এবং কে না জানে ইউরোপের বিগত এই বিপুল যুদ্ধ হইতেছে গণতন্ত্র ও একতন্ত্রের থিওরির-ই experiment মাত্র! এখন, যে-থিওরি সমুদয় দেশেকালে

খণ্ডিত থিওরিকে আত্মসাৎ করিয়া অখণ্ড, সে হচ্ছে সত্য, সে হচ্ছে জীবন-তত্ত্ব, সে-ই সমস্ত সমাজ-ব্যবস্থাকে ধারণ করিতেছে বলিয়া তার নাম ধর্ম্ম।

দেখা গেছে ধর্ম্মের ক্ষুধা মানুষের জীবনের মধ্যে সত্য ক্ষুধা। আমার দেশকে "স্বরাট" করিবার আমার গরজ কি? ভাল খাইব পড়িব বলিয়া? ছেলেপুলেরা ভাল খাইবে পরিবে বলিয়া? অবশ্য তাহা হইলে, দেশের জন্য আত্মবলিদানের মানে বোঝা যায় না। অবশ্য ছাপার হরফে নাম লিখিত হইবার সম্ভাবনা মানুষকে যে প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করাইতে পারে, তা কারও অগোচর নাই, তথাপি একথা কখনো মিথ্যা নয় যে, "man does not live by bread alone,"—কেবলমাত্র খাওয়া-পরার মধ্যে সেই উন্মাদনা নাই যা মানুষকে খাওয়া-পরার উপাদানস্বরূপ যে দেহ, তার বিসর্জ্জনে প্রবৃত্ত করাইতে পারে। ভবিষ্যদ্‌বংশীয়বর্গের কল্যাণ—এ হচ্ছে একটা আইডিয়া এবং বৃহৎ ভাবের প্রতি মানুষের আকর্ষণের প্রচণ্ডতার মানেই হচ্ছে মানুষের ভিতরকার ভূমাতত্ত্ব। দেশ সেবার নিজের মধ্যে নিজের কোনো মানে নাই—যেমন অর্থসঞ্চয় স্পৃহার নিজের মধ্যে নিজের কোনো মানে নাই, মানুষ নিজের মধ্যে যে একের সন্ধান পাইয়াছে তা সে বাইরেও দেখিতে চায়, তা-ই তার Science সেই একে সে প্রাত্যাহিক জীবনের সুবিধার মধ্যে দেখিতে চায়—অর্থ ই মানুষকে আলাদা আলাদা করিয়া জীবনযাত্রার উপকরণজাল সংগ্রহ করিবার উৎপাৎ হইতে বাঁচায়; কিন্তু সেই অর্থের লিপ্সা যেমন মানবের মূল-তত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গতি হারাইয়া আপনিই একান্ত হইয়া উঠিলে মানবের

অকল্যাণ, তেমনি যে দেশসেবার আসল মানে মানুষের চেতনার মনের প্রসার। সে যখন একান্ত হইয়া আপনিই end in itself হইয়া উঠে, তখনই হয় "বন্দেমাতরম্-এর সৃষ্টি এবং আজকের দিনে উক্ত মন্ত্রের ক্রিয়া যে কি তা দেশে এবং বিদেশে সকলের কাছেই সুস্পষ্ট। মানুষ আপনাকে বড় করিবে, সে জগৎ এবং মানব-সমাজের মধ্যে যে অসীম-তত্ত্বকে আবিষ্কার করিল, সে দেখিল যে সে কেবল তত্ত্ব নয়, সে তার বন্ধু, সেজন্যই সীমায় তার লজ্জার আর অবধি নাই—যাকে ডাক দিয়াছেন "অনন্তং ব্রহ্ম", এই মানবত্বের মহলে।

ভারতবর্ষের অন্তরের কাতর প্রশ্ন আজ এই যে, কোথায় সেই মায়াকাঠি যার স্পর্শমাত্রে এই বিপুল ধ্বংস স্তূপের ছড়ানো ইঁট-পাথর কড়ি-বর্গা এক নিমেষে যে-যার জায়গায় ছুটিয়া গিয়া বিশ্বের বিস্ময় শিল্প-প্রাসাদটিকে আর একবার দাঁড় করাইবে?

আমাদের জীবনের মধ্যে এই প্রশ্ন জাগ্রত হইলে আমাদের সাহিত্যে তার ছাপ পড়িতে বিলম্ব হইবে না। ততক্ষণ এই প্রশ্ন পুনঃ পুনঃ উত্থাপনের প্রয়োজন আছে। কেননা, আমরা আসলে কি চাই, তা আমরা-ই কি জানি? তাই জপের প্রয়োজন।

(৭)

যতক্ষণ আমাদের চরিত্র বদ্‌লানোর সূত্র বাহির না হইতেছে, ততক্ষণ আমাদের সাহিত্যের কার্য্য। কারণ, সাহিত্য will-কে তাড়া দিতে না পারিলেও মনকে নাড়া দিতে পারে। ইংরাজি সাহিত্যের ভিতর দিয়া ইংরাজ-মন আমাদের মনকে যে নাড়া দিয়াছে, দেশের

মধ্যে লক্ষ লক্ষ টিকির সহসা খাড়া হইয়া ওঠা কি তারই পরিচয় নয়? তৈলাক্ত টিকি মেকি আধ্যাত্মিকতায় যতই ঝিকিমিকি করিতেছে, আমরা ততই জানিতেছি "Recessional"-এর মধ্যে ইংরাজ-ইতিহাস তথা ইংরাজ-চরিত্রের যে গভীর বাণী আছে, সেই বাণীর জন্য আমাদের পক্ষে উক্ত তথাকথিত "জড়বাদী"-দের মনের সঙ্গে আরো ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের যত দরকার, আমেরিকায় সন্ন্যাসী পাঠানোর তত নাই।

শ্রীমণি গুপ্ত

পলাশ।

—:০:—

আমি সে পলাশ, জন্ম লভিনু
খর নিদাঘের রুদ্রতাপে!
মধু-মাধবের বাসর অন্তে,
না জানি কাহার কঠিন শাপে।

অন্তিম শ্বাস ফেলি বসন্ত
চলি গেল যবে সুদূর পুরে,
বন-বীথিকার উৎসব মাঝে
উৎসের ধারা সরায়ে দূরে,—

ঘুমের জড়িমা ছাইয়া আসিল
দিগ্বধূদের নয়ন পরে,
ধরণী-আনন ম্লান হয়ে গেল
নব-বিরহের বিষাদ ভরে—

সেইক্ষণে আমি জন্ম লভিনু,
সদ্যশোকের তড়িৎশিখা!
গত রজনীর ফুল্ল আসরে—
নিখিল বেদন ললাটে লিখা।

চিরদহনের জীবন আমার

দীপ্তি লভিল দৈন্য মাঝে !

বিশ্বের দুখ বক্ষে বরিয়া,

ফুটিয়া উঠিনু মলিন সাঁঝে।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ রায়

মাভৈঃ।

——:০:——

কিসের শঙ্কা দয়িত তাহার,
কিসের ভয় গো আর,
তোমার বাণীটি শুনেছে যে জন
কোথা তার সংসার!

কোথা তার কাছে বন্ধু স্বজন,
গুরুজন গৃহজ্বালা,
বিত্তের রাশি মিথ্যার বোঝা—
চিত্তের দাহ-ঢালা!

ফেনিল-মত্ত খ্যাতির তীব্র
সুধা-হলাহল ধারা
বিজলি চমকে করে না তাহারে
অন্ধ লক্ষ্যহারা।

দিশাহীন-গতি ক্ষুব্ধ বাসনা
গর্জ্জে না চিতে তার-
বৃথা ক্রন্দন গুমরি উঠে না
দুঃখ-সজল ধার।

নৃত্য-দোদুল চিত্ত তাহার
ছন্দের দেশছাড়া,
মুক্ত স্বাধীন বিরাট পরাণ
সকল শঙ্কাহারা !

নিশিদিন ধরে হৃদয়ে তাহার
বাজে রে মোহন বাঁশি—
বিশ্ব ভরিয়া উঠে গো মন্ত্র—
"ভালবাস, ভালবাসি"।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ রায়

স্বাভাবিক নেতা।

——০*০——
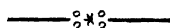
ভাষান্তরিত করলে বাক্যের রসভঙ্গ হয়, অনেক সময়ে অর্থভঙ্গও হয়। সেইজন্য আদিতে বাক্যটা যে ভাষায় ছিল, সেই ভাষাটা উদ্ধৃত করে দিলে বোঝবার সুবিধা হয়। এই প্রবন্ধের নামকরণে যে কথা দুটি ব্যবহার করছি, তার আদি ভাষাটা সেইজন্য এখানে দেওয়া অনাবশ্যক মনে করছি না। সেটা হচ্ছে "natural leader." অনুবাদ ঠিক হয় নি সন্দেহ হওয়াতেই বাক্যটার আদি ইংরেজী রূপ দিলাম।

আমাদের দেশের জমিদার মহাশয়রা এবং তাঁদের পক্ষসমর্থনকারীরা আমাদিগকে বোঝাতে চাচ্ছেন যে, তাঁরাই আমাদের "স্বাভাবিক নেতা", এবং ইচ্ছা করছেন যে আমরা যেমন তাঁদের কর্ত্তৃত্বাধীন আছি তেমনি তাঁদের নেতৃত্বাধীন হই। কথা দুটির সামান্য অর্থ এই যে, তাঁরা আর আমরা (কৃষকেরা) এক দেশে একসঙ্গে জন্মেছি, এবং জন্ম থেকেই তাঁরা আমাদের সকল কাজে পরামর্শ দিয়ে এবং অন্য সকল রকমে সহায়তা করে আমাদের হিতসাধন করে থাকেন। কিন্তু কথাটা কি ঠিক?—প্রাচীন কালে যে, জমিদার নামে কোন পদার্থ ছিল, তার কোনই প্রমাণ পাওয়া যায় না। বৈদিক যুগে তৃণশস্পাযুক্ত উর্ব্বর জমির বন পরিষ্কার করে কৃষকেরা ক্ষেত করেছেন, গ্রাম স্থাপন করেছেন, এমন কথা দেশের প্রাচীন সাহিত্যে অনেক

পাওয়া যায়। তারপর বন্য জন্তু, ঘরের শত্রু, বাইরের শত্রু প্রভৃতি থেকে ক্ষেত্রের শস্য রক্ষা করতে, গোরুবাছুর রক্ষা করতে, গ্রাম রক্ষা করতে এবং এই সকল কাজের জন্য রাজার যা প্রাপ্য তা আদায় করতে রাজা কর্ম্মচারী নিযুক্ত করতেন। কর্ম্মচারীরা বেতন পেত। প্রজার সঙ্গে শঠতা করলে, প্রবঞ্চনা করলে, রাজা তার সর্ব্বস্ব কেড়ে নিয়ে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিতেন। মনুর ব্যবস্থা—"তেষাং সর্ব্বস্ব-মাদায় রাজা কুর্য্যাৎ প্রবাসনম্।" তখন রাজা এবং প্রজার মধ্যবর্ত্তী জমির উপস্বত্ব বা তার অংশভাগী কেউ ছিল না। পৌরাণিক যুগেও এই ব্যবস্থা ছিল। মুসলমান রাজারাও প্রথম প্রথম এর কিছু পরিবর্ত্তন করেন নি। তার অনেক পরে যখন বাঙলার নবাবেরা অধঃপাতের পথে অনেক দূর অগ্রসর হয়ে ঈষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাছে অপরিশোধ্য ঋণে জড়িয়ে পড়ে বাঙলা বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানী তাঁদিকে দিলেন, তখন প্রজার দেয় খাজনা আদায়ের ঠিকাদার-স্বরূপ (revenue farmer) জমিদারের সৃষ্টি হল। তাঁরা প্রজার পূর্ব্ব-জও নন্, সহ-জও নন্। অনেক স্থলে তাঁদের সৃষ্টি হয়েছে কালেক্টারীর নিলামঘরে। থর্ন্টন নামে একজন ইংরেজ কলিকাতা রিভিউ পত্রে এর একটি বেশ সুন্দর বর্ণনা দিয়েছিলেন। কালেক্টার সাহেব (এখনকার নয়, দেওয়ানী পাবার কিছু দিন পরে যখন রাজস্ব আদায়ের জন্য প্রথম কালেক্টার নিযুক্ত হলেন) আফিসে আসীন। তাঁর দক্ষিণহস্তরূপে কানুনগো নিকটেই উপবিষ্ট। বন্দোবস্তের জন্য একটা জমিদারীর কাগজ পেশ হল। পূর্ব্ব বন্দোবস্তের কাগজ-পত্র পড়া হল। কালেক্টার সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, সে জমিদারীর জমিদারের নাম কি?—কানুনগো নাম বললেন। তার পর টাকার

কথা। এ বিষয়েও কানুনগোর কথাই কালেক্টার সাহেবের প্রধান নির্ভর। কোন প্রতিদ্বন্দ্বী জমিদার আরও কিছু বেশী দিতে চায় কি না, তা অবশ্য দেখা হল। তারপর দরদস্তুর করে এক জনের সঙ্গে বন্দোবস্ত হয়ে গেল। এই জমিদার সৃষ্টি-তত্ত্ব পৌরাণিক বিশ্বসৃষ্টি-তত্ত্বের মত উপকথা নয়। এর কাগজ-পত্র দলিল-দস্তাবেজ আছে, এবং জমিদারেরা তা বেশ জানেন। তা ছাড়া অনেক জমিদার আছেন যাঁদের কোন আদিপুরুষ বুদ্ধিবলে, বা কলমের বলে, অথবা বাহুবলে, জমিদারী করেছেন। এঁদের যে কেবল এই দেশেই আবির্ভাব, তা নয়। বিলেতের জমিদার সম্বন্ধে Hyndman বলেন, "the handful of marauders who now hold possession (of the land), have and can have no right save brute force against the tens of millions whom they wrong."

তারপর প্রজার সঙ্গে এঁরা কিরূপ ব্যবহার করেন, সেটা একবার দেখা যাক। সকলেই জানে যে তাঁরা খাজনা আদায়ের ঠিকাদার, শিষ্টাচারের অনুরোধে তাঁদিকে জমিদার বলা হয়। সে হিসেবে তাঁদের কাজ কেবল প্রজার কাছ থেকে খাজনা আদায় করা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, কি আদায় করেন? সরকারী রিপোর্টে তার উত্তর এই—"The modern zamindar taxes his raiyats for every extravagance or necessity that circumstances may suggest, as his predecessors taxed them in the past. He will tax them for the support of his agents of various kinds and degrees, for the payment of his income tax and his postal cess, for the purchase of an

elephant for his own use, for the cost of the stationery of his establishment, for the cost of printing the forms of his rent receipts, for the payment of his lawyers. The milkman gives his milk, the oilman his oil, the weaver his clothes, the confectioner his sweetmeats, the fisherman his fish. The zamindar levies benevolences from his raiyats for a festival, for a religious ceremony, for a birth, for a marriage ; he exacts fees from them on all changes of their holding, on the exchange of leases and agreements, and on all transfers and sales ; he imposes a fine on them when he settles their petty disputes, and when the police or the magistrate visits his estates ; he levies blackmail on them when social scandals transpire, or when an affray or an offence is committed. He establishes his private pound near his cutchery, and realizes a fine for every head of cattle that is caught trespassing on the raiyat's crops. The abwab, as these illegal cesses are called, pervade the whole zamindari system. In every zamindari there is a naib, and under the naib there are gumastas ; under the gumastas there are piyadas or peons. The naib occasionally indulges in an ominous raid in the mofussil : one rupee is exacted

from every raiyat who has a rental, as he comes to proffer his respects. Collecting peons, when they are sent to summon raiyats to the landholders' cutchary, exact from them daily four or five annas as summons fees. (Administration Report, Bengal, 1872-73, page 23). অর্থাৎ—"অবস্থার তাড়নায় বা বিলাসিতার জন্য, অতীতে তাঁর পূর্ব্ব পুরুষেরা যেমন করতেন, এখনকার জমিদারও তেমনি, প্রজার কাছে নানারকম অবৈধ কর আদায় করেন। আমলার ভরণ পোষণের জন্য কিছু, আয়করের জন্য কিছু, ডাক-করের জন্য কিছু, নিজের ব্যবহারের জন্য একটা হাতী কেনা হয়েছে তার জন্য কিছু, তাঁর কাছারীর কাগজ কলমের জন্য কিছু, খাজনার রসিদের ফরম্ ছাপাবার জন্য কিছু, মোকদ্দমা-মামলার খরচের জন্য কিছু, প্রজার কাছ থেকে আদায় করা হয়। দুধ-ওয়ালা তাঁকে দুধ দেয়, তেলী তেল দেয়, তাঁতী কাপড় দেয়, ময়রা মিষ্টান্ন দেয়, জেলে মাছ দেয়। পর্ব্ব, পূজা, ব্রত, উৎসব, ছেলের জন্ম, বিবাহাদিতে প্রজাকে কিছু দিতে হয়। যোত-জমা হস্তান্তর করতে হলে, পাট্টা কবুলিয়ৎ বদলাতে হলে কিছু দিতে হয়। পুলিস বা ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব জমিদারীর মধ্যে এলে কিছু দিতে হয়। প্রজাদের মধ্যে সামান্য সামান্য বিবাদ বিসম্বাদ মেটাতে হলে কিছু দিতে হয়। পারিবারিক বা সামাজিক কোন কলঙ্কের কথা প্রকাশ হলে কিছু দিতে হয়। একটা মারামারি বা অন্য কোন ঘটনা হলে কিছু দিতে হয়। কাছারীর কাছে পাউণ্ড আছে, কারো গরু বাছুর কারো কিছু অনিষ্ট করলে জরিমানা দিতে হয়। এই সকলের নাম "আবওয়াব"। এই আব-

ওয়াব” ছাড়া জমিদারীর কোন কাজই নেই। সকল জমিদারেরই নায়েব আছেন, নায়েবের অধীনে গোমস্তা আছেন, গোমস্তার অধীনে পেয়াদা আছেন। নায়েব মহাশয় কখনো কখনো মফস্বলে অভিযান করেন, প্রজাকে অমনি একটি টাকা নজর দিতে হয়। কোনো কারণে কাছারীতে প্রজার ডাক হল, পেয়াদা ডাকতে গেল, অমনি তলব আনা স্বরূপ পেয়াদাকে দৈনিক চার আনা কি পাঁচ আনা দিতে হয়।” এ সকল কথা কল্পিত নয়। সরকারী রিপোর্টে আছে। আর জমিদারের সেরেস্তা খুঁজলে হিসাবের কাগজপত্রের মধ্যেও এর অনেক পাওয়া যেতে পারে। তবে সকল জমিদারই এর সকলগুলিই সকল প্রজার কাছ থেকে যে আদায় করেন, তা নয়। কিন্তু অনেকেই যে অনেক প্রজার কাছ থেকে এর অনেকগুলি আদায় করেন, তাতেও সন্দেহ নেই।

অনেক জমিদার আছেন যাঁরা খাজনা, আবওয়াব প্রভৃতি আদায় করবার কষ্ট স্বীকার করতে নিতান্ত নারাজ। তাঁরা কিছু লাভ রেখে তাঁদের ঠিকার অধীন ঠিকা দেন। এই অধীন ঠিকাদার বা পত্তনীদার আবার দর-পত্তনী দেন। দর-পত্তনীদার আবার সে-পত্তনী দেন, তিনি আবার তস্য অধীন পত্তনী দেন। সকলেই কিছু কিছু লাভ রেখে থাকেন। এত লোককে লাভ দিতে দিতে, থাকে না কেবল লাভ প্রজার। Baden-Powell বলেন—“This rent is calculated so as to leave a margin of profit, and above the sum payable to the zamindar and the revenue payable to Government, a margin which it depends on the lessee's skill and ability to make more

and more * * In some places there are as many as a dozen gradations between the zamindar at the top and the cultivator of the soil at the bottom." সংক্ষেপে ব্যাপারটা এই যে—উপরে জমিদার আর নীচে কৃষক, এর মধ্যে পত্তনীদার, দর-পত্তনীদার প্রভৃতি অনেকগুলি থাকেন, এবং সকলেই বুদ্ধি ও নিপুণতার সহিত এমন হিসাব করে খাজনা আদায় করেন, যে জমিদারকে তাঁর খাজনা এবং গবর্ণমেণ্টকে তাঁদের রাজস্ব দিয়েও সকলেরই যথেষ্ট লাভ থাকে। Baden Powell এই পত্তনীদার সম্বন্ধে বলেন যে, এই সুচতুর ব্যক্তিটির জমিদারীতে এইমাত্র স্বার্থ যে, তিনি যত পারেন নিজের লাভ করে নেন। তাঁর মনে এ কথা উদয়ই হয় না যে, তাঁর চোষণের পরে যা থাকবে তা শুকনো, নীরস। ব্যাডেন-পাওএলের ভাষায় "Such a person had no other interest but to amass the largest profit to himself, regardless whether on going out he left behind him an estate sucked dry and tenants verging on misery." ১৮৪৩ সালে এই পত্তনী-প্রথা সম্বন্ধে বলা হয়েছিল "Striking its roots all over the country and grinding down the poorer classes to bare subsistence." (Land Systems of British India,—page 638).

তবেই দেখা যাচ্ছে যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সঙ্গে—একশ' বৎসরের কিছু বেশি হল—এই জমিদার সম্প্রদায় শ্রীযুক্ত ঈষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাহাদুর কর্ত্তৃক সৃষ্ট হয়েছেন। বন্দোবস্তটা চিরস্থায়ী হলেও, ছল-বল-কৌশল-খরিদ-বিক্রী-দান-প্রভৃতি দ্বারা অনেক জমিদারী

হস্তান্তরিত হয়েছে এবং নতুন জমিদারের সৃষ্টি হয়েছে। এঁরা সকলেই পত্তনীদার দরপত্তনীদার সমেত, আমাদের "স্বাভাবিক নেতা", অর্থাৎ—"natural leaders." উত্তরাধিকার-সূত্রটা, যেটা natural leader-এর প্রধান অবলম্বন, যখন খণ্ড খণ্ড হয়ে ছিঁড়ে গিয়েছে, তখন এঁদিকে natural leader না বলে ex-officio leader বললে কেমন হয়? Ex-officio-কে ভাষান্তরিত করে আর বাক্যের রসভঙ্গ করব না।

শ্রীহৃষীকেশ সেন।

সত্য-দৃষ্টি।

——:o:——

চিত্ত মোর দগ্ধ কর নিত্য দুঃখ-দানে,
নিরানন্দ শান্তিহারা হোক্ এ জীবন,
ক্ষতি তাহে নাহি নাথ,—শুধু মোর প্রাণে
দিয়োনা জড়ায়ে যেন মোহ-আবরণ।
সত্যের জ্বলন্ত মূর্ত্তি কর প্রজ্জ্বলিত,
মিথ্যা মোহ দূরে যাক্ ; সেও মোর ভালো
যদি প্রাণ হয় তাহে দুঃখে জর্জ্জরিত,
ব্যথাবিদ্ধ ;—নাহি চাই আলেয়ার আলো।
জানি তুমি মোর ভাগ্যে লেখ নাই সুখ,
নয়নের স্নিগ্ধ হাসি, স্নেহ ভালবাসা ;
হোক তাই, তার লাগি হব না বিমুখ।
শুধু মোর প্রাণে জাগে এইটুকু আশা,
উচ্চশিরে বলে যাব, চলে যাব যবে—
সত্যের দেখেছি শক্তি জীবন-আহবে।

শ্রীঅমিয় চক্রবর্ত্তী

———

স্মৃতির ক্ষণিকতা।

ঃ*ঃ

ভুলে যাও, ভুলে যাও, সবে মোরে বলে,
ভুলে যাও দুঃখ তার, সব তার স্মৃতি,
মালাও ত্যজিতে হয় পুষ্প শুষ্ক হলে,
ভুলে পুরাতন আজি গাও নব গীতি।
ভোলা যে সহজ, তাহা খুবই আমি জানি-
এ জগতে কিবা মোরা নিমেষে না ভুলি ?
একান্ত যাহারে মোরা আপনার মানি,
ক্রমে ম্লান হয়ে আসে তারও স্মৃতিগুলি।
তাই বলি, থাক্ স্মৃতি থাকে যত দিন,
মনোমাঝে থাকে থাক্ নিদারুণ ব্যথা—
সান্ধ্যমেঘে আভা সম বিষণ্ণ মলিন,
থাকুক্ জাগিয়া মনে যত তার কথা !
তার পর যদি ধীরে নামে অন্ধকার,
আপনিই লুপ্ত হবে শেষ-আলো তার !

শ্রীঅমিয় চক্রবর্ত্তী

মোস্‌লেম ভারত।*

আমি "সওগাত" থেকে ওমর খৈয়াম সম্বন্ধে যে প্রবন্ধটি উদ্ধৃত করে দিয়েছি, তার ভূমিকায় স্বজাতিকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছি যে, বঙ্গভাষা শুধু আমাদের নয়, মুসলমানদেরও মাতৃভাষা। এ জ্ঞান যে বাঙলার মুসলমান সম্প্রদায়ের মনেও দিব্য পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে, তার পরিচয় পেয়ে যারপর নাই সুখী হলুম। সদ্যপ্রকাশিত মাসিকপত্র "মোস্‌লেম ভারত"-এর মুখপত্রে সম্পাদক মহাশয় "আমাদের কথা" বলে যে ক'টি কথা বলেছেন, সে ক'টি আমাদেরও কথা। সম্পাদক মহাশয়ের কথা এই :—

"বর্ত্তমানে আমাদের "সাহিত্যিক সমাজ" বলিলে কেবল মুসলমান সমাজকেই বুঝাইবে না। পরন্তু বঙ্গদেশবাসী বঙ্গভাষাভাষী হিন্দু মুসলমান মানবসঙ্ঘকেই বুঝাইবে। হউক হিন্দুর ধর্ম্ম ভিন্ন, আর মুসলমানের ধর্ম্ম অন্য, কিন্তু জন্মভূমিগত এবং ভাষাগত হিসাবে হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই এক,—উভয়েই এক প্রকৃতির নিয়মনিগড়ে নিবদ্ধ। * * আজ মুসলমানগণ বঙ্গভাষাকে মাতৃভাষা বলিয়া সাদরে বরণ করিয়া লইয়াছেন, এমন কি অন্দরমহলের ভিতরেও বঙ্গভাষার স্বর্ণ-সিংহাসন সুপ্রতিষ্ঠিত। আজ মুসলমানগণ মনে-প্রাণে বুঝিয়াছেন যে, হৃদয়ের কথা ব্যক্ত করিতে হইলে বাঙলা ভাষার আশ্রয় গ্রহণ ভিন্ন গত্যন্তর নাই।"

* সচিত্র মাসিক পত্র, বার্ষিক মূল্য চারি টাকা। কলিকাতা, ৩ কলেজ স্কোয়ার ইষ্ট, মোসলেম পাব্‌লিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক মৌলভী মোজাম্মেল হক্‌।

এ কথা কটি যেমন স্পষ্ট তেমনি সত্য।

পূর্ব্বোক্ত ভূমিকা আমি এই বলে শেষ করি যে, হিন্দু মুসলমানের যে মিলনের চেষ্টা আজ রাজনীতির ক্ষেত্রে সর্ব্বত্র লক্ষিত হচ্ছে, সে মিলন প্রকৃতপক্ষে সাধিত হবে বঙ্গ সাহিত্যের ক্ষেত্রে। দেখতে পাচ্ছি "মোসলেম ভারত"-এর সম্পাদক মহাশয়ও এ বিষয়ে আমার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। তিনি বলেন ঃ—

"আমাদের মনে হয়, যদি কোনদিন বঙ্গজননীর যুগল সন্তান, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে স্থায়ী সম্মিলন সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে এই বাঙ্গালা সাহিত্যের এই মহা মিলনের ক্ষেত্রেই তাহার আশা করা যাইতে পারে"।

এ আশা ভিত্তিহীন নয়। যে লেখার ভিতর প্রচলিত সামাজিক মনোভাবের অতিরিক্ত কিছু নেই, সে লেখা সাহিত্য নয়—তাই একথা জোর করে বলা চলে যে, সাহিত্যরাজ্যে হিন্দু শুধু হিন্দু নন, তার অতিরিক্ত কিছু; এবং মুসলমানও শুধু মুসলমান নন, তার অতিরিক্ত কিছু। এই অতির দেশই সকল সাহিত্যিকের স্বদেশ।

সাহিত্য বলতে কি বোঝায়, সে বিষয়ে, "মোস্‌লেম ভারতে" একটি সুন্দর প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। কাজী আবদুল ওদুদের "সাহিত্যিকের সাধনা"র মহা গুণ এই যে, উক্ত প্রবন্ধে বিষয়টিকে নানাদিক থেকে দেখা হয়েছে এবং সেই সঙ্গে বিচার করাও হয়েছে। এহেন সুচিন্তিত প্রবন্ধ বাঙলা মাসিকপত্রে নিত্য চোখে পড়ে না। সাহিত্য যাঁরা ভালবাসেন, এ লেখাটি তাঁদের আমি পড়তে অনুরোধ করি। এস্থলে আমি এ কথাটি বলা আবশ্যক মনে করি যে, প্রবন্ধ লেখকের বেশির ভাগ মত আমি খাঁটি বলে মেনে নিই।

বাঙলা ভাষার উপর কাজীসাহেবের কতদূর অধিকার আছে, তার

প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর ইংরাজি পদের ভাষায় অনুবাদে। "সমূহতন্ত্র" কি socialism-এর মন্দ তরজমা? তারপর "ভাব-বিলাস" যে sentimentalism-এর অতি চমৎকার তরজমা, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। Sentimentalism যে এতটা হেয়, তার কারণ ও-বস্তু হচ্ছে বিলাসের একটি অঙ্গ। আর বিলাসী-দেহের চেয়ে বিলাসী-মন যে মানুষের পক্ষে বেশি মারাত্মক, এ কথা দেহাত্ম-বাদী ছাড়া অপর সকলেই মানতে বাধ্য।

আমি মনোবাক্যে "মোস্‌লেম ভারত"-এর শুভকামনা করি। আমার মনে এ আশাও আছে যে, মুসমমান সাহিত্যিকদের হাতে বাঙলা গদ্য সরল ও তরল হয়ে উঠবে। কারণ আমাদের মত সংস্কৃতের গুরুভার তাঁদের বহন করে চলতে হয় না। আর সংস্কৃত ভাষার আর যতই গুণ থাক, ক্ষিপ্রতা নামক ধর্ম্ম তার শরীরে নেই। আর এ কথাও শুনতে পাই যে, ফার্‌সি ভাষার আর যে ত্রুটিই থাকুক, সে ভাষা স্থূলকায় নয়। সুতরাং ফার্‌সি-নবীশদের হাতে বাঙলা ভাষার ফূর্ত্তি যে নষ্ট হবে না, এ আশা কি অসঙ্গত?

আকবর বাদশাহ্‌র দরবারে দুটি গুণী চিত্রকর ছিলেন। আকবর শাহ্ তাঁদের একজনের নাম দিয়েছিলেন "জরীন্-কলম", আর একজনের "শিরীন্-কলম"। আশা করি মুসলমান লেখকদের হাতে আমরা আবার "জরীর কলম" ও "চিনির কলমের" সাক্ষাৎ পাব।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

আষাঢ়ে গল্প।

—:*:—

কিসে যে কি হ'ল, আঠার বছর বয়সের রাজপুত্র চাঁদের মত মুখ, আকাশের মত চোখ, তারার মত দৃষ্টি, পদ্মের মত হাত, কবাটের মত বুক, একদিন মাকে এসে বললেন—"মা, আমি রাজ্যও করব না, সংসারও করব না।"

প্রৌঢ় রাজমহিষী সামনে একখানা আরশি ধরে সিঁথিতে মোটা করে একটা সিঁদুরের রেখা টানতে যাচ্ছিলেন, রাজপুত্রের কথা শুনে তাঁর হাত কেঁপে উঠল, সিঁদুরের রেখাটা বেঁকে গেল। জিজ্ঞেস করলেন—"রাজ্যও করবি নে, সংসারও করবি নে, তবে কি করবি?"

রাজপুত্র উত্তর দিলেন—"একদিক বলে' বেরিয়ে যাব মা।"

মা জিজ্ঞেস করলেন—"সে দিকটা কোন্ দিক?"

ছেলে উত্তর দিলেন—"সে-দিকটা কোনো একটা দিক নয় মা, সে-দিকটা সকল দিক।"

রাজরাণী অনুনয়ের স্বরে বললেন—"এ কি পাগলামি বাবা, রাজ্যও করবি নে, সংসারও করবি নে, এ রাজ্য দেখবে কে? প্রজা-পালন করবে কে?"

রাজপুত্র উত্তর করলেন—"কে করবে জানি নে মা, শুধু এই জানি যে, আমি এখানে হাঁপিয়ে উঠেছি। এই সাতমহলা পুরী, দ্বারে দ্বারে দ্বারী, উঠতে বসতে কায়দা-কানুন, খেতে-শুতে দণ্ড প্রহর গণা,

দু'পা যেতে সঙ্গে সাত শ' লোকের হৈ হৈ রৈ রৈ, একবার মুখ খুললে দশবার "যুবরাজের জয় হোক" শোনা! জীবনের প্রবাহ থেকে সব রস শুকিয়ে ফেলে যেন শক্ত পাথর দিয়ে ভরে' দিয়েছে। এ থেকে আমি একবার ছুটী চাই, কেবল ছুটতে, খোলা আকাশের তলে মুক্ত বাতাসের মাঝে, সামনে পিছনে ডানে বাঁয়ে কোনো শৃঙ্খল নেই, কেবল ছুটতে, বন্ধনহীন শৃঙ্খলহীন কেবল ছুটতে, আর ছুটতে আর ছুটতে; ব্রহ্মাণ্ডের আকাশটাকে চোখ ভরে' দেখে নিতে, দিগন্তের বাতাসটাকে বুকে পুরে টেনে নিতে; একবার, একবার আমি ছুটী চাই।"

রাজরাণী মনে করলেন রাজপুত্র পাগল হ'ল না কি। তৎক্ষণাৎ রাজার কাছে খবর পাঠালেন।

রাজা এলেন। বৃদ্ধ রাজা, মাথার চুল সাদা, ভুরু সাদা, চোখের পাতা পর্য্যন্ত পেকে গেছে। যুবরাজ পিতৃচরণ বন্দনা করলেন। তারপর বললেন—"মহারাজ আপনার দাসানুদাস একবার মুক্তি চায়।" রাজরাজেশ্বর পরাজয় মানল, বৃদ্ধ পিতা তার সন্তানের মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললেন—"এখানে কিসের অভাব বাবা, যে বনবাসী হবে, কোন্ দুঃখে এ সংসার ছেড়ে যাবে?"

যুবরাজ উত্তর করলেন—"মহারাজ! এখানে সব চাইতে বড় অভাব যে কোনো অভাব নেই। মহারাজ, আমি ঠিক জানিনে কোন্ দুঃখ বড়—অভাবের, না অভাবহীনতার। যেখানে মনে ইচ্ছার উদয় হতে না হতেই তা প্রতিপালিত হচ্ছে সেখানে মানুষ থাকে কি করে', কোন্ অবলম্বনকে ধরে' মানুষ সেখানে বাঁচবে? তার চাইতে মহারাজ, আমার মনে হয় পথের মুটেটা পর্য্যন্ত সুখী, তার সামর্থ্যের চাইতে

যে তার আকাঙ্খা বড়, তাই তার বাঁচবার মধ্যে একটা চিরন্তনের কৌতুক, চিরন্তনের রহস্য আছে যা কোনোদিনই নষ্ট হয় না। মানুষের জীবনে একটা চিরন্তনের চেষ্টার দিক আছে বলেই সে-জীবনকে মানুষ সত্য করে পায়। যে জীবনে এই চেষ্টার দিকের আয়োজন নেই, আকাঙ্খা করবার কিছু নেই, সে জীবন মৃত্যুরই সামিল। সে জীবন স্বাস্থ্যবান দেহ-মন-প্রাণের পক্ষে বিষ। মহারাজ, এই মৃত্যু থেকে, এই বিষের সংস্পর্শ থেকে আমি ছুটী চাই। অন্তত আমার দেহটাকে একবার ছুটিয়ে দিয়ে দেখতে চাই—মহারাজ অনুমতি দিন।"

বৃদ্ধ রাজা একবার মুহূর্ত্তের জন্যে অতিপ্রয়াস করে মেরুদণ্ডটাকে ঋজু করে দাঁড়ালেন, দৃঢ়কণ্ঠে বললেন—"আমার অবসর গ্রহণের কাল উপস্থিত, রাজ্যের ভার তোমার, সেই রাজকার্য্যে অবহেলা করে' কর্ত্তব্যের অবমাননা করবে? শাস্ত্রবিরোধী ধর্ম্ম আচরণ করবে?"

যুবরাজ উত্তর করলেন—"রাজরাজেশ্বর! রাজধর্ম্মের চাইতে মানুষের ধর্ম্ম বড়, মানুষের ধর্ম্ম যেখানে রাজার ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করেই সফল হ'তে চায় সেখানে তাই-ই তার সত্য, তাই-ই তার শাস্ত্র। মানুষ রাজসিংহাসনে বসে গৌরব অনুভব করুক কিন্তু মানুষ রাজার চাইতে চিরকালের বড়। মহারাজ, আপনার পুত্রদের মধ্যে যারা রাজসিংহাসন আকাঙ্খা করে তারা রাজ্যশাসন করুক প্রজাপলন করুক, আমাকে এই বর্ণহীন বৈচিত্র্যহীন অভ্যাসের জঠর-চক্র থেকে মুক্তি দিন। আমি ঘুরতে চাই; কিন্তু তা চক্রে নয়—দিগন্তের পানে, আর নিজের ইচ্ছায়।"

কিছুতেই কিছু হ'ল না। পাটরাণীর চোখের জল, বৃদ্ধ রাজার

কাতর বচন, বুড়ো মন্ত্রীর অনুনয় বিনয় অনুরোধ উপরোধ কত বুঝোনো কত পড়ানো কিছুতেই কিছু হ'ল না। রাজপুত্রের কেবল এক কথা—মুক্তি চাই, মুক্তি চাই, মুক্তি চাই।

মন্দ সংবাদ বাতাসের আগে ধায়। সূর্য্যদেব আকাশের এক পোয়া-পথ যেতে না যেতে সারা রাজধানীতে দুঃসংবাদ ছড়িয়ে পড়ল, যে যুবরাজ মনের দুঃখে রাজ্য ছেড়ে চলে' যাবেন।

দেখতে দেখতে সেই আনন্দ-কোলাহলময়ী রাজধানী থমকে-থাকা অশ্রুভরা আঁখির মত ভার হয়ে উঠল, বিষন্ন হয়ে উঠল। যুবরাজ—যাঁর চাঁদের মত মুখ, আকাশের মত চোখ, তারার মত দৃষ্টি, পদ্মের মত হাত, কবাটের মত বুক, সেই যুবরাজ মনের দুঃখে কিনা বনবাসী হবেন! দোকানী দোকান পাট বন্ধ করল, ব্যবসায়ী তার আড়ত বন্ধ করল, ভিক্ষুক তার ভিক্ষা বন্ধ করল, নাগরিকেরা তাদের গৃহ হতে তাদের কর্ম্মস্থান হ'তে দলে দলে বেরিয়ে পড়ল। দলে দলে লোক রাজপ্রাসাদের দিকে ছুটতে লাগল। ধনী দরিদ্র উচ্চ-নীচ স্ত্রী-পুরুষ যুবক-যুবতী বৃদ্ধ-বৃদ্ধা ব্রাহ্মণ-বৈশ্য রাজপুরীর সামনে ক্রমে ক্রমে কোটী লোক জমা হ'ল। সকলেরই এক প্রতিজ্ঞা—আমরা যুবরাজকে যেতে দেব না। কোন্ দুঃখে কিসের অভাবে যুবরাজ এমন সোনার রাজ্য ছেড়ে বনবাসী হবেন? আমাদের যুবরাজ—যাঁর চাঁদের মত মুখ, আকাশের মত চোখ, তারার মত দৃষ্টি, পদ্মের মত হাত, কবাটের মত বুক, তাঁর দুঃখ কিসের? কি অভাব? আমাদের জানান সে অভাব, প্রাণ দিয়ে আমরা সে অভাব পূরণ করব, না পারি তাতে জীবন দেব; কিন্তু যুবরাজকে কখনো ছাড়ব না।

রাজপ্রাসাদের সামনে লোক গিস্ গিস্ করতে লাগল। কেবল

মাথা আর মাথা আর মাথা—একটা মাথার বিরাট অরণ্য। সেই বিশাল জনারণ্য থেকে বিরাট গম্ভীর জলধি-কল্লোলের মত কোটী কণ্ঠে এক সঙ্গে ধ্বনিত হ'য়ে উঠল—"জয় যুবরাজের জয়", "অঙ্গ-বঙ্গ-মগধ-মিথিলা-কাশী-কাঞ্চীর যুবরাজ জয় তরুণাদিত্যের জয়।"

সেই কোটী কণ্ঠের বজ্র-নির্ঘোষনাদে সাতমহলা রাজপুরীর সাত মহল কেঁপে উঠল, মহলে মহলে সব খাট পালঙ্ক আচম্‌কা নড়ে উঠল, সাত মহলে শত রাণীর পোষাপাখীর দল তাঁদের খাঁচার ভিতরে ভীষণ চাঞ্চল্যের সঙ্গে এধার ওধার করে' অর্থহীনভাবে উড়ে বেড়াতে লাগল, টিয়ে পাখীরা দাঁড়ে বসে' ভীষণ ব্যস্ততা সহকারে তাদের পায়ের শিকল কাটবার বৃথা চেষ্টা করতে লাগল, ময়ূরের দল মেঘ ডাকছে মনে করে' তাদের পেখম খুলে দাঁড়াল।

বজ্র-নিনাদে কোটী কণ্ঠে থেকে আবার ধ্বনি উঠল—"জয় যুবরাজের জয়", "অঙ্গ-বঙ্গ-মগধ-মিথিলা-কাশী-কাঞ্চীর যুবরাজ জয় তরুণাদিত্যের জয়।"

বৃদ্ধ মন্ত্রী বললেন, "যুবরাজ, পৌরজনের জনপদবাসীর এই স্নেহ এই অনুরক্তি অবহেলা করবার বিষয় নয়। সমস্ত সাম্রাজ্যের স্নেহ ভালবাসা উপেক্ষা করে' সংসারে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করে' একা একা থাকলে কোন্ উদ্দেশ্য সফল হবে যুবরাজ?"

যুবরাজ উত্তর করলেন,"সংসারে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে থাকতে কে চায় মন্ত্রী? কিন্তু অঙ্গ-বঙ্গ-মগধ-মিথিলা-কাশী-কাঞ্চীতে, এই বিশাল সাম্রাজ্যে সবার চাইতে বিচ্ছিন্ন কি, সবার চাইতে বিচ্ছিন্ন কে মন্ত্রী? এই সাম্রাজ্যের রাজসিংহাসন, এই সাম্রাজ্যের রাজা—নয় কি? এই বিরাট বিচ্ছিন্নতা যে আমাদের চোখে পড়ে না, তার কারণ সে

শূন্য জায়গাটাকে যে আমরা অসংখ্য অসংখ্য আসবাব দিয়ে ভরে' দিয়েছি—এই বিচ্ছিন্নতা ঢাকবার জন্যেই এই বিচ্ছিন্নতাকে ভুলিয়ে দেবার জন্যেই সে-সব আসবাবের এত আড়ম্বর, রাজা যত বড় তাঁর প্রজামণ্ডলী থেকে তার পারিপার্শিক থেকে তাঁর বিচ্ছিন্নতাও তত সম্পূর্ণ আর তাঁর আসবাব পত্রের আড়ম্বরও তত বেশি। বহু শতাব্দী বহু পুরুষ এই আড়ম্বর এই জাঁকজমকে আমরা ভুলে ছিলেম। মন্ত্রী, আর সম্ভব নয়, আমার পক্ষে তা সম্ভব নয়, আমি থাকতে চাই সংসারে সহজ হয়ে, সংসারের নিবিড়তম সংস্পর্শে। তাই আমি রাজসিংহাসনের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি চাই।"

মন্ত্রী বললেন, "যুবরাজ এই সাম্রাজ্যের সমস্ত প্রজামণ্ডলীর দাবী অগ্রাহ্য হবে? উপেক্ষিত হবে?"

রাজপুত্র উত্তর করলেন, "মন্ত্রী, প্রজামণ্ডলীর দাবী রক্ষা করতে আমি তখনই পারব যখন আমার দাবীও সেই সঙ্গে সঙ্গে সফল হয়ে উঠবে। আমার মিথ্যা দিয়ে প্রজামণ্ডলীকে সত্য উপহার কেমন করে' দেব? তাতে যে সার্থক কেউ-ই হ'য়ে উঠবে না।"

কিছুতেই কিছু হোল না। প্রজামণ্ডলীর মুহুর্মুহু জয়ধ্বনি, চতুর মন্ত্রীর যুক্তিতর্ক, বৃদ্ধ রাজার কাতর ভাব, কিছুতেই কিছু হোল না। রাজপুত্রের কেবল এক কথা, আমি ছুটতে চাই, ছুটতে চাই, ছুটতে চাই, উদার আকাশের তলে অন্তহীন দিগন্তের পানে।

বিশাল সাত মহলা রাজপুরী—কত হাসি কত গান কত আমোদ কত উৎসব কত কলরব, সব এক বিরাট নৈরাশ্যের ছায়ায় ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। নহবতে নহবতে রসুনচৌকির সুর আর ফুটল না, ঘোড়াশালে লক্ষ ঘোড়া তাদের খাওয়া বন্ধ করল, হাতীশালে হাজার হাতীর চোখ

দিয়ে টস্ টস্ করে' জল পড়তে লাগল, ময়ূরের দল আর নাচল না, শারী শুকেরা ঠোঁটে ঠোঁট দিয়ে কাঁদতে বসল, হায়! যুবরাজ, যাঁর চাঁদের মত মুখ, আকাশের মত চোখ, তারার মত দৃষ্টি, পদ্মের মত হাত, কবাটের মত বুক, তিনি কি না এমন সোনার সংসার ছেড়ে চলে যাবেন! আনন্দের পুরী অশ্রুতে অশ্রুতে ভরে' উঠল।

কিছুতেই যখন কিছু হোল না তখন রাজা সর্ব্ববিঘ্ননাশন এক যজ্ঞ করতে আদেশ করলেন।

প্রকাণ্ড এক যজ্ঞমণ্ডপ উঠল। যজ্ঞমণ্ডপ আগাগোড়া শুভ্র বস্ত্রমণ্ডিত হ'য়ে সদ্য প্রস্ফুটিত শ্বেতপদ্মের মত শোভা পেতে লাগল। দেশ বিদেশ থেকে কত ব্রাহ্মণ কত পণ্ডিত এলেন, কাশী কাঞ্চী মগধ মিথিলা কোশল পাঞ্চাল, উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম, কত কত দিক দেশ থেকে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত সব এসে যজ্ঞমণ্ডপ জুড়ে' বসলেন। যজ্ঞমণ্ডপ একেবারে গম্ গম্ করতে লাগল। কত পুরোহিত ঋত্বিক। বৈদিক মন্ত্রের গম্ভীর ধ্বনিতে যজ্ঞমণ্ডপ গুম্ গুম্ করে' উঠল। হোমের আগুন লক্ লক্ জিহ্বা মেলে দিয়ে আকাশপানে দব্ দব্ করে' জ্বলে উঠল। অঞ্জলি অঞ্জলি আজ্যের সঙ্গে স্বাহা স্বাহা ধ্বনিতে সমস্ত ঘর ধ্বনিত হয়ে উঠল। যজ্ঞ শেষ হয়ে গেল। রাজপুত্র যজ্ঞভস্মের ফোঁটা কপালে এঁকে লক্ষ ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ সঙ্গে নিয়ে প্রকাণ্ড এক সাদা ঘোড়ায় সোয়ার হলেন। রাজা এসে বললেন—"কুমার, আবার যেন ফিরে এসো।" রাণী এসে বললেন—"বাবা, আবার যেন ফিরো।" মন্ত্রী এসে বললেন—"যুবরাজ, আবার যেন ফিরে আসেন।" মন্ত্রীপুত্র কোটালের পুত্র এসে বললেন—"বন্ধু, দেখো যেন চিরকাল ভুলে থেকো না—আবার ফিরে এসো।" রাজপুত্র

হাসি মুখে সবাইকে বিদায় দিয়ে, সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সিংহদ্বার দিয়ে বেরিয়ে বায়ুবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন।

(২)

প্রকাণ্ড ঘোড়া—দুধের মত রঙ্, রাজহংসীর মত গ্রীবা, রেশমের মত গা, বায়ুবেগে ছুটে চলল। রোদ পড়ে' তার সাদা রেশমী গা চিক্ মিক্ করতে লাগল, খোলা আকাশের মুক্ত বাতাস তার নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করে' যেন তাকে উন্মত্ত করে' তুলল, ঘোড়া যেন পাখা লাগিয়ে বাতাসের আগে উড়ে চলল। রাজপুত্র ছুটে চললেন যেদিকে দু'চোখ যায়। এ রাজার মুল্লুক ছেড়ে ও-রাজার মুল্লুকে, ও-রাজার মুল্লুক ছেড়ে সে-রাজার মুল্লুকে, সে-রাজার মুল্লুক ছেড়ে আর রাজার মুল্লুকে, এমনি করে ছুটে চললেন! কত নদ নদী পর্ব্বত পল্লী নগর কত কানন প্রান্তর পার হয়ে রাজপুত্র ছুটে চললেন, ক্লান্তি নেই, শ্রান্তি নেই, আহার নেই, নিদ্রা নেই। যে রাজ্যের ভিতর দিয়ে যান সেখানেই পুরুষরা বলাবলি করে—"আঃ, কে এমন ভাগ্যবান যে এমন পুত্রের জন্ম দিয়েছে। কুলাঙ্গনারা বলে, "উঃ, কেমন নিষ্ঠুর মা যে এমন ছেলেকে ছেড়ে জীবনধারণ করছে।" রাজপুত্র কত রাজ্য ছাড়িয়ে গেলেন। অঙ্গ বঙ্গ, মগধ মিথিলা, কোশল পাঞ্চাল, চোল চালুক্য, পল্লভ পাণ্ড্য, অবন্তী দ্বারকা—কত কত রাজ্য। এর পর ছুটতে ছুটতে একেবারে পৃথিবীর শেষপ্রান্তে এসে পৌঁছিলেন। আর চলবার উপায় নেই। সামনে ডা'নে বায়ে কেবল জল আর জল আর জল, কেবল নীল আর নীল আর নীল। সেই নীল জলের বুকে সাদা ফেনার মুকুট মাথায় দিয়ে লক্ষ উর্ম্মিবালারা সব হেলছে দুলছে উঠছে পড়ছে হাসছে,

নাচছে। নৃত্যেরও বিরাম নেই, মুখরতারও ক্লান্তি নেই। এখানে ছল্ ছল্ ছল্ ছল্ ছলাৎ, ওখানে চল্ চল্ চলাৎ; এমনি করে' সব লুটো-পুটি খাচ্ছে। পিছনের সমস্ত পৃথিবীর কল কোলাহল এখানে এসে থমকে গেছে, সমস্ত সংগ্রাম এখানে এসে লজ্জায় অবশ হ'য়ে গিয়েছে। এখানে কেবল একটা বিরাট নির্লিপ্ততা, সকল প্রকার সংকীর্ণতাকে যা মুক্তি দিয়েছে, সকল প্রকার বিরোধকে যা অসত্য করে' তুলেছে।

নোনাজলের গন্ধ পেয়ে রাজপুত্রের ঘোড়া আনন্দে চিঁহিঁহিঁ করে' উঠল। রাজপুত্র ঘোড়া থেকে নেমে পড়লেন। তার পর লাগাম ঘোড়ার ঘাড়ের উপর ফেলে দিয়ে সমুদ্রের শুভ্র সৈকতে চিক্কণ বালির উপরে বসে পড়লেন। রাজপুত্রের দৃষ্টি নিবদ্ধ হ'য়ে গেল সেইখানে যেখানে সমস্ত আকাশটা নাচু হ'য়ে নেমে এসে সমস্ত সাগরটাকে আপনার বুকে জড়িয়ে ধরেছে।

তখন সন্ধ্যা লেগে এসেছে। সমুদ্রের ঠাণ্ডা হাওয়া রাজপুত্রের সারা শরীরে স্নিগ্ধ আদর ঢেলে দিতে লাগল। সে স্নিগ্ধ আদরের স্পর্শে রাজপুত্রের চোখ দুটো অমনি বুঁজে বুঁজে আসতে লাগল। রাজপুত্র আর বসে' থাকতে পারলেন না, ধীরে ধীরে তন্দ্রামগ্ন হ'য়ে শুভ্র বালুশয্যায় ঢলে' পড়লেন।

সেই আধ-জাগা আধ-ঘুমের অবস্থায় রাজপুত্রের মনে হ'ল যেন হঠাৎ তার দু'কানের উপর থেকে দুটো পরদা খসে গেল। আর ঐ যে সমুদ্রের বিরামহীন মুখরতা, ও ত কেবল অর্থহীন কল্ কল্ ছল্ ছল্ ছলাৎ নয়। ঐ যে সমুদ্র আবহমানকাল ধরে' স্পষ্ট ভাষায় গান গাচ্ছে! আধ-ঘুমে রাজপুত্র শুনলেন সমুদ্র গাচ্ছে—

দুল্‌বি ওরে দুল্‌বি যদি আমার সুনীল দোলাতে
নাম্‌রে আসি' আমার বুকের জীবন-মরণ-খেলাতে।
দিগন্তে যে বইছে বায়
অনন্তে যে স্বপ্ন ছায়
অস্তিমেতে পারব আমি তোদের সে-সব মিলাতে।

কূলের মায়া করিস্‌ কে রে? অকূলে কার নাইরে টান?
একটি বারে সাহস করি' শোন্‌রে আমার বুকের গান।
পলে পলে নৃত্য করি'
হিয়ায় পুলক উঠ্‌বে ভরি'
ছুটবে তরী আকুল বায়ে লক্ষ করি' শ্রেষ্ঠ দান।

আমার বুকেই মুক্তি পেল ওই রে তোদের জাহ্নবী।
আমার বুকের নেয় নি স্নেহ কোন্‌ কবি সে কোন্‌ কবি?
আমার বুকেই চন্দ্র-তারা
সারা নিশীথ তন্দ্রাহারা
এই বুকেরই পাঁজ্‌রা থেকে উষায় জাগে হেম রবি।

এই বুকেতেই গুপ্ত ছিল সুর-অসুরের সুধা রে
এই বুকেতেই মুক্ত চির মর্ত্ত্য-মনের ক্ষুধা রে।
এই হিয়ারই তলে তলে
শুক্তিবুকে মুক্তা জ্বলে
ঊর্ম্মিমালার সঙ্গে চলে মর্ত্ত্য-মনের সুধা রে।

এই বুকেরই 'পরে আকাশ নামায় অসীম তার কায়া
মুক্ত ওরে কুণ্ঠাবিহীন হেথায় মাটীর সব মায়া।
বদ্ধ মাটীর ক্ষুদ্র প্রাণী
আমার বুকের নিশাস্ টানি'
দেখ্‌লে প্রাণে তার গোপনে লুকিয়ে অসীম কোন্ ছায়া!

রাজপুত্র ফিরে ফিরে যেন কেবলই শুনতে লাগলেন—

দুল্‌বি ওরে দুল্‌বি যদি আমার সুনীল দোলাতে

শুনতে শুনতে যেন সুনীল দোলায় দোল খেতে খেতে রাজপুত্র একেবারে সংজ্ঞাহীন হ'য়ে ঘুমিয়ে পড়লেন।

রাজপুত্রের যখন ঘুম ভাঙল তখন আকাশগায়ে অপ্সরীদের জ্যোছনার আলপনা দেওয়া শেষ হ'য়ে গেছে। আঁধার কেটে চারিদিক একটা অস্পষ্টতার মাধুর্য্যে ভ'রে গিয়েছে। রাজপুত্র এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখলেন—হঠাৎ তাঁর চোখে পড়ল তাঁর ডান দিকে কিছু দূরে একেবারে সমুদ্রের বুক থেকে একটা ছোট্ট কালো পাহাড় উঠেছে আর সেই কালো পাহাড়ের উপরে একটা কি সাদা ধব্ ধব্ করছে। রাজপুত্র উঠে সেই দিকে যাত্রা করলেন।

রাজপুত্র পাহাড়ে উঠে দেখলেন এক প্রকাণ্ড রাজপুরী শঙ্খে-গড়া। শঙ্খের দরজা শঙ্খের জান্‌লা শঙ্খের ঘর শঙ্খের দেয়াল শঙ্খের সিঁড়ি, আগাগোড়া শঙ্খে গড়া। কিন্তু জনপ্রাণী শূন্য। শঙ্খের প্রকাণ্ড সিংহদরজা খোলা, শান্ত্রী নেই প্রহরী নেই, নবৎখানায় রসুনচৌকি নেই। রাজপুত্র সিংহদ্বার দিয়ে প্রবেশ করে' অশ্বশালে গেলেন।

দেখলেন অশ্বশালে অশ্ব নেই, অশ্বপাল নেই, সব শূন্য। সেইখানে আপন ঘোড়া বেঁধে দানা-জল দিয়ে রাজপুত্র রাজপ্রাসাদে গিয়ে প্রবেশ করলেন।

রাজপ্রাসাদে জনপ্রাণী বলতে কেউ নেই। চারদিকে থম্ থম্ করছে। শঙ্খে-গড়া প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড থামে জ্যোছনা পড়ে' চক্ চক্ করছে, খোলা জান্‌লা দিয়ে জ্যোছনা এসে শঙ্খে-গড়া মেঝেয় পড়ে' তা ধব্ ধব্ করছে। মহলে মহলে জ্যোছনার আলো আর ঘরের ছায়া জড়িয়ে চারদিক যেন আরও নিবিড় আরও গভীর হয়ে উঠেছে। রাজপুত্র এ ঘর থেকে সে-ঘর, এ-কক্ষ থেকে সে-কক্ষ, এ-মহল থেকে সে-মহল করে' ফিরলেন। কোথাও একটু মানুষের ভাঁজ নেই। যেন সাগর-পারের কোন্ মায়াবিনী সাগর বুকের কোটী শঙ্খ কুড়িয়ে অমনি অমনি এক রাজপুরী তৈরি করে' রেখেছে।

শাদা ধব্ ধবে শঙ্খের সিঁড়ি। তাই বেয়ে রাজপুত্র দ্বিতলে উঠলেন। কক্ষে কক্ষে কত আসবাব-পত্র। শয়ন কক্ষে শঙ্খের পালঙ্ক পাতা, ভোজন কক্ষে শঙ্খের গালিচা বিছানো, স্নানের ঘরে সব আড়-দেওয়া শঙ্খের চৌবাচ্চা, কেবল জনপ্রাণী বলতে কেউ নেই। আর সার সার শঙ্খের পিঁজরে ঝুলছে সব শূন্য, একটাও পাখী নেই। সার দেওয়া টিয়েপাখীর দাঁড় ঝুলছে, সব শূন্য একটা টিয়ে নেই। এমনি সুন্দর সে রাজপুরী আর এমনি নিস্তব্ধ, যেন তা এক পরমা সুন্দরী রাজকন্যা কিন্তু রূপোর কাঠি ছোঁয়ান। কোথায় সে সোনার কাঠি যে কাঠিতে রাজকন্যা জাগবে। কোন্ সে রাজপুত্র যে সোনার কাঠি খুঁজে আনবে! রাজপুত্র এ-ঘর ও-ঘর আর কত করবেন, তাঁর দু'পা ধরে' গেল। ক্লান্ত দেহে তখন তিনি গিয়ে একটা পালঙ্কে

বসে' পড়লেন। অমনি যেন পালঙ্ক ধীরে ধীরে দুলতে লাগল রাজপুত্রের চোখ বুঁজে বুঁজে আসতে লাগল। চারিদিকে গম্ভীর নিস্তব্ধতা, তার মধ্যে রাজপুত্র যেন কেবল শুনতে লাগলেন—

দুল্‌বি ওরে দুল্‌বি যদি আমার সুনীল দোলাতে—

শুনতে শুনতে পালঙ্কের উপরে রাজপুত্র একেবারে বেঘোরে ঘুমিয়ে পড়লেন।

(৩)

তারপর দিন রাজপুত্রের যখন ঘুম ভাঙল তখন সূর্য্যদেব সমুদ্রের নীল বুক থেকে একটুকু কেবল মাথা তুলেছেন, ঘুমের জড়িমা তখনও তাঁর চোখ থেকে যায় নি, লম্পট সেই ঢুলু ঢুলু নেত্রেই ঊর্ম্মিবালাদের গায়ে গায়ে সোনালি সোহাগ ঢেলে দিয়েছেন। দু' একটা অশান্ত রশ্মি তাঁর চোখ থেকে ছুট দিয়ে একেবারে রাজপ্রাসাদের উঁচু চূড়াতে গিয়ে চড়ে বসেছে। রাজপুত্র চোখ মেলেই দেখেন তাঁর পালঙ্কের পাশে দাঁড়িয়ে এক পরমা সুন্দরী বালিকা।

পরমা সুন্দরী! জ্যোস্নাবরণ তার রঙ, সোনার বরণ তার চুল, আকাশবরণ তার চোখ। সে রঙে চারিদিক উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, সে চুল একেবারে হাঁটুতে এসে পড়েছে, সে চোখে আকাশের বুকের মত প্রশান্ত আর সাগরের বুকের মত গভীর দৃষ্টি, রক্ত কমলের মত দু'খানি হাত, পা দেখা যায় না, কটিদেশ থেকে সাগরবরণ একটা ঘাঘ্‌রা নেমে পা দুটি ঢেকে একবারে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে;

সারা দেহে আর দ্বিতীয় বস্ত্র নেই, সব অনাবৃত। দুটি হাতে দুখানি মুক্তা বসান শঙ্খের কাঁকন—আর দ্বিতীয় অলঙ্কার নেই।

রাজপুত্র বিস্মিত হয়ে পালঙ্কের উপরে উঠে বসলেন, প্রশংসার আলোকে তাঁর দুটি চোখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল। রাজপুত্র বালিকার দিকে কতক্ষণ চেয়েই রইলেন, মনে মনে বললেন, এমন ত কখনও দেখি নি। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, "বালা তুমি কে? তোমায় আমি ভালবাসব।"

অমনি নবৎখানায় রসুনচৌকি বেজে উঠল। রাজপুত্র আশ্চর্য্য হ'য়ে বললেন—"একি! রসুনচৌকি বাজে কোথা থেকে, কাল যে সব শূন্য ছিল!"

বালিকা বললে—"আজ যে আমি এসেছি!"

অমনি হাজার পাখীর সুমিষ্ট কাকলি জেগে উঠল। রাজকুমার বিস্মিত হ'য়ে বললেন—"একি! এত পাখী ডাকে কোথা থেকে, পিঁজরে যে সব শূন্য ছিল!"

বালিকা তেমনি উত্তর দিলে—"আমি যে আজ এসেছি!"

অমনি হাতীশালে হাজার হাতী বৃংহতিনাদ করে উঠল, ঘোড়াশালে লক্ষ ঘোড়া চিঁহিঁহিঁ করে উঠল। রাজপুত্র চমৎকৃত হয়ে বললেন—"এত হাতী এত ঘোড়া এল কোথা থেকে, কাল ত কিছুই ছিল না?"

বালিকা আবার তেমনি উত্তর করলে—"রাজকুমার, আজ যে আমি এসেছি।"

রাজপুত্র ছুটে ঘর থেকে বেরুলেন। দেখলেন বারান্দায় সার সার পিঁজরেতে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী উড়ছে, নাচছে, গাচ্ছে, ডানা

নাড়ছে, গা ঠোকরাচ্ছে। রাজপুত্র নীচে নামলেন। কোথায় সে নিস্তব্ধ পুরী। চারিদিক লোকজনে একেবারে গম্ গম্ করছে। দাস দাসী শাস্ত্রী প্রহরী দৌবারিক প্রতিহারী যেন মুহূর্ত্তে কোন্ সোনার কাঠির স্পর্শে সব জেগে উঠেছে। দরজায় দরজায় শান্ত্রীরা সসম্ভ্রমে অভিবাদন করে' রাজপুত্রের পথ ছেড়ে দিলে। রাজপুত্র হাতীশালে গিয়ে দেখেন হাজার হাতী হাজার মাহুত। ঘোড়াশালে গিয়ে দেখেন লক্ষ ঘোড়া লক্ষ সোয়ার। রাজপুত্র তেমনি ছুটে আবার উপরে উঠলেন। বালিকাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—"তুমি কে ?"

বালিকা একটু মৃদু হাসলে। যেন রক্তকমলের দুটি পাঁপড়ির ফাঁকে এক সার ঘন বিন্যস্ত যূথীর কলি জেগে উঠল। বালিকা হেসে বললে—"আমার নাম প্রেম।"

"প্রেম ?—বড় ত সুন্দর !" রাজপুত্র প্রেমের চোখের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, সে নীল চোখে কি এক গভীর দৃষ্টি, তার তলই পাওয়া যায় না। সে-দৃষ্টিতে রাজপুত্র যেন একেবারে হারিয়ে গেলেন। বললেন—"প্রেম, আমি তোমায় ভালবাসি—আমাকে ভালবাসবে ?"

প্রেম উত্তর দিলে—"রাজকুমার, আমাকে যে ভালবাসে আমিও তাকে ভালবাসি।"

রাজপুত্রের বুকের কাছটায় যেন কি একটা ফেটে গিয়ে তার ভিতরকার রঙীন স্রোত তাঁর সমস্ত শিরায় উপশিরায় চারিয়ে গেল, তারি নেশায় তাঁর দেহের প্রত্যেক অণু পরমাণু নেচে উঠল। ওরে মূর্খ, ওরে নির্ব্বোধ ! ব্যর্থতা কোথায় ?—সাতমহলা পুরীতে নয়, দ্বারে দ্বারে দ্বারীতে নয়, খেতে শুতে দণ্ড প্রহর জানানোতে নয়, সাত শ' লোকের হৈ হৈ রৈ রৈ-তে নয়—আছে তা কেবল হৃদয়ের

সুন্দরহীনতায়, আছে তা কেবল জীবনের জড়ত্বে। এই ত আজ সাতমহলা পুরী, দ্বারে দ্বারে দ্বারী, তবে এর দেয়াল এমন রঙীন হয়ে উঠল কেন ?—অন্তরের ঐ আগুন লেগে রে নির্ব্বোধ ! শিরায় উপশিরায় ঐ নেশা লেগে। রাজপুত্র বললেন—"প্রেম, যদি তোমায় পেতেম তবে আমার নিজ রাজ্য ছেড়ে আসতেম না।"

প্রেম জিজ্ঞেস করল—"তোমার নিজ রাজ্য ? সে কোথায় রাজ-কুমার ?"

দু'জনে গিয়ে পালঙ্কে বসল। তারপর রাজপুত্র আপনার কাহিনী বলতে সুরু করলেন। কেমন করে' তাঁর সংসারে বিতৃষ্ণা জন্মিল, কেমন করে' পিতার ইচ্ছা, মন্ত্রীর অনুরোধ, মায়ের চোখের জল, প্রজা-মণ্ডলীর অনুরাগ, সমস্ত উপেক্ষা করে' তিনি রাজ্য ছেড়ে চলে' এলেন। তারপর কত রাজ্যের ভিতর দিয়ে দিন নেই রাত নেই নিদ্রা নেই, আহার নেই, ক্লান্তি নেই, শ্রান্তি নেই—তিনি ঘোড়া ছুটিয়ে রাত দিন কেবল ভ্রমণ করেই বেড়ালেন। তারপর অবশেষে কেমন করে' এই শঙ্খের রাজপুরীতে এসে পৌঁছিলেন, রাজপুত্র অনর্গল কথা বলে' যেতে লাগলেন যে, সে কত গল্প, তাঁর মুখ দিয়ে যেন গল্পের স্রোত বেরিয়ে আসতে লাগল। কোন্ দিক দিয়ে দিন কেটে গেল। সূর্য্য সারা আকাশ দিয়ে গড়িয়ে গিয়ে পশ্চিম সমুদ্রে ঝুপ করে' ডুব দিলেন, পশ্চিম আকাশে সোনালি আবির উড়তে লাগল, নবৎখানায় পুরবী রাগিনী বেজে উঠল, ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নেমে এল, রাজপুরীর লক্ষ কক্ষে লক্ষ দীপ জ্বলে উঠল। প্রেম পালঙ্ক থেকে চমকে নেমে দাঁড়াল, বলল—"রাজকুমার, আমার যাবার সময় হ'ল, আজ তবে আসি।"

— "আজ তবে আসি ? সে কি প্রেম ! সে কি প্রেম !" রাজপুত্র ব্যথিত আকুল কণ্ঠে বললেন—"তুমি এই যে বললে আমায় ভাল বাসবে, তবে আবার কোথায় যাবে ?"

প্রেম বললে—"রাজকুমার, আমাকে এখন নিজ ঘরে ফিরতে হবে, কাল আবার আসব।"

রাজপুত্র আশ্চর্য্য হয়ে বললেন—"তোমার নিজ ঘর !—সে আবার কোথায় ? আমি যে মনে করেছিলেম তুমি এই রাজপুরীরই রাজকন্যা, কাল কোথায় কোন্ মহলে লুকিয়ে ছিলে !"

প্রেম উত্তর করলে—"না রাজকুমার, আমি রাজপুরীর রাজকন্যা নই। আমার ঘর ঐ ওখানে সাগরবুকে [illegible] দিয়ে বাতায়নের ফাঁকে দেখিয়ে দিলে সমুদ্র।

রাজপুত্র অমনি ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে সমুদ্রের পারের ছাদে গেলেন। ছাদের আলসেতে কনুই রেখে সমুদ্রের দৃষ্টি মেলে তার সামনে ডানে বায়ে দেখতে লাগলেন। দেখলেন কেবল জল, আর জল, আর জল। রাজপুত্র ফিরে এসে প্রেমকে বললেন—"কই সাগর বুকে ত কোনো ঘর বাড়ীর চিহ্ন নেই !"

প্রেম বললে—"সাগরবুকের উপরে নেই তার মাঝে আছে। কুমার, আমার ঘর সাগরবুকের যেখানে প্রায় অতল সেইখানে। যেখানে সাগরবুকের ঊর্ম্মিবালারা তাদের [illegible] আলোক আর বাতাস মিশিয়ে আমার ঘর তৈরি করে দিয়েছে, সেইখানে আমি থাকি।"

রাজপুত্র বিস্ময়ে সংশয়ে কতক্ষণ চুপ করেই রইলেন। তারপর বললেন, "প্রেম, কাল আসবে ত ?"

প্রেম উত্তর দিলে—"আসব বই কি রাজকুমার—নিশ্চয়ই আসব।"

—"আচ্ছা তবে এসো।"

বালিকা রাজপুরী ত্যাগ করে' চলে গেল।

রাজকুমার গিয়ে পালঙ্কে বসলেন। তাঁর সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে পুলক খেলে বেড়াতে লাগল। দু'-বছরের দেশ-বিদেশে ভ্রমণ তাঁর, আজ সে কত দূর। আর আজ এই রাজপুরী তাঁর ছেড়ে যাবার উপায়ই নেই। আজ তিনি শৃঙ্খলাবদ্ধ। কিন্তু সে শৃঙ্খল, সে কি হালকা! কেবলই হালকা, না তার চাইতেও বেশি, সে কি তৃপ্তির, কি শান্তির, সে কি সার্থক! এই শৃঙ্খলে আজ তাঁর এ কী মুক্তি! বাইরের দু' বছরের তাঁর স্বাধীনতার মুক্তি, কেবল শূন্যের বোঝায় সে কী ভারাক্রান্ত! কী অশান্ত! আর আজ এই শৃঙ্খলে মুক্তি ঐশ্বর্য্যে সে কী সম্পদময়, কী শান্তিপূর্ণ!

রাজপুত্র স্বপ্নে কেবল বালিকাকেই দেখতে লাগলেন, তার আকাশ-বরণ চোখ—সে চোখের সাগর-গভীর দৃষ্টি।

(৪)

দু' বছর কেটে গেল। রোজ সূর্য্য-ওঠার সঙ্গে সঙ্গে প্রেম তার জ্যোছ্না-বরণ রঙ্, সোনার-বরণ চুল, আকাশ-বরণ চোখ, সাগর-বরণ ঘাঘ্রা নিয়ে রাজপুরীতে উপস্থিত হয়। রাজপুত্রের সঙ্গে গল্পে-গানে সারা দিন কাটিয়ে আবার সূর্য্য-ডোবার সঙ্গে সঙ্গে চলে' যায়। দুটি বছরের প্রত্যেক দিনটি ঠিক একই ভাবে কেটে গেল। সেই একই

রাজপুরী, মহলে মহলে একই দাসদাসী, তাদের একই আনাগোনা, দেউড়ীতে দেউড়ীতে একই শান্ত্রী প্রহরী, এদের একই সোর-গোল, নহবতে নহবতে একই রস্থনচৌকি, তার ভোর-দুপুর-সন্ধ্যায় একই সুর, সেই সবই কেবল এক, যা রইল না সে হচ্ছে রাজপুত্র নিজে।

সেই সাতমহলা পুরীতে রাজপুত্র আর একা রইলেন না! দু'বছর আগে যখন তাঁর প্রেমের সঙ্গে দেখা হয় তখন কি তৃপ্তিতেই তাঁর অন্তরাত্মা ভরে' গিয়েছিল, কি আনন্দের আলোকেই তাঁর চোখ দুটি উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছিল, কি শান্তিতেই তাঁর অস্তিত্ব জুড়িয়ে গিয়েছিল। আর আজ, আজ তাঁর অন্তরাত্মার এ কি আসোয়াস্তি, তাঁর চোখ দুটিতে কি এক জ্বালা, কি এক বিরাট রাক্ষসী ক্ষুধার অবলেপ, এ কি নিবিড় ব্যথা! রাজপুত্রের চোখ দুটি তার সমস্ত জ্বালা নিয়ে প্রেমের মুখ থেকে ধীরে ধীরে নেমে তার বুকে গিয়ে নিবদ্ধ হ'ল। আঃ, ঐ যে ঐ বুকের উপরে ঠিক তাঁরই হাতের মাপে মাপে দুটি পদ্মের কলি কে জাগিয়ে তুলেছে। ঐ যে সেই পদ্মকোরক দুটির শীর্ষদেশটায় লালচে আভা, তা বুঝি তাঁরই হৃদয়শোণিতের অবলেপ।

ছিলে গো ছিলে, প্রেম! তুমি একদিন অতি সুকুমার ছিলে, আমি একদিন অতি কিশোর ছিলেম, সেদিন আমাদের মিলন ছিল একটু হাসির মিলন, একটি দৃষ্টি বিনিময়ের মিলন। আজ এ প্রদীপ্ত যৌবনে সে অল্পে সুখ কোথায়, তৃপ্তি কোথায়, আনন্দ কোথায়? এ যৌবনের উন্মত্ততাকে কি দিয়ে শান্ত করবে প্রেম? একটি দৃষ্টি দিয়ে? দুটো কথা দিয়ে? একটুকু হাসি দিয়ে?—সে স্বল্পতাকে জীবন যে কখন্ ছাড়িয়ে গেছে!

না, না প্রেম! আজ আমি চাই তোমার নিবিড়তম আলিঙ্গন। তোমার কথা, তোমার গান, সে যে আজ কত ব্যবধানের। আজ চাই তোমার ঐ দেহ-বল্লরী আমার এই বিশাল বুকের উপরে পিষ্ট হ'য়ে যাবে, তোমার হাসি তোমার দৃষ্টি, সে যে আজ কত স্বল্পতার! বুকে বুকে মুখে মুখে চোখে চোখে দেহের প্রত্যেক অণুতে অণুতে আজ মিলন, আজ বিনিময়—তবেই আজ তৃপ্তি, তবেই আজ আমার এ আত্মার বিদ্রোহের শান্তি। আমার এ রাক্ষসী ক্ষুধার কাছ থেকে কি দিয়ে আত্মরক্ষা করবে প্রেম? কি দিয়ে? আমি চাই এর চাইতে কোন্ আর তোমার বড় সত্তা আছে প্রেম? কোন্ বড়? আমি চাই—কেবল অশরীরী তোমাকে নয়, তোমার দেহের প্রত্যেক অণুটির জন্যে আজ আমার দেহের প্রত্যেক অণুটি উন্মাদ। এ উন্মাদকে কি দিয়ে ঠেকাবে? এ উন্মাদকে কিসের সান্ত্বনা দেবে? একটু হাসির? একটু গানের?—পাগল!

সূর্য্য ডুবে গেল, নবৎখানায় পুরবী রাগিনী বেজে উঠল, হাজার কক্ষে হাজার দীপ জ্বলে' উঠল। প্রেম পালঙ্ক থেকে নামতেই রাজপুত্র উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—"প্রেম! একদিনও কি আমার এই রাজপুরীতে রাত্রিযাপন করবে না? অমরত্বকে কি চিরকাল এড়িয়ে চলবে?"

প্রেম চমকে উঠল, তার শঙ্খের মত কান দুটো গোলাপের মত লাল হ'য়ে উঠল, গোলাপের মত গণ্ড দুটি শঙ্খের মত সাদা হয়ে গেল, শুকনো চোখ সজল হ'য়ে এলো, সরস ঠোঁট শুকনো হ'য়ে গেল। প্রেম তার দৃষ্টি রাজপুত্রের চোখের উপরে স্থাপিত করে' বললে—"রাজকুমার তোমার জন্যে আমি জীবন দিতে পারি কিন্তু এখানে রাত্রিবাসের আমার উপায় নেই।"

রাজপুত্র দেখলেন প্রেমের চোখ দুটিতে কি এক দৃষ্টি, সে দৃষ্টিতে কি এক নীরব মিনতি, কি এক করুণ-ভৎর্সনা। রাজপুত্র সে দৃষ্টি সহ্য করতে পারলেন না। তাঁর দৃষ্টি অবনত হ'য়ে গেল। রাজপুত্র যখন চোখ তুললেন তখন দেখলেন তিনি একা। প্রেম কখন্ চলে গিয়েছে।

রাজপুত্রের অন্তরে যেন সহস্র শার্দ্দূল গর্জ্জে উঠল, লক্ষ ফণী ফণা বিস্তার করে' রক্ত চক্ষু মেলে দিল। অত্যাচার, অত্যাচার, আমি এ অত্যাচার সহ্য করব না। আমি চাই চাই-ই প্রেমকে, আরও কাছে আরও কাছে, আরও কাছে। এ চাওয়াকে চিরকাল ব্যর্থ হতে দেব না।

রাজপুত্র ডাকলেন—"প্রতিহারী, প্রতিহারী।"

প্রতিহারী ত্রস্তে এসে অভিবাদন করে দাঁড়াল। রাজপুত্র খানিক-ক্ষণ শির নত করে' কি চিন্তা করলেন। তারপর মাথা তুলে বললেন—"আচ্ছা তুমি যাও।"

রাজপুত্র সেদিন সারারাত পিঞ্জরাবদ্ধ শার্দ্দূলের মত পায়চারি করে' বেড়ালেন।

পরদিন সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যখন প্রেম এলো তখন রাজপুত্র তাকিয়ে দেখলেন, সে কি সুন্দর, কি স্নিগ্ধ, কি কোমল। যেন শিশির-ভেজা সদ্যফোটা পদ্মটি, সে পদ্মের পাঁপ্‌ড়িতে পাঁপ্‌ড়িতে হাসি, সে হাসির অন্তরালে অন্তরালে আমন্ত্রণ। এ কি সত্য সত্যই আমন্ত্রণ, না শুধু তাঁর নিজের প্রাণের আকাঙ্খার প্রতিবিম্ব?

দিন কেটে গেল, সূর্য্যদেব পাটে বসলেন। নহবৎখানায় পূরবী রাগিনী বেজে উঠল, কক্ষে কক্ষে লক্ষ দীপ জ্বলে উঠল, প্রেম পালঙ্ক থেকে নেমে বললে—"কুমার, তবে আজ আসি।"

রাজপুত্র উঠে দাঁড়ালেন, তারপর দুই বাহু তাঁর বুকের উপরে

ন্যস্ত করে বললেন—"প্রেম! আমার আদেশে আজ পুরীর সিংহদ্বার রুদ্ধ, আমার আদেশ ব্যতীত তা খুলবে না।"

অমনি নহবৎখানার রাগ-আলাপ থমকে গেল, পাখীদের কাকলী-রব স্তব্ধ হ'য়ে গেল, কক্ষে কক্ষে দীপশিখা সব স্থির নিস্পন্দ হ'য়ে গেল। সমস্ত রাজপুরীটার প্রত্যেক বস্তুটি যেন কান খাড়া করে' সজাগ হ'য়ে উঠল।

কক্ষতলে দু'জনে দাঁড়িয়ে রইলেন। কারো মুখে একটি কথা নেই। নিমেষের পর নিমেষ কেটে যেতে লাগল। পূর্ণিমার চাঁদ আকাশের অনেক পথ উঠে উর্ম্মিবালাদের গায়ে রূপোর বসন জড়িয়ে দিল। প্রেম বললে—"রাজকুমার, আমায় মুক্তি দাও।"

রাজকুমার উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ব'লে উঠলেন—"প্রেম, প্রেম, যদি আমার অন্তরের তীব্র দাহ বুঝতে পারতে, যদি জানতে কেমন করে আমার হৃদ্‌পিণ্ডের পরতে পরতে সূক্ষ্ম শৃঙ্খল কেটে বসেছে, যদি জানতে—" রাজপুত্রের উচ্ছ্বসিত-কণ্ঠ ক্রমে ক্রমে উন্মাদের মত হ'য়ে উঠল, তাঁর চোখ দুটি জ্বল জ্বল করতে লাগল, রাজপুত্র দুই বাহু বিস্তার করে' গদ গদ কণ্ঠে বললেন--"প্রেম, প্রেম, এসো আজ সমস্ত দূরত্ব সমস্ত ব্যবধান নির্ব্বাসিত হোক।"

প্রেম কেঁপে উঠল, পরমুহূর্ত্তে আপনাকে সংযত করে' ছুটে' পাশের দরজা দিয়ে সমুদ্রের দিক্‌কার ছাদের উপরে বেরিয়ে গেল।

রাজপুত্র ক্ষুধিত শার্দ্দূলের মত তার পিছনে পিছনে ছুটে বেরুলেন। প্রেম ছাদের আলিসাতে উঠতে-না-উঠতে বাম বাহু দিয়ে তার কটি আকর্ষণ করে' আপনার বক্ষের উপর টেনে নিলেন, রাজপুত্রের দক্ষিণ হস্তের নিষ্ঠুরতার নীচে তার হৃদয়পদ্ম পিষিত হ'য়ে গেল,

আর ঠোঁট দুখানির উপর রাজপুত্রের ঠোঁট দুটি যেন একটি শেষ মৃত্যু-আলিঙ্গনে কঠিন হ'য়ে বসে' গেল।

সে-চুম্বনে প্রেমের শিরায় শিরায় একটা তড়িৎ প্রবাহ উন্মাদের মত ছুটে গেল, তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ থর থর করে কেঁপে উঠল, সে কম্পনে তার নীবিবন্ধের গ্রন্থি শিথিল হ'য়ে গেল, ঘাঘ্‌রা খস্‌ খস্‌ করে উঠল, তারপর সর্‌ সর্‌ করে' তা প্রেমের ক্যটিচ্যুত হ'য়ে খসে পড়ল।

প্রেমের কণ্ঠ থেকে একটা নিদারুণ "ওঃ" শব্দ রাজপুত্রকে যেন মুহূর্ত্তের জন্যে চেতনা ফিরে দিল, প্রেম দু'হাতে চরম শক্তি সংগ্রহ করে' রাজপুত্রকে ঠেলে দিলে, তারপর দু'হাতে চোখ মুখ ঢেকে শির অবনত করে' দাঁড়িয়ে রইল।

রাজপুত্র তখন দেখলেন তাঁর সামনে নগ্ন নারী মূর্ত্তিটিকে। দেখতে দেখতে, দেখতে দেখতে তাঁর সমস্ত দেহ স্থির নিশ্চল নিস্পন্দ হ'য়ে গেল, তাঁর চোখ দুটি ধীরে ধীরে, ধীরে ধীরে পাথরের মত কঠিন হ'য়ে উঠল।

রাজপুত্র দেখলেন সেই নগ্ন মূর্ত্তিকে। দেখলেন মাথা থেকে কটি পর্য্যন্ত পরিপুষ্ট সুন্দর এক বালিকা মূর্ত্তি, আর কটি থেকে নেমেছে একটি নিটোলে নিরেট শল্কাবৃত মৎস্যপুচ্ছ।

প্রেম ধীরে ধীরে মাথা তুলল। তারপর বিশ্বের বেদনার কণ্ঠ নিয়ে বললে—"রাজকুমার, আমি অর্দ্ধেক নারী অর্দ্ধেক মাছ, অর্দ্ধেক মানুষ অর্দ্ধেক পশু। আমার যে অংশ পশু সে অংশকে আমি অতি যত্নে তোমার কাছ থেকে গোপন করে' রেখেছিলেম, সেই পশুকে আজ তুমি অনাবৃত করলে, আর আমার সাধ্য নেই তোমার জীবনে স্বর্গের পরশ ব'য়ে আনতে, আজ এইখানে আমাদের চির-বিদায়।"

রাজপুত্র স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। মৎস্যনারী ধীরে ধীরে আলিশার উপরে উঠে আপনাকে নীচ সাগরে ছেড়ে দিল। মুহূর্ত্তে চাঁদের কিরণে মৎস্যপুচ্ছের আঁশগুলো চিক্‌মিকিয়ে উঠল, তারপর ঝুপ্ করে' একটা শব্দ হল, মুষ্টিখানিক হীরকচূর্ণ চারিদিকে ছড়িয়ে গেল, এক নিমেষের তরে জলবুদ্‌বুদেরা পুঞ্জ বাঁধল, তারপর সাগর-বুকের সেই চিরন্তনের গান—

ডুল্‌বি ওরে ডুল্‌বি যদি আমার সুনীল দোলাতে।—

রাজপুত্র কাঁদতে কাঁদতে ছাদ থেকে ভিতরে ফিরলেন। ভিতরে এক পা ফেলতেই রাজপুত্র থম্‌কে দাঁড়ালেন। কোথায়, কোথায়? সে কক্ষে কক্ষে দীপের মালা, সে পিঞ্জরে পিঞ্জরে পাখী, দাঁড়ে দাঁড়ে টিয়ের দল! চারিদিকে নিস্তব্ধ নিঝুম, চারিদিকে আঁধার। রাজপুত্র ছুটে নীচে নামলেন, কোথায় সে দাস দাসী শান্ত্রী প্রহরী দ্বৌবারিক প্রতিহারী সব শূন্য, কোথায়ও একটি জনপ্রাণী নেই, রাজপুত্র গিয়ে দেখেন হাতীশালে একটি হাতী নেই একজন মাহুত নেই, ঘোড়াশালে একটি ঘোড়া নেই একজন শোয়ার নেই, নহবতে রসুনচৌকি নেই। রাজপুত্র রাজপ্রাসাদে ফিরে এলেন চারিদিক শূন্য, নিঝুম, নিঝুম চাঁদের আলো থামের ফাঁকে ফাঁকে আড় হয়ে এসে মেঝেয় পড়ে চারিদিক আরও নিবিড় আরও গভীর করে' তুলেছে। রাজপুত্র হাজার মণ পাথর পায়ে নিয়ে যেন ধীরে ধীরে অতি কষ্টে সিঁড়ি ভেঙে দ্বিতলে উঠলেন, তারপর পালঙ্কে গিয়ে আকুল হয়ে লুটিয়ে পড়লেন। তাঁর দীর্ঘ নিশ্বাসে নিশ্বাসে প্রকাণ্ড রাজপুরী থম্‌থমে হ'য়ে উঠল।

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

জয়দেব।

—:*:—

[এটি আমার প্রথম লেখা। এ প্রবন্ধের পূর্ব্বে আমি বাঙলা ভাষায় গভ ত দূরের কথা, কখনো দু'ছত্র পত্তও লিখি নি। তবে যে হঠাৎ একদিন এত বড় একটি প্রবন্ধ লিখে শেষ করলুম তার কারণ, ওটি আমি লিখতে বাধ্য হয়েছিলুম।

আমি B. A. পাশ করে' যখন M. A. ক্লাসে ভর্ত্তি হই, সেই সময়ে এই কলিকাতা সহরের একটি ক্ষুদ্র সাহিত্য-সভাতেও ভর্ত্তি হই। শুনতে পাই সেই সাহিত্য-সভা কালক্রমে বর্ত্তমান সাহিত্য-পরিষদে পরিণত হয়েছে। শুনতে পাই বলছি এই কারণে যে, যে-তিন বৎসরের ভিতর সে-সভার এই রূপান্তর ও নামান্তর ঘটেছে সে তিন বৎসর আমি একটানা ইংলণ্ডে ছিলুম। দেশে ফিরে এসে দেখি সভার আয়তন বৃদ্ধি হয়েছে, ও নামের পরিবর্ত্তন ঘটেছে এবং সভাস্থলে কাব্যের পরিবর্ত্তে ব্যাকরণের আলোচনা হচ্ছে।

আমাদের সেই ছোট এবং ঘরাও সাহিত্য-সভার একটি অলঙ্ঘনীয় নিয়ম ছিল এই যে, তার প্রতি সভ্যকে পালায় পালায় একটি করে' প্রবন্ধ পাঠ করতে হত। এবং এই নিয়মের অনুবর্ত্তী হয়েই আমি এই প্রবন্ধটি লিখি।

আমি যদি উক্ত সভায় যোগ না দিতুম ত আমার বিশ্বাস, আমি জীবনে আর যাই করি, বাঙলা কখনো লিখতুম না। উক্ত সভাই আমাদের পাঁচজনকে বাঙলা লেখবার নেশা ধরিয়ে দেয়। যে ক'জন উক্ত সভার মেম্বর ছিলেন তাঁরা প্রায় সকলেই অত্তাবধি বাঙলা সাহিত্যের চর্চ্চা করে আসছেন। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত "ব্রহ্মবিদ্যা" এবং শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি "সাহিত্য" নিয়মিত প্রচার করছেন। শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ "নারায়ণ" পত্রের সম্পাদন করছেন এবং অবসর মত বাঙলা কবিতাও রচনা করেন। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত I. C. S. সম্প্রতি বাঙলা

নাটক লেখার মনোনিবেশ করেছেন। তারপর সে সভার যে তিনজন সভ্য দেহত্যাগ করেছেন তাঁরা সকলেই আ-মরণ সাহিত্য-চর্চ্চা করেছিলেন। ৺অক্ষয় কুমার বড়ালের বঙ্গ-সাহিত্যে কীর্ত্তির পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। ৺অনাথকৃষ্ণ দেব সাহিত্য-চর্চ্চাই তাঁর জীবনের ব্রত করে তুলেছিলেন, এবং আমার অতিশয় অন্তরঙ্গ বন্ধু ৺নলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায়ের অল্প বয়সেই মৃত্যু হয়, তাই তিনি এক "প্রিয়দর্শিকা"র অনুবাদ ব্যতীত বঙ্গ-সরস্বতীর ভাণ্ডারে আর কিছু দান করে যেতে পারেন নি।

এ সভার সভাপতি ছিলেন শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বলা বাহুল্য যে, বঙ্গ-সাহিত্যের সেবায় তিনিই আমাদের অনুপ্রাণিত করেছিলেন। তিনিই আমাদের বাঙলা সাহিত্যকে এতদূর ভালবাসতে শিখিয়েছিলেন যে, যদিও আমরা জীবনে নানা বিভিন্ন পথ অবলম্বন করেছি, এবং এমন সব ব্যবসায়ের ব্যবসায়ী হয়েছি যার সঙ্গে বাঙ্গলা-ভাষা ও বাঙ্গলা-সাহিত্যের কোনোরূপ সম্পর্ক নেই, তবুও আমাদের কেউ ও-ভাষা আর ও-সাহিত্যের মায়া অদ্যাবধি কাটিয়ে উঠতে পারি নি।

আমার এই প্রথম বয়সের প্রথম লেখাটির পাণ্ডুলিপি আমি এতকাল ধরে সযত্নে রক্ষা করে এসেছি এই কারণে যে, একদিন সেটি অবিকৃত রূপে প্রকাশ করবার ইচ্ছা আমার বরাবরই ছিল। এ প্রবন্ধ পূর্ব্বে 'ভারতী'তে প্রকাশিত হয় কিন্তু সে নিতান্ত খণ্ডিত আকারে। কেননা প্রবন্ধটিতে স্থানে স্থানে এমন সব স্পষ্ট কথা আছে যা সেকালের মতে প্রকাশযোগ্য ছিল না। আমি অবশ্য সে মত কখনই গ্রাহ্য করে নিতে পারি নি। এতদিন পরে আজ সেটিকে আদ্যোপান্ত ছাপার অক্ষরে তুলতে সাহসী হচ্ছি এই বিশ্বাসে যে, আজকের দিনে বাঙলার সাহিত্যসমাজে স্পষ্ট কথা কারও পক্ষে অরুচিকর হবে না।

এ প্রবন্ধ পুনঃ প্রকাশ করবার অপর একটি কারণ আছে।

আমার রচনা-রীতি, আমার মতামত যাদের মনঃপূত হয় না, তাঁরা অনেক সময়ে আমার নামের আগে বিলেত-ফেরত বিশেষণ বসিয়ে দেন। সম্ভবত

পাঠক সমাজকে এই কথা বোঝাতে যে, আমার মতামতসকল আমি বিলেত গিয়ে সংগ্রহ করেছি। কথাটি যে সত্য নয় তার প্রমাণ পাঠকমাত্রেই আমার বিলাত যাত্রার তিন বৎসর পূর্ব্বে লিখিত এই প্রবন্ধেই পাবেন। আমার হাল লেখার সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে তাঁরা স্পষ্টই দেখতে পাবেন যে আমার একালের ও সেকালের মতামতের পিছনে একটি বিশেষ জাতির মন আছে নূতন দেশ কালের স্পর্শে যে মনের জাত যায় না। তিন বৎসর বিলাত-বাসের ফলে আমার মনের ও মতের যে কিছু বদল হয় নি, এমন কথা বললে একটা মস্ত বাজে কথা বলা হবে, আমার বক্তব্য শুধু এতটুকু যে, বিলাত গিয়ে আমার মনের ধাৎ বদলে যায় নি। সুতরাং আমার নামের পূর্ব্বে 'বিলেত-ফেরত' জুড়ে দেবার কোনই সার্থকতা নেই। ও-বিশেষণের সাহায্যে আমার লেখার সুবিচার কেউ করতে পারবেন না।

প্রবন্ধটি যেমন লেখা হয়েছিল তেমনিই ছাপা হচ্ছে—আমি তার একটি বর্ণও বদল করছি নে, এমন কি তার ভুলভ্রান্তিও সংশোধন করে দিচ্ছি নে। ফোটোগ্রাফির পরিভাষায় যাকে re-touch বলে তাতে ছবি সুন্দর দেখালেও, সে ছবি কার ছবি তা সকল সময়ে এক নজরে ধরা যায় না। আমি আমার যৌবনের মনের ছবি লোকের চোখের সুমুখে ধরে দিতে চাই বলে, ও-প্রবন্ধকে আর re-touch করলুম না, এই ভয়ে যে সে স্পর্শে পাছে মূর্ত্তিটি প্রৌঢ় হয়ে উঠে। যৌবন-সুলভ লেখার যেমন অনেক দোষ থাকে তেমনি কোনো কোনো গুণও থাকে যা আমরা যৌবনের সঙ্গে সঙ্গেই হারিয়ে বসি। এই কারণে আশা করি যে, আমার একালের লেখা যাঁদের কাছে অগ্রাহ্য নয়, এ লেখাটিও তাঁদের কাছে অগ্রাহ্য হবে না, এবং পাঠকমাত্রেই আমার অনেক কড়া মতামতের ভিৎ এই প্রবন্ধের মধ্যে আবিষ্কার করবেন।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।]

* * * * *

একখানি সাহিত্যগ্রন্থকে দুইরকম ভাবে আলোচনা করা যায় :—প্রথমতঃ কাব্যস্বরূপে, দ্বিতীয়তঃ ঐতিহাসিকতত্ব আবিষ্কারের উপায়-স্বরূপে।

প্রথমোক্ত প্রথা অবলম্বন করিলে আমরা কেবল মাত্র তাহার দেশ-কাল নিরপেক্ষ কাব্যহিসাবে দোষ-গুণ বিচারে সমর্থ হই।

দ্বিতীয় প্রথা অবলম্বন করিলে আমরা তাহা যে নির্দ্দিষ্ট সময়ে যে দেশে রচিত হইয়াছিল, সেই দেশের তৎসাময়িক অবস্থা সকলের আলোচনা দ্বারা তাহার তদ্দেশীয় অন্যান্য কাব্য সকলের সহিত কি সম্বন্ধ এবং তাহার দোষ ও গুণ কোন্ কোন্ বিশেষ কারণপ্রসূত, এই সকল বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতে পারি।

কাব্যের দোষ-গুণ বিচার করাই সমালোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য। ঐতিহাসিক প্রথায় আলোচনা উক্ত বিচারের সহায়তা সাধন করে মাত্র। কিন্তু এই উভয় পদ্ধতির মিলিত সাহায্যেই যথার্থ সমালোচনা করা যায়।

দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছি যে সংস্কৃত সাহিত্যে তাদৃশ ব্যুৎপত্তি না থাকায় শ্রীমদ্ভাগবদাদি গ্রন্থের সহিত জয়দেব-রচিত গীতগোবিন্দের কি সম্বন্ধ তাহা আমার নিকট অবিদিত। এবং ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত সম্বন্ধেও আমার পরিমিত জ্ঞান—জয়দেবের সময়ে, অর্থাৎ—বঙ্গীয় রাজা লক্ষণ সেনের সময়ে বঙ্গদেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থাদির সম্যক্ নির্দ্ধারণের পক্ষে যথেষ্ট নহে। সুতরাং উপস্থিত প্রবন্ধে—আমাকে জয়দেবের গ্রন্থ কেবলমাত্র কাব্যহিসাবে বিচার করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতে হইবে। আর একটি কথা, শুনিতে পাই গীতগোবিন্দের নাকি একটি আধ্যাত্মিক অর্থ

আছে। জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার নিগূঢ় মিলনের বিষয়ই নাকি রাধাকৃষ্ণের প্রেমবর্ণনাচ্ছলে বর্ণিত হইয়াছে। আমি যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি তাহাতে এ কাব্যে আধ্যাত্মিকতার কোনও পরিচয় নাই। জয়দেব তাঁহার কাব্যে যে সকল শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন তাহার সহজ ও প্রচলিত অর্থ অনুসারে যতটা বুঝা যায় তাহাই বুঝিয়াছি—কোনও নিগূঢ় অর্থ উদ্ভাবনও করিতে পারি নাই। আমার কাছে কৃষ্ণ ও রাধাকে আমাদেরই মত রক্তমাংসে গঠিত মানুষ বলিয়া বোধ হইয়াছে এবং তাঁহাদের প্রেমকেও স্ত্রী-পুরুষ ঘটিত সাধারণ মানব-প্রেম বলিয়াই বুঝিয়াছি। যদি যথার্থই একটি সুগভীর আধ্যাত্মিক ভাব কাব্যখানির প্রাণস্বরূপ হয় তাহা হইলে আমি উপস্থিত প্রবন্ধে যাহা বলিয়াছি তাহা একান্ত অর্থশূন্য। সূচনাস্বরূপ এই অসম্পূর্ণতার কথা উল্লেখমাত্র করিয়া আমি আসল বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

(২)

রাধাকৃষ্ণের প্রণয়মূলক দুই চারিটি ঘটনা লইয়া জয়দেব গীত-গোবিন্দ রচনা করিয়াছেন।

একদিন কৃষ্ণ গোপিনীগণ সমভিব্যাহারে যমুনাতীরে বসন্তবিহার করিতেছিলেন এমন সময়ে রাধা বেশভূষা করিয়া কৃষ্ণের উদ্দেশে তথায় আসিয়া উক্ত ব্যাপার দেখিয়া ক্রোধভরে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া তথা হইতে চলিয়া গেলেন। কৃষ্ণও একান্ত অপ্রতিভ হইয়া মৌন-ভাব ধারণ করিয়া রহিলেন এবং রাধাকে গমন হইতে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টামাত্র করিতেও সাহসী হইলেন না। কিন্তু রাধা চলিয়া

গেলেন দেখিয়া তিনি গোপবধূদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কোন এক নিভৃত কুঞ্জবনে আশ্রয় লইয়া মনোদুঃখে রাধার কথা ভাবিতে লাগিলেন। এদিকে রাধা স্বস্থানে ফিরিয়া আসিয়া কৃষ্ণকৃত পূর্ব্ব বিহার স্মরণে অত্যন্ত উদ্দীপ্ত হইয়া কৃষ্ণকে আনয়নার্থ তাঁহার নিকট সখি প্রেরণ করিলেন। কৃষ্ণ সখিকে বলিলেন, "আমি যাইতে পারিব না, তাহাকে আসিতে বল।" তারপর সখির রাধার নিকট প্রত্যাগমন এবং কৃষ্ণের প্রার্থনানুযায়ী রাধাকে কৃষ্ণের নিকট পাঠাইবার চেষ্টা। কিন্তু রাধা ইচ্ছা থাকিলেও বিরহজনিত শারীরিক ক্লান্তিহেতু স্থান পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ। সখি অগত্যা আবার কৃষ্ণের নিকট ফিরিয়া আসিলেন। কৃষ্ণ এবার রাধার সকাশে স্বয়ং যাইতে রাজি। সখি ছুটিয়া আসিয়া রাধাকে সুসংবাদ জানাইলে রাধা বাসকসজ্জা হইয়া কৃষ্ণের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কৃষ্ণ কথা রাখিতে পারিলেন না। কাজেই রাধা ঠাহরাইলেন যে কৃষ্ণ অন্য কোন রমণীর সাক্ষাৎ পাইয়া তাহার সহিত জমিয়া গিয়াছেন। উক্ত রমণীর সহিত কৃষ্ণ কিরূপ ব্যবহার করিতেছেন, সেই সকল কথা রাধা কল্পনায় অনুভব করিয়া সেই ভাগ্যবতীর তুলনায় নিজেকে অত্যন্ত হতভাগিনী মনে করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। রাত্রি এইরূপেই কাটিয়া গেল। প্রত্যূষে কৃষ্ণ অন্য রমণীর ভোগচিহ্ন-সকল শরীরে ধারণ করিয়া রাধার সমক্ষে উপস্থিত হইলেন। রাধা কৃষ্ণকে কিরূপ ভাষায় সম্ভাষণ করিলেন তাহা বোধ হয় আর বলিবার আবশ্যক নেই। কৃষ্ণ নিজের দোষক্ষালনের কোনরূপ চেষ্টা করিলেন না, কারণ সে চেষ্টা নিষ্ফল। অধরের কজ্জল, কপোলের সিন্দূর, বক্ষস্থ যাবকরঞ্জিত পদচিহ্ন—এ সকল কোথা হইতে আসিল।

তাহার না হয় একটি বাজে কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে কিন্তু পরিধানের নীলশাটী সম্বন্ধে ত আর কোনরূপ মিথ্যা কৈফিয়ৎ খাটে না। রাধা কথা শেষ করিয়া দুর্জ্জয় মান করিয়া বসিলেন কিন্তু কৃষ্ণের কাছে কি মান টিকে? তিনি মনোমত কথায় রাধার প্রীতি সাধন করিলেন—রাধা কৃষ্ণের উপরে যে আড়ি করিয়াছিলেন তাহা ভাবে পরিণত হইল। এই ত গেল প্রভাত সময়ের ঘটনা, যোগেযাগে দিনটিও কাটিয়া গেল, দিনান্তে অভিসারিকা রাধা, কৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইলেন, উভয়ের মিলন হইল। মিলনান্তর সম্ভোগ, সম্ভোগান্তর কৃষ্ণ কর্ত্তৃক রাধার বেশবিন্যাসের সঙ্গে সঙ্গেই গ্রন্থের সমাপ্তি।

দেখা যাইতেছে, এ কাব্যের মুখ্য বর্ণিত বিষয় রাধাকৃষ্ণের রূপ, তাঁহাদের পরস্পরের বিরহে পরস্পরের দুঃখপ্রকাশ, মিলিত হইলে পরস্পরের কথোপকথন, অর্থাৎ—কেবলমাত্র রাধা কৃষ্ণের দেহের বর্ণনা ও তাঁহাদের মনোগত প্রেমভাবের বর্ণনা। এ ছাড়া আনু-সঙ্গিকরূপে যমুনাতীর, কুঞ্জবন, বসন্তকাল, রাধার সখি ও অন্যান্য গোপিনীগণের কথাও বলা হইয়াছে। গ্রন্থারম্ভে গ্রন্থকারের আত্ম-পরিচয় ও ঈশ্বরের বন্দনা বাদ দিলে দেখা যায়, রাধা ও কৃষ্ণের কেলি ব্যতীত স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতালের অন্য কোনও বিষয়, কোনরূপ ধর্ম্মনৈতিক কিম্বা নৈতিক মতামত ইত্যাদি কিছুই গীতগোবিন্দে স্থান লাভ করে নাই। জয়দেবের মস্তিষ্কপ্রসূত কোনও চিন্তা ইহাতে সন্নিবেশিত হয় নাই। ইহা আমার নিকট অত্যন্ত সুখের বিষয় বলিয়া মনে হইতেছে, কারণ কবির ক্ষমতার পরিসর যত সংক্ষিপ্ত হয় ও তাঁহার কল্পনা যত সঙ্কীর্ণ পরিধির মধ্যে বদ্ধ থাকে

ক্ষুদ্র শক্তিসম্পন্ন সমালোচকের পক্ষে সমালোচনা করাটা ততই সহজ সাধ্য হইয়া উঠে। আমি এখন জয়দেবে যাহা নাই তাহার কথা ছাড়িয়া দিয়া তাহাতে যাহা আছে তাহার বিষয়ই আলোচনা করিব। জয়দেবের কবিত্ব শক্তির পরিমাণ সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে আমি তাঁহার বর্ণিত প্রেম কিরূপ ও তাঁহার বর্ণিত স্ত্রী-পুরুষের রূপই বা কিরূপ, তাহাই যথার্থরূপে নিরূপণ করিতে চেষ্টা পাইতেছি।

মনের ভাবের প্রকাশ—কথায় ও কার্য্যে। সাধারণ গোপিনীগণ, রাধা ও কৃষ্ণ, ইঁহারা প্রেম শব্দের অর্থে কি বুঝেন তাহা তাঁহাদের কথায় ও কার্য্যে বিশেষরূপে বুঝা যায়। গোপিনীগণ কৃষ্ণের কামোদ্দীপ্ত মুখের উপরে সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া কানে কানে কথা কহিবার ছলে তাঁহার মুখচুম্বন করিয়া, পীনপয়োধরভারভরে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া—'কেলিকলাকুতুকেন' কুঞ্জবনে প্রবেশের নিমিত্ত তাঁহার পরিহিত দুকুল ধরিয়া আকর্ষণ করিয়া তাঁহার প্রতি স্বীয় প্রেমের পরিচয় দিয়াছেন।

রাধা কৃষ্ণের বিরহে কাতর হইয়া সখিকে বলিলেন—

> "সখি হে কেশিমথনমুদারং
> রময় ময়া সহ মদনমনোরথ ভাবিতয়া সবিকারং॥"

তাহার পর কৃষ্ণের সহিত মিলন হইলে কৃষ্ণ কি করিবেন এবং তাহার অবস্থা কিরূপ হইবে, রাধা সে বিষয়ে সখিকে একটি দীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন; সে বক্তৃতাটি ইচ্ছাসত্বেও এ সভায় আপনাদিগকে পড়িয়া শুনাইতে পারিলাম না। নিজেরা পড়িয়া দেখিলেই তাহাতে

রাধা বিরহ ও মিলন কি ভাবে দেখেন তাহা অতি স্পষ্টই বুঝিতে পারিবেন।

সখি কৃষ্ণের নিকট রাধার বিরহ অবস্থা জানাইয়া বলিতেছেন—"রাধা ব্রতমিব তব পরিরম্ভসুখায় করোতি কুসুমশয়নীয়ম্"—আরও নানা কথা বলিলেন, ফলে দাঁড়াইল রাধার অবস্থা অতি শোচনীয় তিনি অতিশয় উৎকট ব্যাধিগ্রস্ত, রক্ষা পাওয়া ভার; রোগের কারণ কৃষ্ণের বিরহ। রোগ অতি কঠিন হইলেও কৃষ্ণের দ্বারা অতি সহজেই তাহার প্রশমন হইতে পারে। সখি কৃষ্ণকে বলিলেন, এ রোগ—"ত্বদঙ্গসঙ্গামৃতমাত্র সাধ্যাম্", আর কৃষ্ণ?—তিনিও কথা এবং ব্যবহারে তাঁহার মনোভাব নিঃসন্দেহরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। তিনি কেবলমাত্র চুম্বন, আলিঙ্গন, রমণ ইত্যাদির দ্বারা গোপিনীগণের প্রতি তাঁহার অন্তরের ভালবাসা প্রকাশ করেন। সখি দ্বারা রাধাকে বলিয়া পাঠান যে, যাও শ্রীমতীকে গিয়া বল—"ভূয়স্তৎ কুচকুম্ভনির্ভর পরিরম্ভামৃতং বাঞ্ছতি"। কৃষ্ণ রাধার দুর্জ্জয় মান ভঞ্জনার্থ যে সকল চাটুবচন প্রয়োগ করেন তাহাতেও ঐ একটি ভাবই ফুটিয়া উঠিয়াছে। রাধাকৃষ্ণ ইত্যাদি সকলেই যে-ভাবে মত্ত সে-ভাবের নাম সংস্কৃতে ঠিক প্রেম নহে। জয়দেববর্ণিত প্রেমের উৎপত্তি দেহজ আকাঙ্খা হইতে, তাহার পরিণতি দেহের মিলনে, তাহার উদ্দেশ্য দেহের ভোগজনিত সুখলাভ, তাঁহার নিকট বিরহের অর্থ—প্রণয় প্রণয়িনীর দেহের বিচ্ছেদজনিত শারীরিক কষ্ট।

গীতগোবিন্দে আসল ধরিতে গেলে প্রেমের কথা নাই, কেবলমাত্র কামের বিষয়ই আলোচিত হইয়াছে। হৃদয়ের সহিত জয়দেবের সম্পর্ক নাই, শরীর লইয়াই তাঁহার কারবার। যে রমণীর মনে

প্রেম নাই, যাহার হৃদয় নাই, কেবলমাত্র দেহ আছে—তাহার স্ত্রীসুলভ লজ্জা, নম্রতা ইত্যাদি মানসিক সৌন্দর্য্যের বিশেষ অভাব থাকিবার কথা; রাধিকাপ্রমুখ গোপযুবতীদিগের এই নির্লজ্জতার পরিচয় তাঁহাদের ব্যবহারে ও কথোপকথনে যথেষ্ট পরিমাণে লাভ করা যায়। রাধা কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইলে "স্মর শর পরবশাকুত" প্রিয়মুখ দেখিয়া নিলর্জ্জভাবে উচ্চহাস্য করিয়া উঠেন।

এই ত গেল প্রেমের কথা, এখন শারীরিক সৌন্দর্য্যের কথা পাড়া যাউক। শারীরিক সৌন্দর্য্য তিনটি বিভিন্ন উপকরণে গঠিত :—

(১) অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির গঠন বা আকৃতি

(২) বর্ণ

(৩) ভাব অর্থাৎ—আন্তরিক সৌন্দর্য্যের বাহ্য বিকাশ। জয়-দেবের নায়ক নায়িকা যখন সর্ব্বাংশে আন্তরিক সৌন্দর্য্য বঞ্চিত তখন অবশ্য তাহাদের শরীরে ভাবের সৌন্দর্য্যের দেখা পাওয়া অসম্ভব।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির গঠন এবং পরস্পরের সহিত পরস্পরের পরিমাণ-সামঞ্জস্য ও বর্ণ এ সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইলেও দর্শনেন্দ্রিয় গ্রাহ্য বলিয়া ইহাতে কোনও রূপ ভোগের ভাব সংলিপ্ত নহে। যে সৌন্দর্য্য চোখে দেখা যায়, তাহার কেবল মানসিক উপভোগই সম্ভব, তাহা হইতে যে সুখ লাভ করা যায় তাহা কেবলমাত্র মানসিক আনন্দ, তাহাতে দেহের কোনওরূপ লাভ লোকসান নাই। কিন্তু স্পার্শ করিয়া যে সুখ তাহা চৌদ্দ আনা দৈহিক, সুতরাং জয়দেবের নিকট আমরা আকৃতি ও বর্ণের সৌন্দর্য্য অপেক্ষা শারীরিক কোমলতা ও স্পার্শযোগ্যতা ইত্যাদির অধিক বর্ণনা প্রত্যাশা করিতে পারি এবং জয়দেব এ বিষয়ে আমাদিগকে

নিরাশ করেন না। মুখশ্রীর প্রধান উপকরণ ভাব, গঠন ও বর্ণের সৌন্দর্য্য, তাই জয়দেব মুখশ্রী বর্ণনা দুই কথায় করিয়াছেন—যে দুইটি কথা বলেন তাহাও খানিকটা যেন না বলিলে নয় বলিয়া। সুন্দরী যুবতীদিগের গাত্রের বন্ধুরতার, অর্থাৎ—উন্নত অবনত অংশ সকলের প্রতিই তাঁহার আন্তরিক টান দেখা যায়। তিনি উক্ত অঙ্গাদির বেশ ফলাও বর্ণনা করেন। তাঁহার রমণীদের এইরূপ সৌন্দর্য্যের ভাণ্ডার বেশ পূর্ণ। কৃষ্ণ তাঁহাদের নিকট উপযাচী হইয়া দাঁড়াইলে তাঁহারা কৃষ্ণের হাত ভরিয়া সৌন্দর্য্য প্রদান করেন। আমার বিবেচনায় যে কারণে গীতগোবিন্দের যুবতীদিগের সৌন্দর্য্য থাকাটা আবশ্যক, সে আবশ্যকতা তাঁহারা কেবলমাত্র আবক্ষ সুন্দরী হইলেই উত্তমরূপে সাধিত হইতে পারিত। কৃষ্ণকে জয়দেব যেরূপভাবে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা হইতে তাঁহার চেহারার বিষয় একটা বিশেষ কিছু পরিষ্কার ভাব মাথায় আসে না, কেবলমাত্র তাঁহার বক্ষস্থল যে নির্দ্দয়রূপ আলিঙ্গনের জন্য বিশেষ উপযুক্ত এবং তাঁহার করযুগল যে স্পর্শ সুখলাভের জন্য অষ্টপ্রহর লালায়িত—এই দুইটি কথাই বিশেষরূপে মনে থাকে। গীতগোবিন্দের মুখ্য বিষয়টি কি, তাহা আমি যেরূপ বুঝিয়াছি তাহা আপনাদিগকে এতক্ষণ ধরিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম, এখন আমি তাহার কাব্যাংশের দোষগুণের বিচারে প্রবৃত্ত হইতেছি।

(৩)

কোন একটি বিশেষ রচনা কাব্য কি না ও যদি কাব্য হয় তাহা হইলে কাব্যাংশে শ্রেষ্ঠ কিম্বা নিকৃষ্ট এসকল বিষয়ে মন্তব্য প্রকাশ

করিতে হইলে আগে কাব্য কাহাকে বলে সে বিষয়ে কতকটা পরিমাণে পরিষ্কাররূপ ধারণা থাকা আবশ্যক। আমরা প্রায় সকলেই সচরাচর কবিতা বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিয়া থাকি এবং আমাদের সকলেরই মনে কাব্য যে কি পদার্থ সে বিষয়ে একটা ধারণাও আছে, সেটি যে কি তাহা ঠিক প্রকাশ করিয়া বলা অত্যন্ত কঠিন। কোনও একটি ক্ষুদ্র সংজ্ঞার ভিতর পৃথিবীর যাবতীয় কবিতাপুস্তক প্রবেশ করান যায় না। দুই চারি কথায় কোনও কাব্যের সমস্ত গুণের বর্ণনা করা অসম্ভব। কিন্তু সকল কাব্যের ভিতর যেটি সাধারণ অংশ তাহা নির্ণয় করিতে পারিলে তাহা যে কি, সেবিষয়ে একটি সংজ্ঞা দেওয়া যাইতে পারে। আমার বিবেচনায় আমাদের দেশে প্রচলিত*—"কাব্য রসাত্মক বাক্য"—কাব্যের এই সংজ্ঞায় সকল কাব্যের ভিতর যেটি সাধারণ অংশ, অর্থাৎ—যাহার অভাবে কোনও রচনা কাব্য হইতে পারে না, সেইটি অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত করা হইয়াছে। এই অল্প সংখ্যক কথা কয়েকটির মধ্যে কি ভাব নিহিত আছে তাহা খুলিয়া বুঝাইয়া দিলে বোধ হয় আপনারাও আমার কথা কতক পরিমাণে গ্রাহ্য করিবেন।

'রসাত্মক বাক্য' এই কথা কয়েকটির যথার্থ অর্থ বুঝিতে হইলে রস, আত্মা ও বাক্য, এই শব্দগুলির অর্থ জানা আবশ্যক। প্রথমতঃ 'বাক্য' এই শব্দ লইয়াই আরম্ভ করা যাউক, আমরা দেখিতে পাই বাক্যের দুইটি অংশ আছে। প্রথম, অর্থ—দ্বিতীয়, শব্দ। প্রথমাংশ

* যেকালে এ প্রবন্ধ লেখা হয়, সেকালে সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের কোনো গ্রন্থ আমি চোখে দেখি নি, এমন কি তাদের নাম পর্য্যন্ত শুনি নি, সেই কারণে উক্ত শাস্ত্রীয় বাক্যটি আমি আমাদের দেশে প্রচলিত বাক্য বলে উল্লেখ করতে বাধ্য হয়েছিলুম।

মানসেন্দ্রিয় গ্রাহ্য। দ্বিতীয়াংশ শ্রবণেন্দ্রিয় গ্রাহ্য। যে শব্দ কানে শুনিয়া অন্তরে তাহার অর্থ গ্রহণ করি তাহাই বাক্য।

বাক্যের বিষয় মানুষের মনোভাব।

বাক্যের উদ্দেশ্য তাহা প্রকাশ করা এবং উক্ত উদ্দেশ্য সাধনের উপায় শব্দ। সুতরাং বাক্য রসাত্মক হইতে হইলে প্রথমতঃ ভাব রসাত্মক হওয়া আবশ্যক। দ্বিতীয়তঃ শব্দ রসাত্মক হওয়া আবশ্যক; তৃতীয়তঃ এরূপ ভাবে প্রকাশ করা কর্ত্তব্য যাহাতে রসাত্মক ভাব রসাত্মক শব্দের সহিত সম্পূর্ণরূপে মিশ্রিত হইতে পারে।

শব্দের রস কি? অবশ্য শ্রুতি মধুরতা—যেমন সঙ্গীতে একটি সুর আর একটি সুরের সহিত মিশ্রিত হইয়া অধিকতর শ্রুতিমধুর হয় সেইরূপ একটি শব্দ আর একটি শব্দের সংস্পর্শে অধিকতর শ্রুতিমধুর হয়। কানে শুনিতে ভাল লাগিবার জন্য শব্দবিন্যাসের পারিপাট্য হইতে ছন্দের উৎপত্তি। ভাষা ছন্দবদ্ধ হইলে যত শুনিতে ভাল লাগে, ছন্দ ব্যতিরেকে ততদূর মিষ্টি লাগে না। সুতরাং কবির ভাষা ছন্দযুক্ত—পদ্যে দুইটি উপকরণ বিদ্যমান—প্রথম Rhyme—দ্বিতীয় Rythm—এই দুইটির মধ্যে দ্বিতীয়টিই ছন্দের প্রাণস্বরূপ। Rhyme না থাকিলেও ছন্দ হয় কিন্তু Rythm না থাকিলে চলে না। Rhyme and Rythm উভয়েই সমভাবে বর্ত্তমান থাকিলেই ছন্দ যথেষ্ট পরিমাণে পূর্ণাবয়ব হয়। সুতরাং যে কবির রচনায় Rhyme এবং Rythm যত বহুল পরিমাণে থাকিবে ততই তাঁহার শব্দের রস বেশি হইবে—

যে 'ভাব' মনে সুন্দর ভাবের উদ্রেক করে, আমাদের হৃদয়

বিশুদ্ধ আনন্দে পরিপ্লুত করে তাহাই রসাত্মক ভাব। যেমন ফুল, সুগঠিত প্রস্তর মূর্ত্তি, পূর্ণিমা রজনী ইত্যাদি আমাদের দেখিতে ভাল লাগে কিন্তু কেন লাগে তাহার কোনও কারণ নির্দ্দেশ করা যায় না, সেইরূপ মানবমনের প্রেম, ভক্তি, স্নেহ—সৌন্দর্য্যের আকাঙ্খা, আকাঙ্খাজনিত বিষাদ, জগতের আদি, অন্ত উদ্দেশ্য ইত্যাদি রহস্যপূর্ণ বিষয়ের চিন্তাজনিত মনের আবেগ, বিস্ময়াদি ভাব সকল সহজেই আমাদের ভাল লাগে কিন্তু কেন যে ভাল লাগে তাহার কোনও কারণ নির্দ্দেশ করা যায় না। উক্ত প্রকার রসাত্মক ভাব সকলই কাব্যের মুখ্য বিষয়। এই সকল ভাবের ভিতর যে মাধুর্য্য আছে তাহাই প্রকাশ করা এবং আমাদের মনে এই সকল ভাব উদ্রেক করিয়া আনন্দ প্রদান করাই কবিতার উদ্দেশ্য এবং যে কবি সেই উদ্দেশ্য সাধনে কৃতকার্য্য হয়েন তিনিই যথার্থ শ্রেষ্ঠ কবি। যদিও সুন্দর ভাব লইয়াই কবির কারবার তথাপি পৃথিবীর কোনও সুন্দর জিনিষ একেবারে তাঁহার আয়ত্তের বহির্ভূত নয়। কি বাহ্যিক, কি মানসিক যতপ্রকার সৌন্দর্য্য আছে সকলেরই ভিতর একটা বিশেষ মিল আছে। চিত্রকরের মুখ্য উদ্দেশ্য অবশ্য দর্শনেন্দ্রিয় গ্রাহ্য সৌন্দর্য্য সৃষ্টি দ্বারা লোকের মানসিক তৃপ্তিসাধন কিন্তু তিনি তাঁহার চিত্রে বাহ্যিক সৌন্দর্য্যের ভিতর দিয়া ভাবের সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া তুলিতে পারেন; কবির পক্ষেও ঠিক সেইরূপ। ভাবের সৌন্দর্য্য প্রকাশ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য হইলেও তিনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সৌন্দর্য্যের বর্ণনাতেও ক্ষান্ত নহেন বরং যে কবি নিজের রচনায়—রূপজ, ভাবজ, নৈতিক ইত্যাদি নানাবিধ সৌন্দর্য্যের একত্র মিলন করিতে পারেন, তিনিই তত উচ্চদরের কবি বলিয়া গণ্য হয়েন। কিন্তু যেমন একটি চিত্র-

করের পক্ষে—চিত্রে ভাবের সৌন্দর্য্য প্রকটিত করিতে হইলে—প্রথমতঃ চিত্রটিকে সুন্দর করিয়া আঁকিতে হইবে; দ্বিতীয়তঃ যাহাতে তাহার ভাব পরিষ্কাররূপে ব্যক্ত হয় সেইরূপ করিয়া আঁকিতে হইবে; কবির পক্ষেও ঠিক সেইরূপ কোনও একটি বিষয় কাব্যভুক্ত করিতে হইলে প্রথমে তাহাকে ভাবের সৌন্দর্য্যের সহিত লিপ্ত করিতে হইবে—দ্বিতীয়তঃ তাহাকে সুন্দর ভাষায় ব্যক্ত করিতে হইবে।

আমি 'ভাষা' ও 'ভাব' পৃথক করিয়া আলোচনা করিয়াছি কিন্তু বাস্তবিক কবির নিকট 'ভাষা' ও 'ভাবের' ভিতর কোনও প্রভেদ নাই। কবিতার 'ভাষা' ও 'ভাব' পরস্পরের উপর পরস্পর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। 'ভাব' মন্দ হইলে কবিতার 'ভাষা' কখনই সুন্দর হইতে পারে না এবং ভাষা কদর্য্য হইলে ভাবও সম্পূর্ণরূপ কবিত্বপূর্ণ হইতে পারে না। কবিতার ভাষা ভাবের দেহস্বরূপ—কিছুতেই তাহা ভাব হইতে পৃথক করিতে পারা যায় না। একটি ভাব দুই প্রকার ভাষায় ব্যক্ত হইলে অর্থ সম্বন্ধে অনেকটা বিভিন্ন হইয়া যায়। নিবিড় অন্ধকারকে কালিদাস বলিতেছেন "সূচিভেদ্য-স্তমম্"—জয়দেব বলিতেছেন "অনল্পতিমির"—এ দুয়ের মধ্যে কতটা প্রভেদ আপনারাই বুঝিতে পারিতেছেন।

যে অন্তর্নিহিত শক্তি দ্বারা কবিতায় ভাব ও ভাষার সম্পূর্ণ একী-করণ সম্পন্ন হয় তাহাই কবিতার আত্মা—এই আত্মা আমাদের আত্মার ন্যায় রহস্যজড়িত। যেমন বৈজ্ঞানিকগণ মানবদেহ খণ্ড খণ্ড করিয়াও তাহার ভিতরকার আত্মাকে খুঁজিয়া পান না সেইরূপ সমালোচকেরাও একখানি কাব্যের বিভিন্ন বিভিন্ন উপাদান সকল পরস্পর হইতে বিশ্লিষ্ট করিলেও তাহাদের অন্তরস্থ আত্মাকে

ধরিতে পারেন না। যাঁহারা ভাবের সহিত ভাষা যুক্ত করিয়া কবিতাকে সজীব করিয়া তুলিতে পারেন তাঁহাদেরই কবিতার আত্মা আছে। কিন্তু যথার্থ কবিত্বশক্তি বিবর্জিত কোনও ব্যক্তি যদি বহুল পরিশ্রম দ্বারা বিশেষরূপে পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক ভাব সকলকে পরিপাটি ছন্দ ও ভাষাযুক্ত করেন তাহা হইলেও তাঁহার রচনা কাব্য শ্রেণীভুক্ত নয়। সৃষ্টি ও নির্ম্মাণে যে প্রভেদ, কবিতা ও তাহার অনুকরণে রচিত প্রাণশূন্য ছন্দোবন্ধের সমষ্টিতে সেই প্রভেদ।

পূর্ব্বে যাহা বলিলাম তাহা সংক্ষেপে বলিতে গেলে দাঁড়ায় এই যে—যে রচনায় রসাত্মক ভাব সম্পূর্ণরূপ অনুরূপ ভাষায় প্রকাশিত তাহাকেই আমি কাব্য বলিয়া মানি—এখন দেখা যাউক কাব্য বিষয়ে আমার মত অনুসারে বিচার করিলে জয়দেবের কাব্যজগতে স্থান কোথায়?

(৪)

জয়দেব অধিকাংশ কবিদিগের অপেক্ষা কাব্যের বিষয় নির্ব্বাচনে নিজের নিকৃষ্ট রুচির পরিচয় দিয়াছেন। প্রেমের পরিবর্ত্তে শৃঙ্গার রসকে কবিতার বর্ণিত বিষয় স্বরূপ স্থির করিয়াছেন সেজন্য আমরা কখনও তাঁহাকে কালিদাসাদি কবিগণের সহিত সমশ্রেণীভুক্ত করিতে পারি না। আমি আপাততঃ জয়দেব বিষয়টি কাব্যাকারে গঠিত করিয়া কিরূপ ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন, সেই সম্বন্ধে আমার যাহা বক্তব্য আছে তাহাই বলিতেছি—

জয়দেবের কবিতা সকল—প্রকৃতির শোভা, রাধাকৃষ্ণের রূপ এবং তাঁহাদের বিরহ মিলন ইত্যাদি অবস্থার বর্ণনায় পূর্ণ; সুতরাং

তাঁহার বর্ণনা বিষয়ে কৃতকার্য্যতা অনুসারে তাঁহার কবিত্বশক্তির স্বরূপ নির্দ্ধারিত হইবে। কবিরা দুইরূপ প্রণালীতে বর্ণনা করিয়া থাকেন—প্রথম—স্পষ্ট এবং সহজভাবে, দ্বিতীয়—বর্ণিত বিষয় ইঙ্গিতে বুঝাইয়া দেন। উভয় উপায়ই প্রকৃষ্ট এবং শ্রেষ্ঠ-কবিরা উভয় প্রণালী অনুসারেই বর্ণনা করিয়া থাকেন। জয়দেব কেবলমাত্র প্রথমোক্ত প্রথা অবলম্বন করিয়াছেন। বর্ণনার পারিপাট্য ও সৌন্দর্য্য উপমাদি অলঙ্কার সকলের প্রয়োগ দ্বারা বিশেষরূপে সাধিত হয়। এ জগতের সকল পদার্থের মধ্যেই একটা মিল আছে। আমাদের সময়ে সময়ে কোন একটি পদার্থ কিম্বা ঘটনা দেখিয়া মনে হয় যেন আর অন্য একটি কি জিনিষে এইরূপ ভাব দেখিয়াছিলাম। পৃথক পৃথক পদার্থের ভিতরকার এই সাদৃশ্যের তুলনা হইতে উপমাদির উৎপত্তি—

উপমাদির দ্বারা দুইটি কার্য্য সিদ্ধ হয়—(১) ইহার দ্বারা একটি অস্পষ্ট ভাবকে স্পস্ট করা যায়—(২) ইহা দ্বারা ভাবের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করা যায়। ইহা ব্যতীত কোন দুইটি ভাব বা পদার্থের ভিতর আমার অলক্ষিত কোনরূপ মিল কেহ দেখাইয়া দিলে মনে বিশেষ আনন্দ লাভ করা যায়। কবিতায় যে সকল উপমা ব্যবহৃত হয় তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য—কোনও একটি ভাবের উপমার সাহায্যে সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি এবং কেবলমাত্র উপমার যাথার্থ্য দ্বারা মনের তুষ্টিসাধন, সুতরাং জয়দেবের বর্ণনার যাথার্থ্য এবং সৌন্দর্য্য অনেকটা তাঁহার উপমাদি অলঙ্কার প্রয়োগের শক্তি সাপেক্ষ।

জয়দেবের বিরহাদি বর্ণনা নেহাৎ একঘেয়ে। তাঁহার বিরহী বিরহিনীদিগের নিকট যে বস্তু মনের সহজ অবস্থায় ভাল লাগিবার কথা

তাহাই শুধু খারাপ লাগে। জয়দেব বিরহের ভাবের অন্য কোনও অংশ ধরিতে পারেন নাই। কালিদাসের মেঘদূত কাব্যে যক্ষস্ত্রীর যে বিরহাবস্থা বর্ণিত হইয়াছে তাহাব সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে জয়দেবের বর্ণনায় বৈচিত্রতার অভাব এবং বিরহাবস্থার মধ্যে যে মধুর সৌন্দর্য্য আছে তাহার সম্পূর্ণ উল্লেখের অভাব—এই দুইটি ত্রুটি আমাদের নিকট স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়।

জয়দেবের অভিসার বর্ণনায় কেবলমাত্র বেশভূষার বর্ণনাই দেখিতে পাই, তাহাতে অভিসারিকার মনের আবেগ—প্রেমের নিমিত্ত অবলা রমণীগণ কিরূপে নানারূপ বিপদকে তুচ্ছজ্ঞান করে—এসকল বিষয়ে তিনি একটি কথাও বলেন নাই। এ বর্ণনাও নেহাৎ এক-ঘেয়ে। তাঁহার বসন্ত বর্ণনার প্রধান দোষ তাহাতে একটিও সম্পূর্ণ নূতন কথা দেখিতে পাই না। পূর্ব্ববর্ত্তী কবিরা যে সকল বসন্ত বর্ণনা লিখিয়াছিলেন তাহা হইতেই তাঁহার বসন্ত বর্ণনার উপকরণ সংগৃহীত হইয়াছে। নূতনত্বের কথা ছাড়িয়া দিলেও তাহাতে আরও অনেক দোষ বাহির হইয়া পড়ে। তাঁহার সমস্ত বর্ণনাটিতে সমগ্র বসন্তের ভাব ফুটিয়া উঠে না। তিনি একথা ওকথা বলেন কিন্তু তাহার ভিতর হইতে একটা কোনও বিশেষ ভাব খুব স্পষ্টরূপে দেখা যায় না। কালিদাস অনেকস্থলে বসন্ত বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার অনেক স্থলেই তিনি একটিমাত্র শ্লোকে হয় বসন্তের সমগ্রভাব প্রকাশ করিয়াছেন, নয় একটি মাত্র চিত্রে সমস্ত বসন্ত আবদ্ধ করিয়াছেন—

ক্রমাঃ সপুষ্পাঃ সলিলং সপদ্মং,
স্ত্রিয়ঃ সকামাঃ পবনঃ সুগন্ধিঃ।

সুখাঃ প্রদোষাঃ দিবসাশ্চ রম্যাঃ
সর্ব্বং প্রিয়ে ! চারুতরং বসন্তে ॥

জয়দেব বসন্ত বর্ণনায় অনেকগুলি বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন কিন্তু বর্ণিত বিষয়গুলির মধ্যে খুব একটা ভাবের মিল নাই। তিনি একটি শ্লোকের প্রথম চরণে বলিতেছেন যে "বসন্তে বিরহীগণ বিলাপ করিতেছেন"—সেই শ্লেকের আর একটি চরণে 'অলিকুল কর্ত্তৃক বকুলকলাপ অধিকারের' কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এ দুয়ের ভিতর যে কি স্বাভাবিক মিল তাহা আমি বুঝিতে পারি না। তাঁহার উদ্দেশ্য বসন্তে যে মদন রাজার অধিকার বিস্তৃত হইয়াছে তাহাই বর্ণনা করা। কিন্তু কেবলমাত্র কোন ফুলকে মদন রাজার নখ এবং অন্য অপর আর একটিকে বিরহীদিগের হৃদয় বিদারণের অস্ত্রস্বরূপ বলিলেই সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। যথার্থ মদনবিকারের ভাব কিসে ফুটিয়া উঠে তাহা আমি কালিদাসের একটি মাত্র শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি—

"মধু দ্বিরেফঃ কুসুমৈকপাত্রে
পপৌ প্রিয়াং স্বামনুবর্ত্তমানঃ।
শৃঙ্গেণ চ স্পর্শনিমিলিতাক্ষীং
মৃগীমকণ্ডূয়ত কৃষ্ণসারঃ ॥"

উক্ত শ্লোকে কালিদাস মদনের নখ দূরে যাউক তাঁহার নাম পর্য্যন্ত উল্লেখ করেন নাই তথাপি প্রেমরস-মত্ততার কি চমৎকার চিত্র আঁকিয়াছেন। সমগ্র ভাবের কথা ছাড়িয়া দিলেও জয়দেব এমন একটি মাত্রও শ্লোক রচনা করিতে পারেন নাই যাহাতে

কোনও একটি পদার্থের সজীব চিত্র আমাদের চোখের সম্মুখে ধরিয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রকৃতি বর্ণনাতেও যেরূপ স্ত্রীপুরুষের রূপ বর্ণনাতেও তিনি ঠিক সেইরূপ অক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন। কালিদাস—

> "আবর্জ্জিতা কিঞ্চিদিব স্তনাভ্যাং,
> বাসো বসানা তরুণার্করাগম্।
> পর্য্যাপ্তপুষ্পস্তবকাবনম্রা
> সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব ॥"

এই একটি মাত্র শ্লোকে সমগ্র উমাকে কত সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, জয়দেব এইরূপ দুই চার কথায় একটি স্ত্রী কিম্বা পুরুষের সমগ্র চিত্র বর্ণনা করিতে একান্ত অপারগ। তাঁহার বিশ্বাস পদ্মের ন্যায় মুখ, তিলফুলের ন্যায় নাসিকা, ইন্দিবরের ন্যায় নয়ন এবং বান্ধুলির ন্যায় অধর এই সকলের একটি সমষ্টি করিলেই সুন্দরীর মুখ নির্ম্মাণ করা যায়। উক্ত বিশ্বাসে ভর করিয়া সুন্দর-কবি বিদ্যাকে একটি পদ্মের সহিত তিলফুল নীলোৎপল, বান্ধুলিপুষ্প এবং কুন্দকলিকা ইত্যাদি অতি কৌশল সহকারে সংযোজনা করিয়া যে অপূর্ব্ব মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া উপহার স্বরূপ পাঠাইয়াছিলেন তাহা অবশ্য জয়দেবের নিকট তিলোত্তমার মুখ বলিয়া গণ্য হইতে পারিত। উক্ত প্রকার বিশ্বাসের উপর আমার কোনই আক্রোশ নাই, যিনি ইচ্ছা করেন অনায়াসে তিনি ঐ সকল ফুল যোড়া তাড়া দিয়া যখন তখন মনের সুখে সুন্দরীর রূপ বর্ণনা করিয়া কবিতা লিখিতে পারেন কেবল এইটি মাত্র মনে রাখিলেই আমি সন্তুষ্ট

থাকিব যে পদ্ধতি অনুসারে চলিলে মাথামুণ্ড কিছুই বর্ণনা করা যায় না।

তারপর জয়দেবের উপমার বিষয় কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। প্রথমতঃ আমরা দেখিতে পাই যে জয়দেবের উপমাসকল প্রায়ই নেহাৎ পড়ে-পাওয়া গোছের। জয়দেবের পূর্ব্বে সেই সকল উপমা শত সহস্রবার সংস্কৃত কবিগণ কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হইয়াছে। জয়দেব কাব্য-জগতের বিস্তৃত ক্ষেত্র হইতে তাহা কুড়াইয়া লইয়াছেন মাত্র। কাব্য জগতে, না বলিয়া পরের দ্রব্য গ্রহণ করার প্রথাটা বিশেষরূপ প্রচলিত আছে এবং কোনও কবি যদ্যপি উক্ত উপায়ে উপার্জ্জিত দ্রব্যের সমুচিত সদ্ব্যবহার করিতে পারেন তাহা হইলে তাঁহাকে লোকে কিছু একটা বিশেষ দোষও দেয় না। নেহাৎ পরের দ্রব্য বলিয়া চেনা গেলেই আমরা রাগ করি এবং কবির উদ্দেশে কটুকাটব্যও ব্যবহার করি কিন্তু যদি তাহার একটু মাত্রও রূপের পরিবর্ত্তন দেখিতে পাই তাহা হইলেই ঠাণ্ডা থাকি। জয়দেব অনেকস্থলেই পরের উপমাদি লইয়া তাহার একটু আধটু বদলাইয়া নিজের বলিয়া চালাইবার চেষ্টা পাইয়াছেন। তাঁহার এ বিষয়ে হাত বড় মন্দ সাফাই নহে; আবার অনেকস্থলে যেমনটি পাইয়াছেন অবিকল তেমনটী রাখিয়াছেন। এইরূপ উপমাদি পড়িয়া রাগ করি আর না করি খুব যে খুসী হই তাহা নহে। যে কথা হাজার বার শুনিয়াছি তাহা আর কার শুনিতে ভাল লাগে। আমার ত পদ্মের মত মুখ ইত্যাদি কথা শুনিলেই মনটা একটু অন্যমনস্ক হয় এবং ঐরূপ উপমা বেশীক্ষণ পড়িতে হইলেই হাই উঠিতে আরম্ভ হয় কারণ ওসব পুরাণ কথায় মনে কোনও নির্দ্দিষ্ট ভাব বা চিত্র আসে না। শুনিবামাত্রই মনে

হয় ও সবতো অনেকদিনই শুনিয়াছি আবার অনর্থক ও কথা কেন? ভরসা করি আপনারা সকলেই আমার সহিত এবিষয়ে একমত।

কিন্তু জয়দেব যে কেবলমাত্র প্রচলিত উপমাদি ব্যবহার করিয়াছেন এমন নহে—তাঁহার পরিকল্পিত দুচারিটি নূতন উপমাও গীতগোবিন্দে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার মধ্যে যেগুলি আমার নিকট বিশেষ-রূপে জয়দেবীয় বলিয়া বোধ হইয়াছে, আপনাদের জ্ঞাতার্থে তাহারই দুই একটি এখানে উদ্ধৃত করিতেছি। জয়দেব ঈশ্বরের নরহরিরূপ সম্বন্ধে বর্ণনায় বলিতেছেন—

"তব করকমলবরে নখসম্ভুতশৃঙ্গম্
দলিত হিরণ্যকশিপু তনুভৃঙ্গম্।"

ইহার দোষ—প্রথমতঃ, কমলের নখঘাত ও তদ্‌কর্ত্তৃক ভ্রমরের বিনাশ নেহাৎ অস্বাভাবিক, দ্বিতীয়তঃ নরসিংহের করযুগলকে কমলের সহিত তুলনা করায় এবং হিরণ্যকশিপুকে ভৃঙ্গের সহিত তুলনা করায় উভয়ের ভিতর, বৈরতার, বিরোধীভাবের পরিচয় দেওয়া হয় নাই। তৃতীয়তঃ দুর্দ্দান্ত দৈত্যের সহিত কৃষ্ণ, নরহরিরূপ গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে বধার্থ স্বীয় বীরত্বের পরিচায়ক যে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহাকে কমল ও ভ্রমরের যুদ্ধ স্বরূপ বলায় ভাবের যাথার্থ্য এবং সৌন্দর্য্য কতটা পরিমাণে বজায় থাকিল আপনারাই বিবেচনা করিবেন!

বলরামকে উল্লেখ করিয়া জয়দেব বলিতেছেন—

"বহসি বপুষি বিশদে বসনং জলদাভম্
হলহতি ভীতি মিলিত যমুনাভম্"

হলতাড়নার ভয়ে যমুনা ডেঙ্গায় উঠিয়া বলরামের দেহে বসন-রূপে সংলগ্ন হইয়াছেন এরূপ অযথা কথা বলায় যদি কিছু সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পাইত তাহা হইলে ও না হয় উপমাটি সহ্য করা যাইত, আমার বিবেচনায় জয়দেব বলরামকে জলে নামাইলে, যমুনাকে আর জল ছাড়া করিবার আবশ্যক হইত না। কৃষ্ণের মুখ কিরূপ, না—

"তরল দৃগঞ্চলবলনমনোহরবদনজনিত রতিরাগম্
স্ফুট কমলোদর খেলিতখঞ্জন যুগলিব শরদি তড়াগম্।"

কৃষ্ণের নয়ন-শোভিত বদন দেখিয়া মনে হইল যেন পদ্মের ভিতর খঞ্জন যুগল খেলা করিয়া বেড়াইতেছে। কমলের ভিতর খঞ্জন যুগলের বিহার আমিও দেখি নাই জয়দেবও দেখেন নাই এবং আমার বিশ্বাস ওরূপ কার্য্য খঞ্জনেরা কখনও করে না। এ উপমাটি আমার নিকট যেমন অপ্রাকৃত তেমনি অর্থশূন্য বলিয়া মনে হইতেছে।

আমার এই উপমা তিনটি উদ্ধৃত করার উদ্দেশ্য কেবল জয়দেবকে নিন্দা করা নহে, আমি এই সকল উদাহরণ হইতে জয়দেব কিজন্য এবং কি উপায়ে উপমা প্রয়োগ করিতেন তাহাই দেখাইব। এরূপ উপমা পড়িয়া আপনাদের কি মনে হয় না যে জয়দেব কেবল উপমা প্রয়োগ করাটা কবিতায় আবশ্যক বিবেচনায় উক্ত কার্য্য করিতেছেন, বাস্তবিক উপমায় কবিতার সৌন্দর্য্য বাড়িল কি না এবং কোনও বিশেষ ভাব পরিস্কার রূপে তাহার সাহায্যে ব্যক্ত করা গেল কি না এসব কথা জয়দেবের মনেও আসে নাই। উপমা আপনা হইতেই তাহার

কাছে আসে না, তিনি জোর করিয়া তাহাকে টানিয়া আনেন অর্থাৎ তাঁহার উপমায় স্বাভাবিকতা কিছুমাত্রও নাই। তাহা কেবলমাত্র কৃত্রিমতায় পরিপূর্ণ। প্রমাণ, কবিরা প্রায়ই সুন্দর করযুগলকে কমলের সহিত তুলনা করেন তাই জয়দেব নরসিংহের করযুগলকে কমল স্বরূপ বলিয়া বসিলেন এবং তাহাকে কমল বলায় হিরণ্য-কশিপুকে তাঁহাকে বাধ্য হইয়া ভৃঙ্গ বলিতে হইল। ভাবের সৌন্দর্য্য বজায় থাকিল কি না সে কথা ভাবিয়া আর কি করিবেন? একটি ভুলের জন্য বাধ্য হইয়া আর একটি অন্যায় কাজ করিতে হইল। আবার দেখুন, কবিরা মুখকে পদ্মের সহিত এবং নয়নযুগলকে খঞ্জনের সহিত তুলনা করেন, ইহা জয়দেবের নিকট অবিদিত ছিল না কিন্তু নয়নশোভিত বদনকে কবিরা কি বলেন তাহা তাঁহার জানা ছিল না। কাজেই কি করেন তিনি উপমাস্বরূপ পদ্মের সহিত মনে মনে খঞ্জনের যোগ করিয়া ফেলিলেন, অগত্যা খঞ্জনকেই কমলোদরে প্রবেশ করাইয়া দিতে হইল। ল্যাঠা চুকাইয়া গেল, জয়দেব হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। কবিতা হইল কি না সে কথা আপনারা ভাবুন।

আমি ক্রমে ক্রমে প্রমাণ করিয়াছি যে জয়দেব যখন কোনও বিষয়ের সাধারণ ভাব অথবা তাহার সর্ব্বাবয়বের প্রত্যক্ষরূপ সহজভাবে কিম্বা অলঙ্কারাদির সাহায্যে উত্তমরূপ বর্ণনা করিতে অসমর্থ তখন তাঁহাকে এ বিষয়েও বড় কবি বলিয়া গণ্য করা যায় না।

(৫)

এখন আমি জয়দেবের ভাষা সম্বন্ধে আমার যাহা বক্তব্য আছে তাহা বলিয়াই আমার প্রবন্ধ শেষ করিব। জয়দেবের ভাষা যে

অতিশয় সুললিত এবং শ্রুতিমধুর ইহা তো সর্ব্ববাদিসম্মত। এমন কি যাঁহারা সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ তাঁহারাও একথা স্বীকার করিয়া থাকেন। বরং শেষোক্ত ব্যক্তিদিগকেই উক্ত বিষয়ে জয়দেবের প্রচুর প্ররিমাণে প্রশংসা করিতে দেখা যায়। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি যে কবিতার ভাষার সৌন্দর্য্য হইতে ভাবের সৌন্দর্য্য পৃথক করা যায় না। ভাবের অনুরূপ ভাষা প্রয়োগেই যথার্থ কবিত্ব শক্তির পরিচয়। যাহাদের মস্তিষ্কে ভাব ও ভাষা একত্রে গঠিত হয় না তাহারা লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্য হয় ভাব বিষয়ে পাণ্ডিত্য নয় ভাষা বিষয়ে ছন্দ নির্ম্মাণের কৌশল, এই দুইয়ের একটির সাহায্য লইতে বাধ্য হয়। জয়দেব আমার বিবেচনায় যথার্থ উচ্চ অঙ্গের কবিতা রচনার অক্ষমতা বশতঃ লোকসাধারণের চটক লাইবার অভিপ্রায়ে শেষোক্ত-উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহার রচনায় কিছু অতিরিক্ত মাত্রায় কথার কারিগারি দেখা যায়। মনে কোনও একটি বিশেষ ভাবের উদয় হইলে যে কথাটি স্বভাবতঃই মুখাগ্রে আসিয়া উপস্থিত হয় জয়দেব সেটিকে চাপিয়া রাখেন—তাহার পরিবর্ত্তে শব্দশাস্ত্র খুঁজিয়া ভাবপ্রকাশ বিষয়ে অপেক্ষাকৃত অনেকাংশে অনুপযোগী আর একটি কথা আনিয়া হাজির করেন। কালিদাসাদি যথার্থ শ্রেষ্ঠ কবিদের রচনা-প্রণালী স্বতন্ত্র। তাঁহারা স্বভাবতঃ যে কথাটি মুখে আসে সেইটি ব্যবহার করেন তবে তাঁহাদের ভাবের সহিত আমাদের ভাবের অনেক পার্থক্য সুতরাং যেরূপ শব্দ প্রয়োগ করা তাঁহাদের পক্ষে সহজ, সাধারণ লোকের পক্ষে তাহা একান্তই দুঃসাধ্য। আপনার, আমার, ও জয়দেবের সহিত তাঁহাদের এইটুকু মাত্র তফাৎ। জয়দেবের ভাষার প্রধান দোষ—সুস্পষ্ট rythm-এর

অভাব। তাহার ব্যবহৃত শব্দ সকল একটি প্রায় সম্পূর্ণরূপে অন্য আর একটির ন্যায়। অতিরিক্ত মাত্রায় অকারান্ত শব্দের ব্যবহারে শব্দ সকলের হ্রস্ব দীর্ঘাদি প্রভেদ যথেষ্ট পরিমাণে না থাকায়—সুতরাং তাহাদের উচ্চারণের বৈচিত্র অভাবে—জয়দেবের ভাষায় গাম্ভীর্য্যের একান্ত অভাব ঘটিয়াছে। কিন্তু বাক্যের যে অংশ কেবলমাত্র শ্রবণেন্দ্রিয় গ্রাহ্য তাহাও গাম্ভীর্য্য ব্যতিরেকে সম্পূর্ণরূপে মধুর হইতে পারে না। অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় ভাষা সম্বন্ধেও গাম্ভীর্য্যযুক্ত মাধুর্য্য, গাম্ভীর্য্য বিরহিত মাধুর্য্য, অপেক্ষা বহুল পরিমাণে শ্রেষ্ঠ এবং শ্রীসম্পন্ন। "গীতগোবিন্দের" সহিত "মেঘ-দূতের" তুলনা করিলেই দেখা যায় গাম্ভীর্য্যগুণ বিশিষ্ট হইয়াও শেষোক্ত কাব্যের ভাষা পূর্ব্বোক্ত কাব্যের ভাষা হইতে কত উৎকৃষ্ট।

সমভাবে উচ্চারিত অকারান্ত শব্দের একত্রে বহুল বিন্যাসের আর একটি দোষ আছে—তাহাতে পাঠকমাত্রেরই পক্ষে রচনার অর্থ গ্রহণ করা কিঞ্চিৎ কঠিন হইয়া উঠে। বিভিন্ন বিভিন্ন শব্দ সকল পরস্পর হইতে বিশেষরূপে স্বতন্ত্র না হইলে পাঠকালীন তাহাদের প্রত্যেকের উপর নজর পড়ে না। একটি শ্লোকের অন্তর্ভূত শব্দ সকলের আকৃতিগত স্বাতন্ত্র্য যত সুস্পষ্ট তাহার অর্থও সেই পরিমাণে চট্ করিয়া বুঝা যায়। শব্দ সকলের বৈচিত্র বজায় রাখিয়া তাহাদের ভিতর সামঞ্জস্য সৃষ্টি করিয়া যিনি রচনাকে শ্রুতিমধুর করিতে পারেন তিনিই যথার্থ ভাষার রাজা। জয়দেব তাঁহার রচনায় শব্দ সকলের হ্রস্ব দীর্ঘাদি প্রভেদ জনিত বন্ধুরতা ভাঙ্গিয়া মাজিয়া ঘসিয়া এমন মসৃণ করিয়াছেন যে তাহা পড়িতে গেলে তাহার উপর দিয়া রসনা

ও মন দু-ই পিছলাইয়া যায়। প্রত্যেক শব্দটির উপর মন বসাইতে না পারিলে সমস্ত রচনার অর্থের উপরেও অমনোযোগ আপনা হইতেই আসিয়া পড়ে।

গীতগোবিন্দে কথার বড় একটা কিছু অর্থ নাই বলিয়া জয়দেব যে চাতুরি করিয়া যাহাতে পাঠকের মন ভাবের দিকে আকৃষ্ট না হইতে পারে, সেই অভিপ্রায়ে উক্ত প্রকার শ্লোক রচনা করিয়াছেন এমন বোধ হয় না। কিন্তু ফলে তাহাই দাঁড়াইয়াছে।

এতক্ষণ পর্য্যন্ত আমি শুধু জয়দেবের কবিতার দোষ দেখাইয়া আসিয়াছি। তিনি যে উৎকৃষ্ট কবিদিগের সহিত সমশ্রেণীতে আসন গ্রহণ করিতে পারেন না তাহাই দেখান আমার উদ্দেশ্য। যাঁহার কাব্যের বিষয় প্রেমের তামসিক ভাব, মানব দেহের সৌন্দর্য্য যাঁহার দৃষ্টিতে ততটা পড়ে না, যিনি মানব দেহকে কেবল ভোগের বিষয় বলিয়াই মনে করেন, প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের সহিত যাঁহার সাক্ষাৎ পরিচয় নাই, যিনি বর্ণনা করিতে হইলেই শোনা কথা আওড়ান, যাঁহার ভাষায় কবিত্ব অপেক্ষা চাতুরি অধিক—এক কথায় যাঁহার কাব্যে স্বাভাবিকতার অপেক্ষা কৃত্রিমতাই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে তাঁহাকে আমি উৎকৃষ্ট কবি বলিতে প্রস্তুত নহি। ভরসা করি এ বিষয়ে আপনারাও আমার সহিত এক মত। কিন্তু এ সকল কথা সত্য হইলেও জয়দেবকে যে অনেকে বড় কবি বলিয়া মনে করেন সে কথাও ত অস্বীকার করি যো নাই। জয়দেব সম্বন্ধে এই সাধারণ মত কি কি কারণ প্রসূত তাহা আমি কতকটা নির্ণয় করিতে চেষ্টা কয়িয়াছি—নিম্নে সেগুলির উল্লেখ করিতেছি—

(৬)

প্রথমতঃ শৃঙ্গার রসের বর্ণনায় জয়দেব যখন তাঁহার সমস্ত ক্ষমতা প্রস্ফুটিত করিয়া তুলেন তখন তাঁহার কবিতা বিশেষরূপে স্বাভাবিক হইয়া উঠে—তখন তিনি কোনওরূপ অপ্রাকৃত কিম্বা অযথার্থ কথা বলেন না। যে বিষয়ে যাহার প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে তাহার বর্ণনায় সে অবশ্য বিলক্ষণ নিপুণ। সুরতসুখালসজনিত দেহের অবস্থা তিনি কত জাজ্বল্যমান করিয়া আঁকিতে পারেন। মনের ভাবের কথা নাই বলিলেন, রোমাঞ্চ, শিৎকার ইত্যাদি একান্ত শারীরিক ভাবসকলের বর্ণনায় ত তিনি কাহারও অপেক্ষাও কম নন। আর তাঁহার ভাষায় গাম্ভীর্য্য ইত্যাদি গুণ নাই বটে কিন্তু তাহা শৃঙ্গার রসের বর্ণনার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। যুবতীদিগের দেহের ন্যায় তাঁহার শব্দগুলিও কুসুমসুকুমার। যখন রূপসীদিগের কবরী শিথিল হইয়া যাইতেছে নীবিবন্ধন খসিয়া পড়িতেছে—যখন সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির বন্ধন শ্লথ হইয়া আসিতেছে তখন আর ভাষার বাঁধুনি কি করিয়া প্রত্যাশা করা যায়? রাধার দেহের ন্যায় গীতগোবিন্দের ভাষা 'নিঃসহনিপতিতা লতা' স্বরূপ। তাই শৃঙ্গাররসবর্ণন কালে তাঁহার ভাষা ভাবের অনুরূপ। তিনি শৃঙ্গার রসের কবি। কিন্তু যে রসেরই হউন না কবি ত বটে? এবং কবির যথার্থ রচনা যে জাতিরই হউক লোকের ভাল লাগিবেই লাগিবে সুতরাং জয়দেবের কাব্য সাধারণের একেবারেই অনাদরের সামগ্রী নহে।

দ্বিতীয়তঃ—সাধারণের সংস্কৃত ভাষায় অজ্ঞতা আর একটি কারণ।

সংস্কৃত না জানার দরুণ ভাষার লালিত্য হইতে লোকে ধরিয়া নেয় ভাবেরও অবশ্য সৌন্দর্য্য আছেই আছে—

তৃতীয়তঃ—রাধাকৃষ্ণের প্রেম জয়দেবের কাব্যের বিষয় বলিয়া সাধারণের নিকট জয়দেবের কাব্য এত উপাদেয়। এ সংসারে ফুল, জ্যোৎস্না, মলয়পবন, কোকিলের কুহুস্বর আমাদের সকলেরই ভাল লাগে—চিরদিন লোকের ভাল লাগিয়াছে এবং চিরদিন ভাল লাগিবে। কিন্তু কতকগুলি জিনিষ আছে যাহার যথার্থ একটি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য না থাকিলেও, অভ্যাস ও সংস্কার বশতঃ আমাদের ভাল লাগে—যমুনার জল, তমালের বন, বৃন্দাবন, মথুরা, শ্রীকৃষ্ণের বাঁশি—এ সকলের মধুরতা পূর্ণিমারজনী, দক্ষিণ পবনের ন্যায় আমাদের নিকট পুরাতন হয় না—যিনিই এ সকলের কথা বলেন, তাঁহার কথাই আমাদের শুনিতে ইচ্ছা যায়। আমরা অনেকেই বৃন্দাবন, যমুনার জল এ সকল কিছুই দেখি নাই—বাঁশির স্বরও কখনও শুনি নাই—তবে তাহাদের কথা এত প্রাণ স্পর্শ করে কেন? কারণ ঐ এক একটি কথা হৃদয়ে কত সুন্দর কত মধুর স্মৃতি জাগাইয়া তুলে। আমরা যমুনার জল দেখি নাই বটে কিন্তু তাহার সম্বন্ধে এত সুন্দর কবিতা পড়িয়াছি যে যমুনার সমস্ত সৌন্দর্য্য আমাদের হৃদয়ে লিপ্ত হইয়া গিয়াছে, তাই রাধাকৃষ্ণের প্রণয় সম্পর্কীয় সকল বস্তুকেই প্রকৃতির চিরস্থায়ী সুন্দর অংশ সকলের মধ্যে ভুক্ত করিয়া ফেলি। সুতরাং জয়দেব যখন সেই যমুনা, সেই বাঁশি, সেই রাধা সেই কৃষ্ণ ও সেই বৃন্দাবনের কথা বলেন তখন তাঁহার পরিবর্ত্তে তাহা অপেক্ষা শতগুণে শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব কবিরা আমাদের মনে ঐ সকলের যে সুন্দর মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়াছেন তাহারই দিকে আমাদের দৃষ্টি পড়ে। আমরা

আসল কারণ না বিচার করিয়া মনে করি—জয়দেবের কবিতা পড়িয়াই আমরা মোহিত হইতেছি। তাঁহার পরবর্ত্তী কবি সকলের গুণ আমরা ভুলক্রমে জয়দেবে আরোপ করি। চণ্ডীদাসাদি বৈষ্ণব কবিগণ রাধাকৃষ্ণের প্রেম কাব্যের বিষয় না করিলে জয়দেব আমাদের যতটা ভাল লাগে তাহা অপেক্ষা অনেক কম ভাল লাগিত—অন্ততঃ আমার কাছে।

অনুরোধ।

—০ঃ০—

বালা, হিয়ার আলো
জ্বালো জ্বালো!
বসন্ত ঐ আসে।

সারা জীবন একটি বার
একটি নিশার অভিসার,
একটি দীর্ঘশ্বাসে,

এক নিমেষের মাদকতা,
একটি সাঁঝের আকুলতা,
নিবিড় করি' ধর আজি
পরম বিশ্বাসে,

বালা, হিয়ার আলো
জ্বালো জ্বালো!
বসন্ত ঐ আসে।

বালা, প্রাণের বাণী
কহ রাণী!
বসন্ত যে যায়।

একটি নিমেষ, দুইটি ক্ষণ,
রইবে না ত আজীবন—
ফিরবে না ত হায়!

সজল দুটি আঁখির পাতে,
কাজল-মাখা ঘন রাতে,
উজল করি ধর আজি
প্রেমের বর্ত্তিকায়,

বালা, প্রাণের বাণী,
কহ রাণী!
বসন্ত যে যায়।

বালা, বালা, বালা,
গাঁথ মালা!
বসন্ত ঐ গেল।

নাইরে নিমেষ, নাইযে সময়,
আর কি সাজে জয় পরাজয়?
ফেল, সরম ফেল!

একটি দৃঢ় আলিঙ্গনে,
গাঢ় সোহাগ সচুম্বনে,
একটি চরম দৃষ্টি হানি'
হৃদ্-কমলটি মেল!

বালা, বালা, বালা,
গাঁথ মালা—
বসন্ত ঐ গেল!

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

প্রজাস্বত্বের কথা। (২)

—:*:—

বীরবলজী,

গত বারে আমি যে আপনাকে একখানি পত্র লিখেছিলাম সে-খানি আপনি অনুগ্রহ করে সবুজপত্র সম্পাদক মহাশয়ের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন, আর ততোধিক অনুগ্রহ করে আমার ও আমার লেখার প্রশংসা করেছেন। আপনার প্রশংসাপত্র ধন্যবাদের সহিত আমার শিরোধার্য্য।

আপনি জমির স্বত্ব-স্বামিত্ব সম্বন্ধে মূল সূত্রের নির্দ্দেশ করে দিয়েছেন এবং বলে দিয়েছেন "আপনারা যত পারেন এর টীকা ভাষ্য করুন। টীকা, ভাষ্য, বার্ত্তিক নানা নামে নানা রূপে এদেশে অতি প্রাচীন কাল থেকেই আছে। শঙ্করাচার্য্য, আনন্দগিরি, বাচস্পতি মিশ্র, কুল্লুক ভট্ট, মেধাতিথি প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায়গণ টীকা লিখেই চিরস্মরণীয়। আজকালকার অর্ব্বাচীন কালেও বিশ্ববিদ্যালয়ের মহামহোপাধ্যায় অধ্যাপকগণ পরীক্ষারূপী "তপ্তা বৈতরণী নদী" পার করবার জন্য ছাত্রগণকে পাঠ্যপুস্তকের চেয়ে বহুগুণ প্রবৃদ্ধ কলেবর নোট দিয়ে প্রসিদ্ধি লাভ করে থাকেন। এই সকল নজীরের বলে আমিও যদি তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবার দুঃসাহস করি' তা হলে সে অপরাধ একেবারে অক্ষমণীয় হবে না।

কৃষকের দুঃখের কথা অনেক। তার অন্য কিছুর অভাব থাক

আর নাই থাক, দুঃখের কথার অভাব নাই। আজ তার দু' একটা কথা বলব।

জমিদারের সঙ্গে কৃষকের সম্পর্ক জমি আর তার খাজানা নিয়ে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে এ দুটি কথার সংজ্ঞা (definition) নেই। আমি আগে খাজনার কথা বলব, তারপর জমির কথা। খাজনার সংস্কৃত এবং বাঙলা প্রতিশব্দ "কর" আর ইংরেজী প্রতিশব্দ "rent" একথা না বললেও চলত, কিন্তু এ দুটো কথা এক জিনিষকে বোঝায় না এবং এর একটি অন্যটির প্রতিশব্দ নয়, সেইটে বোঝাবার জন্য কথাটা বলা অনাবশ্যক মনে করছি না। জমি সম্বন্ধীয় করের অর্থ জমি থেকে যে আয় হয় তারই যে অংশটা রাজাকে দেওয়া যায়। Rent এর অর্থ জমির ব্যবহারের বিনিময়ে যা দেওয়া যায়। প্রথমটায় জমি আমারই, আমি চাষ আবাদ করে তার থেকে কিছু লাভ করি, রাজকার্য্য নির্ব্বাহের জন্য রাজাকে সেই লাভের একটা অংশ দিই। এই অর্থেই এদেশে প্রাচীন কাল থেকে এ পর্য্যন্ত "কর" কথাটার ব্যবহার চলে আসছে। দ্বিতীয়টায়, জমি অন্যের, আমি কেবল ব্যবহার করি, আর সেই ব্যবহারের মূল্যস্বরূপ যার জমি তাকে কিছু দিই। এর প্রভেদটা এত স্পষ্ট যে স্পষ্টতর করে তা আর বুঝিয়ে দেবার আবশ্যক নেই। এই জন্যই হিন্দুরাজত্ব কালে এবং মুসলমান রাজত্বকালে রাজা জমি ক্রোক-বিক্রী করতে পারতেন না এবং করতেননা। যথা সময়ে কর দিতে না পারার জন্য জমিদারের "বৈকুণ্ঠ" দর্শন পর্য্যন্ত হত, কিন্তু প্রজার প্রতি কোনো অত্যাচারের কথা শোনা যায় নি। ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ইংরেজ কোম্পানী। তাঁরা দেশের কর আদায়ের ভার পেয়ে কর শব্দের ইংরেজী অনুবাদ করলেন rent এবং শব্দ ও অর্থের যে ঘনিষ্ঠ

সম্বন্ধ আছে তা থেকে তাঁদের দেশে, অর্থাৎ—বিলেতে যে অর্থে rent শব্দটার ব্যবহার আছে সেই অভ্যস্ত অর্থটাই বুঝলেন। বিলেতে জমিটা জমিদারের, প্রজা তার ব্যবহার করে এবং ব্যবহারের মূল্যস্বরূপ কিছু দিয়ে থাকে, তারই নাম rent. কোম্পানীর ইংরেজ কর্ম্মচারীরা আরও বুঝলেন যে পতনোন্মুখ নবাবী-গবর্ণমেণ্ট প্রজার উপর যে সকল অবৈধ কর বসিয়েছিলেন সেগুলিও "আচারাৎ" প্রজার অবশ্য দেয়। সুতরাং জমির আসল কর ও এই অবৈধ করগুলি যোগ করে যা হল তাই হল rent. ১৭৯৩ সালের ৮ রেগুলেশনের ৫৪ ও ৫৫ ধারায় এই অবৈধ করগুলিকে বৈধ করে দেওয়া হল। ব্যবস্থা হল all cesses (abwab, mathat, mangan &c) are to be consolidated with the substantive rent (asl) in one sum. তবে কোম্পানী বাহাদুর দয়া করে বলে দিলেন যে, এর উপরেও যদি কেহ কোনো কর আদায় করেন, তা অবৈধ হবে। No *new* cesses are to be imposed ; কিন্তু এ বিধির সম্মান রক্ষা করা হল একে লঙ্ঘন করে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ভুল ভ্রান্তিগুলো ক্রমে যত দেখা যেতে লাগল, ততই অল্প অল্প সংশোধক বিধিব্যবস্থা হতে লাগল। এই সংশোধক বিধির মধ্যে ১৮৫৯ সালের ১০ আইন একটি। এর দ্বারা প্রজার স্বত্ব কতকটা নির্দ্দিষ্ট করবার চেষ্টা করা হল, কিন্তু বিশেষ কোন ফল হল না। হাইকোর্টের বিচারপতিরা একটা মোকদ্দমা উপলক্ষ্যে বললেন, এই আইনে প্রজার অধিকার সম্পূর্ণ ভাবে বিবৃত করা হয় নি। আরও বললেন যে, চিরাগত আচার প্রতিষ্ঠিত ভোগস্বত্বের যে অধিকার সে অধিকার প্রজার অক্ষুণ্ণ থাকবে। (Selections from papers relating to the Bengal Tenancy Act,

1885) এর মধ্যে এই আইনের খাজনা বৃদ্ধির ধারাগুলি নিয়েও অনেক আন্দোলন সমালোচন হতে লাগল। ম্যালথস (Malthus) খাজনার সংজ্ঞা দিয়েছেন "that portion of the value of the whole production which remains to the owner of the land after all the outgoings belonging to its cultivation, of whatever kind, have been paid, including the profits of the capital employed, estimated according to the usual and ordinary rate of agricultural capital at the time being." অর্থাৎ—কোনো প্রকার শস্য উৎপাদন করতে হলে কৃষকের যে সমস্ত ব্যয় হয় তা, আর তার জন্য যে মূলধন লাগে তার সুদ বাদে উৎপন্ন শস্যের যে অংশ বাকী থাকে তাই হচ্ছে প্রকৃত খাজনা বা rent. হাই কোর্টের সে সময়কার প্রধান বিচার-পতি স্যার বার্নস্ পীকক (Sir Barnes Peacock) একটা মোকদ্দমায় খাজনার ম্যালথস-কথিত এই সংজ্ঞা গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু এতে জমিদারদের সুবিধা হয় না, তাই এই মীমাংসার বিরুদ্ধে একটা মহা আন্দোলন হয়। ১৮৬৫ সালে ঠাকুরাণী দাসী বনাম বিশ্বেশ্বর মুখু-য্যের মোকদ্দমার আপীল্ হাইকোর্টের ফুল বেঞ্চে উপস্থিত হয়। ফুল বেঞ্চের অধিকাংশ বিচারপতিরা স্যার বার্নস্ পীককের মতের সঙ্গে একমত হতে পারলেন না। তাঁরা মীমাংসা করলেন যে, প্রজা জমিদারকে "ন্যায্য" খাজনা দিতে বাধ্য। "ন্যায্য" খাজনার অর্থ করলেন সমস্ত উৎপন্ন শস্যের সেই অংশ যে অংশ দেশের রীতি অনুসারে জমিদারের প্রাপ্য, "that portion of the gross produce, calculated in money, to which the zamindar is

entitled under the custom of the country", (The great rent case. Thakurani Dasi v, Bisheshar Mukhurji, B. L. R. F. B. vol, 202) স্যর বার্নস্ পীককের গৃহীত ম্যালথসের খাজনার সংজ্ঞার সঙ্গে একবার এই সংজ্ঞাটার তুলনা করুন। একটায় মূলধনের সুদ ও চাষের খরচ খরচা বাদে যা থাকে তাই, আর একটায় ও-সকল কিছু বাদ না দিয়ে সবসুদ্ধ যা হয় তারই একটা অংশ। সে অংশটা কত তাও নির্দ্দিষ্ট করে বলা হল না। বলা বাহুল্য এ অংশটা হিন্দু রাজাদের আমলের ছ' অংশের এক অংশ নয়। এর আবার একটি বিশেষণ আছে—দেশাচার অনুসারে জমিদারের যা প্রাপ্য। দেশাচার বলতে বুঝতে হবে, দেশের প্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে যে আচার তা নয়, নবাবী আমলের শেষ ভাগে যে অতি-আচার দ্বারা সকল রকম "আবওয়াব" খাজনার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে "আসল জমা" হয়ে গেল, সেই আচার। এখন বিবেচনা করে দেখতে হবে এই খাজনাটা কি "ন্যায্য"? এই "আবওয়াব"-গুলোও কি ন্যায্য, যুক্তি সঙ্গত? আবওয়াব-রূপী অবৈধ অতিরিক্ত করগুলি বাদ দিয়ে যা থাকে তার সঙ্গে আবওয়াব-সংযুক্ত খাজনার তুলনা করে দেখা উচিত। তা হলে বুঝতে পারা যাবে "আসল জমা" বলে যে খাজনা এখন প্রজার কাছ থেকে নেওয়া হচ্ছে, সেটা আসল নয়। আসলটা তার একটা সামান্য অংশ মাত্র। এই অত্যন্ত অধিক খাজনা দিতে দিতে এবং তার সঙ্গে আরও কত কি দিতে দিতে প্রজা যে নিঃস্ব হয়ে পড়েছে তাতে আর আশ্চর্য্য কি? প্রজার এই শোচনীয় অবস্থা দেখে ১৮৬৮ সালে তখনকার গবর্ণর জেনারেল লর্ড লরেন্স (Lord Lawrence) বলেছিলেন "It would be necessary

for the Government sooner or later to interfere and pass a law which should thoroughly protect the raiyat and make him what he is now only in name, a free man, a cultivator with the right to cultivate the land he holds, provided he pays a fair rent for it" (Bengal Tenancy Act, edited by Rampini and Kerr, 4th Edition, p. xii) এর মধ্যে rent-এর বিশেষণ fair কথাটি সবিশেষ দ্রষ্টব্য।

তার পর ১৮৮৩ সালে যখন Bengal Tenancy Bill ব্যবস্থাপক সভায় পেশ হয়, লর্ড রিপন বলেছিলেন যে, কৃষকের যাতে স্বার্থরক্ষা হয় ও মঙ্গল হয় তা করবেন বলে গবর্ণমেণ্ট প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, কিন্তু "লজ্জার বিষয়" গবর্ণমেণ্ট সে প্রতিজ্ঞা আজও পালন করেন নি। তাঁর নিজের ভাষায় "We have endeavoured to make a settlement which * * * we believe to be urgently needed * * * for the protection and welfare of the taluqdars, raiyats and other cultivators of the soil, whose interests we then undertook to guard and have to our shame, too long neglected." (Selections from papers relating to the Bengal Tenancy Act, 1885, pp 140-141.)

এই সমস্ত থেকে বেশ স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে প্রজার হিত সাধনে গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছা আছে, কিন্তু ব্যবস্থাপক সভায় জমিদারের পক্ষ সমর্থন করতে অনেক প্রভাবশালী লোক আছেন, আর

দরিদ্র অসহায় প্রজার পক্ষ সমর্থন করতে কেউ নেই। কাজেই ব্যবস্থাপক সভার আইন কানুনে প্রজার বিশেষ কোনো উপকার হয় নি। তার দুরবস্থা যেমন ছিল তেমনই আছে। দেশের কৃষিকর্ম্মের বর্ত্তমান হীন অবস্থা বিবেচনা করলে, পক্ষপাতশূন্য বিচারক স্পষ্টই দেখবেন যে প্রচলিত খাজনার হার উৎপন্ন শস্যের মূল্যের তুলনায় অত্যন্ত অধিক এবং তার আদায়ের প্রণালী অত্যন্ত প্রজারক্তশোষক। ১৮৮০ সালে দুর্ভিক্ষ কমিশনকে দেখান হয়েছিল যে, এ দেশের কোনো কোনো তালুকের খাজনা উৎপন্ন শস্যের মূল্যের শতকরা ৩১ অংশ। ১৯০০ সালে ভারত সচিবের কাছে একটা দরখাস্ত করা হয়েছিল। তাতে দেখান হয়েছিল যে বোম্বাই ও মান্দ্রাজ প্রদেশে চাষের খরচ-খরচা বাদে উৎপন্ন শস্যের মূল্যের যা বাঁচে কৃষককে কোনো কোনো স্থলে তার অর্দ্ধেকেরও বেশি খাজনা দিতে হয়। সেই জন্য সেই দরখাস্তে প্রার্থনা করা হয়েছিল যে, খাজনাটা যেন উৎপন্ন শস্যের মূল্যের অর্দ্ধেকের বেশি না হয়। প্রার্থনা মঞ্জুর হয় নি।

স-আবওয়াব খাজনার এই গুরুভার অনেক কৃষকের পক্ষে অসহনীয় হয়ে পড়েছে। বাকী খাজনার মোকদ্দমার সংখ্যা ক্রমে বাড়ছে এবং তার ডিক্রীর দায়ে অনেক কৃষকের জোত জমা বিক্রী হয়ে যাচ্ছে এবং তারা দিনমজুরী করতে বাধ্য হচ্ছে! সেন্সাস রিপোর্টে দেখা যায় এইরূপ দিন-মজুরের সংখ্যা—

১৮৯১ সালে ছিল	১,৮৬,৭৩,২০৬
১৯০১	৩,৩৫,২২,৬৮১
১৯১১ — ...	৪,১২,৪৬,৩৩৫

খাজনা-আইনের প্রত্যক্ষ ফল এমন আর কোথাও দেখা যায় না। গবর্ণমেণ্ট ত আবশ্যক অনাবশ্যক অসংখ্য বিষয়ে কমিশন নিযুক্ত করছেন, কিন্তু দরিদ্র প্রজার শোচনীয় দুরবস্থার হেতু ও প্রতিকার নির্ণয় করতে একটা কমিশন নিযুক্ত করেন না কেন? বিষয়টা যে অনুসন্ধানের যোগ্য তা বোধ হয় কাউকে বুঝিয়ে দিতে হবে না। গবর্ণমেণ্টের কাছে অনেকবার প্রার্থনা করা হয়েছে যে, হতভাগ্য প্রজার অবস্থাটা একবার তদন্ত করে দেখুন, কিন্তু সে প্রার্থনা গবর্ণমেণ্ট কখনো মঞ্জুর করেন নি। দুঃখে ও নৈরাশ্যে ডি, ই, ওয়াচা বলেন "It is a matter of profound regret to have to say that every laudable and reasonable appeal made to the Government here or at home to have once for all an independent and exhaustive inquiry into the condition of the wretched ryot has been uniformly refused" (Indian Journal of Economics, Vol. 1, No. 1.)

এই ত গেল খাজনার কথা, জমির কথাও সংক্ষেপে একটু বলি। জমি মানে যে কেবল চাষের জমি বা বাসের জমি বা বাগান-পুকুর করবার জমি তা নয়, তা আর বুঝিয়ে দিতে হবে না। জমি সংজ্ঞার ভিতর এ সকল ত আছেই, আরও আছে নদী, নালা, খাল, বিল, পাহাড়, পর্ব্বত, বন, খনি প্রভৃতি। আগে এ সকলে প্রজার অধিকার অব্যাহত ছিল। প্রজা প্রাকৃতিক জলাশয়ে অবাধে মাছ ধরত, বনের ফল খেত, বন থেকে জ্বালানী কাঠ আনত, বনে গোরু চরাত, পাহাড়-পর্ব্বত থেকে ঘর তৈয়ের করতে পাথর নিত, খনি থেকে যথাসাধ্য খনিজ নিত। সেকালের বিধি ছিল গ্রামের চার দিকে চারশ' হাত

জমি, অথবা তিন বারে লাঠি ছুড়ে যতদূর ফেলা যায় ততদূর পর্য্যন্ত জমি, পশুচারণের জন্য রাখতে হবে। নগরের চার দিকে এর তিন গুণ।

"ধনুঃ শতং পরীহারো গ্রামস্য স্যাৎ সমন্ততঃ
শম্যাপাতাস্ত্রয়ো বাপি ত্রিগুণো নগরস্য তু ॥"

(মনু ৮। ২৩৭)

আমাদের হিন্দু জমিদারগণ যাঁরা মুখুয্যে মহাশয়ের ছেলের সঙ্গে সান্ন্যাল মহাশয়ের কন্যার বিবাহ এবং আগ্রার লালাজীর পুত্রের সঙ্গে ঢাকার মিত্র মহাশয়ের কন্যার বিবাহকে "অসবর্ণ" বিবাহ-পর্য্যায়ে ফেলে, অসবর্ণ-বিবাহের বিরুদ্ধে বচনামৃত উদ্ধার করবার জন্য শাস্ত্র-সমুদ্র মন্থন করছেন, একবার মনুর এই আদেশটা শিরোধার্য্য করে, তাঁদের জমিদারীভুক্ত প্রত্যেক গ্রামের চার দিকে এই রকম গোচারণ রাখবার ব্যবস্থা করুন না ?

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে গ্রামের সীমা নির্দ্দেশ করা হয় নি, জরিপও হয় নি। সুতরাং গ্রামস্থ এবং গ্রামের নিকটস্থ প্রাকৃতিক জলাশয়, বন প্রভৃতি জমিদারীভুক্ত করে নিতে জমিদার কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করলেন না। প্রজা এখন গোরু চরাবার স্থান পায় না। গ্রামের গো-চর জমি ত সব আবাদ হয়ে গিয়েছে, বনের গো-চরের জন্য কর দিতে হয়। আর গোচর জমির অভাবজনিত ঘাসের অভাবে গাই আর তেমন দুধ দেয় না। শিশুগুলি "গোয়ালিনী মার্কা" বিশুদ্ধ (?) দুধ খেয়ে যকৃৎ বাড়াচ্ছে আর শিশুদের পিতারা ঘিয়ের ছদ্মবেশে সেই নামে যে জিনিষটি বাজারে বিক্রী হয় তাই খেয়ে অজীর্ণ রোগ বাড়াচ্ছেন। জ্বালানী কাঠ ত পাওয়াই যায় না, যেখানে বন আছে

সেখানে মূল্য দিয়ে জমিদারের কাছে কিনতে হয়। প্রজা কাঠের অভাবে গো-চর জ্বালিয়ে তার জমিকে সারশূন্য করে ফেলছে। আর যেহেতু প্রজার "বৃক্ষ রোপন" করবার অধিকার আছে কিন্তু "ছেদন" করবার অধিকার নাই, সেই হেতু প্রজার নিজের আজ্জানো গাছটি মরে গেলে, গাছের মৃত্যু সংবাদটি জমিদারকে দিয়ে, মৃতগাছটি তাঁর বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে আসতে হয়। যে সকল প্রাকৃতিক জলাশয়ে মাছ ধরবার অধিকার প্রজার চিরকাল ছিল, এখন জমিদার তা উচ্চ মূল্যে বিক্রী করে, প্রজাকে নিরামিষ ভোজনের শ্রেষ্ঠত্ব শিক্ষা দিচ্ছেন। এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট জ্ঞানত বা অজ্ঞানত জমিদারকে একটু বিশেষ ভাবে সাহায্য করেছেন। নদীয়া জেলায় একটা বিলে প্রজারা একবার মাছ ধরে। জমিদার তাদের বিরুদ্ধে মাছ চুরির মোকদ্দমা করেন। বিচারের সময় প্রজারা বলে যে মাছগুলো সেই বিলে আপনা আপনি অন্য জলাশয় থেকে আসে এবং আপনা আপনি সেখান থেকে চলে যায়, অর্থাৎ—মাছগুলো স্বাভাবিক সচ্ছন্দচারী, *ferae naturae* কারো অধিকারভুক্ত নয়, তাদের সরালে চুরির অপরাধ হয় না। বিচারক সে কথা শুনলেন না, তাদের চোর সাব্যস্ত করে বেত মেরে ছেড়ে দিলেন। আপীলে জজেরা বললেন ও-টা চুরি নয়। এ নিয়ে একটা আন্দোলন হল, ফল হল মাছমারার আইন—Private Fisheries Act. এই রকম করে প্রজা তার চিরন্তন স্বত্বাধিকার থেকে বঞ্চিত হল, আর জমিদার জলকরের অধিকারটি পেয়ে ধন বৃদ্ধি করতে লাগলেন। এইরূপে এক একটি করে প্রজার অনেক অধিকার লোপ পেয়েছে।

এখন এই লুপ্ত অধিকারগুলি প্রজাকে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যর্পন করতে

হবে। লর্ড লরেন্সের ভাষায় তাকে স্বাধীন করে দিতে হবে, নামে মাত্র নয়, কাজে। আর অত্যাচার থেকে তাকে রক্ষা করতে হবে। এর জন্য যে বিধি-ব্যবস্থা আবশ্যক তা করতে হবে, অর্থাৎ—"pass a law which should thoroughly protect the raiyat and make him what he is now only in name, a free man." কৃষিবলই দেশের বল, একথা গবর্ণমেণ্ট, জমিদার, প্রজা সকলকেই স্মরণ রাখতে হবে।

শ্রীহৃষীকেশ সেন

বৈশ্য।

——:*:——

মনু উপদেশ করেছেন, শূদ্র সমর্থ হলেও ধনসঞ্চয় করবে না। কেননা বহুধনের গর্ব্বে সে হয় ত ব্রাহ্মণকেও পীড়া দিতে আরম্ভ করবে। অথচ এই ভৃগুসংহিতা যে-সমাজের ধর্ম্মশাস্ত্র তার ধনসৃষ্টি ও ধনসঞ্চয়ের কাজটি ছিল বৈশ্যের হাতে। এ বর্ণটি সম্বন্ধে যে শাস্ত্রকারের এমন আশঙ্কা হয় নি, সম্ভব তার কারণ বৈশ্য ছিল আর্য্যসভ্যতার ভিতরের লোক—দ্বিজ। শাস্ত্রের শাসন ছাড়াও তার মনে এই সভ্যতার বাঁধন ছিল, যার টানে কেবল ধনের জোরে বিদ্যা ও বুদ্ধিকে ছাড়িয়ে চলার কল্পনা তার পক্ষে অসম্ভব ছিল।

বিংশ শতাব্দীর বৈশ্যের অবশ্য কোনও ধর্ম্মশাস্ত্রের বালাই নেই; সভ্যতার বাঁধনকেও সে একরকম কাটিয়ে উঠেছে। কেননা বৈশ্য আজ সভ্যতার মাথায় চড়ে' ব্রাহ্মণকে ডেকে বলছে, তোমার কাজ হ'ল আমার কারখানার কল-কব্জা গড়া, কাঁচা মালকে কেমন করে' সস্তায় ও সহজে তৈরী মাল করা যায় তার ফন্দী বাৎলান; না হয় আমার খবরের কাগজে আমার মতলবমত প্রবন্ধ জোগান। শূদ্রকে বলছে, এস বাবু তোমার স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে, লেগে যাও আমার কলের কাজে; পেট-ভাতার অভাব হবে না। আর জেনো এই হচ্ছে সভ্যতা, এতে অসূয়া করা মানে দেশদ্রোহ, একেবারে সমাজের ভিত ধরে' নাড়া দেওয়া। ক্ষত্রিয়কে বলছে, হুসিয়ার থেকো যেন এই যে ব্রাহ্মণ-শূদ্রের

তৈরী আমার কলের মাল দিকে দিকে ছুটল, জলে স্থলে এর গতিকে অবাধ রাখতে হবে, তোমার কামান, বন্দুক, জাহাজ, এরোপ্লেন যেন ঠিক থাকে। বিদেশের বৈশ্য যদি এই বণিকপথের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে নিজে গুঁড়ো হয়ে তাকে গুঁড়ো করতে হবে। তাতে দেশের জন্য প্রাণ দিয়ে তোমারও অক্ষয় কীর্ত্তিলাভ হবে, আমারও গোলাগুলি, রসদ, হাতিয়ারের কারখানার মুনাফা বেড়ে যাবে। আর ঘরেও তোমার কাজের একেবারে অভাব নেই। আমার কলের মজুরেরা অতিরিক্ত বেয়াড়া হয়ে উঠলে তাদের উপর গুলি চালাতেও মাসে মাসে তোমার ডাক পড়বে।

এই যে বৈশ্যপ্রভুর ব্যবস্থা, যার বর্ণ ধর্ম্ম কথনের প্রথম কথা হচ্ছে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, শূদ্র এই তিন বর্ণের এক ধর্ম্ম, চতুর্থ বর্ণ বৈশ্যের শুশ্রূষা, এরি নাম 'ক্যাপিটালিজ্‌ম্' বা মহাজন-তন্ত্র। এর নাগপাশ গত একশ' বছর ধরে' ইউরোপীয় সভ্যতার প্রতি অঙ্গে পাকে পাকে নিজেকে জড়িয়ে এসেছে এবং আজ তার চাপে সে সভ্যতার দম বন্ধ হবার উপক্রম। গত যুদ্ধের কামানের শব্দে ট্রেঞ্চের মধ্যে জেগে উঠে ইউরোপের সভ্যতা এ বজ্রবাঁধন থেকে নিজেকে মুক্ত করবার যে ব্যাকুল চেষ্টা করছে তারি নাম কোনও দেশে 'সোভিয়েট্', কোনও দেশে 'ন্যাশনেলিজেশন্'।

(২)

আধুনিক ইউরোপের সমাজ-ব্যবস্থায় যে করে' বৈশ্য-প্রভুত্বের প্রতিষ্ঠা হয়েছে তার ইতিহাস বিস্ময়কর কিন্তু জটিল নয়। এর মূল ভিত্তি হ'ল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে ইউরোপীয় জাতিগুলির

মধ্যে জড়-বিজ্ঞানের আশ্চর্য্য উন্নতি, প্রকৃতির সকল চেষ্টার শক্তি ও নিয়মের জ্ঞানের অচিন্তিতপূর্ব্ব প্রসার, এবং সে জ্ঞানকে মানুষের ঘরকন্নার কাজে লাগাবার চেষ্টার অপূর্ব্ব সাফল্য। এর ফলে ইউ-রোপীয় সভ্যতার স্থূলদেহ উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যে দেখতে দেখতে একেবারে নব কলেবর নিয়েছে। সে চেহারা ইউরোপের ও ইউরোপের বাইরের পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের সমস্ত সভ্যতার চেহারা থেকে একেবারে ভিন্ন রকমের। বাষ্প আর বিদ্যুৎ এই দুই শক্তিকে লোহার বাঁধনে বেঁধে ইউরোপ যে শিল্প, কারু, কৃষি, বার্ত্তা, ব্যবসা, বাণিজ্য গড়ে তুলেছে তার কাজের ভঙ্গী ও সামর্থ্যের সঙ্গে কোনও যুগের কোনও সভ্যতার সে দিক দিয়ে তুলনা করাই চলে না। যেমন ফরাসি অধ্যাপক সেনোবো লিখেছেন এ দিকে অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপের সঙ্গে আজকার ইউরোপের যে তফাৎ, অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপের সঙ্গে প্রাচীন মিশরের তফাৎ তার চেয়ে অনেক কম। বলা বাহুল্য এ তফাৎ কল কারখানা, রেল ষ্টীমার, টেলিগ্রাফ টেলিফোনে মূর্ত্তিমান হয়ে রয়েছে। এবং আশা করা যায় অল্পদিনেই মোটর, এরোপ্লেন সে মূর্ত্তির অদল-বদল ঘটিয়ে এ তফাৎকে আরও বাড়িয়ে তুলবে। কিন্তু এই যে ইউরোপ কারখানায় কলে শিল্পসামগ্রী তৈরী করছে, রেলে ষ্টীমারে তার পণ্য পৃথিবীময় ছড়িয়ে দিচ্ছে, টেলিগ্রাফ টেলিফোনে দাম দস্তুর বেচা কেনা চালাচ্ছে এর ভিতরের লক্ষ্য কিছুই নূতন নয়। সেটি অতি প্রাচীন, মানুষের সভ্যতার সঙ্গে একবয়সী। সে লক্ষ্য হ'ল কি করে মানুষের জীবনধারণের ও সে জীবনের শোভা সম্পদ বিধানের সামগ্রীগুলিকে যথেষ্ট পরিমাণে জোগান দেওয়া যায়। পশুপালন, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য সবই এই প্রশ্নেরই উত্তর। কেবল উনবিংশ ও

বিংশ শতাব্দীর ইউরোপ তার শিল্প-বাণিজ্যের কৌশলে ও ব্যবস্থায় এ সমস্যার যে সমাধান করেছে, জিনিষের জোগানহিসাবে তা তুলনা রহিত। যা মানুষের অসাধ্য ছিল তা সুসাধ্য হয়েছে ; যা বহুদিন, বহুজন ও বহু আয়াস সাধ্য ছিল সামান্য লোকের নামমাত্র পরিশ্রমে তা মুহূর্ত্তের মধ্যে সাধিত হচ্ছে। বিশেষজ্ঞেরা হিসাব করেছেন, আজ কলের তাঁতে একজনে যে কাপড় বোনে সেটা হাতের তাঁতের ত্রিশজন তাঁতির কাজ ; হাতের চরকার এগার'শ' জনের সুতো আজ কলের চরকায় একজন কেটে নামাচ্ছে।

কিন্তু এ নব শিল্প-বাণিজ্যের এই যে অদ্ভুত কর্ম্মসামর্থ্য, একে চালনা করতে হলে গুটিকতক উপায় অপরিহার্য্য। তার মধ্যে প্রধান হ'ল বিপুল আয়তনের উপাদানকে একই জায়গায় একসঙ্গে বিপুল পরিমাণ শিল্প-সামগ্রীতে পরিণত করা এবং তার জন্যে চাই বহু লোককে একত্র জড় করে' তাদের নানা রকম মজুরীর সাহায্য। আধুনিক কলের দৈত্য উপকথার দৈত্যের মতই নিমেষে পর্ব্বত প্রমাণ কাজ করে ওঠে, কিন্তু সত্যিকার দৈত্য হওয়াতে সে চায় কাজের পরিমাণ, মালের জোগান, আর মানুষের হাতের সাহায্য। সুতরাং শিল্প-বাণিজ্যের এই নূতন কৌশলকে কাজে লাগাতে হ'লে চাই দেশ বিদেশ থেকে কাঁচা মাল সংগ্রহ করে' জমা করা, কল গড়ে' কারখানা বসান, আর সে কল-কারখানা চালাবার জন্য নানারকম বহু মজুর একত্র করা। এবং এ-সবারই জন্য চাই টাকা, অর্থাৎ—পূর্ব্বসঞ্চিত ধন। যাতে মাল কেনা চলবে, কল কারখানা তৈরী হবে, মজুরের মজুরী যোগাবে। এবং সে টাকা অল্পস্বল্প হলে চলবে না, একসঙ্গে চাই বহু টাকা। কেননা এ ব্যাপারের মূল কথাই হচ্ছে, যা পূর্ব্বে নানালোকে নানা

জায়গাতে অল্পেস্বল্পে এবং অল্পস্বল্প তৈরী করত, তাই করতে হবে এক জায়গায়, এক তত্ত্বাবধানে, বিদ্যুৎগতিতে আর হাজার গুণ বেশি পরিমাণে। ফলে ইউরোপ জুড়ে কল কারখানা তারাই বসিয়েছে হাতে যাদের ছিল জমান-টাকা এবং কলের চাকার পাকে পাকে নামতার আর্য্যার মত সে টাকা বেড়ে উঠেছে। আর টাকা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কলও বেড়েছে কারখানাও বড় হয়েছে। অর্থাৎ—টাকার অঙ্কটা আরও বেড়ে চলেছে। আর এও অতি স্পষ্ট যে এই কলের তৈরী মালের রাশিকে দেশ বিদেশে কাটাতে হলে চাই বড় মূলধনী ব্যবসায়ী, যারা একদমে একে নিঃশেষ করে' কিনে নিতে পারবে। ছোট ছোট ব্যবসায়ীর হাত দিয়ে ধীরে সুস্থে এ মাল কাটানোর চেষ্টা করা এসব কারখানার মালিকদের পক্ষে একেবারেই সম্ভব নয়। এমনি করে আজকার ইউরোপের সে বিরাট ধনসম্পদ তার একটা প্রকাণ্ড অংশ এসে জমেছে সংখ্যায় অতি অল্প একটি শ্রেণীবিশেষের হাতে—যারা কারখানার মালিক বা সেই কারখানার মালের ব্যবসায়ী। হিসাবে দেখা গেছে যে আমেরিকার যুক্তরাজ্যে (যা ইউরোপের একখণ্ড 'ছিট' মাত্র) দেশের সমুদয় ধনের এক পঞ্চমাংশেরও বেশি রয়েছে লোক সংখ্যার ত্রিশ হাজার ভাগের এক ভাগের হাতে। ধনের গৌরব সব দেশে, সব কালেই ছিল ও থাকবে। সুতরাং এই অতিধনী বৈশ্য শ্রেণীটি যে ইউরোপের সমাজ ও রাষ্ট্রে প্রতিপত্তিশালী হবে এতে আশ্চর্য্যের কিছুই নেই।

(৩)

কিন্তু এই মহাজন সম্প্রদায়টির ইউরোপে যা প্রভাব ও প্রতিপত্তি-মাত্র, ধন গৌরবের উপর তার সামান্য অংশই নির্ভর করছে। বার

টাকা নেই সে যার টাকা আছে তাকে দূরে থেকেই নমস্কার করতে পারে যদি না জীবিকার জন্য তার দরজায় দাঁড়াতে হয়। এই জন্য ইউরোপের পক্ষে তার মহাজন শ্রেণীটিকে কেবল টাকার খাতির দিয়ে দূরে রাখা সম্ভব নয়। কেননা এই শ্রেণীটিই হয়ে দাঁড়িয়েছে ইউরোপের অন্নদাতা। আর তা দু'রকমে। নূতন শিল্প-ব্যবস্থায় দেশ জুড়ে ধনসৃষ্টির যে সব ছোট খাট ব্যবস্থা ছিল তা লোপ পেয়েছে। একমাত্র কৃষি ছাড়া ইউরোপর সমস্ত ধন প্রকৃতপক্ষে উৎপন্ন হচ্ছে এই মহাজনদের বড় বড় কারখানায়। এবং কৃষি জিনিষটিও আজ ইউরোপের চোখে অতি অপ্রধান শিল্প। কারণ পশ্চিম ইউরোপ আবিষ্কার করেছে নিজের অন্ন দেশে জন্মানোর চাইতে কলের তৈরী শিল্প-সামগ্রী দিয়ে বিদেশ থেকে তা কিনে আনাই তার পক্ষে বেশি সহজ ও সুবিধার। এবং সে শিল্পের জন্য যে কৃষিলভ্য কাঁচা মালের দরকার তার সম্বন্ধেও সেই কথা। ফলে পশ্চিম ইউরোপের অধিকাংশ লোকের জীবিকার উপায় হচ্ছে মহাজনদের এই বড় বড় কারখানাগুলিতে ও তাদের আফিসে হাতে বা কলমে মজুরীগিরি করা। অর্থাৎ—এই মহা শ্রেষ্ঠি সম্প্রদায়টি সাক্ষাৎসম্বন্ধেই এদের মনিব ও অন্নদাতা। আর পরোক্ষে ইউরোপের সবারই অন্নবস্ত্র এরাই যোগাচ্ছে। জীবনযাত্রার যা-কিছু উপকরণ তা হয় আসছে এদের কারখানা থেকে, নয় ত এদেরি কারখানার কলে তৈরী-মালের বিনিময়ে। যাদের হাতে জীবন-মরণের কাঠি রয়েছে তারা যে সর্ব্বময় হয়ে উঠবে এতে আর বিস্ময় কি।

কিন্তু এ বৈশ্য-প্রভুত্বের সবচেয়ে যা প্রধান কথা তা এই, আধুনিক যুগের নূতন ব্যবস্থায় এই যে সব অতিকায় শিল্প-বাণিজ্যের

প্রতিষ্ঠান মহাজনদের মূলধনে ও চেষ্টায় গ'ড়ে উঠেছে এগুলি যত লোকের অন্ন যোগাচ্ছে এর পূর্ব্বে ইউরোপের পক্ষে তা অসাধ্য ছিল। আর অন্ন বাড়লে যে জীবও বাড়ে এটা প্রাণ-বিদ্যার একবারে প্রথম-ভাগের কথা। ফলে গেল-এক'শ বছরের মধ্যে ইউরোপের লোক-সংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে। এবং এখন এ বিরাট জনসঙ্ঘের জীবিকা যোগাতে হ'লে ইউরোপের আধুনিক শিল্প-বাণিজ্যের চাকা একদিনও অচল হলে চলবে না। এর আয়তন যদি একটু খাটো কি বেশ একটুকু মন্দা হয় তবে ইউরোপ তার সমস্ত লোকের মুখে আর অন্ন দিতে পারবে না। উনবিংশ শতাব্দীর শিল্প-বাণিজ্যে ইউরোপে যে লোক বেড়েছে, বিংশ শতাব্দীতে তাদের বাঁচিয়ে রাখতে হ'লে সেই শিল্প-বাণিজ্য ছাড়া আর গতি নেই, এ যে কত সত্য জর্ম্মাণযুদ্ধের এক আঁচড়েইত তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যুদ্ধের ধাক্কায় এ শিল্প-বাণিজ্যের কল যেই একটু বিকল হয়েছে অমনি ইউরোপ জুড়ে কলরব ; ইংলণ্ডে চিনি নেই, ফ্রান্সে কয়লা নেই, জর্ম্মাণিতে চর্ব্বির জন্য হাহাকার, অষ্ট্রিয়ায় দুধ না পেয়ে শিশু মরছে। আর একথা আরও স্পষ্ট হয়েছে, গেল-যুদ্ধের ফলে মূলধনী মহাজনদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের রকম-সকমে। রুষিয়ার বলসেভিক, কি জর্ম্মাণীর সোস্যালিস্ট,কি ইংলণ্ডের ন্যাশনালিজেশন্ পন্থী এমন কথা কারও মুখে ওঠে নি যে, এই যে আধুনিক ইউরোপের দৈত্যাকৃতি সব শিল্প-বাণিজ্য, যা কলের ও কাজের চাপে মানুষকে পিষে ফেলছে, একে ভাঙা দরকার। কেননা ইউরোপ মর্ম্মে মর্ম্মে জানে যে, এই শিল্প-বাণি-জ্যই তার প্রাণ। একে মারতে গেলে মরতে হবে। তাই এখন সবারই লক্ষ্য কি করে' এই শিল্প-বাণিজ্যকেই বহাল ও সচল রাখা চলে, কিন্তু তার বর্ত্তমান মালিক মহাজনদের ছেটে ফেলা যায়। এ চেষ্টা

সফল হবে কিনা তা ইউরোপের ভাগ্যবিধাতাই জানেন। কিন্তু যতদিন না হবে, ততদিন বৈশ্য ইউরোপীয়-সমাজ ও রাষ্ট্রের মাথায় চড়েই থাকবে। কেননা ইউরোপের মুখের অন্ন তার হাতের মুঠোয়।

(৪)

বলা বাহুল্য ইউরোপের বৈশ্য-প্রভুত্বের বেগ কেবল ইউরোপ বা ইউরোপীয়ান জাতিগুলির মধ্যেই আবদ্ধ নেই; পৃথিবীময় সে নিজেকে জানান দিচ্ছে। কেননা ইউরোপ আজ সমস্ত পৃথিবীর প্রভু। এবং স্বভাবতই এ প্রভুত্বের প্রয়োগ হচ্ছে ইউরোপের প্রভু বৈশ্যের মারফত, তারই সুবিধা ও প্রয়োজন মত। ইউরোপের বিজ্ঞান আজ বাহুবলে ইউরোপকে অজেয় ও দুর্নিবার করেছে। এবং সমস্ত পৃথিবী প্রত্যক্ষে বা প্রকৃতপক্ষে ইউরোপের জিত রাজ্য। কিন্তু এ জয় অশ্বমেধের রাজচক্রবর্ত্তীর জয় নয়। যুদ্ধের উল্লাস কি জয়ের গৌরব এর লক্ষ্য নয়। এর উদ্দেশ্য হ'ল জিত দেশ ও পরাজিত জাতিকে ইউরোপের কারখানার কলের চাকায় জুড়ে দেওয়া। যে শিল্প-বাণিজ্য ইউরোপকে অন্নবস্ত্র দিচ্ছে ইউরোপের বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে যোগ তার চাই-ই চাই। সেখানকার মাটীর রস টেনেই ওরা বেঁচে রয়েছে। যে কাঁচা মাল কলে-তৈরী শিল্পে পরিণত হবে, তা প্রধানত আসছে ইউরোপের বাইরে অন্‌ইউরোপীয়ান লোকদের দেশ থেকে। জীবনযাত্রার যে সব উপকরণ, বিশেষ করে' খাদ্য, যা ইউরোপের মাটীতে জন্মে না বা কলে গড়া চলে না, তাও বেশির ভাগ আনতে হবে ওখান থেকেই, অবশ্য এ দুই জিনিষ ইউরোপ গায়ের জোরে কেড়ে নিতে চায় না। তার কারখানার তৈরী-শিল্পের জন্যেই কিনতে চায়। কিন্তু এদের

জোগান যাতে অব্যাহত, আর পরিমাণ যাতে প্রয়োজনমত হয় সে ব্যবস্থা তাকে করতেই হবে। কেননা কারখানার কল একদিনও বসে থাকলে চলবে না। সুতরাং এসব গরম দেশের অলস লোকেরা যদি নিজের ইচ্ছায়, অথবা লাভের লোভে এসব জিনিষ যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন করে' সুবিধার দরে জোগান দিতে না চায় তখন ইউরোপকে বাধ্য হয়েই হাতে চাবুক নিতে হয়, সঙ্গিনের খোঁচায় এদের কাজের ইচ্ছাকে চাগিয়ে রাখতে হয়। এমন কি দু'চারজনার হাত পা' কেটে দিয়ে তাদের বাকী সঙ্গীদের হাত পা'গুলো যাতে কলের চাকার বেগের সঙ্গে তাল রাখতে উৎসাহী হয় সে চেষ্টা থেকেও পশ্চাৎপদ হ'লে চলে না। জর্ম্মাণ অধ্যাপক নিকলাই তাঁর 'যুদ্ধ ও জীবতত্ত্ব' নামের পুঁথিতে লিখেছেন যে, পৃথিবীর পঞ্চাশ কোটী ইউরোপীয়ান ও ইউরোপ থেকে ছড়িয়ে-পড়া শ্বেত মানুষের হাতে এখনি এমন যন্ত্রপাতি আছে যে, আসছে-বিশ বছরের মধ্যে তারা পৃথিবীর একশ' কোটী নানা জাতির অ-শ্বেত মানুষদের একেবারে নির্ম্মূল করে' উচ্ছেদ করতে পারে। এবং ফলে সমস্ত পৃথিবীটা কেবলমাত্র, অন্তত নিজেদের চোখে, উন্নততর শ্বেত জাতিদেরই বাসস্থল হয়। এ বিশ বছরের পরে, অর্থাৎ—যখন চীন তার সমস্ত লোককে আধুনিক অস্ত্র ও যুদ্ধ-বিদ্যায় শিক্ষিত করে' তুলবে, এবং নিজের 'ড্রেডনট' ও কামান গোলা নিজেই তৈরী করতে সুরু করবে, যেমন এখন জাপান করছে, হয়ত এ আর সম্ভব হবে না। কিন্তু ইউরোপ যে একাজে হাত দেবে না তা নিশ্চয়, কেননা ব্যাপারটা এমন ভয়ানক যে কল্পনায় তাকে ফুটিয়ে তুললেই পিছিয়ে আসতে হয়। এবং অধ্যাপক নিকলাই-এর মতে এ জেহাদপ্রচার করা মানে স্বীকার করা যে প্রকৃত জীবনযুদ্ধে,

যেখানে জয়ী হ'তে হয় পরকে মারার শক্তিতে নয়, নিজের বাঁচার শক্তিতে, শ্বেতের চেয়ে অ-শ্বেত শ্রেষ্ঠ। সুদূর ও সূক্ষ্ম তত্ত্বের আলোচনায় এখানে একটা হাতের কাছের মোটাকথা চোখ এড়িয়ে গেছে, ইউরোপ যদি আসছে-বিশ বছরের মধ্যে পৃথিবীর সব অ-শ্বেত জাতি-গুলিকে উচ্ছেদ করতে সমর্থ হয় তবে তার পরের দশ বছরের মধ্যে ইউরোপ আর বর্ত্তমান থাকবে না। তার কল-কারখানার বেশির ভাগই অচল হবে। তার শিল্প-বাণিজ্য সমাজ-রাষ্ট্র সব ব্যবস্থারই মূলে টান পড়বে। কারণ পৃথিবী জুড়ে শস্যক্ষেত্রে, মাঠে, অরণ্যে যে সব কৃষ্ণ, তাম্র, পীত হাত-দ্রব্যসম্ভার জুগিয়ে ইউরোপের সভ্যতার স্থূল শরীরকে স্থূলতর করে তুলছে তার সবগুলিকে যদি শাদা হাত দিয়ে বদল করতে হয় তবে কারখানার কলে দেবার মত হাত ইউরোপে আর বেশি অবশিষ্ট থাকে না। ইউরোপের লোকসংখ্যার ইউরোপে বসে' অন্নসংস্থান অসম্ভব হয়। যে সব ভিত্তির উপর ইউরোপের বর্ত্তমান সভ্যতা দাঁড়িয়ে আছে তার মধ্যে একটা প্রধান হ'ল অন্-ইউ-রোপীয়ান ও অ-শ্বেত লোকদের পরিশ্রমের ফল সহজে ও স্বল্প মূল্যে পাওয়া। প্রাচীন গ্রীক-রোমান পণ্ডিতেরা দাসের শ্রম বাদ দিয়ে নিজেদের সভ্যতার অস্তিত্ব কল্পনা করতে পারতেন না। আধুনিক ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা যে পারেন তার কারণ নামরূপের বদল ঘটালে জানা-জিনিষ চিনতে পণ্ডিতেরও কষ্ট হয়; আর মনে যা ওঠে তা স্পষ্ট করে' খুলে বলার অভ্যাস প্রাচীন পণ্ডিতদের যত ছিল আধুনিক পণ্ডিতদের তা নেই।

ইউরোপের বৈশ্য-প্রভুত্বের খোঁচা এমনি করে' ইউরোপের বাইরে তাম্র কালো পীত সব রং-এর লোকের গায়ে এসেই বিঁধছে। ইউ-

রোপের বৈশ্য চায় এরা নিরলস হয়ে তার কারখানার কাজের উপাদান আর মজুরের খাদ্য যোগায়। কিন্তু এ ছাড়া এর আরও একটা দিক আছে। ইউরোপ যেমন এদের কর্ম্মশীলতা চায় তেমনি সঙ্গে সঙ্গে চায় এ কর্ম্মক্ষমতা সীমা ছাড়িয়ে না ওঠে এবং বিপথে না চলে। শিল্পের উপাদান যোগান এবং কৃষি পশু থেকে খাদ্য উৎপাদন, এতেই নিঃশেষ না হয়ে যদি এদের শক্তি ও বুদ্ধি নব শিল্পের নূতন বিদ্যা শিখে উপাদানকে শিল্পদ্রব্যে পরিণত করার দিকে চলে সেটা ইউ-রোপের চোখে অমঙ্গল। কেননা ইউরোপের আধুনিক শিল্প-বাণিজ্যের মোটকথা বাকী পৃথিবী উপাদান ও খাদ্য যোগাবে, আর ইউরোপ ঐ উপাদান থেকে তৈরী-শিল্পদ্রব্যের এক অংশ বিনিময়ে ফিরিয়ে দেবে। যদি এ ব্যবস্থা উল্টে গিয়ে খাদ্য ও শিল্পসামগ্রী দুই-ই বাইরে থেকে ইউরোপের দরজায় উপস্থিত হয় তবে বদল দিয়ে এদের ঘরে নেবার মত জিনিষ ইউরোপের বড় বেশি থাকবে না। কেননা ইউ-রোপ যে শিল্প-বাণিজ্যে আর সবাইকে ছাড়িয়ে গেছে সে তার দেশের প্রকৃতির গুণে নয়, লোকের প্রকৃতির গুণে। কিন্তু এ কথা যেমন গৌরবের তেমনি আশঙ্কার। যে সব দেশে প্রকৃতি ইউরোপের চেয়ে অকৃপণা, সে দেশের লোকের মনের পঙ্গুত্ব ও শক্তির খর্ব্বতার উপর এ শ্রেষ্ঠত্ব টিকে আছে। মন সচল হ'লে যে ইউরোপের শিল্প-বাণিজ্যের নূতন কৌশল শিখে শক্তিসঞ্চয়ে দেরী হয় না তার পরিচয় জাপান দিয়েছে। এবং যেখানেই এ পরিচয়ের আভাস পেয়েছে, ইউরোপ তার নাম দিয়েছে 'আতঙ্ক'। কারণ ইউরোপের বিশ্ব-প্রেমিকেরা যা-ই বলুন না, ধন ও শক্তিতে ইউরোপ এখন যেমন আছে তেমনি থাকবে। আবার বাকী পৃথিবীটাও ধনী ও শক্তিশালী

হয়ে উঠবে, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের বর্ত্তমান অবস্থায় এর কোনও সম্ভাবনা নেই। ইউরোপ প্রধান হয়েছে, আর সবাই ছোট ও খাটো আছে বলে'। সে প্রাধান্য বজায় থাকবে—আর সবাইকে ছোট খাটো করে' রাখতে পারলে।

(৫)

বৈশ্য-ইউরোপের চাপ পৃথিবীর যে সব প্রাচীন সভ্য জাতিগুলির উপর এসে পড়েছে তাদের সবারই মনে হয়েছে ওর হাত থেকে রক্ষার উপায় ঐ বৈশ্যত্বকে ধার করে' তার উপর শিল্প, বাণিজ্য, সমাজ ও রাষ্ট্র গড়া। কেননা চোখে দেখতে ইউরোপের বাহুতে বল দিচ্ছে তার সব অদ্ভুত কৌশলী কাজের সরঞ্জাম ও উপকরণের বিচিত্র বাহুল্য। আর এ সরঞ্জাম ও উপকরণ সবই যোগাচ্ছে তার বৈশ্যের কর্ম্মব্যবস্থা। প্রাচ্য দেশের মধ্যে সব চেয়ে প্রাচ্য, জাপান পাশ্চাত্যের এই কর্ম্ম-কৌশল অল্পদিনেই আয়ত্ত করেছে। এবং ফলে পশ্চিম ইউরোপের প্রবল জাতিগুলির মত ইউরোপের চোখে সেও একটা প্রধান জাতি। তারও কারখানার কলে ইউরোপের মত মজুর খাঁটিয়ে শিল্প-সামগ্রী তৈরী হচ্ছে; সেগুলো জাহাজে উঠে পৃথিবীর বাজারের মত ফাঁক জায়গা দরকারী, অদরকারী, সাচ্চা, ঝুঁটো, ভারী ও ঠুনকো মাল ভরে' দিচ্ছে, এবং সবের মাল সরিয়ে নিজের জন্য কতটা জায়গা খালি করা যায় তার চেষ্টা দেখছে। মহাজনী-জাহাজের পেছনে তারও মারোয়ারী জাহাজ সেজে রয়েছে; এবং পৃথিবীর শান্তির জন্য ইউরোপের আর পাঁচজন শান্তিপ্রয়াসীর মত সেও কামান, বন্দুক, গোলা, গুলি তৈরী করে' যাচ্ছে। বিশ্বহিতের বাণী তার মুখ থেকেও

সমান তেজে ও সমান বেগেই বেরুচ্ছে ; এবং মানবজাতির সভ্যতা রক্ষা ও বিস্তারের জন্য দুর্ব্বল জাতির সুফলা দেশের গুরুভার বহনে তার পীত-স্কন্ধের উৎসুক্য কোনও শ্বেত-স্কন্ধের চেয়ে কম নয়। বৃদ্ধ চীন ডাইনে ইউরোপ ও বাঁয়ে জাপান দু'দিক থেকে খোঁচা খেয়ে এ বৈশ্যত্বের দিকে লুব্ধনেত্রে তাকাচ্ছে। কিন্তু তার প্রাচীন সভ্যতার গভীর শিকড়, আর প্রকাণ্ড দেহের বিরাট বিপুলতা তাকে সোজা-সুজি ইউরোপের বৈশ্যত্বের পাঠশালায় ঢুকতে দিচ্ছে না। ইউরোপের নবীন বিদ্যার বেগ তার প্রাচীন সভ্যতাকে একটা নূতন সৃষ্টির পথে নিয়ে যাবে, এশিয়া সেই আশায় তাকিয়ে আছে। এবং সমস্ত বাধা কাটিয়ে পাছে চীন নিজের বৈশ্যমন্ত্রে জাপানের মতই সিদ্ধিলাভ করে সেই আতঙ্কে ইউরোপ মাঝে মাঝে চার দিক হল্‌দে দেখছে।

আমাদের ভারতবর্ষ এ বৈশ্য-তন্ত্রের খাস তালুক। কেননা এ মহাদেশ ইউরোপের সেই দেশের অধীন রাজ্য যেখানে বৈশ্য-তন্ত্রের মূর্ত্তি সবচেয়ে প্রকট, আর বৈশ্য-প্রভুত্বের মহিমা সবচেয়ে উঁচু। এবং 'কন্‌ষ্টিটিউশনাল্‌ ল'র পুঁথিতে যা-ই থাকুক আমরা সবাই জানি ব্রিটনের বৈশ্যরাজই আমাদের রাজা। স্বভাবতই প্রজার জাতির চোখে উন্নতি মানে রাজার জাতির মত হওয়া। সেই জন্য আমাদের দুঃখ দৈন্য দুর্দ্দশার কথা যখনি ভাবি তখন সহজেই মনে হয় এর প্রতিকারের উপায় ভারতবর্ষকে বিলাতের মত বড় বড় কারখানায় ভরে' ফেলা; দেশের লোককে গ্রামের মাটি থেকে উপ্‌ড়ে এনে সহরের কলে জুড়ে দেওয়া। এবং সেজন্য সর্ব্বপ্রথম দরকার সকলে মিলে বৈশ্যকে দেশের মাথায় তোলা যাতে যার-ই মগজে বুদ্ধি আর মনে উৎসাহ আছে তার দু'চোখ এদিকে পড়ে। আমাদের সরকারী

বে-সরকারী রাজপুরুষেরাও ভারতবর্ষের যে-জাতি বৈশ্যমহিমা যতটা আয়ত্ত করেছে তাকে ততটা উন্নত বলে' স্বীকার ও প্রচার করেন। এবং আমাদের বড় ছোটর প্রমাণ যে তাঁদের হাতের মাপকাঠি সে কথা বলাই বাহুল্য।

বাধ্য হয়েই স্বীকার কর্ত্তে হবে যে এ মাপে বাঙালীর উন্নতির বহর বড় বেশি নয়। আরব সমুদ্রের তীরের দুই একটি জাতির কাছে ত আমরা দাঁড়াতেই পারি নে। এমন কি যাঁরা বাঙলার বাইরে থেকে কেবল পাগ্‌ড়ী কি টুপি নিয়ে এসে বাঙলার বুকের উপর দিয়ে মোটর হাঁকাচ্ছেন, তাঁদের পাশেও আমরা নিতান্ত খাটো। আমাদের নিত্য দুঃখ-দৈন্যের চাপটা যখনি কোনও নৈমিত্তিক কারণে একটু বেড়ে ওঠে তখনি এই ব্যাপার নিয়ে আমাদের আন্দোলন, আলোচনা, ধিক্কার, অনুশোচনার সীমা থাকে না। কলেজ-ফেরত বাঙালীর ছেলে নিরক্ষর অ-বাঙালীর ব্যবসায়ে কেরাণীগিরির উমেদার, এই উদাহরণ তুলে আমরা বাঙালীর মতি গতি এবং সর্ব্বোপরি আমাদের বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার দুরবস্থা স্মরণ করে' যুগপৎ ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হয়ে উঠি। এ শিক্ষা যে কেবল ব্যর্থ নয়, উন্নতির পথে পায়েশিকল তাতে আর সন্দেহ থাকে না। কেননা অশিক্ষিত বাঙালীর চেয়ে যে নিরক্ষর দীল্লিওয়ালা শ্রেষ্ঠ এর পরিচয় ত একের মোটরকার ও অন্যের ছেঁড়া জুতোতেই সুপ্রকাশ। কিন্তু বাঙালীর মনের এমনি মোহ যে এর প্রতিকারে কেউ ইস্কুল কলেজ তুলে দেবার উপদেশ করে না। প্রস্তাব হয় এগুলিতে অন্য রকম শিক্ষা দেওয়া হোক। শিল্পবিদ্যালয় ও কারবার শেখার ইস্কুলে দেশটা ভরে' ফেলা যাক্। অথচ সকলেই জানি মোটরবিহারী দীল্লিওয়ালা

কি শিল্প কি সওদাগরী কোনও ইস্কুলেই কোনও দিন পড়ে নি।

জর্ম্মাণযুদ্ধ আরম্ভ হবার পর থেকে পৃথিবী-জোড়া দুরবস্থার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বাঙলাদেশের অবস্থা অতি সঙ্কটের জায়গায় এসে পৌঁছেছে। এ সঙ্কট যে কত বড়, আর আমাদের দারিদ্র্যের ব্যাধি যে কত প্রবল তা আমরা এর যে সব বিষচিকিৎসার ব্যবস্থা দিচ্ছি তা দেখলেই বোঝা যায়। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর উচ্চশিক্ষিত ছাত্রদের উপদেশ দিচ্ছেন, 'সবাই মারোয়ারী হও; আর উপায় নেই।' এ কথা বেরিয়েছে তাঁর মুখ থেকে যাঁর সমস্ত জীবন বৈশ্য-ত্বের একটা প্রতিবাদ। ধনের গৌরব ও ক্ষমতার মোহ যাঁর কাছে প্রলোভনের জিনিষই নয়। যাঁর নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য আর ঋষির তপস্যা বিংশ শতাব্দীর বৃটিশ ভারতবনেও জ্ঞানের তপোবন ও শিষ্যের মণ্ডলী গড়ে তুলেছে। যিনি বিদ্যা ও প্রতিভা দিয়েছেন দেশের সেবায়, নিজেকে লোপ করে। এ যুগে যিনি কারখানা গড়ে' তুলেছেন নিজের পকেট নয় দেশের মুখ চেয়ে। আর 'মারোয়ারী হওয়া' ব্যাপারটি কি তা গেল যুদ্ধের টানে সবার সামনে বে-আব্রু হয়েই দেখা দিয়েছে। মারোয়ারিগিরি হচ্ছে ইউরোপীয় বৈশ্যত্বের কবন্ধ। ইউরোপের বৈশ্য পৃথিবীই লুট করুক, আর দেশের মাথায়ই চড়ে বসুক, দেশকে সে ঠিকই অন্ন যোগাচ্ছে। আজকার ইউরোপের ধনসৃষ্টির সে যে মূল উৎস তাতে সন্দেহ করা চলে না। কিন্তু মারো-য়ারিগিরি ধনসৃষ্টির পথ দিয়েই হাঁটে না। ব্যবসা বাণিজ্যের ঐ উত্তমাঙ্গটি তার নেই। তার কাজ হ'ল বিদেশের তৈরী জিনিষ চড়া দরে দেশের মধ্যে চালান, আর দেশের উৎপন্ন ধন সস্তা দরে বিদেশীর হাতে তুলে দেওয়া। এবং এই হাত বদলানোর কারবার থেকে

যত বেশি সম্ভব দেশের ধন, যার সৃষ্টিতে তার কড়ে' আঙ্গুলেরও সাহায্য নেই, নিজের হাতে জমা করা। সে জন্য যে তীব্র লোভ ও একাগ্র স্বার্থপরতা দরকার তার নাম ব্যবসা-বুদ্ধি! এ ব্যবসা-বুদ্ধি যে কত বড় নির্ল্লজ্জ আর কতদূর হৃদয়হীন গেল যুদ্ধের সময় পৃথিবীর সব দেশে তা প্রমাণ হয়েছে। দেশের নিতান্ত দুর্দ্দশা ও সঙ্কটের সময়ও দেশ-জোড়া দুরবস্থার ভিত্তির উপর নিজের ধনের ইমারত গড়ে তুলতে কোনও দেশের কোনও বৈশ্য কিছুমাত্র গ্লানি বোধ করে নি। এবং এক রাজদণ্ডের শাসন ছাড়া এ লোকের নিষ্ঠুরতা আর কোনও কিছুরই বাধা মানে নি।

ধনসৃষ্টির সঙ্গে নিঃসম্পর্ক সওদাগরী ইউরোপেও যথেষ্টই আছে। কিন্তু সেখানে সেটা ধন উৎপাদন ও ধন বিতরণের আনুসঙ্গিক উপদ্রব। আর মারোয়ারিগিরি হ'ল নিছক উপদ্রব। জমিদারীর সঙ্গে মোসাহেব থাকে জানি; কিন্তু জমিদারী নেই, আছে কেবল মোসাহেবের উৎপাত এটা যেমন হাস্যকর তেমনি সঙ্কটজনক। দেশের কৃষক নিরন্ন বলে' স্বল্প মূল্যে তার শ্রমের ফল হাতে জমা করে' দেশের লোক নিরুপায় বলে' চড়া দামে তা বিক্রি করার মধ্যে কোথায় যে দেশের ধনবৃদ্ধি ও উপকার আছে তা অর্থ-নীতিশাস্ত্রের মহামহোপাধ্যায়েরাও আবিষ্কার করতে পারবেন না। আর গলা যদি নেহাৎ-ই কাটা যায় তবে ছুরিটা বাঙালীর না হয়ে অ-বাঙালীর এতে এমন কি ক্ষুব্ধ হবার কারণ আছে। সম্ভাবনটা সুদূর, কিন্তু যদি সত্যই বাঙলার গোটা শিক্ষিত-সমাজটা 'মারোয়ারী'ই হয়ে ওঠে তবে নিশ্চয় জানি আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রই

সবার আগে বলবেন এর চেয়ে বাঙালীজাতির না খেয়ে মরাই ভাল ছিল।

(৬)

ইউরোপের বৈশ্যত্ব বাঙলার মাটিতে ভাল ফলে নি। অথচ ইউরোপের সঙ্গে বাঙালীর পরিচয় ভারতবর্ষের সব জাতির চেয়েই বেশি। বাঙলার বাইরে বাঙালী ত একরকম খৃষ্টান বলেই পরিচিত। কথা এই যে, যে ইউরোপের সঙ্গে বাঙালীর নাড়ীর যোগ সেটা বৈশ্য ইউরোপ নয়, ব্রাহ্মণ ইউরোপ। কল-কব্জা ও ব্যবসা-বাণিজ্যের আধুনিক ইউরোপ ছাড়া ত আর একটা আধুনিক ইউরোপ আছে, যে ইউরোপ প্রাচীন গ্রীক সভ্যতার উত্তরাধিকারী যে আধুনিক ইউরোপ মানুষের মনকে মুক্তি দিয়েছে; জ্ঞানের দৃষ্টি যেমন সূক্ষ্ম তেমনি উদার করেছে। যার কাব্য, সাহিত্য, কলা, দর্শন, বিজ্ঞান, মানুষের সভ্যতার ভাণ্ডার জ্ঞান সত্য সৌন্দর্য্যে ভরে' দিয়েছে। এই ইউরোপের আনন্দালোকই বাঙালীর মন হরণ করেছে, কলের ধোঁয়ায় কালো ইউরোপ নয়। সেই জন্য বাঙলার মাটিতে এখনও জামসেট্‌জী তাতা জন্মে নি, কিন্তু বাঙলা দেশ রামমোহন ও রবীন্দ্রনাথের জন্মভূমি। এখনও বড় কলওয়ালা কি ভারি সওদাগরের আমরা নাম করতে পারি নে, কিন্তু জগদীশ বসু ও প্রফুল্লচন্দ্র বাঙালী জাতির মধ্যেই জন্মেছেন। বাঙালীর নাড়ীতে পশ্চিম থেকে প্রাচীন ভারতীয় আর্য্য ও মধ্যযুগের মুসলমান সভ্যতা, দক্ষিণ থেকে দ্রাবিড় ও পূর্ব্ব থেকে চীন সভ্যতার রক্ত এসে মিশেছে। ইউরোপীয় আর্য্য সভ্যতার বিদ্যুৎস্পর্শে যদি এই অপূর্ব্ব প্রয়াগ-

ভূমিতে আমরা একটি অক্ষয় নূতন সভ্যতা গড়ে' তুলে মানবজাতিকে দান করতে পারি তবেই আধুনিক বাঙালী জাতির জন্ম সার্থক। না হলে আমরা পায়ে হেঁটে চলি কি মোটর গাড়ীতে দৌড়াই, তাতে কিছুই আসে যায় না। কিন্তু এ সার্থকতার জন্য ইউরোপের যে উৎস থেকে জ্ঞান ও সৌন্দর্য্য উৎসারিত হচ্ছে তা থেকে চোখ ফিরিয়ে যেখানে তার কারখানার মাল তৈরী হচ্ছে সেখানে দু'চোখ বন্ধ করে' রাখলে চলবে না, বাঙালীর মারোয়ারী হওয়া একেবারেই পোষাবে না।

বাঙালীকে অবশ্য আগে বাঁচতে হবে। কিন্তু সে জন্য চাই নূতন ধনসৃষ্টি করা, দেশের অন্নকে বহু করা। বেদের ঋষি অন্নের সৃষ্টির জন্য নিজের হাতে হাল ধরেছেন। আজ পৃথিবীর সেই দিন এসেছে যখন অন্নসৃষ্টির ভার কেবল বৈশ্য বহন করতে পারে না। তার ব্রাহ্মণের সাহায্য চাই। এই সাহায্য বাঙালীর জ্ঞান বিজ্ঞান ভারতবর্ষকে দান করবে। যার চোখ আছে তিনিই এর আরম্ভ দেখতে পেয়েছেন। বৈশ্যত্বের নামে নয়, এই ব্রাহ্মণত্বের নামে ডাক দিলে তবেই নবীন বাঙালীর সাড়া পাওয়া যাবে। এই ব্রাহ্মণত্বের ছায়ায় বাঙলা দেশে এমন বৈশ্যত্ব গড়ে' উঠুক যার হাতে ধন দেখে কি শাস্ত্রকার কি দেশের লোক কেউ ভীত হবে না। যে বৈশ্য প্রাচীন সংহিতার অনুশাসন মত "ধর্ম্মেণ চ দ্রব্যবৃদ্ধাবাতিষ্ঠেদ্ যত্নমুত্তমম্", ধর্ম্মানুসারে দ্রব্যবৃদ্ধির জন্য উত্তম যত্ন করবে; "দত্তাচ্চ সর্ব্বভূতানামন্নমেব প্রযত্নতঃ," এবং অতি যত্নে সর্ব্বভূতকে পর্য্যাপ্ত অন্ন দান করবে।

শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত।

পুতলি।

——•:•——

তার সঙ্গে প্রথম দেখার দিনটা না মনে থাকলেও ক্ষণটা এখনও মনে আছে। তখন প্রায় সন্ধ্যা—অস্তগামী সূর্য্যের সোনালি আভা জনবিরল পার্ব্বত্য পথে সেদিন একটা কুহক রচনা ক'রেছিল।

*   *   *   *

তারপর সে যখন আমাদের বাড়ীতে এল—চিরদিনের সুখদুঃখের ভাগী হ'য়ে—সে দিন আমাদের কি আনন্দ আর অতগুলো অপরিচিত মুখের কৌতূহল দৃষ্টির সামনে তার যে কি সঙ্কোচ! সে তখন দেখ্‌তেও ছিল ছোট্টটি আর তার বয়সটাও ছিল তরুণ। তার উপর সে যে গরীবের ঘরে প্রতিপালিত—জন্মটা বড় ঘরে হ'লেও—এ কথাটা বোধ হয় সে তখনও ভুলতে পারে নি।

বাড়ীর সকলে তার পূর্ব্বেকার নামটা ব'দলে নূতন নামকরণ ক'রলে পুতলি বা ডলি—তার পুতুলের মত স্বচ্ছ আর হরিণীর মত সরল বিশ্বস্ত চোখ দুটি দেখে। সে-ও তাই বিনা আপত্তিতে মেনে নিলে।

*   *   *   *

তারপর কতদিন কেটে গেল। ভালবাসার মৃদু উত্তাপে ডলির সঙ্কোচ তুষারের মত যেন গ'লে গিয়ে কেমন ক'রে স্রোতস্বিনীর মুখরতায় পরিণত হ'য়েছিল তা' সে নিজেও টের পায়নি বোধ হয়।

কেমন ধীরে ধীরে সে আমার হৃদয়ে নিজের স্থানটি অধিকার ক'রে নিয়েছিল! বাড়ীর কোথাও আদর ভালবাসার ক্রটী ছিল না এবং সে-ও তার স্নেহ-বন্ধুত্বের বন্ধনে আত্মীয়-অভ্যাগত সকলকেই বেঁধে ফেলেছিল। তবু সে এটা ভোলেনি যে তার সমস্ত সুখ দুঃখ আমাকেই কেন্দ্র ক'রে ঘিরে র'য়েছে আর আমিও জানতুম যে তার ক্ষুদ্র হৃদয়ের সমস্ত ভালবাসাটুকু আমাতেই এসে বিরাম পেয়েছে। নিদাঘ দিনে তার ক্লান্ত চোখের নির্ভর দৃষ্টি আর শীতের রাতে লেপের ভিতর তার সুনিবিড় স্পর্শ আমাকে ওই কথাটাই বিশেষ ক'রে জানিয়ে দিত।

* * * *

তারপরে আরও কতদিন কেটে গেল। সমস্ত নেশার মত নূতনত্বের নেশাও আমার মন থেকে ধীরে ধীরে সরে যেতে লাগল। নিজেকে ফিরে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিদিনকার খুঁটিনাটি কর্ত্তব্যের দাবীও মাথা পেতে স্বীকার করে নিতে হ'ল। কোথায় গেল ছুটীর সেই দীর্ঘ দিনগুলি আর কোথায় পড়ে রইল আমার অবসরের জীবন্ত সাথী আর খেলার ঘুমন্ত স্মৃতি!

কিন্তু ডলি সেটা ঠিক এভাবে স্বীকার ক'রে নিতে পারলে না। এবং এইখানেই আরম্ভ হ'ল সেই নীরব ট্র্যাজেডি যার কথাগুলি কোন নাট্যকারের লেখনী মুখে কোন দিন ফুটে ওঠে নি কিন্তু জীবন রঙ্গমঞ্চে যার অভিনয় প্রতিদিনই চ'লে আসছে।

সকালবেলার কাজের মধ্যে আমার আপিস-কেদারার ফাঁকটুকু সে অধিকার ক'রে ব'সত। আমি ব্যস্ত হ'য়ে ব'লতুম—ডলি এখন নয়; কাজ আছে।

সে চ'লে যেত। তার অভিমান দৃষ্টিটুকু আমার কাজের মধ্যে যে কোথায় মিলিয়ে যেত তার কিছুই খবর থাকত না।

ক্লান্ত সন্ধ্যার বিরল অবসরে আরাম-কেদারার মধ্যে আমার বুকের কাছে তার মুখের সঙ্কোচ স্পর্শ অনুভব ক'রতুম। তার সেই রেশমের মত চুলগুলির ভিতর আঙ্গুল রেখে ব'লতুম—ডলি, এখন যাও; বড়ই ক্লান্ত।

রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে দেখতুম—বিছানার আরাম ছেড়ে দিয়ে সে যে কখন নীচের গাল্‌চেতে শুয়ে ঘুমিয়ে প'ড়েছে কিছুই টের পাই নি।

তাকে কর্ম্ম আর অবসর কিছুরই সাথী ক'রে নিই নি। কয়েকটা অলস দিনে তাকে একটু আমোদ যোগাতে দিয়েছিলুম মাত্র।

* * * *

তাই সে যে আমাকে একেবারে ছেড়ে চ'লে যাবে—এতে আশ্চর্য্য হবারই বা কি আছে? তবে এ-কথাটা ঠিক সে সময় বুঝে উঠতে পারি নি।

সেদিনের কথা সংক্ষেপেই ব'লব। সেদিন বিলাতী স্যাকরার দোকান থেকে তারই জন্যে আনা নূতন কণ্ঠহারটা একেবারেই কাছে রাখতে পারলুম না, দূরে ফেলে দিলুম। সেটা যে আমার কতকটা অনুতাপ এবং অনেকটা অনুগ্রহ দিয়ে গড়া—তাতে স্নেহ ভালবাসার নাম গন্ধও ছিল না।

সেদিন বিনিদ্র রজনীর নিস্তব্ধতার মধ্যে ডলিকে যেন আবার নূতন ক'রে পেলুম। মনে মনে ব'ললুম—বন্ধু, তুমি যে নূতন আশ্রয়ে গেছ, সেখানে তোমার ভালবাসা যেন কখন ক্ষুণ্ণ না হয়।

নীরব অবহেলার অপমান বিষে তোমায় যেন কখন জর্জ্জরিত হ'তে না হয়। তুমি ভালই ক'রেছ। তুমি সুখী হও।

* * * *

তার হৃদয়ের সমস্ত অভিমানটুকু নিয়ে ডলি চ'লে গেছে;— আমার হৃদয়ে একটা অনুতাপের ক্ষত রেখে গেছে মাত্র।

ডলিও চ'লে গেছে—আমিও সেই থেকে কুকুর পোষা ছেড়ে দিয়েছি।

শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ।

"দ্বীপান্তরের বাঁশী"।

——:০:——

সনাতনপন্থী ধর্ম্মাত্মাদের ধর্ম্মের প্রথম ও প্রধান সূত্র হচ্ছে —কর্ম্ম মানুষের বন্ধন। কিন্তু "দ্বীপান্তরের বাঁশী"র কবিতাসমষ্টি ঐ সনাতন সত্যের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে অতি সপ্রতিভভাবে সাক্ষী দিচ্ছে। কেননা বারীন্দ্রের বার বৎসরের পূর্ব্বের কর্ম্মজীবনের একটুকু ছায়া-পাত এই কবিতা পুস্তকটির মধ্যে নেই। যেদিন মাসিক পত্রিকার বিজ্ঞাপনস্তম্ভে "দ্বীপান্তরের বাঁশী"র বিজ্ঞাপন দেখি সেদিন মনে করেছিলুম যে ঐ বাঁশীতে যা শুনব সে হচ্ছে ভৈরব রাগ আর দীপক রাগিনী। কিন্তু যেদিন বইখানি হাতে এলো সেদিন যখন তার মাঝামাঝি এক জায়গায় খুলতেই চোখে পড়ল—

"একটী কিশোরী অঙ্গে তোরে গো ধরিব,
স্বরগ মরত মোর এই ঠাঁই নিব।"

তখন আর বিস্ময়ের সীমা রইল না। যে-মানুষটি একদিন আগুন নিয়ে খেলা করে গেলেন সেই মানুষটিরই হাত দিয়ে এমন সুর বেরুল—কোন্ রহস্যে এমন রহস্য সম্ভব হল? তাই সেদিন এই কথাটা স্বীকার করতে বাধ্য হলুম যে, মানুষের কর্ম্মকে যখনই

---

* দ্বীপান্তরের বাঁশী—শ্রীযুক্ত বারীন্দ্রকুমার ঘোষ প্রণীত গীতি কবিতা; নারায়ণ কার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য, ১৲ টাকা মাত্র।

বড় করে দেখি তখনই তার আত্মাকে ছোট করে ফেলি! আত্মা যখন ক্ষুদ্র হ'য়ে আসে, অশক্ত হ'য়ে আসে তখন বাইরের যা-কিছু সবই তার বন্ধন হ'য়ে ওঠে; কিন্তু তাই বলেই যা সনাতন সত্য—সৃষ্টির গোড়াকার সত্য যে-কথাটা, সেটা হচ্ছে এই যে, আত্মা আপনারই আনন্দে আপনারই শক্তিতে আপনারই স্বাধীন নির্ব্বাচনে মানুষের বাইরের জীবন প্রকাশ করে' করে' চলেছে! মাকড়শা যেমন তার পেটের ভিতর থেকে সুতো বের করে জাল বোনে অথচ সে জালে সে নিজে কখনও আবদ্ধ হয় না, তেমনি করে' আত্মা আপনার অন্ত-রের আনন্দ উৎস থেকে বাইরের হাজার কর্ম্মের হাজার ভোগের জাল বোনে। তবে সেই কর্ম্ম সেই ভোগই যে মানুষের মনকে বাঁধে তার কারণ সাধারণত মানুষের মনে ঐ সত্যটি পৌঁছয় না—পৌঁছি-লেও তা সেখানে জীবন্ত হ'য়ে জ্বলন্ত হ'য়ে অবিরাম জেগে থাকে না। ঐ সত্যটি সদাসর্ব্বদা মনে প্রতিষ্ঠা করে' রাখতে চাইলে সাধনা দরকার। কিন্তু বারীন্দ্রকুমার সাধক। তাই তাঁর কর্ম্মজীবনের রাগ দিয়ে তাঁর কাব্যজীবনের সুর নিয়ন্ত্রিত হয় নি। বারীন্দ্রকুমার সাধক —প্রমাণ তাঁর "দ্বীপান্তরের বাঁশী"।

মানুষ মাত্রেরই জীবন হচ্ছে সাধনা। এ-সাধনার অর্থ হচ্ছে মানুষের জীবনে যে একটা চরম রহস্য আছে সেই চরম রহস্যের সন্ধান নেওয়া—মানুষের মধ্যে যে-একটা পরম মিলনের আকাঙ্ক্ষা আছে, যে পরম মিলনটি যেমন সবার চাইতে সত্য তেমনি সবার চাইতে উপেক্ষিত—সেই পরম মিলনের দিকে এগিয়ে যাওয়া। তবে আমরা বিশেষ ভাবে সাধক বলি তাঁদেরই যাঁরা এ-সাধনা করেছেন সজ্ঞানে। বারীন্দ্রকুমারকে সাধক বলছি, কেননা তাঁর ত এ সাধনা

সজ্ঞানে,—সজ্ঞানে নইলে আমরা "দ্বীপান্তরের বাঁশী"তে এ কথা শুনতে পেতেম না—

"সারাটা জীবন ছিল অভিসার
কেবা তা' জানিত সই ?"

এ অভিসার কিসের অভিসার ?—সেই চরম রহস্যের পানে পরম মিলনের অভিসার। সমস্ত জীবনকে যখন এই অভিসার হিসেবে দেখতে পারি, এই অভিসার বলে' মর্ম্মের প্রতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুভব করতে পারি তখন ত আর দুঃখ নেই। তখন যে দুঃখের দুঃখমূর্ত্তি মোহন হ'য়ে দেখা দিয়েছে, চোখের অশ্রুবিন্দু মুক্তা হ'য়ে ফুটে উঠেছে। গৃহে গৃহে দীপ নিভেছে, ঘরে ঘরে দ্বার রুদ্ধ, চারিদিক স্তব্ধ নীরব—আঁধার জমাট বেঁধে এসেছে—চারিদিক নিশুতি—বিশ্বের নরনারী সুপ্তির কোলে অচেতন, এমন সময় শ্রীরাধা ধীরে ধীরে দ্বার খুলে যমুনাপুলিনের পথে বেরিয়েছেন—মাথার উপরে দেয়া গুরু গুরু ডাকছে—বুকের ভিতরে হৃদয় দুরু দুরু কাঁপছে—কালো কুণ্ডলীকৃত পুঞ্জ মেঘের বুক ফেটে ফেটে চমকে চমকে বিজলী ঝলকাচ্ছে—দারুণ বৃষ্টি শেলের মতো হান্‌ছে—উন্মাদ বাতাস বুকের বসন উড়িয়ে নিয়ে যায়—পথের কাঁটা পদে পদে পায়ে রক্তচিহ্ন এঁকে দেয়; কিন্তু এ যে অভিসার—তাই এখনকার সমস্ত দুঃখ সুখ হ'য়ে উঠেছে—সমস্ত দুঃখ মিলনকে যে আরও নিবিড় করে' তুলবে—এ ত "দুখ নহে সে যে পথ মিলনকুঞ্জের তারি", তাই এখানে শুনি—

"বল কাঁদায়ে কেমনে দিবে গো জ্বালা !
দুঃখ তব বড় প্রণয়-ঢালা।"

তাই শুনি—

"তারে না পেয়ে কাঁদায় এমন সুখ,
কত মিঠা নাহি জানার দুখ!"

এই যে জীবাত্মার "জাগরণ," এই জাগরণ যখন মানুষের অন্তরে অন্তরে সত্য হ'য়ে ওঠে তখন যদিও—

"বুঝিনা সে কথা এ কিসের মেলা"

তবুও এই কথাটাই সমস্ত বেদনাকে ছাপিয়ে ওঠে—

"কে দুটি চরণে রহি,
কত ছলনায় কুঞ্জ দুয়ারে
নিতেছে কিছু না কহি।"

তখন—

"সুপথে কুপথে কলঙ্ক সুযশে
কত যে মালা বদল,"

তখন সুপথ কুপথ কলঙ্ক সুযশ কিছুই মনে থাকে না, তখন কত যে "মালা বদল" এই কথাটাই এমনি মুখ্য হয়ে ওঠে যে, ওরই স্বপ্নে দুঃখ সুখের চেহারা একেবারে বদ্‌লে যায়। সুখ দুঃখ তার পার্থক্য হারায়, দুয়ে একেবারে একাকার হ'য়ে যায়। কি এ রহস্য মানব আত্মার? সাংখ্য এখানে বোকা, বেদান্ত এখানে নির্ব্বাক। কিন্তু সাংখ্য বেদান্তের চাইতেও মানব-হৃদয়ের এই রহস্য বড় বলে' এই জগত-সংসার চিরকাল চল্‌ছে। দুঃখকে মানুষ যদি কেবল দুঃখ বলেই জানত তবে কি নিদারুণই হ'য়ে উঠত এই সৃষ্টি। তবে সৃষ্টি হয় মুছে যেত, না হয় স্থাবর হ'য়ে উঠত।

(২)

বারীন্দ্রের "দ্বীপান্তরের বাঁশী"র মধ্যে মস্ত একটা আরাম আছে। এই বাঙলা দেশের বর্ত্তমান কাব্য-গগনটা রবীন্দ্রনাথের ভাষা ও ছন্দের অনুকরণের অনুকরণ তস্য অনুকরণে ও তাঁর ভাবের অনুবাদের অনুবাদ তস্য অনুবাদে এমনি ভারাক্রান্ত হ'য়ে উঠেছিল যে, "দ্বীপান্তরের বাঁশী" যেন তার মধ্যে একটা পরম আরামের নিশ্বাস ফেলা। যেন এতদিন পরে দাম-ঢাকা সরোবরটার বুকে দাম ফুটিয়ে একটুকু জল চিকমিকিয়ে জেগে উঠল, সে-জল দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল—যেন কতদিনকার গুমোট-বাঁধা আকাশে কার নিশ্বাসে মেঘ কেটে গিয়ে একটুকু জায়গায় নীল আকাশ বেরিয়ে এল। সে আকাশের যেমনি নতুনত্ব তেমনি মনোহারিত্ব। অনুকরণ জিনিষটার মধ্যে আছে আপন আত্মাকে অস্বীকার করা —আর অনুবাদ জিনিষটা হচ্ছে আপন আত্মার সন্ধান না-পাওয়ার নিশানা। যে নিজের আত্মার সন্ধান পায় নি তার দ্বারা কোন-কিছু বড় হবার আশা নেই। পরের প্রভাব যখন নিজের স্বভাবকেই উদ্বুদ্ধ করতে সাহায্য করে তখনই তা মঙ্গলময়, নইলে তা মারাত্মক। পরের আত্মার স্পর্শে নিজের আত্মাই জেগে উঠবে, তবেই সেখানে অমৃতের অবিনশ্বরতার আবির্ভাবের সম্ভাবনা কিন্তু পরের আত্মা যখন জগদ্দল পাথরের মত চেপে চারিদিকের সমস্ত ফাঁক বুজিয়ে দেয় তখন সেই চাপের নীচে থেকে যে সুর যে রাগ বেরয় তার গায়ে গায়ে থাকে একটা ক্লান্তির আবেশ। এই ক্লান্তির আবেশে চারিদিক উজ্জ্বল হয়ে ওঠে না—হ'য়ে ওঠে ভারাক্রান্ত। এই কথাটি সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে

খাটে। কেননা সাহিত্য মানেই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য। আত্মার অনন্ত রূপ অনন্ত ভাব অনন্ত ভঙ্গী সাহিত্যে যেমন করে' ফোটে তেমন মানুষের আর কোনো ক্ষেত্রেই নয়। কেননা আর সকল ক্ষেত্রেই প্রত্যেক মানুষটিকে আর প্রত্যেকের সঙ্গে মানিয়ে বনিয়ে চলতে হয় কিন্তু কেবল এই সাহিত্যের ক্ষেত্রেই তার পরিপূর্ণ মুক্তি, পরিপূর্ণ স্বাধীনতা। এই পরিপূর্ণ মুক্তি যেখানে সফল হ'য়ে উঠেছে সেইখানেই সাহিত্যের বড় সার্থকতার সম্ভাবনা।

এই সব কথাই মনে করে "দ্বীপান্তরের বাঁশী"র যে কথাটা প্রথমেই মনে এসে লাগল সে হ'চ্ছে ঐ একটা পরম আরাম, মুক্তির আরাম। রবীন্দ্রনাথের কবি-আত্মার যে একটা মোহজাল সমস্ত দেশের উপরে বিছিয়ে গিয়েছে সেই মোহজাল ছিন্ন করাই মুক্তি। সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা ও জীবনরক্ষার জন্যে এই মোহজাল ছিন্ন করা নিতান্ত দরকার। রবীন্দ্রনাথকেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বার বার প্রকাশ করলে কি লাভ হবে, কোন্ সম্পদ বাড়বে? তাও আবার তাঁদের দ্বারা যাঁরা রবীন্দ্রনাথের চাইতে ঢের কম শক্তিমান। রবীন্দ্রনাথের কবি-আত্মার চরম পরিণতি রবীন্দ্রনাথের মধ্যেই লাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথকে ডিঙিয়ে যাবার উপায় নেই। নতুন সৃষ্টির জন্যে আমাদের নতুন পথ আবিষ্কার করতে হবে। নইলে কাব্যের স্রোতস্বিনী দু'দিনে পানাপুকুর হ'য়ে উঠতে বাধ্য। সাহিত্যের ধর্ম্মই হচ্ছে নিত্য নব নব সুন্দরের দর্শন পাওয়া। সাহিত্যের ঐ ধর্ম্ম থেকে বিচ্যুত হওয়া মানেই তার মৃত্যু। এ কথা যেন না ভুলি। সে যাই হোক, "দ্বীপান্তরের বাঁশী" যে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব কাটিয়ে উঠেছে তার কারণ এ বাঁশীর সুর ফুটেছে বারীন্দ্রের অন্তর থেকে—তাঁর বুদ্ধি

থেকে নয়। অনুকরণ জিনিষটার মধ্যেই একটা বুদ্ধির খেলা আছে। "দ্বীপান্তরের বাঁশী" বারীন্দ্রের অন্তরের বাঁশী, তাই এ বাঁশীর সুরে এমন সহজ হ'য়ে এই কথাটা ফুটে উঠেছে —

"এ বীণা বাজায় না কেউ
আপনি বাজে;
ওরে এ সোণার ঊষা সাজায় না কেউ
আপনি সাজে।"

এ "আপনি" কে? এ "আপনি" কি?—মানুষের মন নয় বুদ্ধি নয় প্রাণ নয়—এ হ'চ্ছে মানুষের অন্তরের পরম ঠাকুরটি। মানুষের কর্ম্ম বল ধর্ম্ম বল সাহিত্য বল দর্শন বল বিজ্ঞান বল যখন এই পরম ঠাকুরটির মন্দির থেকে উৎসৃষ্ট হয়েছে তখনই মানুষ তার পরম সত্যটিকেও লাভ করেছে। তখন মানুষের জীবনে দুঃখও অমৃতময় হয়ে উঠেছে, কারণ তখন যে তার এই কথাটা স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে—

"সে কানুর হাতে দুখে সাধা বাঁশী
আমি রে হয়েছি তাই।"

(৩)

বারীন্দ্রকুমারের "দ্বীপান্তরের বাঁশী" যে কেবল দ্বীপান্তরেরই বাঁশী তা নয়, তা যমুনাপুলিনেরও বাঁশী। মানুষের মধ্যেকার যে পরম মিলনটির কথা আগে বলেছি সে মিলনকে তিনি প্রকাশ করেছেন রাধাকৃষ্ণের বেনামিতে। বারীন্দ্রের "দ্বীপান্তরের বাঁশী" আকারে ও প্রকারে বৈষ্ণব কবিদের পদানুসারী, বিশেষ করে' চণ্ডীদাসের।

চণ্ডীদাস বলেছেন—

"সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ।"

বারীন্দ্রকুমারও তেমনি বলছেন—

"হৃদি বৃন্দাবনে আমারি কারণে
সেই— সর্ব্বনাশা বাঁশী বেজেছে এবার।"

কিন্তু তা হ'লেও বারীন্দ্রকুমারের কাব্য চণ্ডীদাসের হুবহু ফটোগ্রাফ নয়, কেননা আকারে প্রকারে এক হলেও আচারে বিচারে "দ্বীপান্তরের বাঁশী" ও চণ্ডীদাসের গানে একটা প্রভেদ আছে, সেটা "দ্বীপান্তরের বাঁশী"র কবির নিজস্ব দান—নিজস্ব সুর। এই নিজস্ব সুর আছে বলে "দ্বীপান্তরের বাঁশী" চণ্ডীদাসের পদাবলীর তলে তলিয়ে যায় নি, তা আপনার স্বাতন্ত্র্যে আপনার প্রাণের মূর্চ্ছনায় উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে। "দ্বীপান্তরের বাঁশী"র মূলধন ঋণের কিন্তু বারীন্দ্রের হাতে সে মূলধন বেড়ে গিয়ে নতুন লাভের ঘরে অঙ্কপাত করেছে।

"দ্বীপান্তরের বাঁশী"র এই নতুন লাভের কথা বুঝতে হ'লে চণ্ডীদাসের রাধা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলা দরকার। সুতরাং সংক্ষেপে তা বলছি।

চণ্ডীদাসের রাধা কৃষ্ণপ্রেমে পাগলিনী। রাধা কৃষ্ণের প্রেম, রাধা কৃষ্ণের মিলন—সে হচ্ছে মানুষের সেই পরম মিলনের কথা যা পূর্ব্বে বলে এসেছি। এ মিলন হচ্ছে জীবাত্মার মিলন পরমাত্মার

সঙ্গে, জীবের মিলন ভগবানের সঙ্গে। কৃষ্ণকে পেয়ে রাধা আপনাকেই পূর্ণ করে' পাচ্ছে—ভগবানের সঙ্গে মিলনে জীব আপনারই পরিপূর্ণ সত্যটির স্পর্শ পাচ্ছে।

কিন্তু চণ্ডীদাসের রাধা তাঁর কৃষ্ণপ্রেমে এ জগতকে হারিয়ে ফেলেছিল। এ জগত তাঁর কৃষ্ণপ্রেমের অন্তরায়। ননদিনী, গুরুজন এমন কি "পরশী দুর্জ্জন" পর্য্যন্ত তাঁর কৃষ্ণপ্রেমের বাদ। শ্যাম রাখি কি কূল রাখি। শ্যাম রাখতে গেলে কূল থাকে না—আর কূল রাখলে শ্যাম থাকে না। অর্থাৎ—সেই হয় সংসার নয় ভগবান, সেই অধিভূত ও আধ্যাত্মের বিরোধভাব। তাই কৃষ্ণপ্রেমের সঙ্গে সঙ্গে চণ্ডীদাসের রাধার সংসারবৈরাগ্য, তাই তিনি বলছেন—

"মন মোর আর নাহি লাগে গৃহকাজে"

একা শ্যামে তার অন্তর বাহির একেবারে আচ্ছন্ন হ'য়ে গিয়েছে, তখন এমনি অবস্থা যে—

"কালার ভরমে হাম জলদে না হেরি গো
ত্যজিয়াছি কাজরের সাধ।"

ধীরে ধীরে সৃষ্টির বহুত্ব তাঁর দৃষ্টি থেকে লোপ পেয়ে গেল, তখন—

"পুলকে অতুল দিক নেহারিতে
সব শ্যামময় দেখি।"

এই "সব শ্যামময় দেখি" পিছন থেকে যে সুর এসে আমাদের মনে লাগে সে হচ্ছে এই যে, সৃষ্টির সহস্র নামরূপ তাদের স্বাতন্ত্র্য

হারিয়ে একেবারে একাকার হ'য়ে যাওয়ার সুর। পরম প্রেমে শ্রীরাধার বাইরের জগত অর্থহীন হ'য়ে উঠেছে। এখানে মানুষের সেই পরম মিলনটি স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, আর যা-কিছু অস্পষ্ট থেকে অস্পষ্টতর হ'য়ে উঠেছে। এ পথের শেষ পরিণতি সমাধি বা মোক্ষ বা নির্ব্বাণে বা ঐ রকমের আর যে নামই দেওয়া যাক।

অর্থাৎ—চণ্ডীদাসের সাধনায় ছিল সে-কালের মায়াবাদ বা নির্ব্বাণ-বাদের একটা ছায়া।

কিন্তু বারীন্দ্রকুমারের সাধনার পিছনে আছে একালের লীলাবাদের ছাপ। এইখানেই প্রভেদ। এবং এ প্রভেদ মস্ত প্রভেদ।

তাই বারীন্দ্রকুমার বলছেন—

"এ সুন্দর ভুবনে আমি পাগল গো দিনযামী
শুনি চাঁদে ফুলমুখে
নিতি ওই ওই ;"

এ সুর "নেতি নেতি"-র নয়—এ সুর হচ্ছে "ইতি ইতি"-র—ইহা "ঈশাবাস্যমিদম্ সর্ব্বম্।"

তাই বারীন্দ্রকুমারের রাধাভাব অনুভব করছেন—

"ওগো মায়া বড় মনোহরা"

আর এইটেই হচ্ছে "দ্বীপান্তরের বাঁশী"র মধ্যেকার সুরটি—নতুন সুরটি, যা চণ্ডীদাসে নেই। রাধাকৃষ্ণের গীতে এইটে হচ্ছে বারীন্দ্র-কুমারের নিজস্ব দান।

এই যে মায়া—এই যে সৃষ্টি, প্রাকৃতজন ও প্রাকৃত মনের কাছে এর একটা মনোহারিত্ব আছে। কিন্তু সে খণ্ডহিসেবে। অর্থাৎ—তার কাছে এ সৃষ্টি বা মায়ার এক অংশই মনোহর—এর অন্য অংশ দুঃখের বেদনার মৃত্যুর। কিন্তু এ সৃষ্টির পরম ও অখণ্ড মনোহারিত্বটি সহজ হ'য়ে উঠেছে একমাত্র তাঁরই কাছে, যাঁর কাছে সেই পরম মিলনটি সত্য হয়ে উঠেছে—যেখানে বিশ্বপ্রকৃতির সৎ চিৎ আনন্দের সঙ্গে মানুষের অন্তরের বীণার সৎ চিৎ আনন্দের সুরটির সঙ্গত চলছে—যেখানে মানুষের জীবনের নিবৃত্তি প্রবৃত্তির সুরটি ভগবানের নিবৃত্তি ও প্রবৃত্তির সুরের সঙ্গে এক হ'য়ে গেছে। তখনই জীবের মুক্তি, কেননা তখন সে তার ক্ষুদ্র আমি, অহঙ্কার থেকে খালাস—যে ক্ষুদ্র আমি যে ক্ষুদ্র অহঙ্কার তাকে আসক্ত করে' তোলে কর্ম্মে ভোগে বা নির্ব্বাণে। এই ক্ষুদ্র 'আমি'র ত্যাগে জীবের আর কোনো বন্ধন নেই, কর্ম্মেরও নেই ভোগেরও নেই নির্ব্বাণেরও নেই। সে তখন সেই বিশ্বপ্রকৃতিরই তালে তালে উঠছে পড়ছে হাঁসছে নাচছে এঁকছে বেঁকছে—তখন তার জীবনও ভয়াবহ নয়, মৃত্যুও ভয়াবহ নয়।

এই যে মায়া, এই যে সতত পরিবর্ত্তনশীল জগৎ, ভগবানের এই যে লীলাবিলাস তা বারীন্দ্রের আত্মায় সত্য হ'য়ে উঠেছে, তাই তাঁর মুখে এমন উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে এই কথা—

"এ জগতলীলা— সে পিয়ার ডাক
মুরতী ধরেছে ওই,"

এখানে রহস্যের আর অন্ত নেই—আর সবার চাইতে বড় রহস্য—

"আপন মাধুরী মোরে
করেছে পাগল !"

এই মাধুরীর ত আর অন্ত নেই। এ যে "নিত্য নূতন নূতন"। কত রূপ কত নাম—এই অনন্ত রূপ অনন্ত নাম অনন্ত বিষয়ের মাঝ দিয়ে তাদের স্পর্শ করে করে যে চল্‌ছে সে কেমন অবস্থা?—সে—

"জাগ্রত সমাধি মোর
পিয়াসু যৌবন ;—"

তারপর এই যে চলছে, এই চলার মধ্যেই আবার একটা কত বড় মিলন রয়েছে, এই মিলন যখন ধরা পড়ে, তখন—

"ওগো— চলিতে অথির হয় যে অঙ্গ
মোরি পদে শুনি সে নূপুর-রঙ্গ
এ— কর চরণ প্রতি তনু যেন
তারি তারি মনে হয়।"

এই-ই মানুষের বড় সাধনা, কেননা এখানে মানুষের আত্মাই কেবল সাযুজ্য পায় নি—তার দেহ পর্য্যন্ত সারূপ্য লাভ করেছে। এখানে মানুষের নামরূপ তার পরম মিলনের পথে বাধা হ'য়ে দাঁড়ায় নি উপরন্তু তা এই মিলনের গ্রন্থি হয়ে উঠেছে। আর এই হচ্ছে মানুষের বড় সত্যটি, পরিপূর্ণ সত্যটি।

তাই "দ্বীপান্তরের বাঁশী"র কবিকে আজ আমরা বিশেষ করে' অভিনন্দিত করছি। পরমার্থ সঙ্গীতে আধ্যাত্মিক জীবনে এই সুরই

আজ আমরা চাই। "স্বরগ মরত মোর এক ঠাই নিব।" স্বর্গ ও মর্ত্ত্যকে আজ আমরা একই মিলনবেদীর উপরে দাঁড় করাতে চাই, সেটা হচ্ছে মানুষের জীবনবেদী। "ইহ" ও "অমূত্র"-র মাঝে বিরোধ আজ আমরাভাঙ্তে চাই। কেননা আমরা দেখে শিখেছি যে, ওর শেষেরটি ছেড়ে কেবল প্রথমটি নিয়ে থাকলে তা পরিণামে বড় বিশ্রী হয়ে ওঠে আর আমরা ঠেকে শিখেছি যে ওর প্রথমটি ছেড়ে কেবল শেষেরটি নিয়ে থাকলে পরিণামে তাও বড় বিশেষ সুন্দর হ'য়ে ওঠে না। আশা করি "দ্বীপান্তরের বাঁশী"র সুর তরুণ বাঙলার অন্তরে গিয়ে তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনে এক নতুন মূর্ত্তির প্রাণ প্রতিষ্ঠা করবে।

(৪)

উপসংহারে একটুকু ত্রুটীর কথা না বললে কর্ত্তব্যের হানি হবে। "দ্বীপান্তরের বাঁশী"তে এমন অনেক মিল আছে যা সুষ্ঠু নয়। "ফিরি=উঘারি" "বিভোর=দুরন্তের" "বরষায়=সুরভিময়" এমন কি "যায়= দেয়" ইত্যাদি এ-সমস্ত মিলের দৈন্যহিসেবেই স্বীকার্য্য। বৈষ্ণব পদাবলীতে অবশ্য ওই রকম মিল যেখানে সেখানে মেলে। কিন্তু বাঙলা কাব্য মিলের ঐ দৈন্যকে আজ কাটিয়ে উঠেছে। বিশেষত বৈষ্ণব কবিদের গানের সুরে হয় ত যে মিলগুলি কান এড়িয়ে যেত, "দ্বীপান্তরের বাঁশী"র কবিতার ছন্দে সে রকম মিল এসে হাঁটু-গেড়ে বসে পড়ে ও মনে একটা খোঁচা মেরে যায়। তাতে যে রস-ভঙ্গ হয় তা বলাই বাহুল্য, আশা করি "দ্বীপান্তরের বাঁশী"র কবি ভবিষ্যতে এ-দিকে একটু দৃষ্টি রাখবেন।

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

বিচার

——:•:——

(Oscar Wilde The House of Judgment অবলম্বনে)

সেদিন স্বর্গের বিচারগৃহে স্তব্ধতা বিরাজ করছিল। মানুষ এল উলঙ্গ হয়ে ধর্ম্মরাজের কাছে।

যমরাজ খাতা খুলে মানুষের কার্য্যকলাপ মিলিয়ে দেখছিলেন।

ধর্ম্মরাজ মানুষকে বল্লেন—"তুমি অত্যন্ত পাপ করেছ। যাদের দয়া করা উচিত, তুমি তাদের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছ। ভিখারীকে ভিক্ষা দাও নি, সে কাঁদতে কাঁদতে তোমার দ্বার থেকে ফিরে ফিরে গেছে। আমার অনুশাসন তুমি বরাবর অমান্য করে এসেছ। নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দাও নি, প্রতিবেশীর সঙ্গে কলহ করেছ। আমার ভক্তদের দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছ। বৃথা রক্তপাতে বসুন্ধরা রঞ্জিত করেছ। আমার রাজ্যে তুমি মূর্ত্তিমান অনিয়ম।"

মানুষ বল্লে—"হাঁ, তাই বটে।"

ধর্ম্মরাজ আবার বই খুলে দেখলেন। পরে মানুষকে বল্লেন—"তুমি পাপী, তুমি যা চেয়েছ আমি তাই দিয়েছি। যে মঙ্গল আমিরহস্যে ঢেকে রেখেছি তুমি তা জানবার চেষ্টা করো নি। তোমার সহবাস খারাপ, বাসস্থান কুৎসিৎ চিত্রে শোভিত। নটীর নূপুরনিক্কণ শুনে তুমি তোমার বিলাসশয্যা ছেড়েছ। যেখানে

পাপ সেই স্থানেই তোমার সোৎসাহ গতিবিধি। যা অখাদ্য তাতেই তোমার তৃপ্তি, যাতে লজ্জা নিবারিত হয় না, তাই ছিল তোমার পরিধেয়। তুমি চিরকাল মোহান্ধ হয়ে কামের পুজো করেছ। বিলাসে তোমার পরম আনন্দ-উৎসাহ। দিনরাত নির্লজ্জের মত ব্যবহার করেছ।"

মানুষ বল্লে—"হুঁা, তা করেছি বটে।"

ধর্ম্মরাজ তৃতীয়বার তাঁর বই খুলে দেখলেন।

তিনি মানুষকে বল্লেন—"তোমার সারাটা জীবন একটা বিরাট পাপের অভিনয়। যে তোমার উপকারী তুমি তার অপকার করেছ। আর যে তোমাকে অনুকম্পা দেখিয়েছে, তুমি তাকে নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছ। যে তোমায় খাইয়েছে, তুমি তাকেই দংশন করেছ, যার স্তনধারায় তোমার জীবন বেঁচেছে তুমি সেই মাকে অবহেলা করেছ। যে তোমায় প্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করেছে তুমি তার বিশ্বাস হনন করেছ। যে শত্রুর কাছ থেকেও তুমি ক্ষমা পেয়েছ, তাকে বিপদে ফেলতে একটু ইতস্তত করো নি। যে বন্ধু প্রাণাপেক্ষা ভালবেসেছে তুমি তার প্রতি কপট ব্যবহার করেছ। যে তোমায় প্রেম দিয়েছে তুমি তাকে কামভাবে আলিঙ্গন করেছ।"

মানুষ বল্লে—"হাঁ, তা করেছি বটে।"

এবার ধর্ম্মরাজ বই বন্ধ করলেন। পরে একটু ভেবে বল্লেন—তোমার শাস্তি অনন্তকাল নরকবাস—নিশ্চয়ই তোমাকে এ শাস্তি ভোগ করতে হবে।"

মানুষ চীৎকার করে বলে উঠল—"না, না, তা আমি পারবনা!"

—না, কেন?

—কারণ যতকাল বেঁচেছিলুম, আমি ত নরকেই বাস করেছি।'

ধর্ম্মরাজ খানিকটা নীরব থেকে বল্লেন, "আচ্ছা, নরকে না যেতে চাও, তোমায় স্বর্গেই পাঠাচ্ছি, স্বর্গেই তোমাকে যেতে হবে।"

এবারও মানুষ চীৎকার করে বলে উঠল—না, না, তা তুমি পার না কিছুতেই।

—"কেন, কেন স্বর্গে যাবে না তুমি ?"

—না, সে আমি পারি নে, কারণ স্বর্গ যে কি তা আমি কোনো দিকে কখনো কল্পনাও করতে পারি নি।'

* * *

বিচারগৃহের নিস্তব্ধতা অক্ষুন্নই রইল।

শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়

চিঠি

—:*:—

পদচারণের কবি

মাস্তবর শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী মহাশয়

সমীপে—

রসের যে সিধা পেনু ঢোলে চাঁটিপড়ার শব্দে,—
পাঠাই রসিদ তার, ঢাকে কাঠি থামিবার পরে ;
জানেন্ তো কুড়ে গোরু চিরদিন ভিন্ন গোঠে চরে,
কুড়েমি কায়েমি যার, ত্রুটি তার ঘটে পদে পদে।

মরম বোঝেনা কেউ, মনে ভাবে মেতে আছে মদে,
কেউ কয় 'চালিয়ান্'! 'কি অসভ্য'! কেউ মনে করে ;
আমি শুধু ভুলি হাই,......চিঠির কাগজ নাই ঘরে......
দোয়াতে মসীর পঙ্ক,...এক ফোঁটা জল নাই গঁদে!

লেফাফা দুরস্থ অতি, পোষ্টাফিসে বিকিকিনি তার,
লেফকা-দুরস্ত হওয়া তাই আর হল না আমার!

হুহু ক'রে বে-পরোয়া চ'লে যেতে চায় দিনগুলো,
হা হা করে পদে পদে ওদের কি রাখা যায় ধ'রে ?
বিশেষ গরম দেশে,...হাঁপ ধরে নাকে ঢোকে ধুলো,
ঢাকে ঢোলে চিঠি তাই লিখি আমি দু'বার বছরে।

গোড়াতে জানিয়ে হাল, ক্ষমা চাই বিনয় বচনে,
ওগো ছন্দ-চঞ্চরীক্ ! পদচারণের কবিবর !
পায়চারি করে চিত্ত তব গুঞ্জ-গীতি কুঞ্জবনে,
তারিকে ফুটিয়ে তারা, পদে পদে, নিত্য নিরন্তর !

ইতি—

ভবদীয়

১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৭ শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

আজ ঈদ

——:০:——

আজ ঈদ। ঈদ অর্থ আনন্দ। আজ আনন্দের দিনই বটে, কেননা জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়ের ভীষণ গরম আর সুদীর্ঘদিনব্যাপী কঠোর সংযমের পর আজ রসনা এবং বাসনা মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারছে। কিন্তু আজ এমন আনন্দের দিনেও প্রাণ থেকে অনাবিল আনন্দের ধারা বয়ে সারা জগৎকে হাস্যময় করে তুলছে না। আজও এই আনন্দের পিছনে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে গভীর দুঃখের ক্রন্দন গুম্‌রে গুম্‌রে ফেটে বের হতে চাচ্ছে। আজ এমন দিনেও প্রত্যেক হাসির সঙ্গে শেলির সেই ছত্রটা মনে পড়ছে—" our sincerest laughter with some pain is fraught "

আজ আনন্দ করতে গিয়ে প্রথমে থম্‌কে দাঁড়াচ্ছি প্রকৃতির লীলা দেখে। আজ এত আনন্দেও শান্তি কোথায়?—সেই যে বিশ্বের প্রথম দিন—যেদিন অনন্ত অন্ধকার ভেদ করে সৃষ্টির বিমল আলোক উদ্ভাসিত হয়ে উঠল,—সেদিন যেমন আজও তেমনি প্রতি পলে অনুপলে, প্রতি অণু পরমাণুতে ভীষণ-দ্বন্দ্ব চলছে। আর সে দ্বন্দ্বের ফল হচ্ছে এক,—নিশ্চিত মৃত্যু। আজ এমন শান্তির দিনেও ত এই হত্যাকাণ্ড অপ্রতিহত গতিতে চলছে—বিরাম নাই, হ্রাস নাই। তবে আজকার দিনে কিসের আনন্দ?—চারিদিকের এই যাতনার দৃশ্য দেখে আজও ত

মন গুরুভারে অবনত হয়ে পড়ছে।—তারপর মনে হচ্ছে এই আনন্দের দিনে, এই আনন্দের উপকরণস্বরূপ কত প্রাণীর প্রাণ যাবে—তারা আত্মবলিদান দিয়ে আমাদের রসনার তৃপ্তিসাধন করবে! তবুও যদি এই বলিদান স্বেচ্ছায় হতো!—তারপর মনে হচ্ছে আজ এই আনন্দের দিনে আমার প্রতিবেশীর আনন্দ কই? এই ত মাত্র দশ গজ ব্যবধান, তার বাসায় আর আমার বাসায়। কিন্তু এত কাছাকাছি থাকা সত্বেও আজকার সূর্য্য তার কাছে কোন সুখবর বয়ে নিয়ে আসে নি। তার কাছে গত কালও যেমন, আজও তেমন—কর্ম্মক্লান্ত, ধূলিধূসরিত দীর্ঘ দিবস।—তারপর আরও কাছে যখন তাকিয়ে দেখছি, তখন দেখছি অন্য সব দিনের সূর্য্যকিরণের সঙ্গে যেমন কর্ম্মের ধারা ব'য়ে আসে—আজও তেমনি আমার ঘরে সেই পুরাতন কর্ম্মের ধারা বয়ে আসছে। সকাল থেকে সেই আমার স্নানের জল, সেই ছেলের দুধ, সেই ছেলের মার পান—এই সমস্ত যোগাড় করার জন্য আর আর দিন যারা খেটে মরতো, আজও তারা তেমনি ভাবেই খাটছে। সেই রোজ রোজের ঘানি আজও তেমনি ভাবেই ঘুরছে।—তারপর যখন আরো কাছে তাকাচ্ছি, যখন আমার অন্তরের দিকে তাকাচ্ছি, তখন যা দেখতে পাচ্ছি তার বর্ণনা করতে গেলে চোখের জলে লেখার কালি ধুয়ে মুছে যাবে—তাই বিরত হলাম।

আজ কিসের আনন্দ? আমি অন্য দেশবাসীর কথা জিজ্ঞেস করছি না—আমি জিজ্ঞেস করছি আমার নিজের জায়গার লোকের কথা। আজ বাঙালীর কিসের আনন্দ? আজ কি কেউ এসে চুপি চুপি তার কানে মুক্তির বার্ত্তা বলে দিয়ে গেল, তাই তার এত আনন্দ?—

না আজকার আনন্দ শুধু তেরো শত বৎসরের গতানুগতিকতার ফল ?— আজ এর প্রধান আনন্দ হচ্ছে ঈদের নমাজ। (অন্তত তাই বলা উচিত; কেননা যদি বলি যে আজকের আনন্দের প্রধানতম কারণ,— চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয়র আশা—তা'হলে আজকার দিনেও যাদের এই চারটার মধ্যে কোনটাই জুটবে না, তাদের অপমান করা হয়। আর কথাটাও শোনায় নিতান্ত খারাপ। যদিও প্রকৃতপক্ষে ধরতে গেলে অন্তত বার আনা লোকের পক্ষে আজকার আনন্দের উৎস হচ্ছে রন্ধনশালা!)—আজকার আনন্দ হচ্ছে ধনী, নির্ধন, পণ্ডিত, মূর্খ, বৃদ্ধ, বালক, সুস্থ, রুগ্ন নির্ব্বিশেষে একত্র হ'য়ে একান্ত মনে বিশ্বপতির চরণে আত্মনিবেদনে, আর তারপর শত্রু মিত্র নির্ব্বিশেষে প্রেমালিঙ্গনে। কিন্তু এই যে উপাসনা, আর এই যে আলিঙ্গন, এর মধ্যে সত্যি সত্যি কতখানি আন্তরিকতা আছে, এই বাহ্যিক আচরণের মধ্যে কতখানি সত্য নিহিত আছে, তা' যখন চিন্তা করতে যাই, তখন এ আনন্দের উৎস একেবারে শুকিয়ে যায়। তার উপর যখন মনে হয় যে এই একত্র আরাধনা, এই পরস্পর প্রীতিবিনিময় থেকে অর্দ্ধেক মুসলমানজগত বঞ্চিত, তখন বুঝি এ আনন্দের দিনেও বৎসরের অপর ৩৬৪ দিনের মতই তারা সেই তাদের গৃহ-কারাগারের মধ্যে বদ্ধ হ'য়ে আছে। আজিকার এই মিলনের উৎসবে তাদের কোন ভাগ নেই। আজও অর্দ্ধেক মুসলমানের কাছে তাদের প্রতিবেশীরা অপরিচিত। আজও অর্দ্ধেক মুসলমানের কাছে তাদের প্রতিবেশীদের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত অজ্ঞাত। আজও অর্দ্ধেক মুসলমান হৃদয়ের দ্বার উন্মুক্ত করে' তার প্রতিবেশীকে আলিঙ্গন-পাশে বদ্ধ করবার জন্য উতলা হ'য়ে উঠছে না; কারণ যে অজানিত, অপরিচিত, তার জন্য কি কেউ কখন প্রীতি অনুভব

করে? ল্যাপল্যাণ্ড-বাসীর জন্ত আমার মন ক'বার উতলা হয়? যে সংকীর্ণতার মধ্যে অর্দ্ধেক মুসলমান জন্মাবধি লালিত হয়, সে সংকীর্ণতার পরিসর আজও এক চুল পরিমাণ বর্দ্ধিত হচ্ছে না—তাই বলছিলাম যে আজকার আনন্দ, আজকার মিলন-উৎসব থেকে অর্দ্ধেক মুসলমান-জগত বঞ্চিত। তারপর যে বাকী অর্দ্ধেক আছে তাদেরই বা অবস্থা কি? —স্নান করে অজু করে, যে যেমন পারে ভাল জামা কাপড় পরে গিয়ে সকলে একত্র হ'য়ে লাইন বদ্ধ হ'য়ে দাঁড়াল। কিন্তু এর মধ্যে গোড়াতেই অনেকে, বোধহয় শতকরা ৫০ জন, অজু করার অর্থ বুঝল না। একটা পুরাতন পদ্ধতি আছে বলে, বিড়্ বিড়্ পিট্ পিট্ করে কি আউড়িয়ে, বার তিনেক নাকে মুখে জল দিয়ে হাত পায়ের উপর জল গড়িয়ে, মাথার চুলের উপর আর কানের চার পাশ দিয়ে ভিজা হাত বুলিয়ে উঠে পড়ল। অজু করার অর্থ যে শুধু শরীরকে ধৌত করা নয়, সেই সঙ্গে মনকেও যে ধুয়ে নিতে হবে —তা বুঝল না। তারপর যখন নমাজে গিয়ে দাঁড়াল, তখন আবার সেই বিড়্ বিড়্ করে কি আওড়াল—তার অর্থ সাপ কি ব্যাং, তা বুঝল না। তারপর চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। হয়ত বা ইমাম যা পড়লেন তা শুনতে পেল, হয়ত বা শুনতে পেল না—আর শুনতে পেলেও শতকরা নিরনব্বই জন তা বুঝল না। ততক্ষণ হয়ত বা পোলা-ওটা কেমন হবে তাই ভাবতে লাগল। অথবা আজ ক'বাড়ী ঘুরে কত পয়সা পাবে তারই একটা মানসিক অঙ্ক কসতে ব্যস্ত হ'য়ে রইল। কেউ বা ঈদ উপলক্ষে স্ত্রী-পুত্রকে কিছু দিতে পারল না বলে মনে মনে আফ্‌সোস্ করতে থাকল। তারপর হঠাৎ মধ্যের সারি থেকে কি একটা বলে উঠলো, সবাই হাঁটুর উপর হাতের ভর দিয়ে সামনে

ঝুঁকে পড়ে বার কয়েক পিট্ পিট্ ক'রে কি উচ্চারণ করলো—তার পর আবার উঠে সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়ে আবার পর মুহূর্ত্তে বসে পড়ে একেবারে উপুড় হয়ে কপাল মাটিতে ঠেকিয়ে আবার পিট্ পিট্ করে কি বললো। এমনি ওঠা, বসা, সামনে ঝুঁকে পড়া, মাটিতে কপাল ঠেকান বার দু'য়েক হ'য়ে গেল, তারপর একবার ডান দিকে এক-বার বাঁ দিকে ফিরে কি বললো, তারপর দাঁড়িয়ে বই থেকে কি পড়া হল তাই শুনল, তারপর হাত উঠিয়ে কি প্রার্থনাটা করলো, তারপর সবাই আপন হাত আপন মুখের উপর বুলিয়ে চুমো খাওয়ার মত শব্দ করলো—আর হয়ে গেল আজকার উপাসনা। এই যে pantomime—এর অর্থ ক'জনে বুঝতে পারলে? এ উপাসনাতে ক'জন যোগ দিলে? এক ধর্ম্মের নামেই এমন করে লোকে কিছু না বুঝে ওঠা-বসার কষ্ট সহ্য করে আসছে;—কিন্তু এই কি প্রকৃত ধর্ম্ম? ধর্ম্মের মানে মুক্তি না হয়ে এমন দাসত্ব কেন? আর যে-সে দাসত্ব নয়—মনের দাসত্ব। শরীরের দাসত্ব থেকে মুক্তির তবুও আশা থাকে, কিন্তু এ মনের দাসত্ব থেকে মুক্তি কোথায়? মনে ইচ্ছা ক'র, তবে ত শরীরের দাসত্ব ঘোচে। কিন্তু মনই যখন ইচ্ছা করে না, তখন মনের মুক্তি হবে কেমন করে? অথচ এই যে ওঠা বসা, এর মধ্যেও একদিন প্রাণ ছিল, এবং যাঁরা জ্ঞানী ব্যক্তি তাঁদের জ্ঞানের সঞ্জীবনীসুধা পান করলে এখনও এই অর্থহীন ওঠা-বসা সজীব হয়ে ওঠে। কিন্তু সে ক'জন?—হাজারের মধ্যে ন'শ নিরনব্বই জনই ত সেই তেরো শো বৎসরের শব বুকে করে নিয়ে বেড়াচ্ছে। তাই বলছিলাম আজকার আনন্দ অন্তরের প্রকৃত আনন্দ নয়—শুধু আনন্দের অভিনয় মাত্র।—তারপর যখন মনে হয় যে এই দাসত্বের

নিগড়ে মন এমন কঠিনভাবে বাঁধা পড়ে রয়েছে যে উপাসনার অংশটুকুর পরে যে বক্তৃতার অংশটুকু আছে, সেটুকু সময়ের মাহাত্ম্যে উপাসনার সঙ্গে এমনি জড়িয়ে গিয়েছে যে, সেটুকুও সাধারণের অবোধ্য ভাষায় না পড়লে হ'বে না। অথচ মনের এমন বল নেই যে সেটুকুও আমার সহজবোধ্য মাতৃভাষায় পড়বো। এইত আমার অবস্থা। এর মধ্যে আনন্দের স্থান কোথায়?—সেদিন চীনদেশবাসীর অবস্থার কথা পড়ছিলাম। তাদের চীনা রাজা মিং বংশের শেষ বংশাবতংসকে পরাজয় করে মাঞ্চুরা যখন তাদের স্বাধীনতা কেড়ে নিল, তখন মাঞ্চুদের একটা ঘোর দুশ্চিন্তার কারণ উপস্থিত হলো। মাঞ্চুরা দেখলে যে চীনদের তারা লড়াইয়ে হারিয়েছে বটে কিন্তু তারা তাদের চেয়ে ঢের সভ্য, তাদের জ্ঞানবিজ্ঞান তাদের চেয়ে ঢের উন্নত। তাই মাঞ্চু-বিজেতারা চীনদের মনকে দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ করবার জন্য উপায় স্থির করতে বসে গেল। শেষে তারা এমন এক উপায় স্থির করলে যে, তাতে চীনদেশবাসী শরীরে ও মনে উভয়ত মাঞ্চুদের কাছে ক্রীতদাসের মত হয়ে থাকলো। মাঞ্চুরা তাদের পূর্ব্ব রীতি-নীতি আচারব্যবহার শিক্ষাদীক্ষার বাহ্যিক আচরণের মধ্যে হস্তক্ষেপ করলে না। কিন্তু তাদের বিদ্যালয়ের পাঠ্যগুলি এমন করে দিল যে, সেগুলির মানে গুরু বা শিষ্য কারও সুবোধ্য রইল না—বরং একান্ত অবোধ্য হয়ে গেল। আর তাই শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চীনের লোক মুখস্থ করে বিদ্বান্ বলে পরিচিত হতে লাগল; ফলে বহির্জ্জগতের সঙ্গে তাদের সমস্ত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। এবং সময় যদিও আপন মনে বয়ে যেতে থাকল, কিন্তু চীন-দের বিদ্যাবুদ্ধি জ্ঞানালোচনা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। না জানি

কোন্ শুভ মুহূর্ত্তে য়ুরোপের কামান গিয়ে চীনের সিংহদ্বারে গর্জ্জে উঠলো, আর চীনদেশবাসীর দাসত্বশৃঙ্খল ঝন্ ঝন্ করে বেজে উঠে তাদের নিজের অবস্থা জানিয়ে দিল। আজ বাঙালী মুসলমানের অবস্থা কি মাঞ্চুপদদলিত চীনদেশবাসীর সমতুল্য নয়? তারা কি চীন-দেশবাসীর চেয়ে অধিকতর দুর্দ্দশাগ্রস্ত নয়? চীনেরা তাও রক্ত-মাংস-দেহধারী মাঞ্চুদের দেখতে পেত—আর সেই জন্য তাদের সঙ্গে লড়তে পারত। কিন্তু বাঙালী মুসলমানের মনকে কোন্ মাঞ্চুরাজা এখন দাসত্ব-নিগড় পরিয়ে রেখেছে? তারা কার সঙ্গে যুদ্ধ করবে? মানুষ মানুষের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারে—কিন্তু নিরাকারের সঙ্গে যুদ্ধ করতে সে নিতান্ত অপারগ। জড় বস্তুকে বন্দুক, কামান, তলওয়ার দিয়ে আঘাত করা যায়, খণ্ডিত করা যায়, কিন্তু ছায়ামূর্ত্তির শরীরের ভিতর দিয়ে গোলাগুলি প্রবেশ করে বেরিয়ে যায়,—ছায়ামূর্ত্তি যেমন তেমনি থাকে। তাই বলছিলাম বাঙলার মুসলমানরা চীনদের চেয়েও অধিকতর করুণার পাত্র।

এইত গেল আমাদের নিজের অবস্থা। প্রতিবেশীর দিকে যদি তাকাই, তাহ'লে তাকেও দেখি আমার মত দুর্দ্দশাগ্রস্ত। সেও আজ বহু শতাব্দীর পূর্ব্বের ত্রিং টিং ছটু কিং কিং কিড়িং আওড়াচ্ছে। সেও আজ উপাসনা করতে গিয়ে নিরীহ ছাগ-শিশুকে যূপ কাঠের মধ্যে ফেলে তার উপর খাঁড়ার ঘা মারছে।—মুসলমান যেমন পুরাতন প্রচলিত প্রথার সামনে মাথা নুইয়ে উপাসনার কাজ করছে—সেও তেমনি ইট কাঠ পাথরের মন্দির আর খড় মাটি রংএর প্রতিমাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করছে।

আসল অন্তরের অন্তরতম দেবতার নিকট আত্মনিবেদনের ভাষা আজ বাঙলার মুসলমানও যেমন ভুলেছে, হিন্দুও তেমনি ভুলেছে। তারপর প্রতিবেশীদের ভিতর আর একটা অত্যদ্ভুত আচার দেখছি। তাদের সবারি একরকম রং, একরকম আচার, একরকম ভাষা—কিন্তু তাদের কেউবা আর একজনার মাথায় পা' তুলে দিয়ে নাকি তাকে আশীর্ব্বাদ করছে ; আর কেউবা আর একজনার সঙ্গে দেখা করতে তার বাড়ীর দরজার সামনে গিয়ে বলছে 'মশাই' আমি অমুক এসেছি, আপনি দয়া করে বেরিয়ে আসুন। বেচারীর সাধ্য নেই যে সে বাড়ীর হাতার মধ্যে প্রবেশ করে—কেননা তাহ'লে যে পবিত্র ব্যক্তি সেই বাটীতে বাস করেন তাঁর পবিত্রতা নষ্ট হবে, এবং ফলে উভয়ই পতিত হবে। সেই যে কতশত শতাব্দী পূর্ব্বে সভ্য অসভ্যের মধ্যে তারতম্য রক্ষা করবার জন্য একটা প্রথার সৃষ্টি হয়েছিল, তা' আজও রয়েছে—আরও কতদিন থাকবে কে জানে!

তারপর আজকার আনন্দ উৎসবের দ্বিতীয় অধ্যায়, নমাজ শেষ করে উঠে পরস্পর প্রেমালিঙ্গন। পূর্ব্বেই বলেছি যে এই প্রেমালিঙ্গন থেকে অর্দ্ধেক মুসলমান-জগত বঞ্চিত। অপরার্দ্ধের নিকট এই আলিঙ্গন এই কোলাকুলি একটা প্রথা মাত্র। এই আলিঙ্গনের সঙ্গে বৎসরাবধি-সঞ্চিত মনোমালিন্যের কণামাত্রও ধুয়ে যায় না। বরং অনেক ক্ষেত্রে বর্দ্ধিত হয়। তার উপর আবার মুসলমান-জগতের অর্দ্ধেক পৃথিবীর মানবসমষ্টির দশমাংশের মাত্র একাংশ। বক্রি নয় অংশই এই আলিঙ্গনের বাহিরে। আজিকার এই মিলন-উৎসবে দুই বাহু প্রসারিত করে আমি পাচ্ছি জগতের মানবসমূহের মাত্র এক দশমিক ভাগকে!

তাই আজ এই আনন্দ-উৎসবে আনন্দের চেয়ে বিষাদের ভাগই মনের উপর চাপ দিচ্ছে বেশি করে'। যেদিকে তাকাচ্ছি সেই দিকেই কেবল নিষ্ঠুরতার অভিনয়। অতীত এবং বর্ত্তমানের ইতিহাস চোখের সামনে অগণিত জীবের রক্তে ভিজে লাল হয়ে দেখা দিচ্ছে। এই লাল রং আকাশে বাতাসে চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে—যেন সমস্ত প্রকৃতি তার রক্তনেত্রের ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে পৃথিবী বিভীষিকাময় করে তুলেছে। প্রাণ একেবারে হাঁপিয়ে উঠছে। আর এক-একবার হতাশনেত্রে তাকিয়ে দেখছে, এ বিভীষিকার মধ্যে এমন কোথাও কোন চিহ্ন দেখা যাচ্ছে কিনা যা' মনকে একটু অভয় দিতে পারে—এমন কোনও আলোকের সাক্ষাৎ পাওয়া যাচ্ছে কিনা যার বিমল জ্যোতি এই ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ে স্নেহের প্রলেপ দিতে পারে। আশাতেই মানুষের জীবন। অতীত এবং বর্ত্তমানের মত ভবিষ্যতও যদি এমনি ঘোর তমসাচ্ছন্ন হয়ে থাকে, তাহ'লে মানুষ বাঁচে কি করে? আশা মরীচিকা হ'তে পারে, কিন্তু তবুও তাতে একটা সঞ্জীবনী-শক্তি আছে। তাই যখন দেখছি যে আমেরিকায় শ্বেতাঙ্গের প্রতিনিধিস্বরূপ কাফ্রি নির্ব্বাচিত হচ্ছে, যখন দেখছি যে দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতবাসীর দুঃখে শ্বেতাঙ্গ খৃষ্টান পাদ্‌রির হৃদয় ভেদ করে সহানুভূতির ক্রন্দনধ্বনি উত্থিত হচ্ছে, যখন দেখছি যে ভারতের কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্তের জন্য য়ুরোপের শ্বেতাঙ্গ-রমণী প্রাণপাত করছে, যখন দেখছি যে বাঙলার দেশী মন্ত্রীর যোগ্যতম ব্যক্তি নির্ব্বাচনের সময় হিন্দু মুসলমানকে ভোট দিচ্ছে, যখন দেখছি যে বাঙলার মুসলমান রবীন্দ্রনাথকে আপনার জন বলে মনে করছে, যখন দেখছি বাঙলার মুসলমান লেখকের লেখার মধ্যে স্বাধীনতার বাতাস বইছে—তখন মনে ক্ষীণ আশার সঞ্চার

হচ্ছে। হয় ত বা এমন একদিন আসবে, যেদিন মানুষ মানুষকে শ্বেত, পীত, কৃষ্ণ, খৃষ্টান, মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, অগ্নিউপাসক, নাস্তিক, প্রাচ্য, প্রতীচ্য বলে দেখবে না—দেখবে কেবল মানুষ বলে। সেই শুভদিনের জন্য আমরা কায়মনে প্রার্থনা করছি। আর সেই শুভদিনের আশায় আমরা দুই বাহু প্রসারিত করে বিশ্ববাসী সকল নরনারীকে বক্ষে টেনে নিয়ে নিবিড় প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ করছি।

তরিকুল আলম।

আদিম মানব।

——:০:——

(আমার প্রথম বয়েসের লেখা "জয়দেব" পড়ে সবুজ পত্রের কোনো কোনো পাঠক জানতে চেয়েছেন আমার সেকালের আর কোন লেখা আছে কিনা?

আমি অনেক খুঁজেপেতে আর একটি প্রবন্ধের সাক্ষাৎ লাভ করেছি, যার নীচে আমার স্বাক্ষর আছে। কিন্তু পড়ে দেখছি, সেটি বীরবলের লেখা আমি তার বেনামদার মাত্র।

আমি সেটি পুনঃপ্রকাশিত করছি দুটি কারণে। প্রথমত—যাঁরা আমার ছাত্রাবস্থার লেখা দেখতে উৎসুক তাঁদের কৌতূহল চরিতার্থ করবার জন্য।

দ্বিতীয়ত—এই সত্য প্রমাণ করবার জন্য যে লোকে যাকে বীরবলী ঢং বলে, সে ঢং ক্রিয়াপদের হ্রস্বদীর্ঘতার উপর নির্ভর করে না। ও হচ্ছে রচনার একটা বিশেষ ভঙ্গী। সকলেই দেখতে পাবেন যে, "আদিম মানবের" ভাষা সাধুভাষা।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী)

*　　*　　*　　*

যথার্থ, নিয়মবদ্ধ, সুসংলগ্ন জ্ঞানের নাম বিজ্ঞান। বিজ্ঞানে যাহা বলে, তাহা সকল দেশেই সকল সময়েই সত্য—বিজ্ঞান কোনও দেশের বা কোনও নির্দ্দিষ্ট সময়ের সম্পত্তি নহে। যে কেহ, যখন তখন, ইচ্ছা করিলেই, বিজ্ঞানের কথা যাচাই করিয়া লইতে পারেন। সকল বিষয়ে বৈজ্ঞানিক খাঁটি সত্য জন-সাধারণের কাছে কখনই আদরের সামগ্রী নয়। সত্যের সঙ্গে অনেক আপদ-বালাই থাকে।

সত্য অতিশয় গর্ব্বিত ও উদ্ধত ভাবে আমাদের নিকট আসিয়া হাজির হয়। তাহাকে ঘরে লইলে, অনেক পুরাতন, বহুদিন প্রতিপালিত, দুর্ব্বল বা সবল বিশ্বাস সকলকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিতে হয়। ভুল বিশ্বাসগুলি অনেক যত্নে, অনেক কষ্টে সংগ্রহ করিয়াছি। কিম্বা উত্তরাধিকারসত্ত্বে লাভ করিয়াছি। অতএব স্বোপার্জ্জিত কিম্বা পৈতৃক বলিয়া আমাদের কাছে তাহাদের যে মূল্য আছে, সত্য তাহা বুঝে না। ভুল বিশ্বাসগুলি পূর্ব্বে অনেক কাজে লাগে দেখিয়াছি এবং তাহাদের দরুণ অনেক সুবিধা ভোগ করিতেছি, এ কথা বলিলেও সত্য তাহা কানে তোলে না। এই সকল কারণে, সকলের পক্ষে কেবলমাত্র সত্যকে লইয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করা একেবারেই অসম্ভব। সাধারণ লোকে সাধারণ বিশ্বাস ও জ্ঞান লইয়াই শান্তিতে থাকে। সাধারণ বিশ্বাসের ভিতর সত্য ও মিথ্যা দুই সপত্নী নির্ব্বিবাদে ঘর করে। একত্রবাসের অভ্যাসবশতঃ তাহাদের স্বাভাবিক জ্ঞাতিবৈরতার পরিবর্ত্তে একটা মেলামেশার ভাব আসিয়া পড়ে। মিথ্যা, সত্যের উজ্জ্বল পরিচ্ছদ পরিয়া ও সত্য ব্যবহারিক উপযোগিতার ধূসর বস্ত্রে নিজের দীপ্তরূপ প্রচ্ছন্ন করিয়া লোকের চোখের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায়। সুতরাং সকল দেশেই দর্শন-বিজ্ঞান লব্ধ জ্ঞানের সহিত মনুষ্যসাধারণের সহজবুদ্ধি-লব্ধ জ্ঞানের একটা তুলনা করিয়া, বিজ্ঞানলব্ধ জ্ঞানকে সকল সময়েই লোকে অনাবশ্যক এবং অনেক সময়েই ভ্রমাত্মক বলিয়া মনে করে। মনে এইরূপ একটা ধারণা জন্মাইয়া যায় যে, বুদ্ধিবৃত্তির সম্যক্ পরিচালনার দ্বারা যাহা জানিতে হয়, তাহা অপেক্ষা, বিনা আয়াসে লব্ধ মতামত শ্রেষ্ঠ; কারণ কোনও রূপ না ভাবিয়া চিন্তিয়া আমরা যাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি, তাহা

অবশ্য ঈশ্বরদত্ত জ্ঞান। দর্শন, বিজ্ঞান, মানব চেষ্টার ফল; অতএব প্রমাদপূর্ণ হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু সহজ বুদ্ধি নাকি প্রকৃতির একটি অংশমাত্র, তাই সাধারণ মতামত অন্তঃকর্ণে শ্রুত দৈববাণীর ন্যায় নিঃসংশয়িতরূপে গ্রাহ্য। এরূপ বিশ্বাসে সোয়াস্তির ন্যায় সুখও আছে। আপনা অপেক্ষা অপর কাহাকেও আমরা সহজে বড় বলিয়া মানিতে চাহি না, যদি কেহ নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া পড়ি। আবার অপরে যে কারণে বড়, তাহাতে তাহার সমান হইবার অভিপ্রায় রাখিলে বিশেষ পরিশ্রমের আবশ্যক, কিন্তু পরিশ্রম করিতে লোক সহজেই নারাজ—তাহার উপর আবার একপ্রকার পরিশ্রমেই প্রত্যেক কিছু আর একইরূপ ফললাভ করিতে পারে না। সুতরাং সহজ জ্ঞানের দৈবশক্তিতে নির্ভর করিয়া যদি আমরা আপনাদিগকে অধিকাংশ লোকের সমকক্ষ ও দার্শনিক বৈজ্ঞানিকদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি, তাহা হইলে তদপেক্ষা আর কি অধিক সুখের হইতে পারে? রোজগার না করিয়া ধনী হইতে কাহার অসাধ? কিন্তু যাঁহারা মনোবিজ্ঞান আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে, লোকে যে সকল মতামত প্রকৃতি কর্তৃক স্বীয় জ্ঞানভাণ্ডার হইতে দত্ত অমূল্য রত্নভ্রমে যত্নসহকারে রক্ষা করেন ও জনসাধারণের সমক্ষে আপন গৌরববৃদ্ধির মানসে প্রকাশ করেন, তাহার প্রতি কাণা কড়ি পার্শ্ববর্ত্তী লোকদিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত। প্রকৃতি, তাঁহার জ্ঞানধন কাঙালিবিদায়ে অপব্যয় করেন না।

আমরা শৈশবাবস্থায় সাধারণের মধ্যে প্রচলিত মতামত এমনই অলক্ষিতভাবে শিক্ষা করি যে, পরে তাহা যে শিক্ষালব্ধ, তাহা মনে

থাকে না। বিজ্ঞান ও সাধারণ বিশ্বাস, উভয়েই শিক্ষাজাত। মানব বুদ্ধির সম্পূর্ণ সুশৃঙ্খল ও বৈধ পরিচালনার ফল বিজ্ঞান। মানব বুদ্ধির অসম্পূর্ণ, বিশৃঙ্খল ও অবৈধ পরিচালনার ফল সাধারণ মত। বিনা পরিশ্রমে সত্য মেলে না, পৃথিবীতে মিথ্যা প্রত্যেক নিশ্বাসে পথের ধূলির ন্যায় অজ্ঞাতসারে আমাদের অন্তরে প্রবেশ করে।

মানবজাতি সম্বন্ধে, নানা দেশে নানাপ্রকার সাধারণ মত প্রচলিত আছে। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা আজ কাল অসম্ভব যত্ন ও চেস্টা দ্বারা অনেক সত্য নির্ণয় করিয়া মানব-বিজ্ঞান গড়িয়া তুলিতেছেন। বলা বাহুল্য যে, শেষোক্তের সহিত পূর্ব্বোক্তের কোনও দেশেই সম্পূর্ণ মিল দেখা যায় না। সাধারণতঃ মানবজাতিসম্বন্ধে জ্ঞানবৃদ্ধি না হইলেও লৌকিক মত অদৃশ্য হইবার সম্ভাবনা নাই।

আমরা প্রথমতঃ নিজ পরিবারের মধ্যে প্রচলিত আচার, ব্যবহার, ধর্ম্ম ও নিজ পরিবারভুক্ত লোকদিগকে আদর্শ স্থির করিয়া, সেই আদর্শের সহিত অপর সাধারণের আচার, ব্যবহার, ধর্ম্ম ও চরিত্রের তুলনা করিয়া, অপর সম্বন্ধে ভাল মন্দ মতামত ব্যক্ত করিতে আরম্ভ করি। পারিবারিক দোষ সকল অভ্যাসের গুণে দোষ বলিয়া বুঝিতে পারি না। অন্যের ভিতর, অদৃষ্টপূর্ব্ব গুণ সকল দেখিলে, তাহা হয় দোষ, নয় অত্যন্ত হাস্যজনক পদার্থ বলিয়া মনে হয়। অন্যের কিছু নূতন দেখিলেই, তাহা, হয় চরিত্রহীনতা, নয় নির্ব্বুদ্ধিতাপ্রসূত বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া বসি। স্ত্রীজাতি পরিবারমধ্যে বদ্ধ থাকেন বলিয়া তাঁহারা এইরূপ মনোভাব ছাড়াইয়া উঠিতে পারেন না। তাঁহাদের দেহের ন্যায়, তাঁহাদের হৃদয় মনও গৃহের চতুঃসীমার মধ্যে চির অবরোধে বাস করে। তাঁহাদের যদি কোনও গ্রন্থ ভাল লাগে, তাহা

হইলে, তাঁহারা গ্রন্থকারকে, ভ্রাতা কিংবা প্রণয়পাত্রস্বরূপে ভালবাসিতে ইচ্ছা করেন! আত্মীয়ের প্রতি ভালবাসা ছাড়াও পৃথিবীতে যে অন্য প্রকারের ভালবাসা জন্মিতে পারে, সে কথা তাঁহাদের ধারণার বহির্ভূত। পৃথিবীতে যদি কাহাকেও তাঁহাদের মহৎ বলিয়া, কিংবা উচ্চ মনুষ্যত্ববিশিষ্ট বলিয়া মনে হয়, তাহা হইলে তাহাকে মনে মনে তাঁহারা নিজ পরিবারভুক্ত করিয়া ল'ন। অন্তঃপুর প্রাচীরের বাহিরে যে বিশাল জগৎ পড়িয়া আছে, তাহার কথা, শ্রুতকাহিনীর ন্যায়, তাঁহাদের নিকট কখনই সম্পূর্ণ বিশ্বসনীয় হইতে পারে না।

পুরুষজাতির কার্য্যোপলক্ষে অনেকের সহিত মেলা-মেশা আবশ্যক তাই পুরুষেরা পারিবারিক আদর্শ ত্যাগ করিয়া, সামাজিক আদর্শ গঠন করেন। যিনি পল্লিগ্রামে বাস করেন, গ্রাম্য সমাজের অনুমোদিত আচার ব্যবহার ইত্যাদিই তাঁহার আদর্শ; যিনি নগরে বাস করেন, নাগরিক সমাজ তাঁহার আদর্শ। যাঁহারা দেশভ্রমণে ও সাহিত্য ইত্যাদির চর্চ্চা দ্বারা, নিজের মনের প্রসরতা বৃদ্ধি করিয়াছেন, তাঁহারা জাতীয় আদর্শ গঠন করেন। শিক্ষাপ্রাপ্ত হিন্দুসমাজের নিকট হিন্দুজাতিই মানব আদর্শের চরমোৎকর্ষ লাভে সমর্থ হইয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়। অন্য অন্য জাতির পক্ষেও এই কথা সত্য। নানা বিভিন্ন জাতির সমাজ সম্যক্‌রূপে আলোচনা করিয়া, নানা বিভিন্ন জাতিকে ভালরূপে জানিলে পর, তবে মানবসম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক মতে বিশ্বাস জন্মে; অন্যান্য মানবজাতির প্রতি সহৃদয়তা জন্মে। অজ্ঞতা হইতেই হৃদয়ের অনুদারতা জন্মলাভ করে। প্রশস্ত জ্ঞান ও সঙ্কীর্ণ হৃদয়ের সম্মিলন, অত্যন্ত বিরল। যে জাতি যত অসভ্য, তাহারা সেই পরিমাণে আপনাদিগকে শ্রেষ্ঠ এবং অপর জাতি সকলকে

নিকৃষ্ট মনে করে। এস্‌কুইমোদিগের বিশ্বাস, ঈশ্বর প্রথমে ইংরাজ, ফরাসী ইত্যাদি ইউরোপীয়দিগকে সৃষ্টি করেন; কিন্তু প্রথম চেষ্টার ফল আশানুরূপ ভাল হয় নাই। তাহার পরে সৃষ্টিকার্য্যে দক্ষতা লাভ করিয়া, ভগবান সর্ব্বশেষে জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীব এস্‌কুইমো-দিগকে সৃষ্টি করেন। প্রতিভাসম্পন্ন লেখকদিগের প্রথম রচনা অপেক্ষা পরের রচনা যেরূপ শ্রেষ্ঠ, ইউরোপীয়দিগের অপেক্ষা এস্‌কুইমোরা সেইরূপ শ্রেষ্ঠ। তাহারা আপনাদিগকে Inoits. অর্থাৎ মানব-নামে অভিহিত করে। অপর কাহাকেও তাহারা আদপে মনুষ্যজাতিভুক্ত বলিয়া স্বীকার করিতে চাহে না। তাহারাই পৃথি-বীর একমাত্র মানবজাতি; তাহাদের ধর্ম্মই যথার্থ মানবধর্ম্ম এই বিষয়ে আমাদের সহিত তাহাদের আশ্চর্য্য সাদৃশ্য দেখা যায়।

মানবজাতি কত দেশে কত বৈচিত্রবিশিষ্ট; মানব-চরিত্র দেশ-ভেদে কত বিভিন্ন আকার ধারণ করে, দেশভেদে মানুষের আচার, ব্যবহার, ধর্ম্মনীতি ইত্যাদি, পরস্পর হইতে কত বিভিন্ন, এ সকল বিষয়ে সত্যের সহিত সম্যক পরিচয়ে আমাদের পক্ষে অনেক উপকার আছে। যদি আমরা দেখিতে পাই, মনুষ্যমাত্রেরই মধ্যে একটা মিল আছে, সর্ব্বত্রই বুদ্ধি ও নীতির শ্রেষ্ঠত্বেই যথার্থ মনুষ্যত্ব নিহিত, তাহা হইলে, আমাদের মন হইতে আমরা যাহাকে স্বজাতিপ্রিয়তা বলি এবং যাহা বিজাতির প্রতি ঘৃণার রূপান্তর বই আর কিছুই নহে, তাহার পরিবর্ত্তে, মনে শ্রেষ্ঠ মনুষ্যত্বের প্রতি শ্রদ্ধার উদ্রেক হয়। দেশ কাল বিচার না করিয়া, আমরা যাহাতে বুদ্ধির উদারতা, তীক্ষ্নতা ও চরিত্রের মহত্ব ও সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করি, তাহার প্রতিই আমাদের শ্রদ্ধা ও অনুরাগ জন্মে। যখন আমরা প্রমাণ পাই যে, দেশভেদে

এবং একই দেশে কালভেদে, স্বতন্ত্র রকমের আচার, ব্যবহার, ধর্ম্ম ও নীতি, প্রকৃতির অবিচলিত নিয়মানুসারে ঘটিয়া থাকে, তখন আমরা কখনও কেবলমাত্র আচার ব্যবহারের বিভিন্নতা হইতে জাতি-সমূহের সভ্যতা ও অসভ্যতা প্রমাণ করিতে উদ্যত হই না, কাহাকেও ঘৃণার চক্ষে দেখি না। সর্ব্বশেষে এই মহৎ সত্যটি জানিতে পারি যে, আচার-ব্যবহারে জাতিকে বড় করে না, উন্নত মনুষ্যচরিত্র হইতেই জাতির এবং আচার ব্যবহারের শ্রেষ্ঠত্ব বিশিষ্টরূপে উৎপন্ন হয়।

অজ্ঞতাজাত, অনুদার মনোভাবের জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত আমাদের বাঙ্গলা দেশে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। আজকাল আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মধ্যে এইরূপ নিজমহত্বে বিশ্বাস ও স্বদেশবাৎসল্য ও স্বজাতি-প্রিয়তা কিঞ্চিৎ অনাবশ্যকরূপে অপরিমিত হইয়া পড়িয়াছে। মনে হয়, এতটা না হইলেও বঙ্গসন্তান ক্ষতিগ্রস্ত হইতেন না। বিজাতীর প্রতি ঘৃণা ম্যালেরিয়ার মত সকলের হৃদয় মন আক্রমণ করিয়াছে। বিদেশী সভ্যতাকে গালি না দিলে লেকে সংবাদপত্র পড়ে না। সকলেরই বিশ্বাস, শত্রুর মুখে ছাই অর্পণ করা ব্যতীত, বাঙ্গালীর উন্নতির অন্য কোনও উপায় নাই। কোনও বিষয়ে ইউরোপীয়দিগের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করা গর্হিতকার্য্য বলিয়া গণ্য। আর্য্যদিগের ন্যায় আর্য্য সহানুভূতিরও সাগর পার হইলে জাতি নষ্ট হয়। শূন্যগর্ভ আত্ম-গরিমায় পূর্ণ হইলেই বাঙ্গালী পাঠক রচনার আদর করেন।—লেখায়, সুযুক্তি, সুবিবেচনা ও সুরুচির অভাবই রচনা অধিক মূল্যবান করে। দুঃখের বিষয় এই যে, অন্যায় ও অশোভন মনোভাব, বাঙ্গলার অনেক শিক্ষিত বলিয়া খ্যাত লোকদিগের কথায় ও লেখায় যথেষ্ট প্রকাশ পায়। বাঙ্গালী পাঠকদিগের মনে অন্যান্য জাতি সম্বন্ধে ঈষৎ কৌতু-

হল উদ্রেকের অভিপ্রায়ে, আমি উপস্থিত প্রবন্ধে গুটিকতক অসভ্য জাতির আচার ব্যবহারাদির বিবরণ, সংক্ষেপে বলিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

মানুষকে ভালরূপে জানিতে হইলে, সভ্য অসভ্য, সকল জাতির বিষয়ই সমানভাবে পর্য্যালোচনা করা প্রয়োজনীয়। কিন্তু অসভ্য জাতিদিগের বিষয় জানায়, একটু বিশেষ লাভ আছে। আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ প্রমাণ করিয়াছেন যে, মানুষ কিছু একেবারে সভ্য হইয়াই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে নাই। আজকাল যাহাদিগকে সভ্য দেখি, তাহারা পূর্ব্বে অসভ্য ছিল। মানবজাতি একপদ একপদ করিয়া, সভ্যতার পথে অগ্রসর হইয়াছে। ইতিহাসে এই ক্রমোন্নতির কথা অনেকটা জানা যায়। কিন্তু অনেকটা সভ্য হইবার পূর্ব্বে, আর ইতিহাস রচনা মানুষের পক্ষে সম্ভবে না। সুতরাং ইতি-হাসের পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থা আমাদের জানিবার কোনও নিশ্চিত উপায় ছিল না—বরাবর খানিকটা আন্দাজ ও অনুমানের দ্বারা, গোঁজামিলন দিয়া কার্য্য উদ্ধার করিতে হইতেছিল; কারণ প্রত্যক্ষ প্রমাণের এ স্থলে বিশেষ অভাব। নাইল নদীর ন্যায় মানব-প্রবাহেরও উৎপত্তি স্থান অনাবিষ্কৃত প্রদেশে লুক্কায়িত ছিল। মাঝে মাঝে দুই এক জন গোড়ার খবর বাহির করিয়াছেন বলিয়া, সভ্য সমাজের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন; কিন্তু লোকে তাঁহাদের কথা মানে নাই, তাঁহারাও নিজের কথার সন্তোষজনক প্রমাণ দিতে পারেন নাই।

কিন্তু হঠাৎ ইউরোপীয়েরা মানব ইতিহাসের লুপ্ত প্রথম অধ্যায়-গুলি অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে খুঁজিয়া পাইলেন। অপরিচিত অক্ষর

ও অজ্ঞাত ভাষা হইতে মর্ম্ম উদ্ধার করিতে, প্রথমে তাঁহাদিগকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। ক্রমে বহুলোকের সমবেত চেষ্টার ফলে, আমরা অসভ্য জাতিদের ভিতরকার কথা জানিতে পারিয়াছি। বিস্তৃতকালে যাহা যাহা ঘটিয়াছে, পৃথিবীর জীব জন্তু উদ্ভিদাদি ক্রমে যতপ্রকার বিভিন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল, পৃথিবীর বিস্তৃত ক্ষেত্রে সে সকলেরই নিদর্শন পড়িয়া আছে। যাহা দূর-কালে ঘটিয়াছিল, এখন দূরদেশে তাহা বর্ত্তমান। চার হাজার বৎসর পূর্ব্বে সভ্যজগতে যাহা বর্ত্তমান ছিল, এখন তাহা প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যস্থ ক্ষুদ্র দ্বীপসমূহে ও দুর্গম পর্ব্বতের সঙ্কীর্ণ উপত্যকার মধ্যে বদ্ধ আছে। এখনকার অসভ্যদিগকে দেখিয়া আমাদের আদিম পূর্ব্বপুরুষদিগের যথার্থ অবস্থা আমরা জানিতে পারি।

যথার্থ কথা বলিতে গেলে স্বীকার করিতে হয় যে, এ প্রবন্ধে মানবজাতি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক পর্য্যালোচনার কিছুমাত্র চেষ্টা করা হয় নাই। কারণ সেরূপ চেষ্টায় কৃতকার্য্য হওয়া লেখকের জ্ঞান ও ক্ষমতার বহির্ভূত। সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বঙ্গসমাজের সহিত অসভ্য-সমাজের তুলনা করিয়া অনর্থক লোকের নিকট হাস্যাস্পদ হইবার অভিপ্রায় যে আমার নাই, এ কথা বলা বাহুল্য। Lucretius বলেন যে, তীরে বসিয়া সমুদ্রে জাহাজ ডুবিতে দেখায় বিশেষ আমোদ আছে। সনাতন আর্য্যসমাজের অটল পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ শিখরস্থায়ী বঙ্গসন্তানগণ এই সকল অসভ্যদের সামাজিক, নৈতিক এবং ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় নানাপ্রকার ভুলের ভিতর নাকানি-চুবানি দেখিয়া যদি কিছুমাত্র আমোদ বোধ করেন, তাহা হইলেই আমার শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

অসভ্যদের দেশে বাস করিয়া সুখ নাই। পৃথিবীর উত্তর সীমায় এস্‌কুইমোরা বাস করে। সে দেশে ভয়ঙ্কর শীত ; নদী, মাঠ, পর্ব্বত ইত্যাদি চির-তুষারাবৃত। এক বিন্দু তরল পদার্থ মণি মাণিক্য অপেক্ষাও দুর্লভ। এমন কি বোতলের ভিতর ব্র্যাণ্ডি জমিয়া যায়, অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে গেলে যথার্থই মুক্তা বর্ষণ হয়। শিলাবৃষ্টি ব্যতীত অন্যপ্রকার বৃষ্টি এ দেশে অজ্ঞাত। কঠিন পদার্থ ঠাণ্ডায় আরও কঠিন হইয়া উঠে। রুটি, মাংস ইত্যাদি ছুরিতে কাটে না, কুঠারের সাহায্য ব্যতীত তাহা ভাগ করা যায় না। ইউরোপীয়দিগের শরীরেও এই শীতের দৌরাত্ম্য সহ্য হয় না। মুহূর্ত্তমাত্র আবরণ মুক্ত হইলে, অস্থিমাংসগঠিত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল হিমানীক্লিষ্ট সুকুমার পুষ্পের ন্যায় খসিয়া পড়ে। ইহার উপর আবার ছয় মাস ধরিয়া দিন ও ছয় মাস ধরিয়া রাত্রি। এই দীর্ঘ দিনে সূর্য্যরশ্মি বরফের উপর প্রতিফলিত হইয়া এমন চক্‌চক্‌ করে যে, কোনও দিকে দৃষ্টিপাত করা দুষ্কর। তাহা হইলে অন্ধ হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। যখন রৌদ্রের উত্তাপে বরফরাশি গলিতে আরম্ভ করে, তখন পর্ব্বতশৃঙ্গ সকল ভাঙ্গিয়া পড়ে। বরফাবৃত পৃথিবী শতধা বিদীর্ণ হইয়া যায়—চারিদিক হইতে এই পরিবর্ত্তনের আনুষঙ্গিক কোলাহল উঠিতে থাকে। এই দিনের আলোকে, লোকালয়হীন বরফের প্রান্তর, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাঁকচুরা আকারের পর্ব্বত, তমসাচ্ছন্ন গভীর গহ্বর সকল চোখের সম্মুখে ব্যক্ত হয়। চারিদিকে কোনও প্রাচীন জগতের ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে, মনে হয়। এই অফুরন্ত দিন শরীরে ক্লান্তি ও মনে অবসাদ সহজেই আনয়ন করে।

ছয় মাস রাত্রি আরও ভয়ানক। এই দীর্ঘ রাত্রিতে কেবল

নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকার ও অসহ্য নিস্তব্ধতা দেশ জুড়িয়া বসিয়া থাকে। সৃষ্টির পূর্ব্বে বিশ্বজগতের যেরূপ অবস্থা ছিল বলিয়া কল্পনা করি, এখানে তাহা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই। এই অনিবিড় অন্ধকারে চতুঃ-পার্শ্বের দৃশ্য অত্যন্ত ভীষণ দেখায়। আকাশপথে পুরাকালের নিশাচরদের ন্যায়, অনির্দ্দিষ্ট আকারের কত বিভীষিকা, ছায়ার ন্যায় নিঃশব্দে চলিয়া যায়। ক্ষীণ অস্পষ্ট নক্ষত্রালোকে, দূরের পর্ব্বত সকল বিপুল দেহশালী নিদ্রিত দৈত্যকুল বলিয়া মনে হয়।

ঘোর নিস্তব্ধতার মধ্যে, নিজের বুকের ধুক ধুক শব্দও স্পষ্টরূপে শোনা যায়—দুই তিন ক্রোশ দূরের ঘণ্টার শব্দ কানে আসে। সকলেই জানেন, এই দেশ বৈদ্যুতিক আলোকের জন্মস্থান। যখন তখন অন্ধকার ভেদ করিয়া, বৈদ্যুতিক আলোক সহস্রপ্রকার বিভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করিয়া দেখা দেয়। যখন অরোরা বোরিয়ালিস্ দিগন্তবিস্তৃত রক্তবর্ণ ধনুকের আকারে উপস্থিত হয়, তখন মনে হয়, অন্তরীক্ষে আগুন লাগিয়া গিয়াছে। অরোরা বোরিয়ালিসের আলোক চারি-দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া বরফের উপর অসংখ্য আকারে প্রতিফলিত হয়; অরোরা বোরিয়ালিস্ অল্পক্ষণের জন্য এই প্রচুর আলোক রাশি দ্যুলোকে ও ভূলোকে ছড়াইয়া দিয়া, সহসা অদৃশ্য হয়—আবার সমস্ত অন্ধকারে আবৃত হইয়া পড়ে।

এ দেশে ফল নাই, ফুল নাই, শ্যাম-দুর্ব্বাদল নাই, সুমধুর জ্যোৎস্না নাই। দক্ষিণ পবন মৃদু হইয়া আসে না, ঝড়ের আকার ধরিয়া আসে, চন্দনের শীতল স্পর্শের পরিবর্ত্তে কঠিন তুষার কণা বহিয়া আনে—ঘন পল্লবের ভিতর দিয়া মর্ম্মর ধ্বনি বহিয়া আনে না, বরফে প্রতিহত হইয়া বিকট চীৎকার করে। এ দেশে বসন্ত সর্ব্বা-

পেক্ষা বিশ্রী ঋতু। আমাদের দেশের সস্তা কবিরা সে দেশে গেলে, তাঁহাদের ব্যবসা মারা যায়। কাহারও কাহারও চক্ষে, এ দেশও মধুর সৌন্দর্য্যময় বোধ হয়। অনেক ইংরেজ এ দেশের প্রতি বিশেষ আসক্ত। কিন্তু তাহার কারণ দৃশ্য-সৌন্দর্য্য নহে, তাঁহারা বলেন, শীতের কৃপায় বেশ ভাল রকম ক্ষুধা হয়, বহুল পরিমাণে আহার করা যায়।

এই ত গেল পূর্ব্ব প্রদেশের কথা। পশ্চিম প্রদেশের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল। শীত এত অধিক নয়। কিন্তু দেশটা নিতান্ত ভিজে রকমের। গ্রীষ্মকালে ঘাস গুল্মলতায় মাঠ ঘাট সবুজ হইয়া উঠে। তবে বড় বড় গাছ পালা বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। যে দেশের কথা মনে করিতে আমাদের আতঙ্ক উপস্থিত হয়, আয়েসী-বাঙ্গালী প্রকৃতি কাতর হইয়া উঠে, তদ্দেশবাসীরা সেখানে বেশ সানন্দমনে বাস করে। তাহাদিগকে একরূপ সদানন্দ বলিলে চলে। সকাল, বিকাল, সন্ধ্যা, অষ্টপ্রহর তাহারা হাসির উপরই থাকে। তাহাদের খাবার সময় হাসি পায়, তাহারা ভদ্রলোকের সহিত কথা কহিতে গেলে হাসি চাপিয়া রাখিতে পারে না। আত্মীয় স্বজনের মৃত্যু হইলে, কান্নাতে স্বরু করিয়া হাসিতে শেষ করে—অকারণ এত আনন্দ বিদেশীরা ঠিক বুঝিতে পারে না।

অভ্যাসবশতঃ সকল দেশই সহ্য হয়, ক্রমে ভালও লাগে। মৃত্যুর পর স্বর্গেতর স্থানে গেলে মানুষকে বোধ হয়, অধিক দিন যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না; থাকিতে থাকিতে সে দেশটাও অভ্যস্ত হইয়া আসে; ক্রমে হয়ত ভাল লাগিতেও পারে।

আমেরিকার মধ্যদেশে আপাকেরা বাস করে। সেখানে বৎ-

সরের ভিতর দশ মাস এক ফোঁটাও বৃষ্টি হয় না। আকাশ সম্পূর্ণ মেঘযুক্ত থাকে—সমস্ত দিন সূর্য্য হইতে অগ্নি বর্ষণ হয়। বৃক্ষপত্রহীন, সুদূরবিস্তৃত বালুকাময় প্রান্তর ও কঠিন পর্ব্বত সকল, ছায়ার অভাবে দগ্ধপ্রায় হইয়া যায়। দিন রাত প্রবলবেগে ঝড় বহিতে থাকে—ধূলিতে চতুর্দ্দিক অন্ধকার করিয়া ফেলে। বাকী দুই মাস অজস্র-ধারায় বৃষ্টি হয়—সমস্ত দেশ জলে ভাসিয়া যায়। বৃষ্টি এবং অনাবৃষ্টি দুইয়েরই একটা বাড়াবাড়ি লক্ষিত হয়।

জন্মভূমির হীনতার জন্যই, অনেক জাতি আদিম অবস্থা হইতে উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। বাহ্য-প্রকৃতির সহিত বনিবনাও করিয়া আমাদিগকে জীবন ধারণ করিতে হয়। যেখানে প্রকৃতি জীবনপথে বাধা স্থাপন করিয়াছেন, সেখানে, সেই সকল বাধা অতি-ক্রম করিতেই আমাদের দিন চলিয়া যায়; উন্নতি করিবার অবসর থাকে না।

কোনও দেশে অধিক শীত কিম্বা অধিক গরম, শরীর মনের স্বাস্থ্যের উপযোগী নহে। যেখানে অসভ্য জাতি, সেখানেই হয় জলবায়ু অস্বাস্থ্যকর, না হয় আহার্য্য দ্রব্য বিরল। জীবন কার্য্যের পক্ষে একান্ত আবশ্যক খনিজ পদার্থের অভাবও একটি বিশেষ কারণ। Jevons এবং Greene-এর মতে, বিলাতের বর্ত্তমান উন্নত অবস্থা, ইংরাজদিগের চরিত্র অপেক্ষা, বিলাতের কয়লার খনির নিকট কিছুমাত্র কম পরিমাণে দায়ী নহে।

ভারতবর্ষেও দেখা যায় যে, অস্বাস্থ্যকর এবং অনুর্ব্বর পর্ব্বতের উপত্যকাসমূহেই এ দেশের অসভ্য জাতিদিগের বাস। কেবল নীলগিরি পর্ব্বত সম্বন্ধে এ কথা খাটে না। এই মলয় পবনের

স্বদেশে, শীত গ্রীষ্ম দুইই মাঝারি রকমের। বারমাসই সূর্য্যালোকের অভাব নাই। বৎসরের অধিকাংশ সময়ই আকাশ বেশ পরিষ্কার ও নীল। বর্ষার পর আকাশের নীলিমা আরও গাঢ় ও নির্ম্মল এবং স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ হয়। গাছ পালা, ফলে, ফুলে, ঘন পল্লবে সুশোভিত হইয়া উঠে। অসংখ্য লতা Fern-এ পৃথিবী ছাইয়া ফেলে। যেখানে সেখানে, লাল, নীল, শ্বেত, পীত, নানাবর্ণের অসংখ্য ফুল দলে দলে ফুটিয়া থাকে। চারিপাশে উঁচুনীচু শস্যক্ষেত্র হরিৎ-সমুদ্রের হিল্লোলের ন্যায়, পর্ব্বত অধিকার করিয়া বসে। দূরে পশ্চিমে সমুদ্র দেখা যায়। দেশের গুণে, নীলগিরির টোডারা অন্যান্য অসভ্য জাতি অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। অসভ্যেরা অধিকাংশই দেখিতে কদাকার ও মাথায় ছোট এবং স্বল্পজীবী; কিন্তু টোডারা দেখিতে বেশ সুন্দর, তাহাদের বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম, চক্ষু জ্যোতিপূর্ণ, নাসিকা উন্নত, তাহারা আকারে দীর্ঘ এবং ইংরাজদিগের অপেক্ষাও অধিক দিন বাঁচে। জল বায়ুর গুণে ইহারা শরীরে উন্নত, কিন্তু বুদ্ধি এবং নীতি ইত্যাদি সম্বন্ধে ইহাদের সহিত অন্যান্য অসভ্য জাতিদের সামান্য প্রভেদ। Buckle-এর মতানুসারে, যদি মানব-উন্নতি কেবলমাত্র বাহ্য প্রকৃতি সাপেক্ষ হইত, তাহা হইলে, টোডাদিগের, গ্রীকদিগের ন্যায় সাহিত্য এবং কলাবিদ্যায় পারদর্শী হওয়া উচিত ছিল, কারণ মলয় পর্ব্বত গ্রীস অপেক্ষা সৌন্দর্য্যবিষয়ে কোনও অংশেই ন্যূন নহে। টোডাদিগের এইরূপ অনুচিতরূপে চিরদিন অসভ্যাবস্থায় থাকা সম্বন্ধে সমর্থন কিম্বা প্রতিবাদের ভার বকলের শিষ্যদিগের উপর অর্পিত হইল।

বর্ত্তমান কালের ইউরোপীয় ধনী ব্যক্তিগণ, যেরূপ গ্রীসের প্রস্তর মূর্ত্তি, ইটালীর ছবি, চীন এবং জাপান দেশীয় শিল্পজাত সকলে, গৃহ

পরিপূর্ণ করিয়া, চিরজীবন শিল্প সৌন্দর্য্যে পরিবৃত থাকিয়াও, অশিক্ষা কিম্বা কুশিক্ষার দোষে সৌন্দর্য্যজ্ঞানের অভাববশতঃ, কিছুমাত্র আনন্দ উপভোগ করেন না, উক্ত বিশিষ্ট সহবাসেও চরিত্র সম্বন্ধে কিছুমাত্র শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেন না—টোডারাও ঠিক সেইরূপ প্রকৃতির সৌন্দর্য্য এবং ঐশ্বর্য্যের মধ্যে থাকিয়াও, সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অন্ধ ও উদাসীন। পড়িতে না জানিলে প্রকাণ্ড লাইব্রেরির মধ্যে বাস করার বিশেষ যে কিছু লাভ আছে, এরূপ আমার বিশ্বাস নহে।

বলা বাহুল্য, অসভ্যদের ভালরকম বাড়ী ঘর নাই। অধিকাংশ স্থলে পর্ব্বতের গুহায়, গাছের তলায়, কখনও বা মুক্তবায়ুতে, কেবলমাত্র আকাশের নীচেই তাহারা দিন কাটাইয়া দেয়। যেখানে ঘর বাঁধা নিতান্ত আবশ্যক, সেখানে হাতের গোড়ায় যা পাওয়া যায়, বাঁশ, কাঠ, খড়, গাছের ডাল পালা ইত্যাদি, তাহা দিয়াই কোন রকমে রৌদ্র বৃষ্টির হাত হইতে নিস্তার পাইবার জন্য মাথা লুকাইবার একটু স্থান রচনা করে। এক বিষয়ে সকল দেশের অসভ্যদিগের ভিতর একটা পারিবারিক সাদৃশ্য দেখা যায়। তাহারা বিশ, ত্রিশ, পঞ্চাশ, কোথাও বা দু'তিন শত লোক, আবালবৃদ্ধবনিতা সকলে মিলিয়া একটি মাত্র ঘরে বাস করে। এইরূপ ঘেঁসাঘেঁসিতে বিশেষ রকম ঘনিষ্ঠতা জন্মায়। স্বল্পায়তন স্থানের মধ্যে থাকিতে বাধ্য হওয়ায়, তাহারা কেবলমাত্র একমন নহে, কতকটা একদেহও হইয়া যায়। "বসুধৈব কুটুম্বকং" এই মহৎ বাক্যের, তাহারা আমাদের অপেক্ষা অধিক সম্মান রক্ষা করিয়াছে। অনেকে বলেন, বাঙ্গালীরা একান্নবর্ত্তী পরিবারভুক্ত বলিয়া পাশ্চাত্যদিগের অপেক্ষা অনেক উন্নত মনুষ্যত্ববিশিষ্ট। কেবলমাত্র একান্নবর্ত্তী নহে, উপরন্তু এককক্ষাবর্ত্তী অসভ্যেরা কত

উচ্চ মনুষ্যত্ববিশিষ্ট, পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর দার্শনিকেরা, সে বিষয়ে একটা মীমাংসা করিয়া দিতে বোধ হয় সক্ষম।

একটিমাত্র ঘরে দলশুদ্ধ লোকে রন্ধন, শয়ন, আহার, বিহার ইত্যাদি করায়, তাহাদের শরীর এবং গৃহের পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে ততটা আসক্তি জন্মায় না। গোয়ালে যেমন একপাল গরু থাকে, ইহারাও ঠিক সেইরূপ অবস্থায় বাস করে। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে, গরুর মালিক উক্ত জীবের স্বীয় স্বাস্থ্য লাভের পক্ষে আবশ্যকীয় জ্ঞানে, গোয়াল পরিষ্কার করেন, কিন্তু এই পঞ্চাশ শরীকের গৃহ পরিষ্কার করাটা কেহই একের কর্ত্তব্য মনে করেন না। অনেক স্থলে বাসগৃহের মেজে খুঁড়িয়া মৃতদেহ কবর দেওয়া হয়। ইহলোক এবং পরলোক, এই দুই লোকের অধিবাসীরা, দুই হাত মৃত্তিকার ব্যবধানে বাস করেন!

গারোরা ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের জন্য স্বতন্ত্র গৃহ নির্ম্মাণ করে। গ্রামের সকল ছেলেরা মিলিয়া, একটি বৃহৎ ব্যারাকে বাস করে। মেয়েদের জন্য স্বতন্ত্র মহিলাশালা আছে। যতদিন না বিবাহ হয়, ততদিন তাহাদিগকে সেখানে থাকিতে হয়। রক্ষণাবেক্ষণের জন্য জনকতক জবরদস্ত রমণী তাহাদের কর্ত্রী নিযুক্ত হয়। বৈকালে উক্ত কর্ত্রী-ঠাকুরাণীগণ ছড়ি হাতে করিয়া, কুমারীগণকে পদব্রজে হাওয়া খাওয়াইতে বাহিরে লইয়া যান। ছড়ি লইবার উদ্দেশ্য, পথের কুকুর ও ছোড়া তাড়ান। ক্রমবিকাশপদ্ধতি অনুসারে আজ কাল যাহা Kinder Garten-এ পরিণত হইয়াছে, এইখানেই বোধ হয় তাহার আদি সৃষ্টি।

বেশ ভূষা সম্বন্ধে, ভিন্ন ভিন্ন দেশের অসভ্যেরা পরস্পর অত্যন্ত

বিভিন্ন। জন্মসুলভ নগ্নতা হইতে অনাবশ্যকরূপ পরিচ্ছদপ্রাচুর্য্য ইহাদের মধ্যে সমভাবে প্রচলিত। এরূপ পার্থক্য যে সকল সময়েই অকারণজাত, তাহা নহে। কোথাও বা শীতের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য বিশেষ রকম দেহের আবরণ আবশ্যক। কোথাও বা গরমের জ্বালায় গায়ে এক টুকরাও কাপড় রাখা যায় না। তবে এ বিষয়ে কিছু নিশ্চিত নাই। বেশ ভূষার বাহুল্যের জন্য বিখ্যাত আপাকেদিগের পরিচ্ছদের ভার, সে দেশের প্রচণ্ড গ্রীষ্ম কিছুমাত্র লাঘব করতে পারে নাই। অপ্রয়োজনে কেন যে ইহারা বস্ত্রে শরীর আচ্ছাদিত করে, তাহার যথার্থ কারণ নির্দ্দেশ করা কঠিন। তবে লজ্জা নিবারণ করা যে তাহার উদ্দেশ্য নহে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। অসভ্যজাতিমাত্রেই অতি সহজে এবং অসঙ্কুচিত ভাবে, আবশ্যক হইলেই বেশ পরিত্যাগ করে। নৃত্য করিবার সময় এবং অনেক প্রকার উৎসব এবং ধর্ম্ম কর্ম্মে যোগ দান করিতে হইলে, তাহাদের দেহ, আচ্ছাদনের সম্পর্ক রহিত করা নিতান্ত আবশ্যক। অতিসভ্য প্রাচীন গ্রীক জাতির সহিত, এ বিষয়ে তাহাদের আশ্চর্য্য মিল দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদের মধ্যে লজ্জা গুণ যথেষ্ট পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়; তবে তাহাদের লজ্জার কারণ স্বতন্ত্র। কিসে লজ্জা হওয়া উচিত এবং কিসে উচিত নয়, এ বিষয়ে কোন সভ্য জাতির সহিত তাহাদের একেবারেই মতে মেলে না। ভদ্রতা এবং আবশ্যকতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে নিরপেক্ষ হইয়া পরিচ্ছদধারণের উদ্দেশ্য পাঁচ জনে যেরূপ করে, ঠিক সেইরূপ করা। অর্থাৎ, ইংরাজীতে যাহাকে "ফ্যাশন" বলে, তাহারই প্রাদুর্ভাব উক্তরূপ ব্যবহারের কারণ। "ফ্যাশন" ঊনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতার ফল নহে—ঊনবিংশ

শতাব্দীর হাত এড়াইয়া যে প্রাচীন অসভ্যতা আজিও সভ্য সমাজে বিরাজ করিতেছে, "ফ্যাশন" তাহারি বিকাশ মাত্র। যদি কাহারও এ কথা বিশ্বাস যোগ্য বলিয়া মনে না হয়, তাহা হইলে Herbert Spencer-এর Sociology নামক গ্রন্থ পাঠ করিলে, এ বিষয়ে নিঃসংশয় হইতে পারিবেন।

কিছুদিন পূর্ব্বে আমাদের দেশের কোল, সাঁওতাল প্রভৃতি জাতির মধ্যে, বৃক্ষ পল্লব এবং বল্কল ব্যতীত অন্য কোনও প্রকার পরিচ্ছদ প্রচলিত ছিল না। তাহারা পত্র আবরণ দিয়া লজ্জারক্ষা করিত। নীলগিরির টোডারা একখণ্ড বস্ত্র, প্রাচীন রোমান জাতির টোগার ন্যায়, স্কন্ধের উপর দিয়া পরিধান করে। এক পার্শ্বের অঙ্গ অর্দ্ধ অনাবৃত থাকে, একখানি হাত এবং একটি জঘন কাপড়ে ঢাকা পড়ে না। ইউরোপীয়দের চক্ষে এ পরিচ্ছদ বড় ভাল লাগে; তাঁহাদের মতে, উক্ত পরিচ্ছদ হইতে টোডাদের সুরুচির দিব্য পরিচয় পাওয়া যায়।

মালাবার প্রদেশের নীচ শ্রেণীর স্ত্রীলোকেরা দেহের উপরিভাগ অনাবৃত রাখে। পাশ্চাত্য রমণীগণ, বৈকালিক পোষাক সম্বন্ধে কতকটা স্বাধীনতা ভোগ করেন; তাঁহাদের বৈকালিক পরিচ্ছদে একটু স্বচ্ছন্দ উন্মুক্ত ভাব লক্ষিত হয়। কিন্তু, ইহাদের সন্ধ্যা-সকাল বিচার নাই; সকল সময়েই অঙ্গাবরণ একটু বেশী খোলা। গোধূলি সময়ে অন্তঃপুরের গবাক্ষদ্বারের মধ্য দিয়া ঈষৎলক্ষিত অসূর্য্যম্পশ্যা-দিগের সহিত, পরিস্ফুট দিবালোকে প্রকাশ্য রাজপথে পুরজন সমক্ষে উক্ত অবরোধবাসিনীগণের বহিরাগমনের যে পার্থক্য, পাশ্চাত্য ও মালাবার স্ত্রীপরিচ্ছদের বিভিন্নতাও প্রায় তদনুরূপ। ইংরাজ রমণী-গণ ইহাদিগকে পরিচ্ছদসম্বন্ধে একটু সভ্য করিবার জন্য বহুল চেষ্টা

করিয়াছেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ইংরাজ ললনাদিগকে রাজপথে উন্মুক্তদেহে বাহির হইতে বলিলে, তাঁহারা যে পরিমাণ আপত্তি প্রকাশ করিতেন, মালবার রমণীরা, প্রচলিত পরিমাণ অপেক্ষা অতিরিক্ত কাপড় ব্যবহার করিতে, তাহা অপেক্ষা কিছু কম আপত্তি প্রকাশ করে নাই। শরীরের উত্তমার্দ্ধ বস্ত্রাবৃত করা ইহাদের মতে অসম্মানের বিষয়, বিশেষ লজ্জার কথা, গৃহস্থ ঘরের স্ত্রীলোকের পক্ষে তাহা একেবারেই অসম্ভব।

পাখির পালক ও সলোম পশুচর্ম্মের প্রতি অসভ্যদের একটু বিশেষ টান দেখা যায়। চামড়া অপেক্ষা পালক অধিক যত্নের ধন, কারণ পালকে শুধু পোষাক নির্ম্মিত হয় এমন নহে, পালকের ন্যায় মস্তকের শোভা আর কিছুতেই বাড়াইতে পারে না।

এস্কুইমোরা মাছের চামড়ার জুতা পরে। শুনিতে পাই, সম্প্রতি জন কতক স্বদেশপ্রিয় ব্যক্তি বিলাতি দ্রব্যের আমদানি বন্ধ করিবার উদ্দেশে, মাঞ্চেষ্টার, বারমিংহাম, লণ্ডন প্রভৃতির সম্পর্ক উঠাইয়া দিয়া, নিজেরা কোম্পানি করিয়া কারখানা খুলিবেন। উক্ত মহোদয়গণ দেশীয় মৎস্যচর্ম্ম যদি কাজে লাগাইতে পারেন, তাহা হইলে দেশের বিশেষ উপকার হয়।

এ স্থলে বলা আবশ্যক, অসভ্যদিগের ন্যায় "স্থিতিশীল" লোক সভ্য জগতে দুর্লভ। তাহারা সকল প্রকার উন্নতির ভয়ানক বিরোধী। পুরুষানুক্রমে প্রচলিত আচারব্যবহারের একটুমাত্র পরিবর্ত্তন তাহাদের পক্ষে অসহ্য। বাঙ্গলার নব্য হিন্দুরাও এ বিষয়ে তাহাদের সমকক্ষ নহেন। সুতরাং পরিচ্ছদসম্বন্ধে সনাতন প্রথা বজায় রাখিবার জন্য, তাহারা একান্ত উৎসুক। বৃক্ষত্বক্, পশুচর্ম্মাদি-

রচিত বেশের ন্যায়, প্রকৃতিদত্ত সাজ পরিহার করিতেও নিতান্ত অনিচ্ছুক। পূর্ব্বে টিপু সুলতান মালবার প্রদেশের লোকদের কাপড় পরিতে আদেশ করায়, তাহারা দারিদ্র্যের দোহাই দিয়া আপত্তি করিয়া পাঠায়। টিপু সুলতান নিজখরচে তাহাদের বস্ত্র যোগাইতে রাজি হইলেন। যখন তাহাদের পক্ষে আর কোনও মিথ্যা ওজরের পথ রহিল না, তখন তাহারা কাপড়পরা-রূপ ঘোরতর অত্যাচার সহ্য করা অপেক্ষা দেশত্যাগ শ্রেয়ঃ মনে করিয়া, অন্য রাজার দেশে যাইবার সঙ্কল্প করিল। টিপু সুলতান অগত্যা তাহাদের লজ্জানিবারণের চেষ্টা হইতে ক্ষান্ত হইলেন।

মহারাণী ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার ইচ্ছানুসারে, উড়িষ্যার অসভ্য জাতিরা কিছুদিন হইতে কাপড় পরিতে বাধ্য হইয়াছে। মহারাণীর ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য, ইংরাজসৈন্যের সাহায্য আবশ্যক হইয়াছিল। ইংরাজ এক হাতে বন্দুক ও অপর হাতে কাপড় লইয়া গিয়া তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তাহারা রাইফেল গুলির অপেক্ষা, মাঞ্চেষ্টারের ধুতি অধিক পছন্দ করিল।

পরিচ্ছদসম্বন্ধে পরস্পরের মধ্যে যেমন ভেদই থাকুক, অসভ্য-মাত্রেই অত্যন্ত অলঙ্কারপ্রিয়। তাহাদের মধ্যে উল্কি পরাটাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অলঙ্কারস্বরূপে পরিগণিত, সর্ব্বত্রই এই উল্কির সমান আদর। আবার লাল, নীল, সবুজ ইত্যাদি বর্ণে মুখ চিত্রিত করা বিশেষ বাবুয়ানার লক্ষণ বলিয়া পরিচিত। এস্‌কুইমোরা শোভা বৃদ্ধির জন্য মুখে কালি মাখে, তাহারা নিজের পাণ্ডুবর্ণ তাদৃশ নয়নরঞ্জন বলিয়া বোধ করে না। পাউডারের কথা ঠিক জানা নাই, কিন্তু বিবাহ উৎসবাদি উপলক্ষে মুখে চুন মাখাটা অনেক দেশে প্রচলিত আছে।

স্ত্রীজাতিই অবশ্য অলঙ্কারের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত, কিন্তু তাই বলিয়া অলঙ্কার তাহাদেরই একচেটিয়া নহে, পুরুষেরাও যথেষ্ট পরিমাণে অলঙ্কারভক্ত। সৌন্দর্য্য যে কেবল স্ত্রীজাতির পক্ষে আবশ্যক, এ কথা তাহারা মানে না—পুরুষদেরও সুন্দর হইবার ভারি সাধ!—তাহারাও সর্ব্বদা শোভন ভাবে থাকিতে ইচ্ছা করে। অসভ্য জাতিমাত্রেরই কেশবিন্যাসের দিকে বিশেষ দৃষ্টি আছে। ইস্কুইমো রমণীরা সম্মুখে থর কাটিয়া, পশ্চাতের চুল লম্বা রাখে—পুরুষেরা পশ্চাতের চুল ছোট করিয়া, সম্মুখে ঝুঁটি বাঁধিবার মত দীর্ঘ করিয়া রাখে। এবং ঘাস, পাতা, খড়, পালক, ছেঁড়া নেকড়া, কখনও বা ফুল, ইত্যাদি দ্বারা চুলের গহনা রচনা করে।

আপাকেদের দেশে, কন্যা বিবাহ-যোগ্যা হইলে, ভ্রূ ও চোখের পক্ষ্মরাজি তুলিয়া ফেলে; উদ্দেশ্য, অধিক সুন্দর দেখাইবে। দেহের লালিত্য-সাধনের জন্য অঙ্গরাগ, ইহারা যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহার করে। অঙ্গরাগের দুর্গন্ধে, সভ্য জাতির লোকে বহুদূর হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য হয়, কিন্তু তাহাতে কিছু আসে যায় না, সে গন্ধ তাহাদের ভাল লাগে। রুচিসম্বন্ধে কাহারও সহিত তর্ক করা বৃথা। কড়ি, ঝিণুক, মৃত জন্তুর হাড়, দাঁত, নখ, ছোট বড় পাথরের টুকরা, কাঠ, শুকনা ফল, ইত্যাদিই অলঙ্কারের প্রধান উপকরণ। নির্ম্মমভাবে নাক, কাণ ইত্যাদি বিধাইয়া, ইহারা উক্ত পদার্থ সকলের দ্বারা নির্ম্মিত অলঙ্কার ধারণ করে। হাতে, পায়ে, যেখানে যেরূপ মিলে, হাড়ের, পাথরের, স্থানে স্থানে লোহা পিতলের পর্য্যন্ত প্রচুর গহনা পরে। এক একটি কোল রমণী সাত, আট, কেহ বা দশ পনের সের পর্য্যন্ত ওজনের গহনা বহিয়া বেড়ায়। বিনা কষ্টে কি সুন্দর

হওয়া যায়? মুক্তার অভাবে কড়ির মালাই কণ্ঠের শোভা বৃদ্ধি করে। হস্ত, পদ, কণ্ঠ, নাসিকা এবং কর্ণের অলঙ্কার, আজ পর্য্যন্ত সভ্য জাতিদের মধ্যেও পুরুষদের মনোরঞ্জন করে। আমাদের দেশের সুন্দরীরা অবশ্য তাঁহাদের অসভ্য ভগিনীগণের গহনা সম্বন্ধে সুরুচির এ পর্য্যন্ত অনুমোদন করিবেন। কিন্তু, এক বিষয়ে তাহারা আমাদের সুন্দরীগণ অপেক্ষাও অগ্রগণ্য;—তাহাদের অধরের গহনা আছে। আমরা খালি-অধরই ভালবাসি; বড় জোর তাম্বুলরাগ পর্য্যন্ত সহ্য হয়, তার বেশী নয়। কিন্তু অসভ্য রমণীরা নাক কাণের ন্যায়, অধর বিদ্ধ করিয়া, তাহাতে বেশ ভারি রকমের গহনা পরে; গহনার ভারে অধর উল্টাইয়া পড়ে, মুখের দুই পার্শ্ব দিয়া অজস্রধারায় চিরমুখামৃত বর্ষণ হইতে থাকে। আবার নাসিকারন্ধ্র যত বৃহদায়তন হয়, অসভ্যদের চক্ষে ততই সুন্দর দেখায়। উক্ত সৌন্দর্য্য কৃত্রিম উপায়ে বাড়াইবার জন্য, নাসারন্ধ্র বড় বড় অস্থিখণ্ডের দ্বারা আরও অধিক বিস্ফারিত করিয়া রাখে। আমরা বিস্ফারিত নয়ন দেখিয়া মনের শান্তি হারাই, কিন্তু অসভ্যেরা কবিতা লিখিলে বিস্ফারিত নাসিকার কথাই উল্লেখ করিত, সন্দেহ নাই। উভয়েই সমান বুদ্ধির কাজ করি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অন্যের রুচির উপর কোনও কথা বলা সাজে না—অপরে জোর করিয়া তাহাদের রুচিসম্মত জিনিস আমাদের গিলাইয়া না দিলেই আমরা আনন্দিত থাকি। অসভ্যদের রুচিসম্বন্ধে কিছু অবজ্ঞা প্রকাশ না করিয়াও, বোধ হয়, এ কথা বলা যায় যে, সুন্দরীগণ কৃত্রিম উপায়ে সৌন্দর্য্যবৃদ্ধির ইচ্ছা ত্যাগ করিলে, কিছুমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত হইতেন না। কারণ এ কথা সভ্যজাতিসম্বন্ধেও খাটে। এই অলঙ্কারের অত্যাচার হইতে নিস্তার পাইবার জন্য,

সকল দেশেই, নানা সময়ে রসজ্ঞ পুরুষগণ, "উদ্যান-লতা অপেক্ষা বনলতা শ্রেষ্ঠ"—"রূপসীগণ বিনা আভরণেই অধিকতর রমণীয় হ'ন"—"সুন্দরীর অলঙ্কারধারণে পুনরুক্তিদোষ দাঁড়াইয়া যায়", ইত্যাদি মিষ্ট কথায়, অলঙ্কারের বিরুদ্ধে আপত্তি প্রকাশ করিয়াছেন। সৌন্দর্য্য-প্রিয় লোকমাত্রই চিরকাল এই কথা বলিবে। অলঙ্কার যেরূপ শ্রীবৃদ্ধি করে, ব্যবহার করিতে না জানিলে, সেইরূপ শ্রীহানি করে—কিন্তু প্রকৃতিদত্ত সৌন্দর্য্যের কোনও বালাই নাই, চিরদিনই সমান থাকে। যৌবন প্রত্যেক রমণীর অঙ্গেই পুষ্পের ন্যায় সন্নদ্ধ থাকে।

আষাঢ় ১২৯৮।

শিল্পীর সাধনা।

——:০:——

একান্ন বৎসর বয়সে ইরাণ-তুরাণের বাদশা হুশেন শাহ্ যখন সাতান্ন সংখ্যক বেগমের পাণি-পীড়ন করলেন, তখন—তখন কে জানত যে তাঁরই রাজপ্রাসাদে আরব্য উপন্যাসের নিছক রূপকথাগুলোর একটা এসে নিজের বাস্তবতা প্রমাণ করে' যাবে!

সে যাই হোক্। বাদশা নতুন বেগমের পাণি-পীড়ন করে' তাঁর হারেমে পুরলেন, এদিকে সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দরবারের আমীর ওমরাহ্‌দের মধ্যে কেমন করে' জানাজানি হয়ে গেল যে, নতুন বেগমের মত সুন্দরী ত্রিভুবনে নেই। অপ্সরী?—অপ্সরীরাও সব চির-যৌবনা। যা চিরদিনের, যার ক্ষয়বৃদ্ধি নেই, যা স্থির, তা হাজার সুন্দর হোক কিন্তু তাতে মোহের অবসর নেই। ফুলগুলো ফুটে উঠে ঝরে' যায় বলেই ত ওর সৌন্দর্য্য মুহূর্ত্তের তরে নিবিড়তম হ'য়ে দেখা দেয়, সেই জন্যেই ওর মোহ অনন্ত কালের। নতুন বেগমের ভোম্‌রা রঙের রেশমী চুলের রাশ যে একদিন শণের নুড়ি হ'য়ে উঠবে—তার আঙুরের রসে ভিজান হিঙ্গুল রঙের ঠোঁট দুখানি যে একদিন শুকিয়ে চামড়ার মত হ'য়ে উঠবে—তাজা ফুলের মত গাল দুটো যে শুক্‌নো পাতার মত চুমড়ে যাবে—চোখের কোণ থেকে তড়িৎ ঢালাঢালি যে আর চলবে না—তার বুক যে আর দুলবে না, গ্রীবা যে আর হেলবে না, হৃদয় যে আর টলবে না—এই চিন্তাই যে

হুশেন শাহ্‌কে চতুর্গুণ মাতিয়ে তুলেছে। সুতরাং অপ্সরী?—না, নতুন বেগমের সঙ্গে অপ্সরীর তুলনাই হয় না। অপ্সরী ত নয়ই— মানব মানবীর মধ্যেও এমন রূপ আর কখনও সৃষ্ট হয় নি—আর ভবিষ্যতেও হবে কিনা সে বিষয়ে বাদশা হুশেন শাহের ঘোর সন্দেহ।

কিন্তু আমীর ওমরাহ্‌দের মধ্যে নতুন বেগমের রূপের কথা রটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা আপশোষের কথাও জেগে উঠল। এমন সুন্দরী যে নূতন বেগম—যার দেহে বিশ্বকর্ম্মা তাঁর শ্রেষ্ঠ প্রতিভার ছাপ অঙ্কিত করে' দিয়েছেন—যার তুল্য সুন্দরী সসাগরা পৃথিবীতে নেই, অমরাবতীতে নেই, গন্ধর্ব্বলোকে নেই—তেমন রূপ একদিনের জন্যেও কারো নয়নগোচর হবে না, এই হচ্ছে তাঁদের আপশোষের কথা। তাঁদের মধ্যে দু' একজনা দার্শনিক ওমরাহ্ তাঁদের লম্বা শুভ্র দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে গালিচার বুনোনো রঙিন ময়ূর-গুলোকে নিরীক্ষণ করে' করে' বলতে লাগলেন—তা আসলে সৌন্দর্য্য জিনিসটা সকলের জন্যেই হওয়া উচিত—বিশেষত রূপ দেখলে রূপের কোনো ক্ষতি নেই অথচ দর্শকের মহা লাভ।

আমীর ওমরাহ্‌দের কানাকানি বাদশা হুশেন শাহের কানে পৌঁছিতে বড় বিশেষ বিলম্ব হ'ল না! হুশেন শাহ্ ছিলেন প্রজারঞ্জক রাজা। কাজেই আমীর ওমরাহ্‌দের এই আপশোষের কারণ দূর করবার জন্যে ইচ্ছা করলেন। তাই মনস্থ করলেন যে, নতুন বেগমের একখানি পূর্ণায়তন তস্‌বীর অঙ্কিত করিয়ে তাঁর আমদরবারের বিশাল কক্ষে মস্‌নদের পিছনে দেয়ালের গায়ে ঝুলিয়ে দেবেন। বাদশা মনে মনে এই ব্যবস্থা ঠিক করেই তাঁর প্রধান উজিরকে ডাকলেন— "ফজলু খাঁ।"

ফজলু খাঁ পামিরের মাথার উপরকার বরফের মত সাদা লম্বা দাড়ি হেলিয়ে এসে কুর্ণিস করে' দাঁড়াল—"জাঁহাপনা"—

বাদশা বললেন—"উজির, বর্ত্তমানে এ সসাগরা পৃথিবীতে সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী কে ?"

উজির হাতের পাঁচ আঙুল তাঁর লম্বা দাড়ির মধ্যে চালাতে চালাতে স্মৃতিশক্তিটাকে উগ্র করে' নিয়ে উত্তর করলেন—"জাঁহাপনা, বর্ত্তমানে এ সসাগরা পৃথিবীতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী হচ্ছে হিন্দুস্থানের কোশল রাজসভার চিত্রকর—নাম মৌকূল দেব।"

হিন্দুস্থানের নাম শুনে বাদশা মুহূর্ত্তের জন্যে চিন্তান্বিত হলেন—যেন তাঁর মনে কোন সংশয় উদিত হয়েছে ; কিন্তু তৎক্ষণাৎ যেন সে সংশয়ের একটা সমাধান করে' বললেন—"ফজুল খাঁ, কোশল রাজ-সভার চিত্রশিল্পী ইরাণ-তুরাণের বাদশার দরবারের তরফ থেকে ইস্পাহানে আমন্ত্রিত হোক।

ফজলু খাঁ তাঁর উষ্ণীষ হেলিয়ে কুর্ণিশ করে' বললেন—"প্রবল প্রতাপান্বিত সুজনের রক্ষক দুর্জ্জনের শাসক ইরাণ-তুরানের বাদশা হুশেন শাহের যে আজ্ঞা।"

তার পরদিন পূব গগনে ঊষাসুন্দরী যখন আপনার অবগুণ্ঠন উন্মোচন করবেন কি করবেন না ভাবছিলেন, তখন ইস্পাহানের প্রশস্ত পাথর-বাঁধা রাজপথ কাঁপিয়ে বাদশার পাঞ্জাঙ্কিত পত্র নিয়ে তুরুক সোয়ার কাবুলের পথে হিন্দুস্থান অভিমুখে যাত্রা করল। দ্রুতগামী অশ্বখুরের খটাখট্ শব্দে নিদ্রিত নাগরিকেরা চকিত হ'য়ে উঠে বসল। বেলা হ'লে ইস্পাহানের বাজারে বাজারে রটে গেল যে,

হিন্দুস্থান থেকে চিত্রকর আসছে—নতুন বেগমের তসবীর আঁকবার জন্যে।

(২)

বাদশা আমীর ওমরাহ্দের নিয়ে তাঁর খাস দরবারে বসে' ছিলেন। ইরাণ-তুরাণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি তায়েজউদ্দিন সেদিন হেমন্ত-সন্ধ্যার মত করুণ কণ্ঠস্বরে বাদশা-সমীপে সুন্দরী তরুণীর অশ্রু-ভেজা ব্যথিত কালো আঁখি-তারার মত একটা নব রচিত গজল্ সারেঙ্গী সহযোগে গান করছিলেন। গজল্ বলছিল—"রূপোর দেয়ালী লেগেছে— এমনি নিবিড় জোছনা, যেন মনে হয় তা মুঠো বেঁধে দলা পাকিয়ে ঢিল ছোঁড়াছোঁড়ি খেলা যায়, শিশির-ভেজা পাতায় পাতায় জোছনা ছল্‌কে উঠে পিছলে পড়ছে—দূর এলবুরুজ পাহাড়-তলীর বুল্‌বুল্‌রা সব আর সেদিন ঘুমুতে যায় নি—তাদের গানের সুর ঘন জোছনার বুক চিরে চিরে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে—এমনি রাতে নিঠুরা পিয়ারী বাহুর বাঁধন আল্‌গা করে' কাউকে কিছু না বলে' ক'য়ে কোন্ অজানার পথ ধরে' কোথায় চ'লে গেল—কোথায় গেল......"

'চারিদিক মেঘে মেঘে ছেয়ে গিয়েছে—কালো কালো মেঘ, বিদ্যুৎ বুকে করা মেঘ। এলবুরুজ পাহাড়তলীর ময়ূরের দল পেখম তুলে নৃত্য করে' করে' তাদের কেকা রবে চারিদিক মুখর করে' তুলেছে। বারি ঝর্‌তে আরম্ভ করল,—ঝর্ ঝর্ ঝর্—বিরাম নেই বিরতি নেই—কত দিনকার কার অশ্রু—কোন্ অলকার কোন্ অপ্সরীর—এমনি বাদল-বুকের মধ্যে বসে' বসে' কে যে বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছে—এমন দিন, তবুও পিয়ারী ফিরে এল না—কেন এল না..........."

"পিয়ারী কেমন করে' ফিরবে—পিয়ারী যে পথ ধরে' গিয়েছে, সে ত ফেরবার পথ নয়—সে যে কেবল যাবারই পথ, সে-পথ—সে যে মরণের পথ........."

সারেঙ্গীর মিষ্টি সুরের সঙ্গে কবির মিষ্টি সুর মিলে গজলের ব্যথা-ভরা কাহিনী, বাদশার খাস দরবারের প্রশস্ত কক্ষের কোণে কোণে কোন্‌-হারিয়ে-যাওয়া কাকে খুঁজে বেড়াতে লাগল। যে আমীর ওমরাহ্‌রা যুবক, তাদের কি একটা ব্যথার আনন্দে বুক ফুলে উঠল, টলে উঠল—বাদশার খুড়ো আশী বছর বয়সের বৃদ্ধ বৈরাম খাঁর পর্য্যন্ত কুয়াশা-ঢাকা চোখ দুটো ছল্‌ছল্‌ করে' উঠল। গান শেষ করে' কবি সারেঙ্গী ও ছড়টা গালিচার উপরে নামিয়ে রাখলেন—চারিদিকে নিস্তব্ধতা, কেবল সদ্য সমাপ্ত গজলের সুর বাতাসের বুক চিরে আকাশের গায়ে গায়ে একটা রেশের চিহ্ন এঁকে দিয়ে দিয়ে দূর হতে দূরান্তরে চলে যেতে লাগল—মুহূর্ত্ত ধরে' যেন কারো নিশ্বাস প্রশ্বাসও পড়ছে না—এমনি নিবিড় নিস্তব্ধতা। তারপর দরবারের সবাই যেন হঠাৎ চমক ভেঙ্গে জেগে সমস্বরে বলে' উঠলেন—"ক্যাবাৎ ক্যাবাৎ।"

বাদশা সস্মিত হাস্যে কবির দিকে ফিরে বললেন—"তায়েজ, তোমার কাব্য সাধনা, সঙ্গীত সাধনা, যন্ত্র সাধনা, সবই সার্থক!"

কবি তায়েজ তাঁর বিনম্র শির আরও নত করে' কি বলতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় উজির ফজলু খাঁ প্রবেশ করে' বাদশা-সমীপে নিবেদন করলেন—"জাঁহাপনা, হিন্দুস্থান হ'তে কোশল-রাজসভার চিত্রশিল্পী মোকুল দেব ইরাণ-তুরাণের বাদশা, দুর্বিলের রক্ষক দুর্জ্জনের শাসক প্রবল প্রতাপান্বিত হুশেন শাহের দরবারে হাজির।"

বাদশা বললেন—"তাকে এইখানে নিয়ে আসা হোক।"

উজির তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে গেলেন, আবার পরক্ষণেই ফিরে এলেন—সবাই দেখলেন, তাঁর সঙ্গে প্রবেশ করল এক অতি সুন্দর তরুণ যুবক।

অতি সুন্দর তরুণ যুবক। তার চোখ দুটোতে যেন বিদ্যুতের রেখা টানা—কুঞ্চিত কেশ গুচ্ছে গুচ্ছে এসে তার বলিষ্ঠ স্কন্ধ ছেয়ে ফেলেছে—অতি চিক্কণ গোঁফের রেখার চিহ্ন তার স্ফুটনোন্মুখ যৌবনের ঘোষণা করছে—আঙুলগুলো যেন ছবির মত সুশ্রী—বাদশা বিস্ময় প্রকাশ করে' বললেন—"এই যুবক পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চিত্রকর?"

যুবক তার মাথা অবনত করল, উজির ফজলু খাঁ উত্তর দিলেন—"হাঁ জাঁহাপনা।"

"এমনি তরুণ বয়সে!"

উজির উত্তর দিলেন—"জাঁহাপনা, প্রতিভাসুন্দরী তরুণের গলেই তাঁর বরমাল্য প্রদান করতে ভালবাসেন।"

বাদশা প্রসন্ন দৃষ্টিতে শিল্পীর দিকে ফিরে বললেন—"সুন্দর বিদেশী যুবক, চিত্রবিদ্যায় তোমার কতদূর পারদর্শিতা?"

যুবক উত্তর দিলে—"জাঁহাপনা, কবি, চিত্রকর, গায়ক এদের পারদর্শিতার মাপযন্ত্র অন্যের কাছে। আমার যে কি রকম পারদর্শিতা তা আমি নিজে কেমন করে' বলব? তবে আমার অঙ্কিত চিত্রে হিন্দুস্থানের অনেক নৃপতি অনুগ্রহ করে' সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।"

বাদশা বললেন—"শোন যুবক, ইসলাম-রমণী কোনদিন বিধর্ম্মী-পুরুষের কাছে তার মুখাবরণ উন্মোচন করবে না, শাস্ত্রের নিষেধ—না দেখে তুমি তার আলেখ্য অঙ্কিত করতে পারবে?"

শিল্পী বিস্মিত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলে—"না দেখে কি করে' ছবি আঁকা চলতে পারে জাঁহাপনা ?"

বাধা দিয়ে বাদশা জিজ্ঞাসার সুরে বললেন—"কেবল তার বর্ণনা শুনে।"

যুবক বললে—"এমন কবি কে আছে জাঁহাপনা যে শব্দ অর্থ ও সুর দিয়ে রক্তমাংস ও বর্ণকে এমনি করে' মুর্ত্তিমান করে' তুলতে পারে যা আবার রঙে ও তুলিতে পরিবর্ত্তিত করা যেতে পারে ?"

গৌরবান্বিত দৃষ্টিতে বাদশা উত্তর দিলেন—"বিদেশী যুবক! আছে, ইরাণ-তুরাণের শ্রেষ্ঠ কবি—তার কণ্ঠস্বরে শরৎ-উষার উজ্জ্বল আকাশ সান্ধ্য গগনের মত ব্যথিত হ'য়ে ওঠে—হেমন্ত-সন্ধ্যার করুণ রাগিণী বসন্ত-উষার মত হাস্যময় হ'য়ে ওঠে—যার সারেঙ্গীর আলাপে প্রচণ্ড নিদাঘে বর্ষার শৈত্য আমন্ত্রন করে' আনে—শীতের শুভ্র মাটীতে সবুজ রঙ জাগিয়ে তোলে—যুবক তুমি নিজেই বিচার করবে"—বাদশা কবি তায়েজকে গান করতে আদেশ করলেন।

সারেঙ্গীর সুর জেগে উঠল—কিশোরী প্রিয়ার সলজ্জ চাউনির মত মিষ্টি, তার রেশমী চুলের স্পর্শের মত মোলায়েম—সে সুরের রেশ প্রিয়ার অঙ্গের স্পর্শেরই মত শ্রবণেন্দ্রিয়কে বুলিয়ে যায়।

"সুরমা-আঁকা চোখ—পিয়ারি সে কেমন চাতুরি ?—রজনীর কালো আঁধারের মাঝে পুঞ্জ মেঘের বুক থেকে বিদ্যুৎ কেমন ঝিলিক্ হানে ?—তাই পিয়ারীর কালো চোখের চার পাশে সুরমা আঁকা পিয়ারীর কালো চোখের তারা সে মেঘ—চোখের পাতায়-আঁকা সুরমা সে রজনীর আঁধার—পিয়ারীর দৃষ্টি সে বিদ্যুৎ—সে-বিদ্যুৎ

কেমন উজ্জ্বল, কেমন নিবিড়, কেমন তীব্র—সুরমা আঁকা চোখ—পিয়ারি সে কেমন চাতুরী ?"

"সুরমা-আঁকা চোখ—পিয়ারি জানি জানি সে কেমন চাতুরী। পিয়ারি যে চোখ দুটোতে সুরমা ঢেকে তার সারা দেহের আকাঙ্ক্ষা-রাশিকে গোপন করতে চায়—তার মনের শঙ্কা সঙ্কোচ সরম স্পষ্ট করে' তুলতে চায়—তার চঞ্চল দৃষ্টিকে নিবিড় করতে চায়—তার হাস্যময় দৃষ্টিকে ব্যথা ভরা দেখতে চায়—সুরমা-আঁকা চোখ—পিয়ারি জানি জানি সে কেমন চাতুরী।"

গান থামল—রইল শুধু একটা সূচী-সূক্ষ্ম রেশের আধ-লুপ্ত আধ-সুপ্ত রণন্।

তরুণ চিত্রকর প্রশংসমান নেত্রে বললে—"ইরাণ-তুরাণের কবি, হিন্দুস্থানের চিত্রকরের অভিবাদন গ্রহণ করুন।" তার পর বাদশার দিকে ফিরে বললে—"জাঁহাপনা, কবি তায়েজের ক্ষমতা অসাধারণ। কবির সুরে সুরে আমার তুলি চলবে—তাঁর গানের সঙ্গে সঙ্গে নতুন বেগমের ছবি ফুটে উঠবে—তাঁর চোখ জেগে উঠবে—তাঁর বুক দুলে উঠবে—গণ্ডে তাঁর গোলাপ ফুটবে—হাতে তাঁর চাঁপার কলি জাগবে—পায়ে তাঁর রক্তকমল বিকশিত হবে—তাঁর ওড়না উড়বে, বেণী দুলবে, ঘাগ্রা ঝুলবে; কিন্তু তাঁর আত্মার কথা আমি বলতে পারব না জাঁহাপনা। কবি তায়েজের সুরের সঙ্গে সঙ্গে নতুন বেগমের বাহিরকেই আমি দিতে পারব—জাঁহাপনা, তাঁর আত্মার সন্ধান আমি দিতে পারব না।"

বাদশা জিজ্ঞাসা করলেন—"কেন শিল্পী ?"

শিল্পী উত্তর দিলে—"জাঁহাপনা, আত্মা যে সাম্না সাম্নি দেখবার

জিনিষ—হাজার বর্ণনাতেও তার আসল পরিচয় নেই। শিল্পীর আত্মা দিয়ে নতুন বেগমের আত্মা স্পর্শ করতে না পারলে তার তুলির সঙ্গে তা কখনও ধরা পড়বে না। এ আত্মায় আত্মায় স্পর্শ অনুবাদের ভিতর দিয়ে হ'তে পারে না। জাঁহাপনা, আমি ছবি আঁকব; কিন্তু তাতে আত্মার সন্ধান করবেন না।"

বাদশা বলে' উঠলেন—"কিন্তু নতুন বেগমের যে দেহের চাইতে আত্মা সুন্দর—আত্মা সুন্দর বলেই ত তার দেহ সুন্দর—সেই আত্মাকে বাদ দিয়ে শুধু দেহের ছবি আঁকা—যেন গন্ধ বাদ দিয়ে গোলাপ ফোটান—নেশা বাদ দিয়ে মদ চোঁয়ান; কিন্তু বিধর্ম্মীর কাছে ইস্লাম-রমণী কেমন করে' মুখ খুলবে?—উপায় কি?" বাদশা তাঁর দরবারের আমীর ওমরাহ্দের দিকে তাকিয়ে উজিরকে সম্বোধন করে বললেন—"ফজ্‌লু খাঁ, উপায় কি?"

ইরাণ সাম্রাজ্যের প্রধান উজির বিমনা হলেন। আমীর ওমরাহ্রা পরস্পরের মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগলেন। সভা নিস্তব্ধ—চারিদিকে একটুকু শব্দ নেই। সেই নিস্তব্ধতার মাঝে বৈরাম খাঁ তাঁর সুদীর্ঘ শরীর নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। তার পর তাঁর দীর্ঘোন্নত শরীর বেঁকিয়ে কুর্ণিস করে' বললেন—"জাঁহাপনা, উপায় আছে। নতুন বেগমকে বিধর্ম্মীর সাম্নে মুখ খুলতে হবে না—তা একখানি দর্পণের সামনে করলেই চলবে। সেই দর্পণে প্রতিবিম্বিত নতুন বেগমকে দেখলেই শিল্পীর উদ্দেশ্য সফল হবে। শাস্ত্রও রক্ষা হবে—কর্ম্মও ঠেকা থাকবে না।"

বৈরাম খাঁর কথা শুনে সবার বিষণ্ণ মুখ প্রসন্ন হয়ে উঠল। বাদশা প্রশংসমান নেত্রে খুল্লতাত বৈরাম খাঁর দিকে তাকিয়ে উজিরকে

লক্ষ্য করে বললেন—"ফজলু খাঁ, খুল্লতাত বৈরাম খাঁর যুক্তি গৃহীত হোক।"

দরবার ভাঙল। আমীর ওমরাহ্‌রা বৈরাম খাঁর বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করতে করতে নিজ নিজ আবাসে ফিরলেন।

(৩)

দ্বারে দ্বারে পুরু রেশমি পরদা—তারি পাশে পাশে উলঙ্গ কৃপাণ হাতে যমদূতের মত কালো হাব্‌সী খোজা। এখানে বুঝি ক্ষুদ্র মধুমক্ষিকাটিরও প্রবেশ করবার পথ নেই। এখানে বুঝি আর কোন শব্দ নেই, কেবল দুধের মত সাদা কঠিন পাথরের উপরে রক্ত কমলের মত রাঙা কোমল পা ফেলে চলে'-যাওয়া রূপসীদের নূপুর-নিক্কন, কেবল লিলায়িত তনুর ভঙ্গীতে ভঙ্গীতে তাদের জঙ্ঘা-স্পর্শ-সুখে বিহ্বল ঘাগরার খস্ খস্ শব্দ, কেবল তাদের কৌতুক-উচ্ছ্বাস-উদ্দীপ্ত হাসির ছন্দময় গিটকিরি, কেবল কত কত উৎস হতে উচ্ছ্বসিত গোলাপজলের বিরতিহীন ঝর্ ঝর্ শব্দ। এখানে বুঝি আর কোন গন্ধ নেই—কেবল কত কত তরুণীদের নিশ্বাস-বিচ্ছুরিত সুরভি, কেবল তাদের সুদীর্ঘ সুদীর্ঘ বেণী-কুণ্ডল হতে উৎসারিত স্বপ্নময় গন্ধাবলেপ, কেবল তাদের সারা অঙ্গ হতে উৎসৃষ্ট এক আবেশময় আভাস। এখানে বুঝি আর কোন রূপ নেই, কেবল সদ্য ফোটা গোলাপরাশির স্তবক, কেবল ফুল্ল প্রস্ফুটিত চম্পকদলের উগ্রতা। এখানে বুঝি আর কোন রস নেই, কেবল সাকির আপন-ভোলা বিফলতা, কেবল সিরাজির সকল-ভোলা মাদকতা। মানুষ জীবনকে ধরে' রাখতে পারে না, কিন্তু যৌবনকে ধরে' রাখতে চায়। এমনি বাদশার হারেম।

এখানে কত কত রূপসী তরুণীর কমল-চোখের কোমল দৃষ্টি কুয়াশায় ঢেকে গেল—কোমল মুখের কমল-হাসি শুকিয়ে উঠল—গ্রীবা আর হেলল না, বুক আর দুলল না, চরণ আর চল্‌ল না; কিন্তু শেষ নেই, আবার কত কত নব নব তরুণী এসে তাদের রূপ-যৌবন দিয়ে এখানটাকে ভরে' তুলল। বাদশা হুশেন শাহের কালো চুল শাদা হ'য়ে গেল, দন্তাভাবে গণ্ড শীর্ণ হয়ে পড়্‌ল, তড়িতাভাবে দৃষ্টি মলিন হয়ে উঠল; কিন্তু এখানটায় তাঁর রূপ-যৌবনের সম্পদ অব্যাহত। এমনি ইরাণ-তুরাণের বাদশার হারেম।

সেই হারেমে কত কত দ্বারে কত কত পরদা সরিয়ে কত কত কক্ষ অতিক্রম করে' কত কত হাবসী খোজার ক্রূর শার্দ্দূল-দৃষ্টির সামনে দিয়ে তরুণ শিল্পী বাদশা হুশেন শাহ্‌ ও উজির ফজলু খাঁর সঙ্গে প্রবেশ করল। হারেমে বিদেশী বিধর্ম্মীর আভাস পেয়ে বেগমদের পোষা ময়ূরের দল একবার ভীষণ কেকারবে যেন তাদের আপত্তি জানিয়ে দিল। তার পর হারেমের এক প্রান্ত হতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত যাদুমন্ত্র বলে নিমেষে যেন একটা পুরু নিস্তব্ধতার গালিচা বিছিয়ে গেল। কত কত মরাল গতির ছন্দে ছন্দে শিঞ্জিনী নিক্বনার অর্দ্ধেক ফুটে আর অর্দ্ধ ফোটার আর অবসর পেলে না—কত কত হাসির গিটকিরি মাঝপথে এসে হঠাৎ চকিতে থেমে গেল—যেন সজীব যা যেখানে ছিল সব সেই সেইখানেই সেই অবস্থাতেই সহসা প্রস্তরের মত কঠিন হ'য়ে গেল—চারিদিকে কেবল নিস্তব্ধতা—সেই নিবিড় নিস্তব্ধতার মাঝে কেবল গোলাপবারির ঝর্‌ ঝর্‌ শব্দ। সেই নিস্তব্ধতার মাঝে বাদশা শিল্পী ও উজিরকে নিয়ে একটি প্রকাণ্ড কক্ষে প্রবেশ করলেন।

কক্ষের এক পার্শ্বে দেয়ালে-গাঁথা এক সুবৃহৎ দর্পণ—একটা ক্রুদ্ধ-চক্ষু ঘোর রক্তবর্ণ সাটিনের মাঝখানে জড়োয়া কাজের একটা প্রকাণ্ড অর্দ্ধচন্দ্র আঁকা পরদায় আগাগোড়া ঢাকা। বাদশা উজির ও শিল্পী তিন জনে এসে সেই দর্পণের সামনা সামনি কক্ষের অপর প্রান্তে দাঁড়ালেন। অদৃশ্য হস্তের টানে পরদা সরে গেল। রত্নখচিত সিংহা-সনে উপবিষ্ট নতুন বেগমের প্রতিবিম্ব দর্পণের গায়ে ফুটে উঠল—

যেন মসী-লিপ্ত অমাবস্যার অন্ধকারের বিরাট গহ্বর হতে শরৎ পুর্ণিমার লক্ষ চাঁদ সহসা এককালে জেগে উঠল—যেন কঠিন রসহীন প্রাণহীন পাষাণের বুক চিরে এককালে-ফোটা বসোরার গোলাপ ফুটে উঠল—যেন ঘোর অমানিশায় পুঞ্জ মেঘের বুক চিরে বিদ্যুতের রেখা ফুটে অচঞ্চল হয়ে চারিদিক উদ্ভাসিত করে' রাখল—যেন—। বাদশা বললেন—"শিল্পী, এই তোমার আলেখ্য।"

বাদশা শিল্পীর দিকে চোখ ফিরিয়ে দেখলেন, বুঝলেন তাঁর কথা শিল্পীর কানে যায় নি—তার দৃষ্টি দর্পণে নিবদ্ধ—শিল্পী মন্ত্রমুগ্ধ—বাহ্যজগত তার কাছে লোপ পেয়েছে। বাদশার ঠোঁট দুখানিতে একটা তৃপ্তির, একটা গৌরবের, যেন একটা বিজয়ের নিঃশব্দ হাসির রেখা অঙ্কিত হ'য়ে গেল।

শিল্পীর দৃষ্টিতে কি ছিল—দর্পণে প্রতিবিম্বিত মূর্ত্তির অবনত চোখ দুটি ধীরে ধীরে যেন মন্ত্রচালিত হ'য়ে উত্তোলিত হয়ে মন্ত্রমুগ্ধ শিল্পীর প্রতি নিবদ্ধ হল—সেই চোখ দুটিতে বিস্ময়ের একটা ক্ষণিক প্রভা যেন মুহূর্ত্তের জন্য খেলে গেল—তার পর আজীবন সংগোপিত অনন্ত গোপন আকাঙ্খা আকুলতার আড়াল থেকে দুটি তরুণ চোখ আর দুটি তরুণ চোখের সঙ্গে মিলিত হ'ল—দর্পণের মূর্ত্তি যেন তার রক্তে

রন্ধ্রে একটা পুলক নিয়ে কেঁপে উঠল—শিল্পীর স্নায়ুতে স্নায়ুতে যেন একটা তড়িৎ প্রবাহ চারিয়ে গেল—তার পর নারীর দৃষ্টি অবনত হ'য়ে গেল—পুরুষের চোখে পলক পড়ল না। দর্পণের মসৃন গায়ের উপরে মনে হ'ল কে যেন সিঁদূর ঢেলে দিল। অদৃশ্য হস্তের টানে পরদার দর্পণ ঢাকা পড়ল। শিল্পী চমক ভেঙ্গে জেগে উঠল—দেখলে চারিদিক যেন সন্ধ্যার মত মলিন হ'য়ে উঠেছে।

বাদশা বললেন—"শিল্পী—"

তরুণ যুবক সংযত স্বরে বললে—"জাঁহাপনা, আমি হিন্দুস্থানের রাজন্যবর্গের অনেক অনেক অন্তঃপুর-মহিলাদের দেখেছি, কিন্তু এমন রূপ কখনও আমার নয়নগোচর হয় নি।"

স্মিত হাস্যে বাদশা বললেন—"শিল্পী, যা চোখে দেখলে, তাই যদি চিত্রপটে ফুটিয়ে তুলতে পার, তবে লক্ষ স্বুবর্ণ মুদ্রা তোমার পুরস্কার।"

শিল্পী উত্তর করলে—"জাঁহাপনা, আমাকে ছয় মাস সময় দিন। আর আমি চাই একটি নির্জ্জন নিভৃত স্থান, অতি নিভৃত, যেখানে বাইরের জগতের রাগ রঙ্গ হাসি অশ্রু আমার প্রাণে কোন ঢেউ-ই তুলবার স্বুযোগ পাবে না—যেখানে একান্ত ভাবে থাকবে আমি আর আমার আলেখ্য।"

বাদশা উজিরের দিকে ফিরে বললেন—"ফজলু, মতিমঞ্জিলে শিল্পীর বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হোক্।"

তিনজনে হারেম ত্যাগ করলেন।

আবার তরুণীদের কলকণ্ঠ ফুটে উঠল। তাদের পায়ে পায়ে কত কত লাস্য নিয়ে নূপুর নিক্কণ জেগে উঠল, তাদের হাস্যোচ্ছ্বাস কক্ষে

কক্ষে রণিত হ'য়ে উঠল; কিন্তু সেদিন সেই হারেমে একটি নিভৃত কক্ষে একটি তরুণীর অন্তরে অন্তরে একটা নবীন স্বপ্নের আভাসে যে একটা নব তন্ত্রী বাজতে লাগল, তার সঙ্গে সেই তুচ্ছ প্রতিদিনকার উদ্দেশ্যহীন হাসি-গানের কোনই মিল রইল না।

(৪)

সসাগরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চিত্রকর সে, দেশ বিদেশে কোটী কোটী নর নারীর মুখে মুখে তার নাম ফিরে বেড়াচ্ছে; কিন্তু সে নিজে এতদিন কোথায় ছিল? কোথায় আপন-ভোলা হ'য়ে ঘুরছিল? কি জীবন সে এতদিন যাপন করেছে? কি জীবন? কোন্ একান্ত বাইরে বাইরে সে তুলি আর রঙ নিয়ে কেবল কি এক তুচ্ছ খেলা করে' বেড়িয়েছে? শিল্পী সে, কিন্তু এই এতদিন তার কাছ থেকে জীবনের অমৃতের উৎস এমনি করে' গুপ্ত হয়েছিল যে, তার অস্তিত্বের সন্দেহমাত্র তার মনে জাগে নি! তার তুলির মুখে কত কত সুন্দরীর ভোমরা-কালো আঁখি-তারা বিশ্ব-বিমোহিনী দৃষ্টি নিয়ে জেগে উঠেছে, তার তুলির সোহাগে সোহাগে কত কত তরুণীর হৃদয়ের উপরে অঞ্চল-ঢাকা ভরা-বুক আধ আভাস নিয়ে মাথা তুলেছে, তার তুলির আদরে আদরে কত কত কমলের মত হাত চাঁপার কলির মত আঙুল নিয়ে ফুটে উঠেছে, কিন্তু তার পিছনে কি ছিল? আজ যে সে জানে যে, তার পিছনে ছিল তার কেবল অপূর্ণতা—আর অপূর্ণতা—আর অপূর্ণতা। তার পিছনে ছিল না শিল্পী তার সবখানি নিয়ে, ছিল না শিল্পীর নিগূঢ় জীবনের নিবিড় চরম আনন্দের অনুভূতি, ছিল না শিল্পীর নিজেকে নিঃশেষে ঢেলে দেওয়া। সে

কেমন করে' কাটিয়েছে, কেমন করে' !—এই অসম্পূর্ণতা নিয়ে, এই বিরাট শূন্যতা নিয়ে—কেমন করে' সে এতদিন ছিল, কেবল এই রঙ তুলি ও চিত্রপটের বিরাট ব্যর্থতাভরা ব্যঙ্গ নিয়ে? হায়! তার নিগূঢ় আনন্দের উৎসটি এতদিন কে এমন করে' নিষ্ঠুর ভাবে তার অলক্ষ্য করে' রেখেছিল!

কিন্তু আজ তার কোন্ নিগূঢ় অন্তরের গোপন কক্ষে কোন্ একটা মণি-মুক্তা-খচিত বীণার স্বর্ণ-তারে কার অদৃশ্য অঙ্গুলির স্পর্শ পড়ল—সেই স্পর্শে যে সুর বেজে উঠল—সেই সুরে তার আজ একি হ'য়ে গেল! একি বেদনা, একি আনন্দ! তা ত আজ তার বুঝবারও ক্ষমতা নেই—আজ যে কেমন তার বেদনা আর আনন্দ একেবারে ছড়িয়ে গেছে, দুটোকে আর ত তার আলাদা করবার উপায় নেই—আজ যে কেমন তার মনে হচ্ছে, বেদনাও আনন্দ—আনন্দও বেদনা। মৌকূল, মৌকূল, এতদিন কোন্ মরুভূমির মধ্যে পিপাসা নিবারণের জন্যে ঘুরে ঘুরে মরছিলে!

ঐ যে নিগূঢ় গোপন বীণার তারে ঝঙ্কার—কি ঐশ্বর্য্যময় সে ঝঙ্কার—সেই ঝঙ্কারের সঙ্গে সঙ্গে যে আজ এক নিমেষে সব নিবিড় অর্থপূর্ণ হয়ে উঠল—চোখে যে কিসের অঞ্জন লেগে গেল—এই ধরিত্রীর মাটিতে মাটিতে এত গান, এত সুখ, এত সৌন্দর্য্য—এই যে মতিমঞ্জিল, ঐ যে তরুশ্রেণী, ঐ যে কুসুমকুঞ্জ, ঐ যে লতাবিতান - সব যেন কেমন উজ্জ্বল কেমন সজীব হ'য়ে উঠল। শিল্পী, শিল্পী, তুমি এতদিন কোন্ অন্ধ-করা অরণ্যে কেবল মুক্তির পথ খুঁজে মরছিলে!

দুটি তরুণ চোখ আর দুটি তরুণ চোখ—তাদের মিলনে এমনি

রহস্যের সৃষ্টি, এমনি অমৃতের উৎস, এমনি দিকে দিকে পুলক জেগে উঠল, আকাশে বাতাসে হিল্লোল খেলে গেল, জল স্থল রঙিন হয়ে উঠল!

সে আজ ছবি আঁকবে—নতুন বেগমের। নতুন বেগম! না—না—না—নতুন বেগম কে? তাকে ত সে তেমন করে' জানে না—তার সঙ্গে ত শিল্পীর কোনই পরিচয় হয় নি। না—না—সে নতুন বেগম নয়—ইরাণ-তুরাণের কেউ নয়—বাদশা হুসেন শাহের কেউ নয়—তার হারেমের কেউ নয়—সে যে শিল্পীর নিভৃত গোপন-মনের মন্দিরের দেবী—যে কোমল স্পর্শে তার হৃদয়-বীণায় মোহন রাগিণী বাজিয়ে তুলেছে—তার দৃষ্টিসম্পাতে তার হৃদয়-পদ্ম প্রত্যেক দলটি নিয়ে ফুটে উঠেছে। না—না—সে নতুন বেগম নয়—ইরাণ-তুরাণের কেউ নয়—বাদশা হুসেন শাহের কেউ নয়—তার হারেমের কেউ নয়—সে যে শিল্পীর নিভৃত গোপন হৃদয়-মন্দিরের প্রণয়িনী—যার গণ্ড কপোল কণ্ঠ শিল্পীর দৃষ্টিতে লাজ-লালিমার রক্তিমাভায় ছেয়ে গিয়েছে—যে শিল্পীর দৃষ্টি বিনিময়ে তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে পুলক নিয়ে কেঁপে উঠেছে—না, সে বৃদ্ধ হুসেন শাহের নতুন বেগম নয়—সে যে চিরতারুণ্যের জীবন-মন্দিরে যুগযুগান্তরের সঙ্গিনী!

তারি, কেবল তারি ছবি সে আঁকবে? নতুন বেগম? নতুন বেগম?—নতুন বেগম বলে কেউ এই পৃথিবীতে নেই—নেই—নেই। নেই—এই ব্রহ্মাণ্ডে ইরাণ-তুরাণ বলে' কোন স্থান নেই—বাদশা হুশেন শাহ্ বলে' কোন ব্যক্তি নেই—তার হারেম বলে কোন কারাগার নেই—সেখানে নতুন বেগম বলে' কোন বন্দিনী নেই। আছে শুধু অনন্ত শূন্য অনন্ত অবসরের মাঝে দুটি তরুণ তরুণা, দুটি প্রেমিক

প্রেমিকা—আছে শুধু দুটি হৃদয়, চারটি আঁখি, একটি অনন্তকালের নিবিড় চুম্বন। এই আর কিছুই নয়।

কেবল তারই ছবি সে আঁকবে। যে-ছবি সে আঁকবে—কেবলই কি তুচ্ছ রঙ দিয়ে? তুচ্ছ রঙ দিয়ে! তার হৃদয় শোণিতের বিন্দুতে বিন্দুতে যে আলেখ্যের প্রত্যেক অণু পরমাণু প্রাণ পাবে—তার নিশ্বাসে নিশ্বাসে যে তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ জেগে উঠবে, তার আত্মার স্পর্শে স্পর্শে তা চিত্রপটে ফুটে উঠবে—তুচ্ছ তুলি আর রঙ?—না।

শিল্পী এক মনে মতিমঞ্জিলে ছবি আঁকতে লাগল।

ধীরে ধীরে তার কাছে বাহ্যজগত লোপ পেয়ে গেল। মতিমঞ্জিল তার বিস্তীর্ণ উদ্যান—বিশাল তরুশ্রেণী—নিবিড় লতাবিতান, সব অদৃশ্য হ'য়ে গেল—রইল শুধু তার চোখের সামনে একটি তরুণীর মূর্ত্তি—কুন্তল যার নিবিড়, দৃষ্টি যার গভীর, বক্ষে যার ইঙ্গিত, কক্ষে যার সঙ্গীত, জঙ্ঘা যার বিরহ-কাতর, চরণ যার নিগড় বাঁধা।

শিল্পী এক মনে ছবি আঁকতে লাগল।

(৫)

দেখতে দেখতে ছ'মাস কেটে গেল।

গোধূলির স্বর্ণে স্বর্ণে পশ্চিমাকাশে গৈরিক ওড়না উড়িয়ে পূরবী রাগিণী বেজে উঠেছে—বাদশা হুশেন শাহ্ ফজলু খাঁকে সঙ্গে নিয়ে মতিমঞ্জিলে এসে উপস্থিত হলেন। শিল্পীকে বললেন—"শিল্পী, তোমার ছ'মাস শেষ।"

শিল্পী আভূমি প্রণত হ'য়ে উত্তর দিলে—"জাঁহাপনা, আলেখ্যও শেষ।"

বাদশা বললেন—"আজ হিন্দুস্থানের চিত্রকরের ক্ষমতা কতদূর, তার বিচার হবে শিল্পী।"

শিল্পী বিনম্র শিরে বহু কক্ষ অতিক্রম করে' বাদশা ও উজিরকে মতিমঞ্জিলের নিভৃততম অংশে একটি কক্ষে নিয়ে এল। গোধূলি লগ্নে কক্ষের মধ্যে আঁধার হ'য়ে এসেছে। শিল্পী রৌপ্য-দীপদানে দুটি দীপ জ্বালিয়ে তার চিত্রপটের দু'পাশে রক্ষা করল। চিত্রপটের উপরে পরদা ঢাকা।

পরদা-ঢাকা চিত্রপটের সামনে এসে বাদশা ও উজির দাঁড়ালেন। শিল্পী ধীরে ধীরে চিত্রপটের উপর থেকে পরদা সরিয়ে নিয়ে এক পাশে এসে দাঁড়াল।

বাদশার কোষের অসি ঝন্ঝন্ করে' বেজে উঠল, তাঁর হাতের আকর্ষণে খাপ থেকে তা অর্দ্ধেক বেরিয়ে এল। শিল্পী তৃপ্তির হাস্যে শান্তস্বরে বললে—"জাঁহাপনা, এ আলেখ্য মাত্র।"

ইরাণ-তুরাণের বাদশা লজ্জিত হ'য়ে তরবারি আবার খাপে পুরলেন। কণ্ঠ হ'তে বহুমূল্য মণিহার খুলে শিল্পীর গলায় পরিয়ে দিলেন। তারপর বাদশা আর উজির দু'জনে বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে আলেখ্যের দিকে তাকিয়ে রইলেন। এ ত রঙ দিয়ে আঁকা ছবি নয়—এ যে মূর্ত্তিমান রক্তমাংসের শরীর! কে বলবে নতুন বেগম আজ বাদশা হুশেন শাহের হারেমে—সে আজ মতিমঞ্জিলের একটি নিভৃত কক্ষে রত্নখচিত সিংহাসনে উপবিষ্টা!

প্রথম বিস্ময়ের কথঞ্চিৎ উপশমে বাদশা বললেন—"শিল্পী, তোমার শক্তি অলৌকিক, ঐশ্বরিক—লক্ষ সুবর্ণ মুদ্রার পরিবর্ত্তে পাঁচ লক্ষ তোমার পুরস্কার—হিন্দুস্থানের নৃপতিরা না বলে ইরাণ-তুরাণের

বাদশা গুণের আদর করতে জানে না! আর শিল্পী, কাল প্রাতে অনুচরবর্গ নিয়ে কোতোয়াল আসবে, আলেখ্য রাজপ্রাসাদে স্থানান্তরিত করবার জন্যে—সেজন্যে প্রস্তুত হয়ে থেকো। শিল্পী, তুমি নতুন বেগমের ছবি আঁক নি, দ্বিতীয় নতুন বেগমের সৃষ্টি করেছ।"

বাদশা ও উজির মতিমঞ্জিল ত্যাগ করলেন।

ওঃ প্রলয়! মুহূর্ত্তের মধ্যে শিল্পীর পায়ের নীচেকার কক্ষতল প্রলয় ঘূর্ণনে ঘুরতে লাগল! কক্ষের আসবাব সব তার চোখের সুমুখে যেন মত্ত হ'য়ে নাচতে লাগল, চারিদিকের দেয়াল যেন দুলতে লাগল, দীপদানে দীপ যেন মরণাহত মানুষের হাসির মত বীভৎস হ'য়ে উঠল, শিল্পী টল্‌তে টল্‌তে চিত্রপটের সামনে মেঝের উপরে বসে পড়ল!

স্বপ্ন! স্বপ্ন! সব স্বপ্ন—আপনার চারিদিকে স্বপ্নের জাল বুনে এতদিন কি প্রবঞ্চনার মাঝেই না সে এই ছ'মাস কাটিয়েছে!—কোথায় সে? কে সে!—মিথ্যা—মিথ্যা—সব মিথ্যা। তার চাইতে অনেক বেশি সত্যি, লক্ষ কোটী গুণ সত্যি, ভয়ঙ্কররূপে সত্যি এই ইরাণ-তুরাণ, ইরাণ-তুরাণের বাদশা হুশেন শাহ্‌, হুশেন শাহের হারেম, আর সেই হারেমে বন্দিনী নতুন বেগম—সত্যি সত্যি, ওগো অতি সত্যি, নিষ্ঠুর ভাবে সত্যি, নির্ম্মম ভাবে সত্যি, মৃত্যুর মত সত্যি!

সেই হুশেন শাহের রাজপ্রাসাদে এই আলেখ্য স্থানান্তরিত হবে কাল—একটি মাত্র রজনীর অবসানে। এই আলেখ্য, যে আলেখ্যের প্রতি অণুতে অণুতে তার অস্তিত্ব বিছিয়ে আছে, যে আলেখ্য মাসে মাসে দিনে দিনে নিমেষে নিমেষে আপনার প্রত্যেক চিন্তাটি দিয়ে, প্রত্যেক বিশ্বাসটি দিয়ে, প্রত্যেক ইচ্ছাটি দিয়ে, প্রত্যেক আকাঙ্ক্ষাটি

দিয়ে, সে জাগিয়ে তুলেছে—তাই একজনের একটি মাত্র কথায় চির-দিনের জন্যে তার কাছ থেকে অপসারিত হবে। বাদশার আম-দরবারে এই আলেখ্য ঝুলবে, লক্ষ লোকের চোখের তৃপ্তির জন্যে—তার জন্যে রইবে শুধু লক্ষ কণ্ঠে অজস্র বাহবা। শিরা হ'তে বিন্দু বিন্দু করে' রক্ত চুইয়ে বাহবা লাভ! না—না—চাই নে বাহবা, চাইনে লক্ষ দশ লক্ষ কোটী লক্ষ স্বুবর্ণ মুদ্রা, আমায় ফিরিয়ে দাও—ফিরিয়ে দাও কেবল এই আলেখ্যখানা!

বাতুল—বাতুল, এই আলেখ্য? ওরে শিল্পী, ওরে মূর্খ মৌকূল, কোথায় তোর মানসী কোথায়? এই আলেখ্য? তোর মানসী যে প্রত্যেক নিমেষটিতে বাদশা হুশেন শাহের অন্তঃপুরবাসিনী, সূর্য্যের আলোর পর্য্যন্ত যার মুখ দেখবার অধিকার নেই, এই আলেখ্য? জড়—জড়—কেবল রঙ আর রঙ আর রঙ—জড়—জড়—অতি জড়। জড়? না—না—কে বললে জড়। ওরে নাস্তিক-ঐ যে, ঐ যে বুক দুলছে না কি? ঐ যে চোখের পাতায় অশ্রুবিন্দু কাঁপছে, ঐ যে ঠোঁট দুখানি পাংশু হ'য়ে উঠল—জড়? নয়—নয় কিছুতেই নয়—ঐ যে দীর্ঘ নিশ্বাসে বুক দমে গেল—ঐ যে ঘাঘরার প্রান্তটা কেঁপে উঠল না কি? পাগল—পাগল—এ যে একেবারেই জড়—শক্তিহীন, গতিহীন, ইচ্ছাহীন!

শিল্পী উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে সেই কক্ষতলে বসে আলেখ্যের দিকে অনিমেষ চোখে চেয়ে রইল। ঐ ঠোঁট দুখানি যদি একবার—কেবল একবার মাত্র নড়ে' ওঠে, একবার মাত্র ডাকে—"শিল্পী"। ঐ চোখের তারা দুটি যদি কেবল একটিমাত্র নিমেষের জন্যে চঞ্চল হ'য়ে ওঠে, যদি—যদি—যদি—আঃ কি নিষ্ঠুর শাণিত তরবারির একটুকু স্পর্শে

তার সূক্ষ্ম কোমল স্বপ্নের জাল একেবারে ছিন্ন ভিন্ন হ'য়ে অদৃশ্য হ'য়ে গেল, হাওয়ায় মিশিয়ে গেল। শিল্পী নিস্তব্ধ হ'য়ে বসেই রইল—দণ্ডের পর দণ্ড কেটে যেতে লাগল, সন্ধ্যার আঁধার ধীরে ধীরে নিবিড় কালো হ'য়ে উঠল, মতিমঞ্জিলের বৃক্ষে বৃক্ষে পাখীর ডাক সব নীরব হ'য়ে গেল, দণ্ডে দণ্ডে প্রহর কাটতে লাগল, শিল্পী ক্লান্ত দেহ মন নিয়ে ধীরে ধীরে কখন্ নিদ্রাভিভূত হ'য়ে গালিচার উপরে টলে পড়ল তা জানলও না।

* * * *

এদিকে মধ্যরজনীর নীরবতাকে মুখরতায় ভরিয়ে দিয়ে বাদশা হুশেন শাহ্‌র হারেমে মহা উৎসব চল্‌ছে। সহস্র দীপালোকে রাত্রির অন্ধকার দূর করছে, অথচ তা দিনের একান্ত স্পষ্টতায় কোন দিকেই সমাপ্তি টানে নি—সবই যেমন রহস্যময়, আভাসময়, ইঙ্গিতময়। বেলোয়ারী ঝাড়ের ঠুন্‌টান্, বলয় কঙ্কনের ঠিনি ঠিনি, নূপুর নিক্কনের রিনি-ঝিনি। কত কত রূপসী তরুণী হীরে মণি মুক্তা জহরতে ভূষিত। প্রত্যেক অঙ্গ সঞ্চালনে দীপ-রশ্মিস্পর্শে তাদের আর সারা দেহ হ'তে যেন তারার টুক্‌রো ছিটিয়ে ছিটিয়ে পড়ছে। তাদের নিবিড় কালো আঁখিতারা হ'তে অবিরাম ক্ষরিত হচ্ছে অমৃত ও হলাহল, জীবন ও মৃত্যু—ঐ যে দেখা যায় তাদের আবেশবিহ্বল আঁখি পাতে পাতে অঙ্কিত অমরার সিংহাসন আর গভীর গহন রসাতলের বিরাট গহ্বর।

অসংখ্য তরুণী রূপসী তাদের রূপের ডালি নিয়ে, চটুল চাহনি নিয়ে, হাসির তরঙ্গ তুলে, উঠছে, বসছে, ঘুরছে, ফিরছে, চলছে। এই তরুণীদের মেলার মধ্যে বৃদ্ধ হুশেন শাহ্।

কি নিষ্ঠুর উৎসব! কি নির্ম্মম এই অসংখ্য তরুণীদের একটি বৃন্তকে ঘিরে তাদের আশা আকাঙ্ক্ষা সাধ আহ্লাদের সমাপ্তি! না জানি ঐ চটুল চাহনীর পিছনে কত শত দীর্ঘ নিশ্বাস সংগোপিত, ঐ হাল্‌কা হাসির পশ্চাতে কত কত হতাশার গুরুভার অটুট, কত কত জীবনের ব্যর্থতা, ঐ উৎসব রজনীর পশ্চাতে আপনার কড়া ক্রান্তির হিসেব টেনে চলেছে! প্রবল প্রতাপশালী হুশেন শাহ্, ঐ বিরাট ব্যর্থতার বিনিময়ে কিছু দান করবার ক্ষমতা তোমার হাতে নেই

নতুন বেগম গান গাচ্ছিল—কি করুণ কি কোমল সে সুর! যেন তার আঁখির পাতে বিশ্বের অশ্রুরাশি থম্‌কে যাচ্ছে, যেন তার ঠোঁটের কোণে সারা জগতের বিষাদ গুম্‌রে মরছে, আর তার কণ্ঠস্বরে কি মিষ্টি বীণার তানেই অশ্রুসাগর উথলে উঠছে!

"ওগো অচেনা, তুমি এমনি পরিচিত—এতদিন তবে কোথায় ছিলে? যখন প্রথম বুল্‌বুল্‌ ডেকেছিল, যখন প্রথম সিরাজির স্পর্শ স্নায়ুতে স্নায়ুতে চারিয়ে গিয়েছিল, যেদিন প্রথম দিগন্তের কোণে কোণে চোখ দুটি তোমার সন্ধানে ফিরছিল, সেদিন তুমি কোথায় ছিলে—কোথায় ছিলে?—"

"বুল্‌বুল্‌কে খাঁচায় পুরে দিলে, সিরাজি জহরত-মণ্ডিত পিয়ালায় রক্ষিত হ'ল, চোখের সাম্‌নে আঁধার নেমে এল, অচেনা তুমি আজ কেমন করে' কোথায় থেকে এলে?—"

"ওগো পরিচিত—কেবলই জল ঝরবে, মেঘ থেকে কেবলই জল ঝরবে, জোছনা আর খেলবে না, ফুল আর ফুটবে না, বুল্‌বুল্‌ আর ডাকবে না, ওগো তুমি চির-পরিচিত—

"ওঃ"—গান আর শেষ হ'ল না। সহসা নতুন বেগম দু-হাতে বুক চেপে গালিচার উপরে লুটিয়ে পড়ল, তার মুখ পাংশুবর্ণ হ'য়ে গেছে, চোখের তড়িৎ মলিন হয়ে গেছে।

বাদশা হুশেন শাহ্ চক্ষের পলকে এসে লুণ্ঠিতা নতুন বেগমের পার্শ্বে নতজানু হ'য়ে বসলেন—দেখলেন নতুন বেগম অতি কষ্টে নিশ্বাস প্রশ্বাস নিচ্ছে। বাদশা শঙ্কিত কণ্ঠে ডাকলেন—"পিয়ারী, পিয়ারী—"

হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে অতি কষ্টে নতুন বেগম উত্তর দিলে—"জাঁহাপনা, বাঁদীর পোস্তাকি মাপ করবেন। বুকের ভিতরটা হৃদ্‌পিণ্ডটা যেন কে চেপে চেপে ধরছে—" বেগমের শ্বাস ফুরিয়ে এল, আর কিছু ফুটল না।

তৎক্ষণাৎ বাঁদীরা ধরাধরি করে' নতুন বেগমকে কক্ষান্তরে নিয়ে গেল, শয্যায় শায়িত করে' দিলে, প্রতি মুহূর্ত্তে তার শ্বাসকষ্ট উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হ'তে লাগল। হাকিমের জন্যে লোক প্রেরিত হল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই নতুন বেগমের যেন নিশ্বাস প্রশ্বাসের কষ্টের কতকটা উপশম হ'ল, তার মুখ থেকে ধীরে ধীরে যন্ত্রণার চিহ্ন দূরীভূত হ'য়ে গেল, শান্তির নিশ্বাস ফেলে নতুন বেগম ধীরে ধীরে চোখ দুটি নিমীলিত করল, ধীরে ধীরে তার রঙিন্ ঠোঁটে রঙিনতর একটা হাসির রেখা অঙ্কিত হ'য়ে গেল।

হাকিম এলেন, নিদ্রিতা নতুন বেগমের নাড়ী স্পর্শ করলেন, একটা বিস্ময়ের ক্ষণিক আভা তাঁর চোখ দুটোতে খেলে গেল, আত্মসম্বরণ করে' তিনি আবার দ্বিগুণ মনোযোগের সঙ্গে নাড়ী অনুভব করলেন, তারপর ধীরে ধীরে হাতখানিকে শয্যায় নামিয়ে রাখলেন। গম্ভীর কণ্ঠে

হুশেন শাহের দিকে ফিরে বললেন—"ইরাণ-তুরাণের প্রবল পরাক্রান্ত বাদশা জাঁহাপনা, নতুন বেগম এ নশ্বর জগত ত্যাগ করে' বেহেস্তের পথে যাত্রা করেছেন।"

বাদশার মুখ দিয়ে কথা সরল না।

* * * *

শিল্পী স্বপ্ন দেখছিল। হিমাদ্রির কোন্ গহন গভীর নির্জ্জন গুহায় একমনে সে আপনার মানসীর ছবি আঁকছিল। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর সে অনাহারে অনিদ্রায় ছবি আঁকছিল। সহস্র বৎসর পরে তার ছবি আঁকা শেষ হ'ল। তখন শিল্পী সভয়ে দেখলে, এ ত আর কেউ নয়—এ যে নতুন বেগম। দেখতে দেখতে গিরিগুহা পরিবর্ত্তিত হ'য়ে মতিমঞ্জিল হ'য়ে গেল। হতাশায় শিল্পী তার অঙ্কিত আলেখ্যের সাম্‌নে লুটিয়ে পড়ল।

সহসা শিল্পী দেখলে ছবিতে আঁকা ওড়না যেন একটু কেঁপে উঠল, আলেখ্যের চোখের পাতা মিট্‌মিট্ করে' উঠল, চোখের তারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল, ঠোঁট দুটো নড়ে উঠল, ধীরে ধীরে আঁকা মানসী-মূর্ত্তি চিত্রপট থেকে কক্ষতলে নেমে পড়ল, তার কানে এসে বাজল—"শিল্পী—"

শিল্পী ঘুম থেকে চমকে উঠল, জেগে দেখলে, তার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে এক তরুণী স্তিমিত থেকে তার মুখ দেখলে, ভয়ে বিস্ময়ে তার মুখ থেকে বেরিয়ে পড়ল—"নতুন বেগম!"

স্বপ্নময়ী বললে—"শিল্পী, নতুন বেগম মরেছে, আমি তোমার প্রণয়িনী, এস—রাত আর বেশি নেই—"

নিমেষে শিল্পীর ঘুমের ঘোর কেটে গেল—তার দেহের প্রত্যেক অণু-পরমাণু জাগ্রত হ'য়ে উঠল, তার শিরায় শিরায় তড়িৎ চারিয়ে গেল। এত স্বপ্ন নয়—এ যে সত্যি—অতি সত্যি। তৎক্ষণাৎ তরুণ যুবক উঠে দাঁড়াল, তরুণীর হাত ধরে' বাইরে বেরিয়ে এলো। রজনীর শেষ শুকতারা পূব গগনে জ্বল্-জ্বল্ করছিল। সেই শুকতারার আলোকে আলোকে প্রেমিক প্রেমিকা হাত ধরাধরি করে' দূর দিগন্তে কোথায় মিশিয়ে গেল।

(৬)

মানুষের হাজার শোক হোক্ রাজার রাজকার্য্য বন্ধ থাকে না। পরদিন বাদশা হুশেন শাহ্ কোতোয়ালকে মতিমঞ্জিল থেকে নতুন বেগমের তস্বীর আনবার জন্য পাঠালেন। কোতোয়াল অনুচরবর্গ নিয়ে মতিমঞ্জিল উদ্দেশ্যে চললেন। যথাসময়ে ফিরে এসে বাদশা-সমীপে নিবেদন করলেন—"জাঁহাপনা, মতিমঞ্জিলে শিল্পীর সাক্ষাৎ পাওয়া গেল না।"

বাদশা বিস্মিত হলেন, উজিরকে সঙ্গে নিয়ে মতিমঞ্জিল উদ্দেশে যাত্রা করলেন। এসে দেখলেন শিল্পী অদৃশ্য। শিল্পী যে কক্ষে ছবি আঁকছিল সেই কক্ষে দুজনে প্রবেশ করলেন। দেখলেন কেউ কোথাও নেই। আপনার স্থানে পরদা-ঢাকা চিত্রপট—তার দুপাশে রজতাধারে তৈলহীন প্রদীপ দুটিতে সল্‌তের ভস্মাবশেষ।

বাদশা চিত্রপট দেখে হৃষ্ট হলেন। বললেন—"উজির, চিত্রকর না থাক, চিত্রপট রয়েছে—তাই আমাদের যথেষ্ট। চিত্রকর যদি

পুরস্কার প্রত্যাশা না করে সে দোষ ইরাণ-তুরাণের বাদশার নয়—”
বলতে বলতে তিনি চিত্রপটের পরদা অপসারিত করলেন।

বাদশার মুখের কথা মুখেই মিলিয়ে গেল। দু'জনে মন্ত্র-মুগ্ধের মত ছবির দিকে তাকিয়ে রইলেন। চিত্রপটে রত্নখচিত সিংহাসন যেমন আঁকা ছিল তেমনি আছে; কিন্তু তার উপরকার নতুন বেগমের চিহ্নমাত্র নেই।

রত্নসিংহাসনের রত্নগুলো যেন প্রাণ পেয়ে জ্বল্ জ্বল্ করছে।

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

অভিভাষণ।*

—:০:—

এই রঙ্গপুর সহরে আমি পূর্ব্বে একবার আসি সভাপতির আসন ত্যাগ করতে, সেই সহরে আমাকে যে আর একবার আসতে হবে সভাপতির আসন গ্রহণ করতে, একথা সেদিন আমি স্বপ্নেও ভাবি নি।

আজ থেকে চার বৎসর পূর্ব্বে, যে সভায় নূতন সভাপতিকে বরণ করে নেবার জন্য আমাকে রঙ্গপুরে উপস্থিত হতে হয়েছিল, সে সভার আলোচ্য বিষয় ছিল সাহিত্য। অপরপক্ষে আজকের সভার আলোচ্য বিষয় হচ্ছে, ইংরাজিতে যাকে বলে পলিটিক্স। আমি "রাজনীতি"র পরিবর্ত্তে পলিটিক্স শব্দ ব্যবহার করছি এই কারণে যে, পলিটিক্স বলতে শুধু রাজার নয়, প্রজার কথাও বোঝায়। আর যতদূর জানি, এ সভার কর্ত্তাব্যক্তিদের ইচ্ছা যে, আজ রাজার অবিচারের ও রাজার অত্যাচারের কথাটা মুলতবি রেখে, প্রজার অধিকারের ও প্রজার কর্ত্তব্যের বিষয়ই আলোচনা করা হয়।

আমি এই বলে সুরু করেছি যে, একদিন আমাকে এরূপ সভার যে নায়ক হতে হবে, একথা সেদিন আমি স্বপ্নেও ভাবি নি। এর কারণ দেশের কোনো সম্প্রদায় যে আমাকে পলিটিক্সের কোনো আসরে টেনে

* উত্তর-বঙ্গ রায়ত কন্‌ফারেন্সের রঙ্গপুর অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ। সঃ সঃ

নামাবেন, এবং সেই সঙ্গে সে আসরের মুল-গায়েন করবেন, এ দুরাশা সেকালে আমার মনে স্থান পায় নি।

পলিটিসিয়ানরা জানতেন যে আমি লিখি ছোট গল্প, আর তার চাইতেও ছোট, অর্থাৎ—চৌদ্দপেয়ে কবিতা, আর সেই সঙ্গে লিখি বড় বড় প্রবন্ধ। সে সব প্রবন্ধ এত লম্বা যে, তা পড়বার অবসর কাজের লোকের নেই, ধৈর্য্য বাজে লোকের নেই, উপরন্তু সে সব প্রবন্ধের ভাষা এত সহজ যে, পণ্ডিত লোকের পক্ষে তা বোঝা অসম্ভব। এই সব লেখাপড়ার ফলে, এ খ্যাতিও আমি অর্জ্জন করি যে, পলিটিক্স সম্বন্ধে আমি নির্লিপ্ত ও উদাসীন। মনের দেশে এই বিপথে যাওয়ার দরুণ বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে অনেকে আমার উপর ব্যাজারও হয়েছিলেন। তাঁদের বিশ্বাস যে, আমি যদি বাঙলায় সাহিত্য রচনা করবার বৃথা চেষ্টা না করে ইংরাজিতে পলিটিক্স লিখতুম, তাহলে একটা কাজের মত কাজ করতে পারতুম। ছেলেবেলায় গল্প শুনেছি যে, একটি জেলেনি জনৈক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতকে দেখে দুঃখ করে বলেছিল যে, "হায়! এত বড় জোয়ানটা পুঁথি পড়ে সারা হল, মাছ ধরলে কাজে লাগত"। অনেকের ধারণা যে, আমিও পুঁথি পড়ে সারা হয়েছি; এ অনুমান সত্য হোক আর না হোক, একথা সত্য যে, পলিটিক্সের বহতা জলে আর পাঁচ জনের মত আমিও বহুবার নেমেছি—তবে সেখানে কখনো মাছ ধরতে চেষ্টা করি নি।

এই সব কারণে আপনারা আমাকে আজ যে আসন দিয়েছেন, তাতে আমি নিজেকে কৃতার্থ মনে করছি। কথা কওয়া যাদের জীবনের প্রধান কাজ, অনুকূল শ্রোতালাভের বাড়া সৌভাগ্য তাদের আর কি হতে পারে!

(২)

আপনাদের নিমন্ত্রণ আমি সাদরে গ্রহণ করলেও, স্বচ্ছন্দ চিত্তে করি নি। সত্য কথা বলতে গেলে, এ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে অবধি আমার মনে সোয়াস্তি নেই। কেন যে নেই, তার কারণ আপনাদের কাছে নিবেদন করছি।

প্রথমত, আমি জানি যে, এ রকম সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করবার আমি ঠিক যোগ্যপাত্র নই। বক্তৃতা করা আমার ব্যবসায় নয়। এ বিষয়ে কৃতিত্ব লাভ করবার পক্ষে আমার স্বভাব ও অভ্যাস দুইই প্রতিকূল। কথকতা করবার জন্য ভগবদ্দত্ত গলা থাকা চাই—তা সে কথকতার বিষয় মহাভারতই হোক আর নব-ভারতই হোক। ভগবান আমাকে কথকের গলা দেন নি। তারপর স্বভাবের ত্রুটি আমি অভ্যাসের বলে শুধরে নিতে চেষ্টা করি নি। বক্তৃতার আসরে আমি কস্মিনকালেও গলা সাধি নি। লেখককে বক্তার উচ্চ মঞ্চে দাঁড় করানো, বৈঠকী গাইয়েকে নগর সংকীর্ত্তনে যোগ দেওয়ানোর সামিল। যে গলা দু'-চার জনকে শোনাবার জন্য তৈরি করা হয়েছে, সে গলা দু'-চার হাজার লোককে কি করে শোনানো যায়? এ প্রভেদ শুধু স্বরের নয়—সুরেরও। লেখকেরা তাঁদের ভাষা যতদূর সম্ভব মোলায়েম করতে চান, সুরেলা করতে চান তার উপর যদি পারেন ত মাঝে মাঝে এত মৃদু মীড় লাগান, যা সকলের শ্রুতিগোচর হয় না। অতএব এ জাতের লোকের পক্ষে তারায় গলা চড়িয়ে সেই পঞ্চম সুর ধরা অসম্ভব, যা শুনে লোকের দশা ধরবে। আর সে বক্তৃতা করায় লাভ কি যা শুনে মানুষ ক্ষেপে না ওঠে? আমি কিন্তু আমার ক্ষমতার সীমা জানি। অনেককে ক্ষেপানো ত দূরের কথা, কাউকেও

আমি প্রাণপণ চেষ্টাতেও উত্তেজিত করে তুলতে পারি নে। বরং অনেকে বলেন যে, আমার কথা তাঁদের জ্বলন্ত উৎসাহে বরফ জল ঢেলে দেয়। কথা আমি অভ্যেস করেছি, ধীরভাবে—বল্‌তে ধীরভাবে নয়, স্পষ্টকরে জড়িয়ে নয়, সংক্ষিপ্ত করে ফলাও করে নয়, সাদাভাবে রঙ চড়িয়ে নয়, শ্রোতার বন্ধু হিসেবে, গুরু হিসেবে নয়। তা ছাড়া আমার কথার আর একটি গুণ অথবা দোষ আছে, যা—লোক মাতানোর পক্ষে প্রতিকূল। লোকে বলে আমার গল্প ও কবিতার মধ্যে পলিটিক্‌সের ভেজাল আছে। হয়ত তা আছে, কিন্তু এ সত্য সর্ব্বলোক বিদিত যে আমার পলিটিক্সের গায়ে কবিত্ব ও উপন্যাসের গন্ধমাত্রও নেই। অতএব আমার মতামত প্রচারের যোগ্য নয়, বিচারের যোগ্য।

(৩)

কিন্তু আসলে যা নিয়ে আমি সঙ্কটে পড়েছি, সে হচ্ছে ভাষা। পূর্ব্ব হতে শুনে আসছি যে, এ সভায় এমন বহুলোক উপস্থিত থাকবে যারা ইংরাজি জানে না। আমার কথা তারা বুঝবে কি না—সে বিষয়ে আমার বিশেষ সন্দেহ আছে। আমি অবশ্য বাঙলা বলছি কিন্তু এ বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ সচেতন যে, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বাঙলা অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের জানা-ভাষা নয়।—আমরা কই বাঙলা কথা কিন্তু তার মানে হয় ইংরাজি নয় সংস্কৃত। আমাদের জ্ঞান না হতে আমাদের শিক্ষা সুরু হয় আর অর্দ্ধেক জীবন শেষ না হতে সে শিক্ষার শেষ হয় না। জীবনের এই অর্দ্ধেক দিন আমরা শিক্ষা লাভ করি, একদিকে ইংরাজি ভাষা ও ইংরাজি শাস্ত্রে আর একদিকে সংস্কৃত ভাষা

ও সংস্কৃত শাস্ত্রে। এ শিক্ষার ভিতর অবশ্য ইংরাজির ভাগ পোনেরো আনা আর সংস্কৃতের খাদ এক আনা। ফলে আমাদের মনোভাব প্রায় সবই ইংরাজি। কাজেই আমরা যখন বাঙলা বলি কিম্বা লিখি তখন আমরা জ্ঞাতসারে হোক অজ্ঞাতসারে হোক, ইংরাজিরই তরজমা করি। আমাদের মধ্যে ভাষার বিষয় যাঁরা সতর্ক, তাঁরা কথায় কথায় ইংরাজি ভাষার অনুবাদ না করলেও, কথায় কথায় ইংরাজি ভাবের অনুসরণ করেন, আমাদের বাঙলার পুরো অর্থ শুধু তাঁরাই বুঝতে পারেন, যাঁদের ইংরাজি ভাষা ইংরাজি শাস্ত্রের সঙ্গে সম্যক পরিচয় আছে।

সকল দেশেই, যুগ বিশেষে, নতুন ভাব নতুন জ্ঞান প্রথমে উচ্চ-শ্রেণীর লোকের মনে হয় জন্মলাভ নয় স্থানলাভ করে। তার পরে সেই নতুন জ্ঞান নতুন ভাব কালক্রমে সমগ্র জাতির মনে চারিয়ে যায়। যে সব মনোভাব নিয়ে আমরা লেখাপড়ার কারবার করি, সে সকল যে অদ্যাবধি সর্ব্ব-সাধারণের সম্পত্তি হয়ে ওঠে নি তার কারণ ও-সকল ভাব আমাদের মনেও এখনো পুরো বসে যায় নি। আমাদের নবলব্ধ জ্ঞান হয় অতি দূরদেশের, নয়, অতি দূরকালের সামগ্রী। তার পর সে জ্ঞানও আমাদের আয়ত্ব করতে হয় একটি বিদেশী ভাষা, নয় একটি মৃতভাষার সাহায্যে। এ শিক্ষার ফলে আমাদের মুখের কথা—পুরোপুরি আমাদের মনের কথা হয়ে ওঠে না। যে বস্তু আমাদের সম্পূর্ণ আপনার হয়ে ওঠে নি, তা আমরা পরকে দান করব কি করে?

তা ছাড়া—এ শিক্ষা আমাদের মনের দেশে একটি নূতন উপদ্রবের সৃষ্টি করেছে। সংস্কৃত শাস্ত্রের সঙ্গে বিলেতি শাস্ত্রের মিল ত নেই-ই বরং অনেক ক্ষেত্রে ঘোরতর বিরোধ আছে। ফলে আমাদের মনে সেকেলে ও একেলে, দেশী ও বিলেতি ভাবের ঠেলাঠেলি গুতোগুতি

চলছে। আমরা ঠিক করে উঠতে পারি নে, এ দু পক্ষের ভিতর কোন্ পক্ষের জয় হওয়া উচিত, উভয়ের মিলন করাও আমাদের পক্ষে এক রকম অসম্ভব। এ অবস্থায় মনের শান্তির জন্য আমরা আমাদের মনকে এ দু-পক্ষের ভিতর ভাগ বাটোয়ারা করে নিয়েছি। মনের যে ভাগের ইহলোকের সঙ্গে সম্বন্ধ, সে অংশ এখন ইংরাজির দখলে আর যে ভাগের পরলোকের সঙ্গে সম্বন্ধ, সে অংশ সংস্কৃতের দখলে। এ পৃথিবীতে বেঁচেবর্ত্তে থাকবার জন্য, বড় হবার জন্য, মানুষ হবার জন্য, যে সব বিষয়ের দরকার, সে বিষয়ে আমরা যখন কথা বলি, তখন সে সকল কথার মানে দেখতে হয়, ইংরাজি সাহিত্যে, আর মৃত্যুর পর আমাদের আত্মার কি গতি হবে, সে বিষয়ে আমরা যখন কথা কই, তখন সে কথার মানে দেখতে হয় সংস্কৃত শাস্ত্রে।

রাজনীতি, অর্থনীতি, শিল্প বাণিজ্য, এমন কি স্বদেশ, স্বজাতি, স্বরাজ্য প্রভৃতি শব্দ আমাদের কানে আসামাত্র তার ইংরাজি অর্থ আমাদের মনে উদয় হয়, যে অর্থ অশিক্ষিত লোকের জানা নেই। অপর পক্ষে আমরা যখন মৃত্যুর অপর পারে লভ্য সালোক্য, সাযুজ্য, কৈবল্য, নির্ব্বাণ মোক্ষ প্রভৃতি কথা উচ্চারণ করি, তখন আমাদের মনশ্চক্ষুর সুমুখে এসে দাঁড়ায় সংস্কৃত দর্শন। স্বর্গ আর এখন আমাদের মাথার উপরে নেই, নরকও পায়ের নীচে নেই। যদি কেউ বলেন—ও-দুটি গেল কোথায়, তার উত্তর—আমাদের বিশ্বাস ঐ দু'য়ে মিলেমিশে যা সৃষ্টি হয়েছে, তারি নাম দুনিয়া।

আমি একদিন একটি হিন্দুস্থানী ভদ্রলোকের সাক্ষাৎ লাভ করে যুগপৎ অবাক ও নির্ব্বাক হয়ে যাই। তাঁর সর্ব্বাঙ্গে ছিল ইংরাজি সাজ, পায়ে বুট, পরণে পেণ্টলুন, গায়ে বুকভাঙ্গা কোট, গলায় ফিতে-

বাঁধা কলার, মাথায় হ্যাট ; কিন্তু তাঁর কপালে প্যাটপ্যাট করছিল, আধুলী প্রমাণ একটি হোমের ফোঁটা, আর তাঁর হ্যাটের নীচে থেকে উঁকি মারছিল বিঘৎ প্রমাণ একটি টিকি। তাঁকে দেখবামাত্র আমার মনে হল, এই মূর্ত্তিটিই হচ্ছে আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনের প্রতিমূর্ত্তি। বলাবাহুল্য যে, অশিক্ষিত ভারতবাসীর মনের এ চেহারা নয়—সে মূর্ত্তি হচ্ছে অর্দ্ধনগ্ন।

এ বিষয়ে এত কথা বলবার আমার উদ্দেশ্য, এই সত্যটি খাড়া করা যে, এই শিক্ষার প্রসাদে আমাদের মধ্যে একটা নতুন জাতি-ভেদের সৃষ্টি হয়েছে। শিক্ষিত বাঙালী একজাত, অশিক্ষিত বাঙালী আলাদা। এ দুয়ের মনের ভিতর কোনরূপ জ্ঞাতিত্ব কিম্বা কুটুম্বিতা নেই, যে জ্ঞাতিত্ব যে কুটুম্বিতা ইংরাজ আসবার পূর্ব্বে এদেশে উচ্চ-নীচ সকলের ভিতর ছিল। আজ থেকে একশ' বছর আগে আমাদের পরস্পারের শিক্ষা দীক্ষার ভিতর এমন কোন প্রভেদ ছিল না যে, আমাদের প্রপিতামহদের কথা তোমাদের প্রপিতামহেরা বুঝতে পারতেন না। সেকালে উচ্চ শ্রেণী ও নিম্ন শ্রেণীর লোকেদের ভিতর অবস্থার যাই ইতর বিশেষ থাকুক, পরস্পারের মনের বিশেষ পার্থক্য ছিল না। মানুষের আশা আশঙ্কা, ভয় ভাবনা, হিতাহিত জ্ঞান, ধর্ম্ম কর্ম্ম—এ সব বিষয়ের মতামত সেকালে উচ্চ নীচ সকল লোকের এজমালী সম্পত্তি ছিল। আর আজকের দিনে আমাদের মন বিলেতি ভাবের আকাশে ঘুড়ির মত খানিকটা উঠে লাট খাচ্ছে অপর পক্ষে জনসাধারণের মন যেখানে ছিল সেখানেও নেই, একমাত্র নিজের অন্নবস্ত্রের চিন্তার মধ্যে ডুবে তলিয়ে গেছে। কেননা তাদের মনকে একমাত্র সাংসারিক ভাবনার উপরে তুলে রাখবার সূত্রটি আজ ছিন্ন

হয়েছে। উচ্চশ্রেণীর লোকের সঙ্গে নিম্নশ্রেণীর লোকের মনের প্রভেদ আজকের দিনে বাস্তবিকই আকাশ পাতাল। ফলে এদেশে জনসাধারণ বলে যে একটা প্রকাণ্ড সম্প্রদায় আছে সেকথা আমরা একরকম ভুলেই গিয়েছিলুম।

(৪)

আমার এ কথা মোটেই অত্যুক্তি নয়।

ভুলে যে গিয়েছিলুম তার কারণ ভোলবার যথেষ্ট সুযোগ ছিল। যা মনে করে রাখবার প্রয়োজন নেই মানুষে সহজেই তা ভুলে যায়। শুধু শিক্ষায় নয় জীবনেও আমরা নিম্নশ্রেণীর সঙ্গে পৃথক হয়েছি এবং সেও অবস্থার গুণে।

আমরা যে শুধু ইংরাজি শিক্ষিত, তাই নয়—আমরা ইংরাজের হাতে-গড়া সম্প্রদায়, ইংরাজ শাসনের কৃপায় আমাদের উদয় ও আমাদের অভ্যুদয়।

শিক্ষিত সম্প্রদায় ওরফে ভদ্র সম্প্রদায়ের লোকেরা সকলেই হয় জমিদার নয় হাকিম, হয় উকিল নয় ডাক্তার, হয় স্কুল মাষ্টার নয় কেরাণী।

সেকালে এদেশে এ শ্রেণীর লোক যে মোটেই ছিল না তা নয়।

পুঁথির পঠন পাঠন করবার, খাতাপত্র লেখবার, নাড়ী টেপবার ও বড়ি গেলাবার লোক, অর্থাৎ—ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থ সেকালেও অবশ্য ছিল। এবং প্রধানত এই তিন জাতের লোকেই আজকের দিনে সমাজের মাথায় উঠেছেন।

সেকালে এঁরা দিন গুজরান করতেন দেশের লোকের আশ্রয়ে, আজকে করেন ইংরাজ-রাজের আশ্রয়ে। সেকালে এ দল সংখ্যায় বড় বেশি ছিল না, তাদের আর্থিক অবস্থাও ঠিক হিংসে করবার মত ছিল না এবং তাদের বিস্তার বহরটাও খুব খাটো ছিল।

সেকালের তুলনায় একালে আপিস আদালত স্কুল-কলেজ হাঁস-পাতাল ডাক্তারখানা জেল ও থানার সংখ্যা এত অসম্ভব বেড়ে গেছে যে স্বর্গীয় পিতামহেরা একবার যদি দেশে ফেরেন ত এদেশ যে তাঁদের দেশ তা তাঁরা একনজরে ঠাওর করতে পারবেন না।

উপরে যে সকল ক্ষেত্রের উল্লেখ করলুম সে সকল ক্ষেত্রেই মানুষের কাজ হচ্ছে—হয় কথা কওয়া, নয় কলম পেষা।—এক কথায় মস্তিষ্কের কাজ। অবশ্য থানায় ও ডাক্তারখানায় ভদ্র সম্প্রদায়ের কিছু হাতের কাজও আছে কিন্তু তাকে ঠিক শিল্প বলা যায় না।

কিন্তু যেমন ব্যক্তিবিশেষের তেমনি জাতিবিশেষেরও যদি মাথাটা প্রকাণ্ড হয়ে ওঠে আর সেই সঙ্গে তার হাত পা সব শুকিয়ে যায় তাহলে সেটা কি স্বাস্থ্য কি বল কিছুরই পরিচয় দেয় না। মানুষের দেহের ওরকম অবস্থা দেখলে লোকে বলে তার মাথায় জল হয়েছে অতএব আমাদের সম্বন্ধে কেউ ও-রকম কথা বললে আমরা রাগ করতে পারি কিন্তু তার উপর হাত তুলতে পারি নে কেননা সে হাত আমাদের একরকম নেই বললেই হয়।

ইংরাজের আমলে আমাদের হাত যে শুকিয়ে গিয়েছে তার প্রমাণ যে-সম্প্রদায়ের কাজই হচ্ছে হাতের কাজ, সে সম্প্রদায় একরকম উচ্ছন্নে গেছে। কামার কুমোর তাঁতি ছুতোর যুগী জোলা প্রভৃতি সব কলের তলে চাপা পড়ে পিষে গিয়েছে। শিল্পীর দল এখন আর এদেশে

নেই, আছে ইউরোপে আমেরিকায় জাপানে অষ্ট্রেলিয়ায়। তাদের হাতের তৈরি মাল আমাদের জীবনযাত্রার সম্বল। কিন্তু যে দেশে শিল্প আছে সে দেশে একালে শিক্ষার সঙ্গে শিল্পের, মাথার সঙ্গে হাতের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ, এর একটির শক্তির সঙ্গে অপরটির শক্তি বাড়ে কিম্বা কমে সুতরাং সে সব দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় সমাজ দেহেরই উচ্চাঙ্গ। এদেশে সে উচ্চাঙ্গ ছিন্ন অঙ্গ। আমি যখন একটু দূর থেকে স্ব-সম্প্রদায়কে দেখি, তখন আমি মনে মনে এ কথা না বলে থাকতে পারি নে যে, "কাটা মুণ্ড কথা কয়।" শুধু কথা কয় না, বড় বড় কথা বলে, তাও আবার ইংরেজিতে! এ দেখে যাঁর আনন্দ হয় তিনি ছেলে মানুষ, আমার শুধু হাসি পায়, কিন্তু সে হাসি কান্নারই সামিল।

সে যাই হোক আমাদের সমাজ দেহের একটা প্রধান অঙ্গ যে শুকিয়ে গিয়েছে—এবং তার ফলে আমাদের জাতীয় জীবন যে নিতান্ত দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে এবং জাতীয় জীবনকে সুস্থ ও সবল করতে হলে এদেশে শিল্পের যে পুনর্জ্জন্ম দেওয়া চাই এ কথা ত সর্ব্ববাদী সম্মত। এই মনোভাবেরই ত নাম স্বদেশী!

আজকের সভায় এ বিষয়ের আলোচনা আর তুলব না। কেননা এ সমস্যা যেমন গুরুতর তেমনি জটিল। এর সরল মীমাংসা সরল হতে পারে কিন্তু মীমাংসাই নয়। কারও কাছে এমন সঞ্জীবনী মন্ত্র নেই—যার বলে আমাদের মৃত শিল্পকে এক মুহূর্ত্তে খাড়া করে তুলতে পারা যায়। এ সব মন্ত্রতন্ত্রের কথা নয়, যন্ত্রতন্ত্রের কথা। শিল্পবাণিজ্য বর্ত্তমান যুগে তার স্বদেশী চরিত্র ত্যাগ করে সর্ব্বদেশী হয়ে উঠেছে। শিল্পবাণিজ্যের জালে সমগ্র পৃথিবী আজ এমনি জড়িয়ে পড়েছে যে

ইচ্ছে করলেই তার থেকে ছিঁড়ে বেরিয়ে যাবার শক্তি কোন দেশেরই নেই। দেখ না কেন এত বড় ঐশ্বর্য্যশালী ও প্রতাপশালী দেশ ইংলণ্ড অর্দ্ধমৃত জর্ম্মাণী আর অর্দ্ধক্ষিপ্ত রুসিয়ার সঙ্গে বাণিজ্যের প্রণয়-পাশে আবদ্ধ হবার জন্য কতদূর লালায়িত হয়েছে। ইউরোপের প্রতি দেশের আজ এ জ্ঞান হয়েছে যে এ ক্ষেত্রে কোন দেশকে একঘরে করতে গেলে নিজে একঘরে হয়ে পড়তে হয় এবং তাতে আর যাই হোক, অন্নবস্ত্রের কোন সুসার হয় না। আমাদের শিল্পের পুনঃপ্রতিষ্ঠা অবশ্য করতেই হবে, নইলে পৃথিবীর আর সব মহাজন জাতের কাছে আমাদের দেশ রেহানাবদ্ধ হয়ে থাকবে আর তাদের সুদ দিতেই আমরা সর্ব্বস্বান্ত হব। এ যুগের আর্থিক হিসাব এই। যে জাতি মাল ঘরের ও পরের জন্য তৈরি করে, তার স্থান সবার উপরে। যে জাতি মাল কি ঘরের কি পরের কারও জন্যে তৈরি করে না, তার স্থান সবার নীচে। আর যে জাতি মাল শুধু ঘরের কিম্বা শুধু পরের জন্য তৈরি করে, এমন কোনও জাতি যদি থাকে - তার স্থান মাঝে, তার কপালে হয় ওঠা, নয় নামা ছাড়া অন্য গতি নেই। তবে এ সমস্যা আমাদের পক্ষে বিশেষ গুরুতর এই কারণে যে, আমাদের দেশে এমন কিছু শিল্প নেই, যাকে লালন পালন করে আবার আমরা বড় করে তুলতে পারি। এ বস্তু আমাদের নতুন করে গড়তে হবে—তার জন্য বহু ভাবনা চিন্তা চাই—বহু পরিশ্রম চাই, অটল ধৈর্য্য চাই, একাগ্র সাধনা চাই। যদি কেউ মনে করেন যে, তিনি শুধু সভায় বক্তৃতা করে ও কাগজে আর্টিকেল লিখে আমাদের লুপ্ত শিল্পকে উদ্ধার করবেন, তাহলে আমি বলি, তিনি কলেরও বল জানেন না, ধনেরও বল জানেন না। বর্ত্তমানে দুটি ধাতু পৃথিবীর উপর প্রভুত্ব

করছে, সোনা আর রূপো। যে জাত এ দুই ভূতকে আমলে না আনতে পারবে, সে জাত পঞ্চভূতে মিলিয়ে যাবে। আর এ দুটিকে সত্য সত্যই দখলে আনতে হলে, চাই প্রবুদ্ধ জ্ঞান আর প্রকৃষ্ট কর্ম্ম। আমরা যে মনে করি যে, এ লড়াই আমরা কথায় ফতে করব, তার কারণ আমরা জানি শুধু বক্তৃতা করতে আর কলম পিষতে। উপরে যা বললুম তার থেকে এ অনুমান করবেন না যে, শিল্প-বাণিজ্য নিয়ে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বলা কওয়ার কোনই সার্থকতা নেই। তা যদি মনে করতুম, তাহলে আমি এ সভায় উপস্থিত হতুম না, কেননা একমাত্র কথা কথা কওয়া ব্যতীত অপর কোন শক্তি আমার নেই।

এই সব আলোচনার প্রথম ফল এই যে, আমাদের জাতীয় দৈন্যের বিষয়ে আমরা যখন সচেতন হই, তখন আমরা বুঝতে পারি যে, আমরা কি মহা সঙ্কটে পড়েছি।

এর দ্বিতীয় ফল এই যে, আমাদের জীবন সমস্যাটা যে কত ভীষণ, সে বিষয়ে আমাদের চোখ ফোটে। আর যে ক্ষেত্রেই হোক না কেন বিপদ চোখে পড়লেই তা অর্দ্ধেক কেটে যায়।

(৫)

দেশের জনসাধারণের সঙ্গে আমরা যে পৃথক হয়ে পড়েছি,—দেশের লোকের মনের ও জীবনের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক যে অতি দূর হয়ে পড়েছে, এই কথাটা সকলকে স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য আমি "রায়তের কথা" লিখি; কেননা নিম্ন শ্রেণীর সঙ্গে আমাদের সঙ্গে যা কিছু যোগাযোগ আছে, সে একমাত্র জমিসূত্রে। আগে যে লিখি নি, তার কারণ ও-কথা দু-বছর আগে বললে তা'তে বড় কেউ কান

দিত না। আজকের দিনে সকলে দিতে বাধ্য, কারণ জনসাধারণকে হঠাৎ আমাদের পলিটিক্সের আখড়ায় টেনে আনা হয়েছে।

আজকের দিনে সবারই মুখে একটি কথা নিত্য শোনা যায়, সে কথা হচ্ছে ডিমোক্রাসি। এই ইংরেজি কথাটার নানারূপ সংস্কৃত অনুবাদ করা হয়েছে যথা—প্রজাতন্ত্র, গণতন্ত্র, জনতন্ত্র, স্বায়ত্ত্বশাসন, লোকায়ত্ত্ব শাসন ইত্যাদি। সাদা বাঙলায় ডিমোক্রাসির মানে হচ্ছে রাজ্যের সেই শাসন-প্রণালী, যার গোড়ায় আছে লোকমত। একথা বলাই বেশি যে, লোকমত জানতে হলে লোকের কাছে যাওয়া দরকার, তাদের সুখ দুঃখ তাদের অভাব অভিযোগের সন্ধান নেওয়া প্রয়োজন। আমি যদি ভোটের জন্য তোমাদের দ্বারস্থ হই, তাহলে তোমরা আমাকে অবশ্য জিজ্ঞাসা করবে, আমি বাঙলার মন্ত্রীসভায় বসলে, আমার দ্বারা তোমাদের কি দুঃখ দূর হওয়া সম্ভব। এর জবাব আমাকে দিতেই হবে, এবং সে জবাব আমার পক্ষে দেওয়া অসম্ভব, যদি না আমি জানি তোমাদের ব্যথা কোথায়। এর থেকে আমি ধরে নিয়েছি যে, আজকের দিনে শিক্ষিত সম্প্রদায় "রায়তের কথা"য় কান দেবেন। এ ধরে নেওয়াটা আমার পক্ষে যে ভুল হয় নি তার প্রমাণ, আমার জবানী রায়তের কথা শুনে শিক্ষিত সম্প্রদায় ঈষৎ চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। অনেকেই আমার মতে সায় দিয়েছেন, যাঁরা দেন নি তাঁরা চুপ করে আছেন। অবশ্য আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, অর্থাৎ—একদল পলিটিসিয়ান আছেন, যাঁরা শুনতে পাই, আমার উপর ঈষৎ নারাজ হয়েছেন। তাঁদের মতে আমার কথাটা ঠিক; কিন্তু এ সময়ে তা তোলাটা বুদ্ধিমানের কাজ হয় নি। তাঁরা নাকি আমার ঐ লেখার দরুণ উভয় সঙ্কটে পড়েছেন, একপক্ষে জমিদার, অপর

পক্ষে রায়ত, এদের মধ্যে কার মন রেখে চলবেন, তা তাঁরা ঠিক বুঝতে পারছেন না। যেহেতু তাঁরা পেট্রিয়ট, সে কারণ তাঁরা রায়তের পক্ষে, আর যেহেতু তাঁরা পলিটিসিয়ান, সে কারণ তাঁরা জমিদারের পক্ষে। এর উত্তরে আমার নিবেদন এই যে, পেট্রিয়টিজম ও পলিটিক্সের এই বিচ্ছেদটা যত শীগ্‌গির মিলনে পরিণত হয়, ততই দেশের মঙ্গল।

পেট্রিয়টিজম ও পলিটিক্সের, দেশভক্তি ও রাজনীতির এই বিচ্ছেদটা কাল্পনিক নয়। পেট্রিয়টিজম হচ্ছে একটা মনের ভাব আর পলিটিক্স হচ্ছে একটা বৈষয়িক কাজ। দেশভক্তি চাই কি গান গেয়েই আমরা নিঃশেষ করে দিতে পারি, অপর পক্ষে রাজনীতি চাই কি একটা স্বত্বের মামলা মাত্র হয়ে উঠতে পারে। আমার বক্তব্য হচ্ছে, গান গাওয়া ও বক্তৃতা করা ছাড়াও দেশভক্তির আরও ঢের কাজ আছে। একটি জগৎ-বিখ্যাত ফরাসী লেখক আজীবন দুনিয়া দেখে শুনে শেষটা মানুষকে একটা অমূল্য পরামর্শ দিয়েছিলেন। তিনি সকলকে ডেকে বলেন—"নিজের জমি আবাদ করো।" আমিও আমার স্বজাতিকে বলি, নিজের জমি আবাদ করো। এ জমি শুধু ধানের জমি নয়, মনের জমিও বটে, জ্ঞানের জমিও বটে, ধর্ম্মের জমিও বটে, কর্ম্মের জমিও বটে। যতদিন পর্য্যন্ত আমরা নিজের জীবন নিজে গড়ে তুলতে কোমর না বাঁধব, ততদিন আমাদের পরমুখাপেক্ষী হয়ে থাকতেইহ বে, আর তার ফলে ক্ষণিক উল্লাসের পিঠ পিঠ আমাদের আক্ষেপ করতে হবে।

(৬)

জমি আবাদ করতে হলে, প্রথমে জমি চেনা চাই। আমি "রায়তের কথায়" এক জায়গায় বলেছি যে, এদেশে এমন মানব

জমিন পতিত রয়েছে, যা আবাদ করলে ফলত সোনা। আর সে মানব জমিন হচ্ছে বাঙলার কৃষক-সম্প্রদায়।

✓ পৃথিবীতে এমন অনেক লোক আছেন, যাঁরা একটা নূতন কথা শুন্‌লে, না ভেবে চিন্তে তার একটা প্রতিবাদ করে বসেন, কেননা ভাববার চিন্তবার অভ্যাস তাঁদের নেই, আছে শুধু প্রতিবাদ করবার। তার্কিকদের এ উপদ্রব আমাকে অপর ক্ষেত্রেও সহ্য করতে হয়েছে এবং সেই সূত্রে আমার কিঞ্চিৎ জ্ঞানলাভও হয়েছে।

আমি কলম ধরে অবধি এই মত প্রচার করছি যে, বাঙলা-সাহিত্য বাঙলা ভাষাতেই লেখা কর্ত্তব্য। আমরা শিক্ষিত সম্প্রদায়, আমাদের অভ্যস্ত ইংরাজী ও সংস্কৃত শিক্ষার প্রসাদে ও প্রভাবে একটি নূতন ভাষা গড়ে তুলেছি—যে-ভাষা আধ-বাঙলা আধ্-সংস্কৃত এবং যে ভাষার নাম সাধুভাষা। আমরা বলি বাঙলা, লিখি সাধুভাষা। মুখের কথার সঙ্গে বইয়ের কথার এই বিচ্ছেদটা দূর করার প্রস্তাব করবার দরুণ আমার বিরুদ্ধে এই সব অভিযোগ আনা হয় যে, আমি বঙ্গসাহিত্যের ইজ্জৎ নষ্ট করছি, আমি ইতর কথাকে প্রশ্রয় দিচ্ছি, আমি মুড়ি-মিছরির একদর করছি, এক কথায় বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত্যের সর্ব্বনাশ করতে প্রস্তুত হয়েছি। এ নিয়ে আমাদের মধ্যে বহু তর্কাতর্কি বহু বকাবকি, বহু রাগারাগি পর্য্যন্ত হয়ে গেছে। এর ফল কি দাঁড়িয়েছে? —আজ নূতন লেখকের দল প্রায় সকলেই নিজের জবানী কথা কই-ছেন, উপরন্তু বঙ্গসাহিত্যের দু-একটি মহারথী যাঁরা আমার উপর শব্দভেদী বাণনিক্ষেপ করেছেন, তাঁরাও আবার কেঁচে মাতৃভাষাতেই গণ্ডুষ করছেন।

তারপর আমি বহুদিন থেকে প্রচার করে আসছি যে, যতদিন না আমরা আমাদের নিজের ভাষায় শিক্ষিত হব ততদিন আমরা

যথার্থ শিক্ষিত হব না, ততদিন জ্ঞান বিজ্ঞান সকলই আমাদের মুখস্থ থাকবে, কিছুই আমাদের মনস্থ হবে না। বিদেশী ভাষায় শিক্ষালাভ করে, আমাদের মনের সঙ্গে, আমাদের জ্ঞানের যে বিচ্ছেদ ঘটেছে সেই পার্থক্য দূর করবার প্রস্তাব করবার দরুণ আমার বিরুদ্ধে এই সকল অভিযোগ আনা হয়েছে যে, আমি আমাদের শিক্ষার আভিজাত্য নষ্ট করতে উদ্যত হয়েছি, বাঙলা-ভাষার মত একটা ইতর ভাষাকে জ্ঞান বিজ্ঞানের বাহন করতে উদ্যত হয়েছি, বাঙলাকে ইংরাজি রাজাসনে বসাতে চাচ্ছি—এক কথায় শিক্ষার সর্ব্বনাশ করতে বদ্ধপরিকর হয়েছি। আমি আজ ভবিষ্যদ্বাণী করে রাখছি যে, কাল না হোক, পরশু বাঙলা ভাষাই বাঙালীর শিক্ষার বাহন হবে, আর তার দৌলতে, বাঙালীর মন সেইরূপ শক্তি ও ঐশ্বর্য্য লাভ করবে, বাঙলা ভাষায় লেখবার দরুণ বাঙলা সাহিত্য যে শক্তি ও ঐশ্বর্য্য লাভ করছে।

আমি কি সংস্কৃত, কি ইংরাজী কোন ভাষার বিরুদ্ধেই যুদ্ধ ঘোষণা করি নি। আমার কথা এই যে মৃতভাষা ও বিদেশী ভাষা যত্ন করে শেখবার জিনিস নয়, কষ্ট করে লেখবার জিনিষ নয় তা ছাড়া অপর ভাষা শিক্ষার উদ্দেশ্য নিজের ভাষা ভোলা কখনই হতে পারে না। দূরদেশ ও দূর কালের জ্ঞান বিজ্ঞান আত্মসাৎ করবার জিনিস। যা বাইরে থেকে আসে তা নিজের ভাষার সাহায্যেই আয়ত্ত করতে হবে, নিজের মন দিয়েই পরিপাক করতে হবে।

এই সব কারণে যখন শুনি যে আমি "রায়তের কথা" তুলে ইতর লোককে নাই দিয়ে মাথায় চড়াচ্ছি, সাম্প্রদায়িক বিরোধের সৃষ্টি করছি, যেখানে পরস্পরের মনের মিল আছে সেখানে মনান্তর ঘটাচ্ছি, এক কথায় আমাদের অভিজাত সমাজের সর্ব্বনাশ সাধন

করতে উদ্যত। তখন সে অভিযোগের প্রতিবাদ করাও নিষ্প্রয়োজন মনে করি। এস্থলে আমি শুধু একটি কথা বলতে চাই। ভাষা, শিক্ষা পলিটিক্স; সকল বিষয়েই আমার মতামতের ভিতর একটি বিশেষ মনোভাব ফুটে বেরয়। সে হচ্ছে এই বিশ্বাস যে বাঙলার নব-সভ্যতা বাঙলার জমির উপরেই গড়ে তুলতে হবে আর সে জমি শুধু চাষের জমি নয় মনেরও জমি।

(৭)

এদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের এ যুগে সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য হচ্ছে আমাদের জাত গড়ে তোলা। জাতি-গঠনই যে আমাদের রাজনীতির একমাত্র লক্ষ্য এ কথা মুখে সকলেই বলেন এবং মনে অনেকেই করেন। এবং প্রতি দেশসেবকই নিজের ধারণা অনুসারে এ ক্ষেত্রে নিজের কর্ত্তব্য স্থির করে নেন।

আমার ধারণা এই যে আমাদের স্বজাতিকে তার ভিৎ থেকেই গড়ে তুলতে হবে। অতএব আমাদের দেখতে হবে সে ভিৎ কোথায়।

বাঙালীর মনের ভিৎ হচ্ছে বাঙলার ভাষা। আর বাঙালীর জীবনের ভিৎ হচ্ছে বাঙলার চাষা। এই চাষা শব্দটা মুখে আনতে আমার প্রবৃত্তি হয় না, কেননা কথাটার ভিতর কৃষক সম্প্রদায়ের প্রতি অবজ্ঞার পরিচয় ফুটে বেরয়।—যে জমি চষে তার প্রতি এই অবজ্ঞা যেমন অযথা তেমনি জাতির পক্ষে ক্ষতিকর। তাই আমি জাতীয়জীবনে কৃষক সম্প্রদায়ের স্থান নীচে হলেও তার মূল্য যে কত উচ্চ নিজের সম্প্রদায়কে সেই কথাটা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই।

মানুষে যে দিন কৃষিকাজ করতে আরম্ভ করেছে সেই দিন তার সভ্যতার গোড়াপত্তন হয়েছে। পৃথিবীর সকল সভ্যতাই হচ্ছে কৃষিমূল। শুধু তাই নয়—সেই দিনই পৃথিবীর একটা ভূভাগ মানুষের স্বদেশ হয়ে উঠেছে। মরুভূমি কারও স্বদেশ নয়, কেননা যে ভূমি মানুষকে অন্ন দেয় তাই মানুষের মাতৃভূমি। জন্মভূমি জননীরই তুল্য কেননা জননী শিশুকে স্তন্য দেন আর জন্মভূমি মানুষকে অন্ন দেয়। যে স্বদেশ-প্রীতির গুণকীর্ত্তন করতে করতে আমাদের দশা ধরে সে প্রীতি আদিতে কৃষকেরই মনে জন্মলাভ করে। আর সেই মাটি ভালবাসাটাই উদার হয়ে স্বদেশ-প্রীতির আকার ধারণ করেছে। আর স্বদেশ-প্রীতি যে আসলে কৃষকেরই মনোভাব তার পরিচয় প্রতি সভ্য দেশেই পাওয়া যায়। ইউরোপের গত যুদ্ধে সকল দেশেই এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে যে পেট্রিয়টিক মনোভাব যে পরিমাণে কৃষকের মধ্যে আছে সে পরিমাণে কলের কুলির মধ্যে নেই। স্বদেশকে জর্ম্মাণদের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য ফ্রান্সের কৃষকেরা হাজারে হাজারে অকাতরে প্রাণ দিয়েছে। এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই, কেননা ফ্রান্সের, কৃষকদের কাছে জর্ম্মাণদের কর্ত্তৃক ফ্রান্স অধিকার মাতৃহত্যারই তুল্য। আর যার শরীরে মানুষের রক্ত আছে সে খুনীর হাত থেকে মাকে বাঁচাবার জন্য নিজের রক্তপাত করতে দ্বিধা করে না। কি ফ্রান্স কি জর্ম্মাণী কি ইতালী সকল দেশেই যে সম্প্রদায় জমির মালিক আর যে-সম্প্রদায় জমি চষে সেই সম্প্রদায় প্রধানত Nationalist, আর যে-সম্প্রদায় কল কারখানায় মজুরি করে সে সম্প্রদায় প্রধানত internationalist। যারা কল কারখানায় মজুরি করে দিন আনে দিন খায় তাদের মনে স্বদেশ-প্রেমের চাইতে স্বজাতি-বাৎসল্য প্রবল। আর

ইউরোপের এক দেশের মজুর অপর দেশে মজুরকে তার স্বজাতি মনে করে। সুতরাং এ কথা নির্ভয়ে বলা যায় যে, যে-স্বরাজ্য লাভের জন্য আমরা সকলে অস্থির হয়ে উঠেছি সে স্বরাজ্য আমাদের ভাগ্যে যদি কখনো জোটে, তা হলে—আমাদের কৃষক সম্প্রদায়ই আমাদের স্বদেশপ্রীতির সর্ব্বপ্রধান আধার ও নির্ভর স্থল হইবে।

আজকে যে তাদের সে প্রীতি নিজের ক্ষেতের গণ্ডী পেরয় না—তার কারণ যে শিক্ষার ফলে এ ভালবাসা উদার হয় সে শিক্ষা তাদের নেই।

ভাবের দিক ছেড়ে দিলেও, একমাত্র বৈষয়িক হিসেবে দেখলেও দেখা যায় যে কৃষক সম্প্রদায় হচ্ছে আমাদের জীবনের সর্ব্বপ্রধান আশ্রয়স্থল। ইংরেজ আসবার পূর্ব্বে এ দেশের সকল সম্প্রদায় এই কৃষিজীবীদের আশ্রয়েই জীবন ধারণ করত। শিল্পের সঙ্গে কৃষির যোগ চিরদিনই অতি ঘনিষ্ঠ, আজকের দিনেও সে যোগ নষ্ট হয় নি। বোম্বায়ের কাপড়ের কল ও বাঙলার চটের কল দেখে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মুখে আজ জল আসে। তাঁরা পারলে দেশটাকে একটা বিরাট কারখানা করে তোলেন কিন্তু তাঁরা ভুলে যান যে তুলো ও পাটের অভাবে ও-সব কল একমিনিটও চলতে পারে না, আর তুলো ও পাটের জন্ম হয় জমিতে।

একালের সঙ্গে সেকালের তফাৎ এই যে আমাদের দেশে সেকালে শুধু শিল্পের সঙ্গে কৃষির নয়, শিল্পীর সঙ্গে কৃষকের যোগাযোগটাও অতি ঘনিষ্ঠ ছিল। তাঁতি জোলা কামার কুমোর, জমিদারের কাছথেকে পেত জমি ও কৃষকের কাছথেকে ধান। উঁচু জাতের লোকেরাও ঐ জমির উপসত্বের উপরই সংসার চালাত।

ব্রাহ্মণের খোরপোষ চলত—ব্রহ্মোত্তরের কৃপায়। কৃষাণের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাঁর যে পরিচয় ছিল তার প্রমাণ এই শ্লোক

বামন গেল ঘর।
লাঙ্গল তুলে ধর॥

সেকালে বেশির ভাগ ব্রাহ্মণ কায়স্থ লেখাপড়ার কাজের চাইতে ক্ষেতের কাজে বেশি মনোনিবেশ করতেন। ফলে কৃষির মর্য্যাদা ও কৃষকের মর্ম্ম আমাদের চাইতে সে কালের বাঙালী ঢের বেশি বুঝত। এ সত্য তাদের প্রত্যক্ষ ছিল যে সমগ্র সমাজ ঐ কৃষির ভিত্তির উপরেই দাঁড়িয়ে আছে। আজকে যে কথা তর্ক করে বোঝাতে হয়—সে জিনিস ছিল তাদের চোখে-দেখা পদার্থ।

আজকের দিনে আমরা এ সত্য ভোলবার যে অবসর পাই তার কারণ, এক জমিদার ছাড়া ভদ্রসম্প্রদায়ের আর কাউকেও নিত্য নিয়মিত কৃষকের হাত-তোলা খেতে হয় না। অথচ আজকের দিনে কৃষকের উপর আমাদের যতটা নির্ভর সেকালে ততটা ছিল না। ধনসৃষ্টির দুটি উপায়—কৃষি ও শিল্পের ভিতর শিল্প আমাদের নেই, আছে শুধু কৃষি।

আমরা—যারা মাইনের চাকর, একটু খোঁজ করলেই জানতে পারব সে মাইনে আসে কৃষকের কাছথেকে—তার পর ওকালতি বলো, ডাক্তারি বলো, সবারই ফিসের টাকা, ঐ কৃষকের কাছ থেকেই আসে। কিন্তু সেটা যে আমাদের চোখে পড়ে না, তার কারণ সে টাকা আসে, হয় সরকারের তহবিল নয় জমিদারের তহবিলের ভিতর দিয়ে তার পর পাঁচ হাত ঘুরে। কথাটা যে কতদূর সত্য একটা কাল্পনিক

উদাহরণ দিয়ে তা বোঝানো যাক। আজকাল এ দেশে ধর্ম্মঘট আমাদের হাতে একটা রাজনৈতিক অস্ত্র হয়ে উঠেছে। রাজার অবিচার অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করবার কারো কারো মতে ও-ছাড়া আমাদের অপর কোনও অস্ত্র নেই। ধরে নেওয়া যাক তাই। যে সব ধর্ম্মঘটের আমরা সৃষ্টি করছি তাতে যারই যা অসুবিধা হোক দুনিয়ার কাজ একরকম চলে যায়। কিন্তু ধরুন যদি কৃষকেরা পণ করে বসে যে ফসল আর তারা বুনবে না—তাহলে কি হয়? সমগ্রজাতির শুধু ভাবলীলা নয়, সেই সঙ্গে ভবলীলাও স্বল্প দিনেই সাঙ্গ হয়। এই সব কারণে আমি এ সম্প্রদায়ের অবস্থার প্রতি ভদ্র-সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করেছি। যে-কৃষি বাঙলার ঐশ্বর্য্যের মূল ও যে-কৃষক বাঙলার শক্তির আধার, সেই দুয়ের উন্নতি সাধনই—যাঁরা জাতিগঠন করতে চান, তাঁদের প্রথম কর্ত্তব্য। এই হচ্ছে আমার লেখা রায়তের কথার মূল কথা।

(৮)

আমরা যখন বলি যে, আমরা জাতিগঠন করতে চাই—তার অর্থ আমরা একজাতি গঠন করতে চাই—কেননা পলিটিক্সের হিসাবে এক দেশের লোকসমূহ একজাতি বলেই গণ্য।

আমাদের দেশে সকলকে নিয়ে একটা জাতি গড়ে তোলবার অন্তরায় হচ্ছে আমাদের জাতিভেদ।

প্রথমত ধর্ম্মের প্রভেদের দরুণ আমরা সম্পূর্ণ পৃথক দু'টি জাতিতে বিভক্ত। হিন্দু একজাতি, মুসলমান আর এক।

তারপর আমরা—যারা নিজেদের হিন্দু বলি, আমরা একজাত নই—ছত্রিশ জাত। এবং সামাজিক হিসেবে এই অসংখ্যজাত—পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কহীন।

এ প্রভেদ পুরাকাল থেকে চলে এসেছে, তার পর ইংরাজি শিক্ষা আবার আমাদের মধ্যে নূতন একটা জাতিভেদের সৃষ্টি করেছে। শিক্ষিত সম্প্রদায় একজাতি, অশিক্ষিত সম্প্রদায় আর এক।

তা ছাড়া ধনী দরিদ্রের যে জাতিভেদ সব দেশেই আছে, সে ভেদ এদেশেও আছে। আর এ কথা নিশ্চিত যে, মানুষে মানুষে এই বৈষম্য—পলিটিক্যাল হিসাবে এক জাতি গঠনের অন্তরায়। সুতরাং যিনি বাঙলায় একজাতি গঠনের প্রয়াসী তাঁর ভেবে দেখা উচিত, এর ভিতর কোন্ ভেদটি আমাদের দ্বারা দূর হওয়া সম্ভব।

ধর্ম্মের ভেদে যে জাতিভেদ ঘটেছে, সে ভেদ দূর করা যে অসম্ভব সে কথা বলাই বাহুল্য। ভারতবর্ষের লোকের মনোভাব আজও এতটা পলিটিক্যাল হয়ে ওঠে নি, আর আশা করি কখনও উঠবে না যে তারা ধর্ম্মের চাইতে পলিটিক্সকে বড় করে তুলবে—কেননা তা করার অর্থ আত্মার চাইতে সংসারকে বড় করে তোলা।

এ ক্ষেত্রে আমরা যা করতে পারি সে হচ্ছে এই যে, ধর্ম্ম যেন আমাদের পরস্পরের আত্মীয়তার প্রতিবন্ধক কিম্বা প্রতিকূল না হয়। এই কারণে ধর্ম্মের সঙ্গে পলিটিক্স জড়ানো—আমি একান্ত ভয়ের বিষয় মনে করি। কেননা এ অবস্থায় জাতিতে জাতিতে যে পার্থক্য আছে তা'ত থেকেই যাবে; উপরন্তু পরস্পারের বিরোধের সুযোগ ক্রমে বেড়েই চল্‌বে। এই কারণে আমাদের দেশে পলিটিক্যাল হিসেবে মুসলমান-দের যে এক শ্রেণী আর হিন্দুদের আর এক শ্রেণী করা হয়েছে সে

বন্দোবস্তের আমি মোটেই পক্ষপাতী নই। এর ফল যে কি করে শুভ হতে পারে, তার মর্ম্ম গ্রহণ করা আমার বিদ্যেয় কুলোয় না। আর যাঁদের কুলোয় তাঁদের দূরদর্শিতারও আমি তারিফ করতে পারি নে।

সে যাই হোক—শিক্ষাজাত আমাদের এই নূতন জাতিভেদ দূর করার সাধ্য আমাদের আছে, অতএব এ দেশের উচ্চ সম্প্রদায়ের সঙ্গে নিম্ন সম্প্রদায়ের মনের যে বন্ধন ছিন্ন হয়েছে, সেই বন্ধন সূত্রে পরস্পরের আবার আবদ্ধ হবার চেষ্টা আমাদের পক্ষে সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। এক দেহের অন্তরে যদি দু'টি মন থাকে যারা পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধ শূন্য তাহলে সে দুয়ের উল্টোটানে সে দেহের সকল শক্তি নষ্ট হয়, সকল গতি ব্যর্থ হয়।

এখন দেখা যাক, কি উপায়ে আমরা আমাদের মনের ঐক্য ফিরে আনতে পারি। এর দুটি উপায় আছে।

প্রথম। আমরা ভদ্রসম্প্রাদায় যদি স্কুল কলেজে না ঢুকি, আপিস আদালত ছেড়ে দিই, অর্থাৎ—লেখাপড়ার সম্পর্ক না রাখি, তাহলে অবশ্য আমরা দেশশুদ্ধ লোক সহজেই বিদ্যাবুদ্ধিতে একজাত হয়ে যাই।

এ উপায়টা দেখতে অতি সহজ, কেননা কিছু করার চাইতে কিছু না-করার দিকে মানুষের মনের স্বাভাবিক ঝোঁক আছে। এবং ভদ্র সম্প্রদায়ের পক্ষে এ উপায় অবলম্বন করবার প্রস্তাবও যে না হয়েছে তা নয়।

দ্বিতীয়। উপায় হচ্ছে অশিক্ষিত সম্প্রদায়কে শিক্ষিত করা। আমি এই দ্বিতীয় উপায়ের পক্ষপাতী।

কেন পক্ষপাতী তার কৈফিয়ৎ দিতে গেলে পণ্ডিতের তর্ক সুরু করতে হয়। এ সভা সে তর্কের ক্ষেত্র নয়। সুতরাং একটা উদাহরণের সাহায্যে কথাটা পরিষ্কার করা যাক।

আমাদের ভদ্র-সম্প্রদায় যখন প্রথম ইংরাজি শিক্ষা লাভ করেন, তখন তাঁদের মধ্যে জনকতক উৎসাহী ব্রাহ্মণযুবক আমাদের সামাজিক জাতিভেদ ভুলে দেবার উদ্দেশ্যে পৈতা ফেলে দেন! তাঁরা ভেবেছিলেন যে উক্ত উপায়ে অতি সহজে ব্রাহ্মণ শূদ্র একাকার হয়ে যাবে। কিন্তু ফলে দাঁড়াল এই যে দু'দশ জন ছাড়া আর কেউ পৈতা ফেললেন না, আর যাঁরা ফেললেন তাঁরা ইতোনষ্টস্ততোভ্রষ্ট হলেন। অর্থাৎ—কি ব্রাহ্মণ-সমাজ কি শূদ্র-সমাজ উভয় সমাজেরই তাঁরা বহির্ভূত হয়ে থাকলেন।

কিছুদিন থেকে এ দেশের লৌকিক-মনের একটা উজানগতির পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। অনেক অব্রাহ্মণ জাত আজকের দিনে পৈতা নিচ্ছে, এক আধটি করে নয় শয়ে শয়ে কোথাও বা হাজারে হাজারে। এ উপবীত ধারণের ফলে তারা ব্রাহ্মণ হয়ে ওঠে নি, কিন্তু শূদ্রত্বের অপবাদ থেকে তারা মুক্ত হচ্ছে এবং এই সূত্রে তাদের আত্মমর্য্যাদাও বেড়ে যাচ্ছে। এ প্রচেষ্টার আমি পক্ষপাতী। তাই শিক্ষাজাত জাতিভেদ দূর করবার জন্যে আমার মতে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনের পৈতা ফেলাটা সদুপায় নয় তার সদুপায় হচ্ছে অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের পক্ষে মনের পৈতা নেওয়া! এই কারণেই আমি লোকশিক্ষার এত পক্ষপাতী। জনগণকে যে-শিক্ষা দিতে আমরা আজ প্রয়াসী হয়েছি জানি তার ফলে লোকসমাজ মনে ব্রাহ্মণসমাজ হয়ে উঠবে না। কিন্তু সেই শিক্ষাসূত্রে এ দুই সমাজের মনের যোগ হবে। এতে

সমগ্র সমাজের মনের শক্তি যথেষ্ট পরিমাণে বেড়ে যাবে, কেননা তখন আমাদের সমাজদেহের সর্ব্বাঙ্গে একই রক্ত চলাচল করবে।

বোধ হয় বলা নিষ্প্রয়োজন যে আমি ভদ্র সম্প্রদায়ের শিক্ষাদীক্ষা নষ্ট করতে চাই নে, অর্থাৎ—আমাদের সমাজদেহের মুণ্ডপাত করতে চাই নে। এ যুগে সব চাইতে বড় বল হচ্ছে বুদ্ধিবল, এবং জ্ঞান বিজ্ঞানই হচ্ছে বুদ্ধির প্রধান খোরাক। আমাদের মনকে সে খোরাক না যোগালে জাতির যে সর্ব্বপ্রধান শক্তি তাই ক্ষুণ্ণ হয়ে পড়বে, তার চাইতে সর্ব্বনাশের বিষয় আর কিছু হতে পারে না। আমি চাই চাষা ভদ্র হোক। আর আমার বিশ্বাস চাষারাও চায় না যে ভদ্র সম্প্রদায় চাষা হোক। জনসাধারণের ঐ পৈতা নেবার প্রবৃত্তি থেকেই দেখা যায় যে তারা নিজে উপরে উঠতে চায় অপরকে নীচে নামাতে চায় না।

(৯)

বিশেষ করে রায়তের কথা আলোচনা করবার জন্য এ সভায় আমি উপস্থিত হই নি। এ বিষয়ে আমার যা বক্তব্য ছিল সে সবই আমি "রায়তের কথা"য় বলেছি। যে কথা একবার বলেছি সে কথার পুনরুল্লেখ করবার কোনও প্রয়োজন নেই।

তা ছাড়া আমার কথার এমন কোনও প্রতিবাদ অদ্যাবধি আমার কর্ণগোচর হয় নি, যার দরুণ আমি আমার মতামত পরিবর্ত্তন করতে বাধ্য হয়েছি। দক্ষিণ কিম্বা বাম কোন মার্গের পলিটিসিয়ানরা আমার কথার এমন কোন জবাব দেন নি, যার উল্টো জবাব দেওয়া দরকার।

এমন কি জমিদার সম্প্রদায়ও এ বিষয়ে চুপ করে আছেন। এর থেকে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, রায়তের অবস্থার উন্নতিকল্পে আমি যে সব প্রস্তাব করেছি, তাতে তাঁদের বিশেষ কিছু অমত নেই।

তবে শুনতে পাই যে, কেউ কেউ আমার প্রতি এই দোষারোপ করছেন যে, রায়তের কথা তুলে আমি সাম্প্রদায়িক বিবাদের সৃষ্টি করছি।

আমাদের ভদ্রসম্প্রদায়ের সঙ্গে আমাদের নিম্নসম্প্রদায়ের যুদ্ধ বাধানোর অভিপ্রায়ের লেশমাত্র যে আমার মনের কোন কোণে স্থান পায় নি তার প্রমাণ এই যে, এক্ষেত্রে আমার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, এ দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে মনের ও জীবনের বন্ধন দৃঢ় করা। বলা বাহুল্য যে, আমাদের ভদ্র-সম্প্রদায়ের অধিকাংশ লোক অল্পবিস্তর জমির মালিক, অর্থাৎ—জমিদার। আমার বিশ্বাস যেখানে সে বাঁধন একেবারে ছিঁড়েও যায় নি, সেখানে তা ঢিলে হয়ে গিয়েছে। আমার এ বিশ্বাসের কারণ যে কি, তা এতক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে বলেছি।

জমিদার ও রায়তে যদি আজ যুদ্ধ বাধে, তাহলে কোন্ পক্ষ যে এ ফেরা হার মানবে তা আমি সম্পূর্ণ জানি। সুতরাং সে বিবাদের যিনি সৃষ্টি করবেন, তিনি আর যারই হোক, রায়তের উপকার করবেন না। জমিদার-সম্প্রদায় চিরকালই বাঙলার একটা প্রবল সম্প্রদায় ছিল আর আজকের দিনে সব চাইতে প্রবল সম্প্রদায় হয়ে উঠেছে। আমাদের রাজনীতির ক্ষেত্রে তাঁদের একটি পৃথক সম্প্রদায় করে তোলা হয়েছে। দুদিন পরে যদি দেখা যায় যে, লাট দরবারে তাঁরাই দেশের বিধাতা হয়ে বসেছেন, তাহলে আর যিনিই হোন আমি আশ্চর্য্য হব না।

প্রজার অবস্থার আমি যে বদল করতে চাই, সে আইনের মারফৎ; আর বর্ত্তমান আইনের বদল করা আর না করার উপর

ভবিষ্যতে জমিদারের হাত অনেকটা থাকবে। সুতরাং জমিদার যদি প্রজার বিরোধী হন, তাহলে প্রজার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হতে কিঞ্চিৎ দেরি লাগবে।

রায়তের দুরবস্থা না ঘুচলে বাঙালী জাতির যে দেহে বল ও মনে শক্তি আসবে না, এ সত্যটা জমিদার সম্প্রদায়ের কাছেও অবিদিত থাকতে পারে না। সুতরাং তাঁরা যে জাতীয়-উন্নতির পথ আগলে দাঁড়াবেন, এ ভয় আমি পাই নে। তা ছাড়া জমিদারদের এ জ্ঞান নিশ্চয়ই আছে যে, তাঁরা যদি রায়তের উন্নতির বিরোধী হন, ত আজ হোক কাল হোক সমগ্র জাতি তাঁদের বিপক্ষ হয়ে উঠবে। আর তার ফল যে কি হবে, তা সহজেই অনুমান করা যায়। সজ্ঞানে কেউ আত্মহত্যা করে না, কোন ব্যক্তিও নয়, কোন সমাজও নয়।

তবে একটি কথা। বিরোধের কারণ বর্ত্তমান রেখে বিরোধ কেউ চিরদিনের জন্য স্থগিত রাখতে পারে না। তুমি যদি শুধু তোমার স্বার্থ দেখ, তাহলে আমিই বা কেননা আমার স্বার্থ দেখব এই হচ্ছে মানুষের সহজ কথা। আমি প্রজার হয়ে যে সকল দাবী করেছি, সেগুলি মঞ্জুর করলে, জমিদার রায়তের বিরোধের সম্ভাবনা অনেক কমে আসে। সুদূর ভবিষ্যতের কথা কেউ বলতে পারে না, তাই আমরা বর্ত্তমান সমস্যার একটা বর্ত্তমান মীমাংসার পথ দেখাতে চেষ্টা করেছি।

গৃহ-বিবাদ সৃষ্টি করবার অভিযোগ আমার বিরুদ্ধে যে কেন আনা হয়েছে, তা আমি বেশ জানি। ধনী ও দরিদ্রের ভিতর যে জাতিভেদ রয়েছে, সে ভেদ কথঞ্চিৎ পরিমাণে দূর করতে যিনি প্রয়াসী হবেন,

তাঁর বিরুদ্ধে এ অপবাদ সকল দেশে সকল ধনীব্যক্তি ও তাঁদের মোসাহেবের দল চিরদিনই নিয়মিত এনে থাকেন। পলিটিক্সের ভিতর যখনই ইকনমিক্সের সমস্যা এসে পড়ে, তখন যিনি সে সমস্যার বিচার করতে বসেন, তিনিই নিন্দার ভাগী হন। রাজনীতির লম্বা চৌড়া কথা দিয়ে অর্থনীতির কথা চাপা দেওয়া এক শ্রেণীর পলিটিসিয়ানদের চির-কেলে রোগ। কিন্তু এ চেষ্টার ফলে ইউরোপে জনগণের দারিদ্র্যের কথাটা চাপা পড়া দূরে থাক, আজকের দিনে সে-দেশের রাজনীতি ঐ অর্থনীতির নীচে চাপা পড়েছে। অতীতে কি ছিল জানি নে। কিন্তু বর্ত্তমানে পৃথিবীর বেশির ভাগ লোকের জীবনযাত্রা এত কষ্টকর হয়ে পড়েছে যে, সে কষ্টের কথাটা উহ্য রেখে পলিটিক্সের স্বাধীনতার কথা বললে ইউরোপের লোক আজ তা আর কানে তোলে না। সেদেশে class war, অর্থাৎ—কারখানার মালিকের সঙ্গে তার মজুরের বিবাদটা আজ ধর্ম্মযুদ্ধ বলে গণ্য। এই সব দেখে শুনে আমার মনে হয়েছে যে, দেশের বেশির ভাগ লোকের আর্থিক অবস্থার কথাটা চাপা দিয়ে যে সকল পলিটিক্সের কথা আজকাল কওয়া হচ্ছে, তার মোহ বেশি দিন টি ঁকবে না। আমাদের সমাজদেহের রোগ কোথায় এবং তার চিকিৎসা কি এ বিষয়ে আজ যদি আমরা উদাসীন থাকি, তাহলে ভবিষ্যতে সে রোগ মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে। রায়তের কথা মুখ্যত তাদের ব্যথার কথা এবং সে ব্যথার কতকটা উপশম যে আমরাই করতে পারি, এই সত্যটা সকলের চোখের সুমুখে দাঁড় করানো আমার মতে প্রতি শিক্ষিত লোকের পক্ষে কর্ত্তব্য এবং আমি যথাসাধ্য সেই কর্ত্তব্য পালন করতে চেষ্টা করেছি।

কিছুদিন পূর্ব্বে আমি আমাদের সম্প্রদায়কে তোমাদের কথা শোনাবার চেষ্টা করেছিলুম আর আজ আমি তোমাদের সম্প্রদায়কে আমাদের কথা শোনাতে চেষ্টা করলুম। অবস্থা তোমাদেরও ভাল নয়, আমাদেরও ভাল নয় সুতরাং সমগ্রজাতির শক্তি ও শ্রীবৃদ্ধির জন্য তোমাদের সঙ্গে আমাদের মনের ও জীবনের ঘনিষ্ঠ মিলনের প্রয়োজন আছে। এই আমার শেষ কথা।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

বিলাতের পত্র।

—:০:—

(লণ্ডন থেকে আমার একটি বন্ধু আমাকে যে পত্র লিখেছেন, তার এক অংশ প্রকাশ করছি। এর থেকে পাঠকেরা দেখতে পাবেন যে, যে সকল যুবক ভবিষ্যতে আমাদের দেশের intellectual-নেতৃত্ব গ্রহণ করবে, তাদের মনের ভিতর কি সকল মত পুষ্ট হচ্ছে। রাজনৈতিক বাজে বুলি ও হুজুগের অসারতা সম্বন্ধে তাঁদের যে চোখ ফুটছে, নিম্নোদ্ধৃত ছত্রক'টি তার নিদর্শন।—সম্পাদক।)

লণ্ডন, ২৫শে অগস্ট্, ১৯২০।

* * * *

সবুজ পত্রের জন্য প্রবন্ধ পাঠাতে পারছি নে, তার জন্য বড়ই লজ্জিত রয়েছি। মাঝে প্রায় ২৭।২৮ দিন বেশ একটু স্কটলাণ্ডে আর লেকডিষ্ট্রিক্টে বেড়িয়ে এলুম। এডিনবরায় ছিলুম প্রায় দিন তের; বাকী ক'দিন হাইলাণ্ডস্-এ, আর লেক্স্-এ। আপনার বোধ হয় ও-সব জায়গা দেখা আছে। ইন্‌ভারনেস, ফোর্ট অগস্টস্, ওবান আর কেজিক,—বড় চমৎকার লাগল। মনে হ'ল, যেন ডারওয়েণ্ট-ওয়াটার বরোডেল্ অঞ্চলটা হাইলাণ্ডস্-এর চেয়েও সুন্দর। কিন্তু হাইলাণ্ডস্ এক ধরণের জিনিস, এ আর এক ধরণের। দেশে হিমালয় দেখেছি, হিমালয়ের বিরাট বিশাল রূপ না থাকলেও এদেশের পাহাড়

অতি মনোরম লাগল। আবার সেই সব জায়গায় যাবার ইচ্ছে হয়। শেষ দু'দিন ব্লাকপুল-এ কাটাই। অতি কদর্য্য লাগল এই সী-সাইড (Sea-side place) প্লেসটা—কি ভীষণ ভীড়, কি ভাল্‌গারিটী—নাগরদোলা, রিং-খেলার আড্ডা, সমুদ্রের ধারের রাস্তায় আর বীচে লোকের গা ঘেষাঘেষি। আমাদের দেশের তীর্থস্থানের মত লোকের ঠেলাঠেলি, কিন্তু উদ্দেশ্য একেবারে অন্য রকম। এখানকার ছোটলোকেরা মিডল্ স্কুল অবধি প'ড়ে পুরাতন বিশ্বাস আর শালীনতা আর স্বাভাবিক সুরুচি হারাচ্ছে, কিন্তু কুসংস্কার বা অন্ধ-বিশ্বাস যাচ্ছে না। সেখানে (ব্লাকপুল-এ) দেখলুম ম্যাডেম লীলা, ম্যাডেম ল্যরা, ম্যাডাম কিরো-প্রমুখ খাঁটী ইংরেজ মহিলা—সংখ্যায় কম নয়—হাত দেখে ভবিষ্যৎ বলছেন, ৬ পেনী থেকে শিলিং দর্শনী—আর সর্ব্বত্রই মেয়ে-পুরুষে লম্বা লাইন করে দাঁড়িয়ে গেছে। এদেশের ডেমোক্রাসীর যে উৎকট রূপ দেখছি, আমাদের দেশে এর আবৃত্তির কল্পনা করে ভীত হয়ে যাচ্ছি, বোধ হয় ডেমোক্রাসী কোথাও টিকবে না। আরিষ্টোক্রাসী ছাড়া ভাল শাসন যেন হওয়া সম্ভব নয়। রুষেও তো নাকি বল্‌শেভিক্-তন্ত্র এখন জনকতক মাথাওয়ালা লোকের ইঙ্গিতে চ'লছে। Emancipation of the intellect, freedom of the spirit—এ সব বুলী দেশে শুনতুম—কোথায় সে সব ? মনে হয়, বুঝি সাবেক কালের চাল-চিন্তা এখনকার চেয়ে ভাল ছিল, শোভন সুন্দর ছিল। কিন্তু এখন অবশ্য তার টিঁকে থাকা অসম্ভব, কারণ জীবন ঢের বেশি জটিল হ'য়ে যাচ্ছে। The golden age that never was—তার জন্য অতীতের দিকেই তাকাতে ইচ্ছে করে। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমি বড়ই নিরাশ হ'য়ে প'ড়ছি।

স্কটলাণ্ডে মুমূর্ষু গেলিক ভাষার অবস্থা স্বচক্ষে দেখা গেল। এত বড় একটা ভাষা (গেলিক আর আইরিশ একই ভাষা), ১৫০০ (খ্রীঃ) পর্য্যন্ত যার সাহিত্য পশ্চিম-ইউরোপের সব চাইতে বড় সাহিত্য ছিল, যে-ভাষা এক সময়ে সমস্ত পশ্চিম-ইউরোপে চ'লত (খ্রীঃ পুঃ ৪০০ থেকে কেল্টিক ভাষার প্রচার ছিল প্রায় সমগ্র পশ্চিম-ইউরোপে) এখন তার চর্চ্চা নেই, আদর নেই, হাজার তিরিশেক জেলে আর চাষার ভাষা হয়ে তার অবশিষ্ট বছর তিরিশ চল্লিশের জীবন গুজরাচ্ছে। আইরীশরা সংখ্যায় চার মিলিয়ন, এর মধ্যে বিশ হাজার লোক গেলিক বলে। ইংরেজের হাত এই গেলিক ভাষা আর কেল্টিক কালচার আর স্পিরিটকে ধ্বংশ করতে কম ছিল না। তাই আইরীশ লোকেরা, মুখ্যতঃ ইংরেজ-বিদ্বেষের বশে, আইরীশ-গেলিকের পুনরুদ্ধারের জন্য ব্যর্থ-প্রয়াস করছে। আমি ভাষা, সাহিত্য ও সভ্যতার বহুত্বে বিশ্বাস করি; সব ধুয়ে মুছে যাক, এক বিশ্বভাষা বিশ্বসভ্যতা তার জায়গায় চলুক, এই মতে আমি বিশ্বাস করি নে, একে সম্ভবপর বিবেচনা করি নে, কল্যাণকর বলেও ভাবি নে। A federation of cultures, languages, religions—not their suppres sion by one type. ইংরেজ ব'নে-যাওয়া হাইলাণ্ডার অতি ভীষণ জীব; এই জন্যই বাইরে—the Scot is the better Englishman. যেমন জার্ম্মাণ ও পোলিশ য়িহুদী আজকাল ইংলণ্ডে গোঁড়া ইংরেজ হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

খিলাফৎ ডেলিগেশনের কর্ত্তারা এখানে খুব খানিক হৈচৈ করলেন। দেখ্ছি, স্বদেশী আন্দোলোনের যুগে যে সব Mushroom patriots উঠেছিলেন, লম্ফে ঝম্পে, বোকামিতে, গোঁড়ামিতে * * প্রমুখ

সে সব ভুঁইফোড়দের চেয়ে একটুও কম নন্। এই দলের লোকেরা তোফা আছেন—আহার বিহার ভ্রমণ বেশ চ'লছে— কিন্তু কাজ কিছু কর'তে পারলেন না। এঁরা তুর্কীকে উদ্ধার করবার জন্য আমেরিকাতে প্রয়াণ করবার মানস করছিলেন, কিন্তু একটি বাঙালী মুসলমান এই রকম ক'রে না-হক্ গরীব ভারতবর্ষের পয়সা খরচ করবার বিরুদ্ধে দাঁড়ানতে শীগ্‌গিরই সবাই ঘরে ফির্‌ছেন। বোধ হয় আলিগড়াইট্ ইয়ং টার্কদের সঙ্গে থেকে, এঁদের সাহচর্য্য তাঁর বড় সুখকর লাগছে না। যে মুসলমান চোস্ত উর্দূ ব'লতে পারে না, আলিগরাইটরা তাকে কৃপার চক্ষে দেখে—তার সঙ্গে একটু প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের দৃষ্টিতে কথা কয়। * * * * * *

কৈফিয়ৎ।

—:*:—

আমার বন্ধু বান্ধবেরা গত কংগ্রেস সম্বন্ধে একটু বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করবার জন্য আমাকে অনুরোধ করেছেন। এ আলোচনা একটু ধীর ভাবে করা কর্ত্তব্য, কেননা আপাত দৃষ্টিতে এ কংগ্রেস যে মনোভাবের পরিচয় দিয়েছে তা এক হিসেবে যেমন হাস্যকর আর এক হিসেবে তেমনি গুরুতর। কংগ্রেস সম্বন্ধে একটা মতস্থির করবার পক্ষে ইংরাজিতে যাকে public opinion বলে, তার থেকে কোনরূপ সাহায্য আজ পাওয়া যাচ্ছে না। এ বিষয়ে যাঁর সঙ্গেই কথা কও না কেন, দেখতে পাবে তাঁর মত সম্পূর্ণ তাঁর নিজস্ব, অর্থাৎ— সে মত অপর কারোও মতের সঙ্গে মেলে না। আমি ইতিপূর্ব্বে আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন বিষয়ে এহেন ঘোর মত-ভেদের পরিচয় পাই নি। মহাত্মা গান্ধির প্রস্তাবের যাঁরা বিপক্ষে তাঁদের পরস্পরের মতেরও যেমন কোন মিল নেই, যাঁরা পক্ষে তাঁদের পরস্পরের মতেরও তেমনি মিল নেই। গত কংগ্রেস আর কিছু করুক আর নাই করুক, দেশের লোককে অব্যবস্থিতচিত্ত করে রেখে গিয়েছে। এই কারণে এ কংগ্রেস সম্বন্ধে আমার যা বক্তব্য তা বারান্তরে লিপিবদ্ধ করব।

এই কংগ্রেসের সঙ্গে আমার যেটুকু ব্যক্তিগত সংস্রব ছিল আজ সেই সম্বন্ধে দুটি একটি কথা বলতে চাই।

কিছুদিন পূর্ব্বে আমি যখন আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট বাঙলার নবগঠিত কাউন্সিলের একটি সদস্য পদপ্রার্থী হয়ে দাঁড়াই তখন আমাদের শিক্ষিত সমাজ একটু আশ্চর্য্য হয়েছিলেন কিন্তু অসন্তুষ্ট হন নি, তারপর সেদিন যখন আমি আমার সে অভিপ্রায় ত্যাগের কথা প্রকাশ করি, তখনও আমাদের শিক্ষিত সমাজ একটু আশ্চর্য্য হয়েছিলেন, এবং এ সংবাদ শুনে অনেকে যেমন সন্তোষ প্রকাশ করেছেন, কেউ কেউ আবার তেমনি অসন্তোষও প্রকাশ করেছেন। এতে অবশ্য আমি আশ্চর্য্য হই নি—কেননা আমি পূর্ব্বেই বলেছি যে, কংগ্রেসের প্রস্তাবানুযায়ী আমাদের কর্ত্তব্য যে কি, সে বিষয়ে লোকমতের কোনরূপ ঐক্য, কোনরূপ স্থিরতা নেই।

যেহেতু আমি বাঙলার কোনও পলিটিক্যাল-পার্টির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট নই—সে কারণ অনেকে জিজ্ঞাসা করেন যে, আমার পক্ষে কংগ্রেস-পার্টির অপর বিশ জনের মতানুসরণ করবার কারণ কি ?

এস্থলে আমি আমার ব্যক্তিগত মতই প্রকাশ করব—কেমনা, আমরা অনেকে এক কাগজে নাম স্বাক্ষর করলেও আমার ধারণা, আমাদের মধ্যে প্রতি ব্যক্তিই নিজের নিজের হিসেব থেকে কাউন্সিলের সদস্য হবার অভিপ্রায় ত্যাগ করেছেন।

কাউন্সিল বয়কট করার যে কোনও যুক্তিযুক্ত কারণ কিম্বা সার্থকতা আছে, এরূপ বিশ্বাস আমার কোনও কালেই ছিল না, আজও নেই। আমি কি কংগ্রেসে, কি লোক-সমাজে, উক্তরূপ বয়কট করবার স্বপক্ষে অদ্যাবধি এমন কোনও যুক্তি তর্ক শুনি নি, যার দরুণ আমার পূর্ব্বমত ত্যাগ করতে আমি বাধ্য হয়েছি। ধরে নেওয়া যেতে

পারে যে, এ বিষয়ে অধিকাংশ বাঙালী একমত—নচেৎ কংগ্রেসের বাঙালী কর্ত্তাব্যক্তিরা কখনই কাউন্সিলে প্রবেশ করবার চেষ্টা করতেন না, এবং মহাত্মা গান্ধীর প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিতেন না। যাঁরা বলেন যে, কাউন্সিলকে দক্ষযজ্ঞে পরিণত করবার উদ্দেশ্যে তাঁরা সেখানে প্রবেশ করবার চেষ্টা করেছিলেন, তাঁদের কথা একেবারেই মিছে—কেননা, ও-কথা তাঁরা তাঁদের ভোটারদের কাছে বলেন না। অতএব এ বিষয়ে অধিক কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন।

দ্বিতীয়ত মহাত্মা গান্ধীর প্রস্তাবের বিরুদ্ধে যাঁরা ভোট দিয়েছিলেন তাঁরাও যে উক্ত প্রস্তাবানুসারে চলতে বাধ্য—এ মত আমি গ্রাহ্য করতে পারি নে। আমার মতে যাঁরা ভারতবর্ষীয় প্রাদেশিক Congress Committee-র মেম্বর, তাঁরা উক্ত প্রস্তাব শিরোধার্য্য করতে অবশ্য বাধ্য, বাদবাকী সকলে নয়। কেননা কংগ্রেস পার্লিয়া-মেণ্ট নয় এবং কংগ্রেসের প্রস্তাবও আইন নয়। তবে এ কথা আমি মানি যে, রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রতিব্যক্তি যদি তার মতের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে ও সেই অনুসারে চলতে বদ্ধপরিকর হয় তাহলে রাজনীতির কাজ চলে না, কেন না ও-হচ্ছে দশে মিলে করবার কাজ।—

এ অবস্থায় যাঁরা কাউন্সিলের সদস্য পদপ্রার্থী হয়েছিলেন, তাঁরা কংগ্রেসের মত উপেক্ষা করতে পারতেন, যদি তাঁরা জানতেন যে তাঁদের electorate-এর মত অন্যরূপ।

আমাদের পক্ষে নিজ নিজ electorate-র বেশির ভাগ লোকের মত জানা অসম্ভব। এই কারণে আমি কংগ্রেসের মত গ্রাহ্য করা সঙ্গত মনে করি। যত দিন না দেশে electorate organisation

গঠিত হচ্ছে তত দিন কাউন্‌সিলের ক্যাণ্ডিডেট্‌দের পক্ষে কংগ্রেস কন্‌ফারেন্স প্রভৃতির মতানুসারে চলা ছাড়া উপায়ান্তর নেই—কেন না সে মত যে electorate-এর মত নয়, এমন কথা আমরা জোর করে কেউ বলতে পারি নে।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

রামমোহন রায়।*

—:•:—

আপনাদের সেক্রেটারি মহাশয় আমাকে আপনাদের সুমুখে উপস্থিত হয়ে দু-চার কথা বলবার জন্যে বহুদিন ধরে অনুরোধ করে আসছেন। কতকটা অবসরের অভাবের দরুণ কতকটা আলস্যবশত সে অনুরোধ আমি এতদিন রক্ষা করতে পারি নি। তিনি যে বিষয়ে আমাকে বলতে অনুরোধ করেন, সে বিষয়ে ভাল করে কিছু বলবার জন্য আগে থেকে প্রস্তুত হওয়া দরকার, এবং তার জন্য কতকটা অবসরও চাই, কতকটা পরিশ্রমও চাই।—রামমোহন রায় সম্বন্ধে যেমন তেমন করে যা-হোক একটা প্রবন্ধ পড়ে তুলতে আমার নিতান্ত অপ্রবৃত্তি হয়। যে ব্যক্তিকে আমি এ যুগের একমাত্র মহাপুরুষ বলে মনে করি, তাঁকে মৎকরাক্কা রকম একটা সার্টিফিকেট দিতে উদ্যত হওয়াটা আমার মতে ধৃষ্টতার চরম সীমা।

শেষটা আপনাদের সেক্রেটারি মহাশয় যখন আমাকে কথোপকথনচ্ছলে এই মহাপুরুষের সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দেবার অনুমতি দিলেন তখন আমি তাঁর উপরোধ এড়িয়ে যাবার কোনও পথ দেখতে পেলুম না।

কিছুদিন পূর্ব্বে "প্রবাসী" পত্রিকা এ যুগের বাঙলাদেশের সব 'ইতে বড় লোক কে, পাঠকদের কাছথেকে এই প্রশ্নের জবাব

* কোন একটি সাহিত্যসভায় পড়া হবে বলে' লিখিত।—

চেয়েছিল। পাঠকদের ভোটে স্থির হয়ে গেল যে, সে ব্যক্তি রাজা রামমোহন রায়। দেশের লোক যে এ সত্য আবিষ্কার করেছে এ দেখে আমি মহা খুসি হলুম। কিন্তু সেই সঙ্গে আমার মনে একটি প্রশ্নও জেগে উঠল। রামমোহন রায় যে বাঙলার, শুধু বাঙলার নয়, বর্ত্তমান ভারতবর্ষের অদ্বিতীয় মহাপুরুষ এ সত্য বাঙালী কি উপায়ে আবিষ্কার করলে?—রামমোহন রায়ের লেখার সঙ্গে চাক্ষুস পরিচয় আছে এমন লোক আমার পরিচিত লোকের মধ্যে একান্ত বিরল, অথচ এঁদের মধ্যে অধিকাংশই হচ্ছেন যথোচিত সুশিক্ষিত এবং দস্তুরমত স্বদেশভক্ত। লোকসমাজে অনেকেরই বিশ্বাস যে রামমোহন রায় বাঙলা গদ্যের সৃষ্টি করেছেন। তিনি বাঙলার সর্ব্ব-প্রথম গদ্য-লেখক কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে; কিন্তু যে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই সে এই যে, তিনি হচ্ছেন বাঙলা-গদ্যের প্রথম লেখকদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান লেখক। অথচ তাঁর লেখার সঙ্গে বাঙলা লেখকদেরও পরিচয় এত কম যে, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ এ কথা লিখতেও কুণ্ঠিত হন না যে, রামমোহন রায় ইংরাজি-গদ্যের অনুকরণে বাঙলা-গদ্য রচনা করেছিলেন। এর পর যদি কেউ বলেন যে, শঙ্করের গদ্য হার্বার্ট স্পেনসারের অনুকরণে রচিত হয়েছিল তাতে আশ্চর্য্য হবার কোনই কারণ নেই। কিন্তু আপনাদের একটি খবর দেই, যা শুনে আপনারা শুধু আশ্চর্য্য নয়, অবাক হয়ে যাবেন। আপনারা সকলেই অবগত আছেন যে, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় কিছুদিন ধরে নানা উপায়ে একদল research-scholar তৈরি করবার চেষ্টায় আছেন, কাউকে scholarship দিয়ে, কাউকে ডাক্তার উপাধি দিয়ে, আর কাউকে বা প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি দিয়ে। এঁদের হাতে যে

সকল গবেষণাপূর্ণ পুস্তক তৈরি হচ্ছে তার মধ্যে দুচারখানা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে একখানি হচ্ছে—

History
of
Bengalee Literature
In The Nineteenth Century.
1800—125
By
Sushil Kumar De, M.A.

Premchand Roychand-Research Student, Post-Graduate Lecturer, Calcutta University, and Hony. Librarian Bangiya Shahitya Parishat.

বঙ্গভাষার এই ইতিহাসখানি পুস্তিকা নয়, অক্টেভো সাইজের ৫১০ পাতার পুস্তক। এ পুস্তকে রাজা রামমোহন রায়ের নামোল্লেখ পর্য্যন্ত করা হয় নি। যদি কোথায়ও করা হয়ে থাকে ত, সে নাম সাধারণ পাঠকের চোখে সহজে পড়ে না—তা আবিষ্কার (research) সাপেক্ষ। এ উপেক্ষার কারণ কি? ঐতিহাসিক মহাশয়ের মতে বঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাসে রামমোহন রায়ের নাম যে উল্লেখযোগ্য নয়, এ কথা বিশ্বাস করা কঠিন, কেননা তিনি গণ্ডা গণ্ডা পণ্ডিত মুনসি মিসনারি এবং কবিওয়ালাদের বিষয় গণ্ডা গণ্ডা পাতা লিখেছেন। সুতরাং আমাদের ধরে নিতেই হবে যে, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের লাইব্রেরিতে রামমোহনের গ্রন্থ নেই এবং দে-মহাশয় research করেও তার সাক্ষাৎ পান নি।

রামমোহন রায়ের লেখার সঙ্গে বাঙলার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের যে পরিচয় নেই এর চাইতে তার কি আর বেশি জাজ্বল্যমান প্রমাণ হতে পারে!

(২)

এখন জিজ্ঞাস্য হচ্ছে, রামমোহন রায় এই অল্প কালের মধ্যেই ইতিহাসের বহির্ভূত হয়ে কিম্বদন্তির অন্তর্ভূত হয়ে পড়লেন কেন? এ প্রশ্নের সহজ উত্তর এই যে, সাধারণত লোকের মনে এই রকম একটা ধারণা আছে যে, রামমোহন রায় বাঙালী জাতির একজন মহাপুরুষ নন, কিন্তু বাঙলার একটি নব ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের মহাজন।

এ ভুল ধারণার জন্য দোষী কে? ব্রাহ্ম-সমাজ না হিন্দু-সমাজ? এ প্রশ্নের উত্তর আজকের সভায় দিতে আমি প্রস্তুত নই, কেননা তাহলেই নানারূপ মতভেদের পরিচয় পাওয়া যাবে, নানারূপ তর্ক উঠবে এবং সে তর্ক শেষটা বাক্-বিতণ্ডায় পরিণত হবে। ইংরাজদের ভদ্রসমাজে ধর্ম্ম ও পলিটিক্সের আলোচনা নিষিদ্ধ, কেননা বহুকালের সঞ্চিত অভিজ্ঞতার বলে প্রমাণ হয়েছে যে, এই দুই বিষয়ের আলোচনায় লোকে সচরাচর ধৈর্য্যের চাইতে বীর্য্য বেশির ভাগ প্রকাশ করে। ফলে বন্ধু-বিচ্ছেদ, জ্ঞাতি-বিরোধ প্রভৃতি জন্মলাভ করে, এক কথায় হাত হাত সমাজের শান্তি ভঙ্গ হয়। এক্ষেত্রে আমি রামমোহন রায়ের ধর্ম্মমতের আলোচনায় যদি প্রবৃত্ত হই, তাহলে তাঁর সমসাময়িক সেই পুরোণো কলহের আবার সৃষ্টি করব। একশ' বৎসর আগে রামমোহন রায়কে তাঁর বিপক্ষ দলের কাছ থেকে যে সকল যুক্তি তর্ক শুনতে হত আজকের দিনে আমাদেরও সেই সব

যুক্তিতর্ক শুনতে হবে। রামমোহন রায়ের রচিত "পথ্য প্রদান" প্রভৃতি পড়ে দেখবেন, সে যুগের "ধর্ম্ম-সংস্থাপনকারীরা" যে ভাবে যে ভাষায় তাঁর মতের প্রতিবাদ করেছিলেন, এ যুগেও সেই ভাব সেই ভাষায় নিত্য প্রকাশ পায়। এই একশ' বৎসরের ভিতর মনোরাজ্যে আমরা বড় বেশি দূর এগোই নি। অতএব এক্ষেত্রে রামমোহন রায়ের ধর্ম্মমত-সম্বন্ধে নীরব থেকে, তাঁর সামাজিক মতেরই যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় দিতে চেষ্টা করব। তার থেকেই দেখতে পাবেন যে, তাঁর চাইতে বড় মন ও বড় প্রাণ নিয়ে, এ যুগে ভারতবর্ষে অপর কোনও ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করেন নি। মানুষমাত্রেরই জ্ঞানের আশ্রয় হচ্ছে দুটি বাইরের জিনিস—এক মানব-সমাজ আর এক বিশ্ব। ইংরাজি-দর্শনের ভাষায় যাকে cosmic consciousness এবং social consciousness বলে, মানুষমাত্রেরই মনে এ দুই consciousness অল্পবিস্তর আছে।

এ বিশ্বের অর্থ কি, এর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কি, সে সম্বন্ধ ইহ-জীবনের কি অনন্ত কালের এই শ্রেণীর প্রশ্নের মূল হচ্ছে cosmic consciousness, এবং সকল ধর্ম্ম, সকল দর্শনের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই সব প্রশ্নের জবাব দেওয়া।

অপর পক্ষে ইহ-জীবনে কি উপায়ে আমার অভ্যুদয় হবে, সমাজের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কি তার প্রতি আমার কর্ত্তব্যই বা কি, কিরূপ কর্ম্ম সমাজের পক্ষে এবং সামাজিক ব্যক্তির পক্ষে মঙ্গলকর এই শ্রেণীর প্রশ্নের মূল হচ্ছে social consciousness, এবং পলিটিক্স আইন শিক্ষা প্রভৃতির উদ্দেশ্য হচ্ছে, সমাজের মঙ্গল সাধন করা।

নিত্য দেখতে পাই যে, এ দেশের লোকের মনে এদানিক এই ভুল বিশ্বাস জন্মলাভ করেছে যে, ভারতবর্ষে পুরাকালে ছিল একমাত্র

cosmic consciousness এবং ইউরোপে বর্ত্তমানে আছে শুধু social consciousness ; আমাদের দেশের শাস্ত্র মুক্তকণ্ঠে এর প্রতিবাদ করছে। যাকে আমরা "মোক্ষশাস্ত্র" বলি, তা cosmic consciousness হতে উদ্ভূত আর যাকে আমরা "ধর্ম্মশাস্ত্র" বলি, তা social consciousness হতে উদ্ভূত। জ্ঞানমার্গ ও কর্ম্মমার্গ সেকালে ছিল ঠিক উল্টো উল্টো পথ। ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার সঙ্গে কর্ম্ম-জিজ্ঞাসার যে কি প্রভেদ, তা যিনি বেদান্তের দু-পাতা উল্টেছেন তিনিই জানেন। এ দুই যে বিভিন্ন শুধু তাই নয়, এ উভয়ের ভিতর স্পষ্ট বিরোধ ছিল। কর্ম্ম যখন ক্রিয়া কলাপে পরিণত হয়, তখন জ্ঞানকাণ্ড তার প্রতিবাদ করতে বাধ্য আর ধর্ম্ম যখন কর্ম্মহীন জ্ঞানে পরিণত হয়, তখন কর্ম্মকাণ্ড তার প্রতিবাদ করতে বাধ্য হয়। জ্ঞানকর্ম্মের সমন্বয় করবার জন্য ভারতবর্ষে যুগে যুগে বহু মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়েছে, যাঁদের কাছে এ সত্য প্রত্যক্ষ ছিল যে, কর্ম্মহীন জ্ঞান পঙ্গু এবং জ্ঞানহীন কর্ম্ম অন্ধ। রামমোহন রায় এঁদেরই বংশধর, এঁদের পাঁচজনেরই একজন।

(৩)

তিনি জ্ঞানকর্ম্মের সমন্বয় করতে ব্রতী হয়েছিলেন, তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই, সেকালে তাঁর বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ ছিল যে, তিনি গৃহী হয়েও ব্রহ্মজ্ঞানী হবার ভাণ করতেন, এক কথায় তিনি ছিলেন একজন "ভাক্তজ্ঞানী"।

এই ভাক্ত শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে গৌণ, অপ্রধান ইত্যাদি। এ বিশেষণে বিশেষিত হতে রামমোহন রায় কখনই আপত্তি করেন নি। তিনি মুক্তকণ্ঠে বলেছেন যে, তিনি যে ব্রহ্মের স্বরূপ জানেন, এমন

স্পর্দ্ধা তিনি কখনই রাখেন নি। তবে গৃহীর পক্ষে যে বাহ্যিক ক্রিয়া কলাপই একমাত্র সেব্য-ধর্ম্ম এবং গৃহস্থের পক্ষে যে ব্রহ্মনিষ্ঠ হওয়া অসম্ভব, একথা যেমন ন্যায়বিরুদ্ধ, তেমনি অশাস্ত্রীয়। এ কথার উত্তরে ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীরা যোগবাশিষ্ঠের একটি বচন তাঁর গায়ে ছুঁড়ে মেরেছিলেন। সে বচনটি হচ্ছে এই :—

"সংসার বিষয়াসক্তং ব্রহ্মজ্ঞোস্মীতি বাদিনং।
কর্ম্মব্রহ্মোভয়ং ভ্রষ্টং তং ত্যজেদন্ত্যজং যথা॥

অর্থাৎ —

"যে ব্যক্তি সংসার-সুখে আসক্ত হইয়া আমি ব্রহ্মজ্ঞানী ইহা কহে, সে কর্ম্মব্রহ্ম উভয় ভ্রষ্ট অতএব অন্ত্যজের ন্যায় ত্যাজ্য হয়।"

এ সম্বন্ধে রামমোহন রায় বলেন—"যোগবাশিষ্ঠে ভাক্তজ্ঞানীর বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা যথার্থ বটে"।

এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করবার উদ্দেশ্য হচ্ছে, এই দেখিয়ে দেওয়া যে, কর্ম্ম ও ব্রহ্মজ্ঞানের একসঙ্গে চর্চ্চা করা যেতে পারে কি না, এইটিই ছিল সে যুগের আসল বিবাদস্থল। এ বিবাদ আমরা আজ করি নে, কেননা দেশসুদ্ধ লোক এখন গীতাপন্থী, এবং আপনারা সকলেই জানেন যে, লোকের ধারণা যে, গীতায় শুধু জ্ঞানকর্ম্মের নয়, সেই সঙ্গে ভক্তিরও সমন্বয় করা হয়েছে। দেশসুদ্ধ লোক আজ যে পথের পথিক হয়েছে, সে পথের প্রদর্শক হচ্ছেন রামমোহন রায়। সুতরাং ধর্ম্মমত সম্বন্ধেও তিনিই হচ্ছেন এ যুগের সর্ব্বপ্রথম এবং সর্ব্বপ্রধান মহাজন। যে শাস্ত্রের বচন সকল আজ শিক্ষিত অশিক্ষিত সকল লোকের মুখে মুখে ফিরছে, রামমোহন রায়কে সেই বেদান্ত-শাস্ত্রের আবিষ্কর্ত্তা বললেও

অত্যুক্তি হয় না। আপনারা শুনে আশ্চর্য্য হয়ে যাবেন যে, সেকালে একদল পণ্ডিত তাঁর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনেন যে, উপনিষদ্ বলে সংস্কৃত ভাষায় কোন শাস্ত্রই নেই, ইশ কেন কঠ প্রভৃতি নাকি তিনি রচনা করেছিলেন। এ অভিযোগ এত লোকে সত্য বলে বিশ্বাস করেন যে, রামমোহন এই মিথ্যা অভিযোগের হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভ করবার জন্য প্রকাশ্যে এই জবাব দিতে বাধ্য হয়েছিলেন যে, এই কলিকাতা সহরের শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের বাড়ীতে গেলেই সকলে দেখতে পাবেন যে, বেদান্ত শাস্ত্রের সকল পুঁথিই তাঁর ঘরে মজুত আছে। বিশেষ করে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের নাম উল্লেখ করবার কারণ এই যে, তিনি ছিলেন রামমোহন রায়ের বিপক্ষদলের সর্ব্বাগ্রগণ্য পণ্ডিত।

স্কচ দার্শনিক Dugald Stewart বলেছিলেন যে, সংস্কৃত বলে কোন ভাষাই নেই—ইংরেজদের ঠকাবার জন্য ব্রাহ্মণেরা ঐ একটি জালভাষা বার করেছে। একথা শুনে এককালে আমরা সবাই হাসতুম, কেননা সেকালে আমরা জানতুম না যে, এই বাঙলা দেশেই এমন একদল টোলের পণ্ডিত ছিলেন, যাঁদের মতে বেদান্ত বলে কোন শাস্ত্রই নেই, বাঙালীদের ঠকাবার জন্য রামমোহন রায় ঐ একটি জাল-শাস্ত্র তৈরি করেছেন। এই জালের অপবাদ থেকে রামমোহন রায় আজও মুক্তি পান নি। আমাদের শিক্ষিত সমাজে আজও এমন সব লোকের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, যাঁদের বিশ্বাস—“মহানির্ব্বাণ তন্ত্র” রামমোহন রায় এবং তাঁহার গুরু হরিহরানন্দ ভারতী এই উভয়ে মিলে জাল করেছেন। এঁরা ভুলে যান যে, দলিল লোকে জাল করে, শুধু আদালতে পেশ করবার জন্য। এই কারণেই টোলের

পণ্ডিত মহাশয়েরা "দত্তক চন্দ্রিকা" নামক একখানি গোটা স্মৃতিগ্রন্থ রাতারাতি জাল করে ইংরেজের আদালতে পেশ করেছিলেন। সে জাল তখন ধরা পড়ে নি, পড়েছে এদানিক। ঈশ কেন কঠ এমন কি মহানির্ব্বাণ-তন্ত্র পর্য্যন্ত কোনও আদালতে গ্রাহ্য হবে না, ও-সবই irrelevant বলে rejected হবে। সুতরাং রামমোহন রায়ের পক্ষে মোক্ষশাস্ত্র জাল করবার কোনই প্রয়োজন ছিল না। তবে যে লোকে "মহানির্ব্বাণকে" জাল মনে করে তার কারণ তারা বোধ হয় "দত্তকচন্দ্রিকা"-কেও genuine মনে করে। এই শ্রেণীর বিশ্বাস এবং অবিশ্বাসের মূলে আছে একমাত্র জনশ্রুতি। এই এক-শ' বৎসরের শিক্ষা-দীক্ষার বলে আমাদের বিচার বুদ্ধি যে আজও ফণা ধরে ওঠে নি, তার কারণ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে সে বুদ্ধি স্বল্পজ্ঞানের সংকীর্ণ গণ্ডীর ভিতর আটকে পড়েছিল, আর এই বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে সে বুদ্ধি আমাদের অতি-জ্ঞানের চাপে মাথা তুলতে পারছে না। আমি আশা করি একবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে, বাঙালীর বিদ্যার বোঝা কতকটা লঘু হয়ে আসবে আর তখন বাঙালীর বুদ্ধি স্বচ্ছন্দে খেলে বেড়াবার একটু অবসর পাবে।

(৪)

রামমোহন রায় সম্বন্ধে আর একটি লৌকিক ভুল ধারণা এই যে, তিনি ছিলেন ইংরাজি শিক্ষার একটি product, অর্থাৎ—ইউরোপের কাব্য ইতিহাস দর্শন বিজ্ঞানের প্রভাবেই তাঁর মন তৈরি হয়েছিল, এক কথায় তিনি আমাদেরই জাত। আমার ধারণা যে অন্যরূপ সে কথা

কথা বলতে গেলে তিনি এ যুগে বাঙালা দেশে প্রাচীন আর্য্যমন নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সে মনের পরিচয় আমি এখানে দু' কথায় দিতে চাই। আপনারা সকলেই জানেন যে কাণ্টের দর্শন তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথম pure reason, দ্বিতীয় practical reason আর তৃতীয় হচ্ছে æsthetic judgment. আমার বিশ্বাস ভারতবর্ষীয় আর্য্যেরা যার বিশেষ ভাবে চর্চ্চা করেছিলেন, সে হচ্ছে এক pure reason আর এক practical reason এবং রামমোহনের অন্তরে এই দুই reason-ই পূর্ণমাত্রায় প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছিল। তিনি অলঙ্কার শাস্ত্রকে কখনো দর্শন শাস্ত্র বলে গ্রাহ্য করেন নি, রসতত্ত্বকে আত্মতত্ত্ব বলে ভুল করেন নি, অর্থাৎ—মানুষের মনের æsthetic-অংশের তাঁর কাছে বিশেষ কিছু মর্য্যাদা ছিল না। বেদান্তের ধর্ম্ম Spiritual কিন্তু emotional নয়। মীমাংসার ধর্ম্ম ethical কিন্তু emotional নয়, অপর পক্ষে খ্রীষ্টান বৈষ্ণব মুসলমান প্রভৃতির ধর্ম্মে emotional-অংশ অতি প্রবল এবং সকল দেশের সকল মূর্ত্তি-পূজার মূলে মানুষের সৌন্দর্য্যবোধ আছে।

পাছে আমার কথা কেউ ভুল বোঝেন সেই জন্য এখানে বলে রাখা আবশ্যক যে, emotion শব্দ আমি মানুষের প্রতি মানুষের রাগদ্বেষ অর্থেই ব্যবহার করেছি, কেননা anthropomorphic ধর্ম্ম-মাত্রেরই সেই emotion হচ্ছে যুগপৎ ভিত্তি ও চূড়া। এ ছাড়া অবশ্য cosmic emotion বলেও একটি মনোভাব আছে, কেননা তা না থাকলে মানুষের মনে cosmic consciousness জন্মাতই না। আদিরসই এ জগতে একমাত্র রস নয়, অনাদি রস বলেও একটি রস আছে, যাঁরা এ রসের রসিক তাঁদের কাছেই উপনিষদ হচ্ছে মানব-

মনের গগনচুম্বি কীর্ত্তি। বলা বাহুল্য মানুষ মাত্রেরই মনে এই উভয়-বিধ emotion-এর স্থান আছে। এর মধ্যে কার মনে কোন্‌টি প্রধান সেই অনুসারেই তাঁর ধর্ম্মমত আকার ধারণ করে।

কিছুদিন পূর্ব্বে রামমোহন রায়ের একটি নাতিদীর্ঘ জীবনচরিত ইংরাজি ভাষায় বিলাতে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থকার তাঁর নাম গোপন রেখেছেন। এ পুস্তকে তাঁর সম্বন্ধে অনেক নূতন কথা আছে। তার মধ্যে একটি কথা হচ্ছে এই যে, তিনি বিলাতে গিয়ে খৃষ্ট ধর্ম্মের প্রতি অনুকূল হয়েছিলেন, এবং লেখকের বিশ্বাস তিনি আরও কিছুদিন বেঁচে থাকলে সম্ভবত খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করতেন, এ কথা বিশ্বাস করা আমার পক্ষে অসম্ভব। তবে তিনি যে উক্ত ধর্ম্মের সঙ্গে বিশেষ পরিচয়ের ফলে তার প্রতি অনুকূল হয়েছিলেন এ কথা গ্রাহ্য করায় বাধা নেই। বাইবেলের যে অংশ রামমোহনের ভাষায় বলতে হলে, "বড়াই বুড়ির কথায়" পরিপুর্ণ, তিনি সেই অংশের উপরেই বরাবর তাঁর বিদ্রূপবাণ বর্ষণ করে এসেছিলেন; কিন্তু খৃষ্ট ধর্ম্মের যে অংশ spiritual এবং ethical সে অংশের প্রতি অনুকূল হওয়া ছাড়া উদারচেতা লোকের উপায়ান্তর নেই। আর রামমোহনের স্বভাবে আর যে দোষই থাকুক তিনি সকীর্ণমনা ছিলেন না। ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁর অন্তরে যে গোঁড়ামির লেশমাত্র ছিল না, তিনি যে একটি নতুন সম্প্রদায় গড়তে চান নি, কিন্তু স্বজাতিকে সাম্প্রদায়িক মনোভাব থেকে মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন, তার পরিচয় আদি ব্রাহ্ম-সমাজের trust deed-এ পাবেন। পৃথিবীতে আমরা দু-জাতীয় অতি-মানুষের সাক্ষাৎ পাই, এক যাঁরা saviour, অর্থাৎ—অবতার হিসেবে গণ্য আর এক যাঁরা liberator-হিসেবে

গণ্য। রাজা রামমোহন রায় ছিলেন এই শেষোক্ত শ্রেণীর একজন মহাপুরুষ।

(৫)

আজকের সভায় আমি বিশেষ ভাবে রামমোহন রায়ের social consciousness-এর পরিচয় দিতে প্রতিশ্রুত হয়েছি। তবে তাঁর ধর্ম্মবুদ্ধির পরিচয় না দিলে, তাঁর সম্বন্ধে আলোচনা অঙ্গহীন হয় বলে যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে তাঁর দার্শনিক মনোভাবের পরিচয় দিতে বাধ্য হয়েছি। কারও ছবি আঁকতে বসে তাঁর মাথা বাদ দিয়ে দেহটি আঁকলে সে চিত্র যে পূর্ণাঙ্গ হয় না তা বলাই বাহুল্য।

রামমোহন রায় যখন যুবক তখন ইংরাজ এ দেশের একছত্র রাজা হয়ে বসেছেন। সমগ্র দেশ তখন ইংরাজের রাষ্ট্রনীতির অধীন হয়ে পড়েছে, আমাদের সমগ্র জীবনের উপর ইংরাজী-সভ্যতার প্রভাব এসে পড়েছে। ইংরাজের শাসন ও ইংরাজী-সভ্যতার প্রভাব যে আমাদের জাতীয় জীবনের মহা পরিবর্ত্তন ঘটাবে, এ সত্য সর্ব্ব-প্রথমে রামমোহন রায়ের চোখেই ধরা পড়ে। এই অতুল শক্তিশালী নব-সভ্যতার সংঘর্ষে ভারতবাসীদের অন্তত আত্মরক্ষার জন্যও সে সভ্যতার ধর্ম্মকর্ম্মের পরিচয় নেওয়াটা নিতান্ত আবশ্যক হয়ে পড়েছিল। এই যুগসন্ধির মুখে একমাত্র রামমোহন রায়ের অন্তরে সমগ্র ভারতবর্ষ তাঁর আত্মজ্ঞান লাভ করেছিল। রামমোহন এই মহা সত্য আবিষ্কার করেন যে এই নব-সভ্যতার সাহায্যে ভারতবাসী শুধু আত্মরক্ষা নয় স্বজাতির আত্মোন্নতি করতে পারবে। তাই জাতীয় আত্মোন্নতির যে পথ তিনি ধরিয়ে দিয়ে গিয়েছেন অদ্যাবধি আমরা সেই পথ ধরে

চলেছি। ইতিমধ্যে আর কেউ কোনও পথ আবিষ্কার করেছেন বলে ত আমার জানা নেই। যাকে সময়ে সময়ে আমরা নূতন পথে যাত্রা বলি সে রামমোহন রায়ের প্রদর্শিত মার্গে পিছু হটবার প্রয়াস ছাড়া আর কিছুই নয়।

(৬)

পৃথিবীতে যে সকল লোককে আমরা মহাপুরুষ বলি, তাঁরা প্রত্যেকেই জাতীয় মন ও জাতীয় জীবনকে এমন একটা নতুন পথ ধরিয়ে দেন, যে-পথ ধরে মানুষে মনে ও জীবনে অগ্রসর হয়। যে পথে অগ্রসর হয়ে অতীত ভারতবর্ষ বর্ত্তমান ভারতবর্ষে এসে পৌঁচেছে সে পথের তিনিই হচ্ছেন সর্ব্বপ্রথম দ্রষ্টা এবং প্রদর্শক। আমাদের জীবনে যে নবযুগ এসেছে তিনিই হচ্ছেন সে যুগের আবাহক।

ইংরাজের হাতে পড়ে আমাদের জীবনের ও মনের যে আমূল পরিবর্ত্তন ঘটবে, ভারত-সভ্যতা যে নব কলেবর ধারণ করবে এ সত্য সর্ব্বাগ্রে রাজা রামমোহন রায়ের চোখেই ধরা পড়ে। সে যুগে তিনি একমাত্র লোক ছিলেন, যাঁর অন্তরে ভারতের ভবিষ্যৎ সাকার হয়ে উঠেছিল। তাঁর সমসাময়িক অপরাপর বাঙালা-লেখকের লেখা পড়লে দেখা যায় যে এক রামমোহন রায় ব্যতীত অপর কোনও বাঙালীর এ চৈতন্য হয় নি যে, নবাবের রাজ্য কোম্পানীর হাতে পড়ায়, শুধু রাজার বদল হল না, সেই সঙ্গে জাতীয় জীবনের মহা পরিবর্ত্তনের সূত্রপাত হল। ইংরাজের সঙ্গে সঙ্গে দেশে এমন সব নব-শক্তি এসে পড়ল যার সমবায়ে ও সংঘর্ষে ভারতবর্ষে একটি নূতন সমাজ ও নূতন সভ্যতা গঠিত হল। এবং সে সকল শক্তি যে কি

এবং তার ভিতর কোন কোন শক্তি আমাদের জাতি গঠনের সহায় হতে পারে সে বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ সজ্ঞান ছিলেন। তাঁর দৃষ্টিকে দিব্যদৃষ্টি ছাড়া আর কিছু বলা চলে না, কেননা দেড়শ' বৎসর ইংরাজের রাজ্যে বাস করে এবং প্রায় একশ' বৎসর ইংরাজি শিক্ষা লাভ করেও আমাদের মধ্যে আজ খুব কম লোক আছে, শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে শিক্ষা সম্বন্ধে সমাজ সম্বন্ধে যাঁদের ধারণা রাজা রামমোহন রায়ের তুল্য স্পষ্ট। সম্যক জ্ঞানের অন্তরে কোন দ্বিধা নেই, কোনও ইতস্তত নেই। সে জ্ঞান কিন্তু শুধু স্কুল-কলেজে বই পড়ে লাভ করা যায় না, ভগবদ্দত্ত প্রতিভা ব্যতীত কেউ আর যথার্থ জ্ঞানের অধিকারী হতে পারেন না। আপনারা মনে রাখবেন যে, রাজা রামমোহন ইংরাজের স্কুল-কলেজেকখনো পড়েন নি, এবং ইংরাজি শিক্ষার সম্বল নিয়ে মনের দেশে যাত্রা স্তুরু করেন নি। সংস্কৃত আরবি ও ফার্সি এই তিন ভাষায় ও শাস্ত্রে শিক্ষিত মন দিয়েই তিনি ইংরাজি সভ্যতার দোষগুণ বিচার করতে বসেন এবং তার কোনও অংশ তিনি প্রত্যাখ্যান করেন এবং তার কোন কোন শক্তিকে সঞ্জীবনী শক্তি হিসেবে অঙ্গীকার করেন।

(৭)

জনরব এই যে রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন করে দেশের লোককে খৃষ্ট ধর্ম্মের আক্রমণ হতে রক্ষা করেছেন, সে আক্রমণের বিরুদ্ধে তিনি যে লেখনীধারণ করেছিলেন সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। আমি নিম্নে তার একটি লেখা থেকে কতক অংশ উদ্ধৃত করে দিচ্ছি, তার থেকে আপনারা রামমোহন রায়ের মনের ও সেই সঙ্গে তাঁর বাঙালা-রচনার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাবেন।

"শতার্দ্ধ বৎসর হইতে অধিক কাল এদেশে ইংরাজের অধিকার হইয়াছে। তাহাতে প্রথম ত্রিশ বৎসরে তাঁহাদের বাক্যের ও ব্যবহারের দ্বারা ইহা সর্ব্বত্র বিখ্যাত ছিল যে, তাঁহাদের নিয়ম এই যে, কাহারো ধর্ম্মের সহিত বিপক্ষাচরণ করেন না। আপনার আপনার ধর্ম্ম সকলে করুক ইহাই তাঁহাদের যথার্থ বাসনা। পরে পরে অধিকারের ও বলের আধিক্য পরমেশ্বর ক্রমে ক্রমে করিতেছেন।

কিন্তু ইদানীন্তন বিশ বৎসর হইল কতক ব্যক্তি ইংরেজ, যাহারা মিসনারি নামে বিখ্যাত, হিন্দু ও মুসলমানকে ব্যক্তরূপে তাঁহাদের ধর্ম্ম হইতে প্রচ্যুত করিয়া খৃষ্টান করিবার যত্ন নানাপ্রকার করিতেছেন।

প্রথম প্রকার এই যে, নানাবিধ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পুস্তক রচনা ও ছাপা করিয়া যথেষ্ট প্রদান করেন, যাহা হিন্দু ও মুসলমানের ধর্ম্মের নিন্দা ও জুগুপ্সা ও কুৎসাতে পরিপূর্ণ হয়।

দ্বিতীয় প্রকার এই যে, লোকের দ্বারের নিকট অথবা রাজপথে দাঁড়াইয়া আপনার ধর্ম্মের উৎকর্ষ ও অন্যের ধর্ম্মের অপকৃষ্টতা সূচক উপদেশ করেন।

তৃতীয় প্রকার এই, কোন নীচলোক ধনাশায় কিম্বা অন্য কোন কারণে খৃষ্টান হয় তাহাদিগকে কর্ম্ম দেন ও প্রতিপালন করেন, যাহাতে তাহা দেখিয়া অন্যের ঔৎসুক্য জন্মে।

যদ্যপিও যিশুখৃষ্টের শিষ্যেরা স্বধর্ম্ম সংস্থাপনের নিমিত্ত নানা দেশে আপন ধর্ম্মের ঔৎকর্ষের উপদেশ করিয়াছেন কিন্তু ইহা জানা কর্ত্তব্য যে, সে সকল দেশ তাঁহাদের অধিকার ছিল না। সেইরূপ মিসনারিরা ইংরেজের অনধিকারের রাজ্য যেমন তুরকি ও পারসিয়া প্রভৃতি দেশে, যাহা ইংলণ্ডের নিকট হয়, এরূপ ধর্ম্ম উপদেশ ও পুস্তক প্রদান যদি করেন, তবে ধর্ম্মার্থে নির্ভয় ও আপন আচার্য্যের যথার্থ অনুগামীরূপে প্রসিদ্ধ হইতে পারেন।

কিন্তু বাঙলা দেশে যেখানে ইংরেজের সম্পূর্ণ অধিকার ও ইংরেজের নাম-মাত্রে লোক ভীত হয়, তথায় এরূপ দুর্ব্বল দীন ও ভয়ার্ত্ত প্রজার উপর দৌরাত্ম্য

পদ্ধতির বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেছিলেন। কেননা উক্ত উপায়ে লোকের ধর্ম্মমতের পরিবর্ত্তন ঘটানো সকল দেশেই উপদ্রববিশেষ এবং প্রবল রাজার জাতের পক্ষে দুর্ব্বল প্রজার জাতের উপর এরূপ ব্যবহার নিতান্ত অত্যাচার। রামমোহন রায় সেই অত্যাচারের বিরুদ্ধেই নির্ভিক প্রতিবাদ করেছিলেন। যে যুগে ইংরেজের নাম-মাত্রে লোকে ভীত হত, সে যুগে ইংরেজের বিরুদ্ধে এই তীব্র প্রতি-বাদ করায় তিনি যে অসাধারণ সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন সে সাহস সকল দেশে সকল যুগেই দুর্ল্লভ।

(৮)

আজকের দিনে যে-মনোভাবকে আমরা জাতীয়-আত্মমর্য্যাদা-জ্ঞান বলি, রামমোহন রায়ের এই ক'টি কথায় তার প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর সমসাময়িক অপর কোনও ব্যক্তির মনে এ মনোভাবের যে লেশমাত্র ছিল তার কোনই নিদর্শন নেই। কিন্তু যেটা বিশেষ করে আমাদের চোখে পড়ে সে হচ্ছে এই যে, এর মধ্যে মিছা আত্ম-শ্লাঘার নাম গন্ধও নেই, অপর পক্ষে যথেষ্ট পরিমাণে আত্মগ্লানিও আছে। সে যুগের বাঙালী যে দুর্ব্বল, ভয়ার্ত্ত ও দীন ছিল সে কথা তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন, এবং কিসে স্বজাতীর দুর্ব্বলতা, ভীরুতা ও দীনতা দূর করা যায় সেই ছিল তাঁর একমাত্র ভাবনা, আর তাঁর জাতীয় উন্নতি-সাধনের সকল চেষ্টার একমাত্র লক্ষ্য ছিল স্বজাতিকে মনে ও জীবনে শক্তিশালী ও ঐশ্বর্য্যবান করে তোলা। এই কথাটি মনে রাখলে তাঁর সকল কথা সকল কার্য্যের প্রকৃত অর্থ আমরা বুঝতে

পারি। তার পর স্বজাতিকে তিনি উন্নতির যে-পথ দেখিয়ে দিয়েছিলেন সে পথ সুপথ কি কুপথ তার বিচার করতে হলে রামমোহন রায় কোন্ সত্যের উপর তাঁর মতামতের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তার সন্ধান নেওয়া আবশ্যক।

পৃথিবীতে যে-সকল লোকের মতামতের কোনও মূল্য আছে তাঁদের সকল মতামতের মধ্যে একটা সঙ্গতি একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, কেননা তাঁদের নানা বিষয়ে নানাজাতীয় মতের মূলে আছে একটি বিশেষ মানস-প্রকৃতি। রাজা রামমোহন রায় কি আধ্যাত্মিক, কি সাংসারিক যে-কোন বিষয়ে মত প্রকাশ করেছেন, সে সকলের ভিতর দিয়ে তাঁর অসামান্য স্বাধীনতা-প্রিয়তা সদর্পে ফুটে বেরিয়েছে। তিনি যে বেদান্তের এত ভক্ত তার কারণ, ও-শাস্ত্র হচ্ছে মোক্ষশাস্ত্র। যে জ্ঞানের লক্ষ্য মুক্তি, ফল মুক্তি, সেই জ্ঞানকে আয়ত্ব করবার উপদেশ তিনি চিরজীবন স্বজাতিকে দিয়েছেন। এ মুক্তি কিসের হাত থেকে মুক্তি?—এর দার্শনিক উত্তর হচ্ছে, অবিদ্যার হাত থেকে। এই অবিদ্যা বস্তু যে কি, সে বিষয়ে তর্কের আর শেষ নেই, ফলে অদ্যাবধি কেউ এ বিষয়ে একটা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন নি। অবিদ্যার মেটাফিজিক্যাল রহস্য ভেদ করবার বৃথা চেষ্টা না করেও, সহজ বুদ্ধির সাহায্যে বোঝা যায়—বেদান্তের প্রতিপাদ্য মোক্ষ হচ্ছে ব্রহ্ম-বিষয়ক লৌকিক ধর্ম্মের সঙ্কীর্ণ ধারণা হতে মনের মুক্তি।

আপনারা সকলেই জানেন যে, বেদান্ত শাস্ত্র নেতিমূলক। বেদান্তের "নেতি নেতি"-র সার্থকতা, সাধারণ লোকের ব্রহ্ম বিষয়ক সকল অলিক ধারণার নিরাস করায়। এ বিষয়ে শঙ্করের মত তাঁর মুখ

থেকেই শোনা যাক্। বেদান্তের চতুর্থ সূত্রের ভাষ্যের দুটি বাক্য এখানে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি।

"তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসত।"

অস্যার্থ—"তুমি তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জান যিনি ইদন্তারূপে (এই, অমুক অথবা অন্য কোন প্রকারে) উপাসিত হন না।

"ন হি শাস্ত্রমিদন্তয়া বিষয়ীভূতং ব্রহ্ম প্রতিপিপাদয়িষতি।"

অস্যার্থ—"বেদান্তশাস্ত্র তাঁহাকে ইদন্তারূপে (কোনরূপ বিশেষণ দিয়া) প্রতিপাদন করিতে ইচ্ছুক নহে। শাস্ত্র এইমাত্র প্রতিপাদন করে যে, ব্রহ্মপদার্থ ইদং জ্ঞানের অবিষয়"।

বলাবাহুল্য ধর্ম্মজ্ঞানের রাজ্যে, এহেন মুক্তির বারতা পৃথিবীর অপর কোনও দেশে অপর কোনও শাস্ত্রে পাওয়া যায় না। এ মত কিন্তু নাস্তিক মত নয়, এ মত শুধু সকল প্রকার সঙ্কীর্ণ আস্তিক মতের বিরোধী।

আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা যেমন প্রাচীন ভারতবর্ষের আর্য্য-সভ্যতার চরম বাণী, সামাজিক সভ্যতা তেমনি বর্ত্তমান ইউরোপীয় আর্য্য-সভ্যতার চরম বাণী। এ সত্য আজকের দিনে আমাদের সকলেরই নিকট প্রত্যক্ষ, কেন না এ যুগের ইউরোপীয় সভ্যতার মূলমন্ত্র যে কি তা ইংরাজি শিক্ষার প্রসাদে আমরা সবাই জানি। কিন্তু এদেশে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সৃষ্টির বহুপূর্ব্বে, অর্থাৎ—একশ' বৎসর পূর্ব্বে—একমাত্র রামমোহন রায়ের চোখে এ সত্য ধরা পড়ে। ইউরোপের ঐ মহামন্ত্রই যে আমাদের যথার্থ সঞ্জিবনী মন্ত্র হবে এই বিশ্বাসই ছিল তাঁর সকল কথা সকল ব্যবহারের অটল ভিত্তি। তাই তিনি একদিকে যেমন ইউরোপের পৌরাণিক ধর্ম্ম অগ্রাহ্য করেছিলেন, অপরদিকে তিনি

তেমনি ইউরোপের সামাজিক ধর্ম্ম সোৎসাহে সানন্দে অঙ্গীকার করে ছিলেন। এই liberty-র ধর্ম্মকেই আত্মসাৎ করে ভারতবাসী যে আবার নবজীবন, নবশক্তি লাভ করবে এই সত্য প্রচার করাই ছিল তাঁর জীবনের মহাব্রত।

(৯)

Liberty শব্দটা আজকের দিনে এত অসংখ্যলোকের মুখে মুখে ফিরছে, এক কথায় এতটা বাজারে হয়ে উঠেছে যে, ভয় হয়, যে অধিকাংশ লোকের মুখে ওটা একটা বুলি ছাড়া আর কিছুই নয়। গীতার নিষ্কাম ধর্ম্মের কথাটাকে আমরা যে একটা বুলিতে পরিণত করেছি এ কথা ত আর সজ্ঞানে অস্বীকার করা চলে না। যে কথা মুখে আছে মনে নেই, যদিও বা মনে থাকে ত জীবনে নেই—তারই নাম না বুলি? অতএব এস্থলে, বর্ত্তমান ইউরোপ liberty শব্দের অর্থে কি বোঝে সে সম্বন্ধে বর্ত্তমান ইতালির একজন অগ্রগণ্য লেখকের কথা এখানে বাঙলায় অনুবাদ করে দিচ্ছি।

"প্রাচীনকালে liberty শব্দের অর্থে লোকে বুঝত শুধু দেশের গভর্ণমেণ্টকে নিজের করায়ত্ব করা। বর্ত্তমানে লোকে liberty বলতে শুধু রাজনৈতিক নয় সেইসঙ্গে মানসিক ও নৈতিক স্বাধীনতার কথাও বোঝে। অর্থাৎ—এ যুগে liberty-র অর্থ, চিন্তা করবার স্বাধীনতা, কথা বলবার স্বাধীনতা লেখবার স্বাধীনতা, নানা লোক একত্র হয়ে দল বাঁধবার স্বাধীনতা, বিচার করবার স্বাধীনতা, নিজের মত গড়্‌বার এবং সে মত প্রকাশ করবার, প্রচার করবার

খৃষ্টাব্দে রাজা রামমোহন রায়ই করেন। অদ্যাবধি আমরা শুধু তার টীকাভাষ্যই করছি।

আধ্যাত্মিক দাসবুদ্ধির মত সামাজিক দাসবুদ্ধিরও মূলে আছে অবিদ্যা। আজকালের ভাষায় আমরা যাকে অজ্ঞতা বলি, শাস্ত্রের ভাষায় তাকে ব্যবহারিক অবিদ্যা বলা যেতে পারে।

জাতীয় মনকে এই অবিদ্যার মোহ থেকে উদ্ধার করবার জন্য রামমোহন রায় এদেশে ইউরোপীয় শিক্ষাকে আবাহন করে নিয়েছিলেন। যে-জ্ঞান সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নয় কিন্তু ছেরেপ কল্পনামূলক সে জ্ঞান মানুষকে মুক্তি দিতে পারে না। রামমোহন রায় আবিষ্কার করেন যে, ইউরোপীয়দের অন্তত দু'টি শাস্ত্র আছে, সত্য যার ভিত্তি। এক বিজ্ঞান আর এক ইতিহাস। এই বিজ্ঞানের প্রসাদে এ বিশ্বের গঠন ও ক্রিয়ার যথার্থ জ্ঞান লাভ করা যায় আর এই ইতিহাসের কাছ থেকে মানব-সমাজের উত্থান পতন পরিবর্ত্তনের যথার্থ জ্ঞান লাভ করা যায়, অন্তত এ দুয়ের চর্চ্চার ফলে মানুষের মন মানুষ-সম্বন্ধে ও বিশ্ব-সম্বন্ধে "বড়াই বুড়ির কথার" প্রভুত্ব হতে নিষ্কৃতি লাভ করে। যে-কোন ক্ষেত্রেই হোক না কেন অবিদ্যার হাত থেকে উদ্ধার পাওয়ার নাম মুক্তি লাভ করা এবং মুক্তপুরুষই যথার্থ শক্তিমান পুরুষ। কিন্তু যথার্থ মুক্তি সাধনা সাপেক্ষ। রামমোহন রায় দেশের লোককে এই সত্যমূলক ইউরোপীয় শাস্ত্রমার্গে সাধনা করতে শিখিয়ে গিয়েছিলেন। তারই ফলে বর্ত্তমান ভারতবর্ষে বাঙালী জাতির স্থান সবার উপরে। কি সাহিত্যে, কি আর্টে, কি বিজ্ঞানে, কি রাজনীতির ক্ষেত্রে বাঙালী যে আজ ভারতবর্ষের সর্ব্বাগ্রগণ্য জাতি, বাঙালীর চিন্তা বাঙালীর কর্ম্ম আজ যে বাকি ভারতবর্ষের

আদর্শ, বাঙালী যে এ যুগে মানসিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সমগ্র ভারতবর্ষের যুগপৎ শিক্ষা ও দীক্ষাগুরু, তার কারণ একটি বাঙালী মহাপুরুষের প্রদর্শিত মার্গে বাঙালীর মন বাঙালীর জীবন আজ একশ' বৎসর ধরে অগ্রসর হয়েছে। এক কথায় আমাদের জাতীয় প্রতিভা রামমোহন রায়ের মনে ও জীবনে সম্পূর্ণ সাকার হয়ে উঠেছিল।

সুতরাং রামমোহন রায়ের মনে বাঙালী জাতি ইচ্ছা করলে তার নিজের মনের ছবি দেখতে পারে। বাঙালী জাতির মনে যে সকল শক্তি প্রচ্ছন্ন ও বিক্ষিপ্ত ছিল, রামমোহন রায়ের অন্তরে সেই সকল শক্তি সংহত ও প্রকট হয়ে উঠেছিল। এর প্রমাণ রামমোহন রায়ের মন ও প্রকৃতি যদি অ-বাঙালী হত তাহলে আমরা পুরুষানুক্রমে কখনই শিক্ষায় ও জীবনে অজ্ঞাতসারে তাঁর পদানুসরণ করতুম না।

এ কথাটা আজ স্বজাতিকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া দরকার, কেননা রাজনীতির নামে আজ ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশ থেকে এমন সব প্রস্তাব আসছে যা মেনে নিলে বাঙালী তার জাতীয় প্রকৃতির উল্টো টান টানতে প্রস্তুত হবে, ফলে তার জাতীয় প্রতিভা হারিয়ে বসবে। আর বাঙালী যদি তার স্বধর্ম্ম হারায় তাতে যে শুধু বাঙলার ক্ষতি তাই নয়, সমস্ত ভারতবর্ষেরও ক্ষতি। আমরা যদি আমাদের মনের প্রদীপ জোর করে নেবাতে চেষ্টা করি, তাহলে যে ধূমের সৃষ্টি হবে তাতে সমস্ত ভারতবর্ষের মনের রাজ্য অন্ধকার হয়ে যাবে। একদল আত্মহারা বাঙালী আজকের দিনে স্বধর্ম্ম বর্জ্জন করতে উদ্যত হয়েছেন বলে রামমোহন রায়ের আত্মাকে স্বজাতির সুমুখে খাড়া করা অবশ্যকর্ত্তব্য বলে মনে করি।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

নন্-কো-অপারেশন।

——:*:——

সমস্ত দুপুরটা বিছানায় শুয়ে আর বড় বড় নেতাদের নন্-কো-অপারেশন-এর উপর বক্তৃতা পড়ে' যখন মাথাটা ভীষণ রকম গরম হয়ে উঠ্‌ল, তখন বেড়াতে বেরুলুম্। একখানা ট্রামে উঠে বন্ধু অনিলের বাড়ীর দিকে চললুম। ট্রামে উঠে দেখি একদল কংগ্রেসের ভলাণ্টিয়ারের সঙ্গে কণ্ডাক্‌টারের বচসা হচ্চে। ভলাণ্টিয়াররা সবাই বালক। ছেলেরা ট্রামের পয়সাটা ফাঁকি দিতে পাল্লে যেমন মনে করে কি যুদ্ধ জয়ই কললুম, এরাও দেখলুম তাই। ভলাণ্টিয়াররা বলছে, "আমরা পয়সা দেব না—কারণ আমরা ভলাণ্টিয়ার"। কণ্ডাকটার বেগতিক দেখে ইন্‌স্‌পেকটারের মধ্যস্থতা মানল। ইন্‌স্‌পেকটারকেও ছেলেরা বললে, তারা পয়সা দেবে না, কারণ তারা মহাত্মা গান্ধীর লোক। ইন্‌স্‌পেকটার বল্লে, "আচ্ছা ছোড় দেও, গান্ধীজীকা লোক হ্যায়।" মনে মনে ভাবলুম, "উঃ কি প্যাট্রিঅটিজম্!" আমার পাশে দুটি যুবক বসেছিল। একজন অন্যকে বলল, "হুঁ হুঁ প্যাটরিঅটিজম্‌টা চালানো হল কোম্পানির পয়সার উপর দিয়ে, নিজের পয়সার উপর হলে বোঝা যেত।" আমি মনে মনে বললুম, "উঃ কি পাষণ্ড! এসময়ে লোকের পয়সার কথা মনেও আসতে পারে!" সমস্ত পথটা ট্রামে আসতে আসতে রাগে আর তাদের দিকে একবারও ফিরে চাই নি।

অনিলের বাড়ীতে গিয়ে অনিল এবং অনিলের দাদাদের সঙ্গে

নন্-কো-অপারেশন ব্রত গ্রহণ করা উচিত কি না তাই নিয়ে মহা তর্ক জুড়ে দিলুম। যুক্তি দেখাতে দেখাতে একবার এমনি হাত ছুঁড়লুম যে, অনিলের নাক থেকে চশমাটা পড়ে ভেঙ্গে গেল। আমি কিন্তু তাতেও দমি নি। তর্কের স্রোত ক্রমাগত বয়ে যেতে লাগল। রাত ৯টা পর্য্যন্ত তর্ক করে যখন ক্লান্ত হয়ে পড়লুম তখন বাড়ী ফিরে এলুম। কিন্তু এতটা শ্রম পণ্ড হল, কারণ আমাতে আর অনিলেতে কিছুতেই অনিলের মেজদা'কে দলে টানতে পার্লুম না।

বাড়ী এসে যখন খেতে বসলুম, মা কাছে এসে বসলেন। মন কিন্তু সেই দিকে পড়ে আছে। "নন্-কো-অপারেশন—নন্-কো-অপারেশন!" খেতে খেতে হঠাৎ সোজা হয়ে বসে বলে উঠলুম, "বটেই ত, নন্-কো-অপারেশন ছাড়া আমাদের আর গতি নেই!" মা বললেন, "কি হ'ল, গলায় কাঁটা লাগ্‌ল?" আমি অপ্রস্তুত হয়ে তাড়াতাড়ি বললুম, "না কিছু হয় নি ত"। আমার এই রকম ভাব গতিক আর অসাধারণ গম্ভীর মুখ দেখে মা একটু ভীত হয়ে পড়লেন। খেয়ে ওঠ্‌বার পর মা জিজ্ঞাসা করলেন, "কি হয়েছে রে?" আমি মুখে একটু হাসি আনবার চেষ্টা করে বললুম, "কৈ মা, কিছু হয় নি ত;" কিন্তু মুখে হাসি এল না। সে সময়ে কি হাসি আসবার সময়? মা বিশেষ ভীত হয়ে চলে গেলেন।

সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠেই খবরের কাগজ খানা নিয়ে পড়তে বসে গেলুম। সমস্ত সকালটা কাগজ পড়ে কাটিয়ে দিলুম। দুফুরে আহারের পর ছাদে আমার ঘরটিতে বসে এই সমস্ত গভীর বিষয় আলোচনা করতে করতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়লুম, টেরও পেলুম না।

*　　　*　　　*　　　*

কতক্ষণ ঘুমিয়েছি জানি নে, কিন্তু যখন ঘুম ভাঙলো, তখন শুনতে পাচ্চি দূরে আকাশের উপর ভাসতে ভাসতে একটা চিল করুণ দীর্ঘ স্বরে ডাকছে চীঁ—ঈ—ঈ—ঈ। কি-জানি-কেন মনটা যেন কি-রকম করে উঠল। আমি চোখ চেয়ে চুপ করে যে আরাম কেদারাটার উপর ঘুমুচ্ছিলুম, সেইটার উপরই শুয়ে রইলুম। চিলটা ক্রমাগত ডাকতে লাগল চীঁ—ঈঈ—ঈই—। সমস্ত ছাদটা নিস্তব্ধ, আমার ঘরে একটুও শব্দ নেই—আর কানের ভিতর আসছে খালি সেই করুণ ক্ষীণ চিলের ডাক।

আমি উঠে চেয়ারখানাকে জানলার কাছে টেনে বসলুম। জানলাটার ভিতর দিয়ে দেখা যাচ্ছিল দুটো নারকেল গাছের ডগা, আর তার পিছনে ঘন নীল আকাশ। এক টুকরো ছোট্ট স্বচ্ছ শাদা মেঘ নারকেল গাছ দুটোর মাঝখান দিয়ে ভেসে যাচ্ছিল। শরৎটা যে এতদূর এগিয়ে এসেছে তা আমি আগে খেয়াল করি নি। পাশে টেবিলটার উপর চেয়ে দেখি সকালের কাগজখানা পড়ে রয়েছে। তার উপর বড় বড় অক্ষরে লেখা—"নন্‌-কো-অপারেশন"! আমি কাগজ-খানাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সেই দূর নীল আকাশের দিকে বদ্ধদৃষ্টি হয়ে বসে রইলুম। যেন আকাশটা আগে ছিল না, আজ হঠাৎ আবিষ্কার করে ফেলেছি, এমনি ভাবে এমনি করে চেয়ে রইলুম। মনে পড়ে গেল রবীন্দ্রনাথের সেই দুটো পংক্তি—

"শরৎ তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলি
ছড়িয়ে গেল ছড়িয়ে গেল
ছাপিয়ে মোহন অঙ্গুলি।"

চোখের সামনে একখানি মুখ ভেসে উঠল, এমনি দিনে যাকে ছেড়ে আমি কখনও থাকতে পার্ত্তুম না। অসাধারণ ঔজ্জ্বল্য সে মুখে। মুখখানি সুন্দর কি অসুন্দর আমার মনে নেই। শরতের আকাশের মতই উজ্জ্বল সে মুখের চোখ দুটি। আমি জীবনে ভুলবো না। কি শান্ত কি মধুর দৃষ্টি সে চোখে। সে এক দণ্ডে আমার অতি আপনার, অতি নিকট হয়ে গেল। অসহ্য আনন্দে মন ভরে উঠল। যাকে কখনও খুঁজি নি, অথচ যাকে না হলে আমার এক দণ্ডও চলবে না, এ যে সেই।

পিছন থেকে অনিল ডেকে উঠল, "কিরে বিকেল হ'ল, বেড়াতে যাবি নে? হাঁ, মেজদা'কে অনেকটা দলে টানা গেছে। নন্‌-কো-অপারেশন-এর গর্ভে যে কত সুফল আছে অনেক করে' কিছু বুঝিয়েছি।" আমি বললুম, "ভাই অনিল, এখন আর ও-সবের নাম করিস্ নে।" অনিল চমকে উঠে বললে, "কেন রে?" আমি বললুম, "ভাল লাগছে না।" অনিল বড় বড় দুটো চোখ বার করে আমার দিকে চেয়ে রইল।

শ্রীতারাদাস দত্ত

কবিকথা।

——:০:——
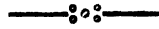
কোন্ বিরহের তীব্রসুরা পান করিলে কবি ?
পেয়ালা মাঝে জাগ্‌ল কাহার দীপ্ত মুখের ছবি ?
ছন্দেতে কার্ পায়ের নূপুর বাজ্‌ল তালে তালে—
কণ্ঠটি কার্ জড়িয়ে এল তোমার সুরের জালে !

নিমেষটিরে ধন্য ক'রে গাইলে তুমি গাথা—
নিমেষ তরে ভুলিয়ে দিলে বিশ্বমনের ব্যথা ;
একটি নিমেষ—মরুর মাঝে একটি জলের ধারা,
একটি নিমেষ—আঁধার সাঁঝে উজল সন্ধ্যাতারা।

চাইলে না তো বিত্ত কোনো বিশ্বসভার মাঝে—
কোন্ গরবীর কণ্ঠমালা শিরে তোমার রাজে !
নৈশপুরের কোন্ দেবী সে, যার রূপেরি ছটা
উজল ক'রে রাখলে আয়ুর দীর্ঘ বরষ ক'টা !

গোলাপবনের মাঝখানেতে ছোট্ট কুটিরখানি,
উদাস হাওয়ায় মিশ্‌ত যেথায় স্রোতস্বিনীর বাণী—
সেইখানেতে তোমার রচা হৃদয়-ছ্যাঁচা গান
তুল্‌লে কাহার কণ্ঠবীণায় তীব্র করুণ তান !

রাজসভাতে ব'স্‌তে তুমি সবার শেষে আসি—
বাদ্‌শাজাদির মুখের 'পরে খেল্‌ত নাকি হাসি?
চিকের পারে কাঁকনটি তার বাজ্‌ত মধুর বোলে,
অলক্‌-খসা ফুলটি এসে প'ড়ত নাকি কোলে!

* * * *

কোন্‌ সাহারায় রাত্রিশেষে গাঁথ্‌ছ তারার মালা?
নিজের বোনা তাঁবুর মাঝে জাগ্‌ছে সে কোন্‌ বালা!
পেয়ালা হাতে কাট্‌বে রাতি? সুর্‌মা-পরা আঁখি—
পিয়াস-আকুল-পথ-চাওয়া তার সফল হবে নাকি!

আস্‌বে নাকো ঝড়ের সাথে সর্ব্ব-নাশের দায়—
শেষ প্রহরের জের্‌টা টেনে ব্যগ্র-ত্বরিৎ পায়?
মিলন-তৃষা উঠ্‌বে জ্ব'লে বিদ্যুতেরি সনে,
রক্ত বুকের উঠ্‌বে নেচে নিবিড় আলিঙ্গনে!

পাগল-করা চুম্বনে তার ওড়্‌না রবে মুখে?
কাঁচলখানি টুট্‌বে নাকো তুষার-সাদা বুকে?
অন্তরেতে ঝড়ের খেলা, বাইরে পড়ে বাজ—
শিথিল তনু, নীবির বাঁধন, আকুল পেশোয়াজ!

ওমর কবি! ওমর কবি! সেই নিমেষের নেশা
নিঃশ্বাসেরি মতই আজও বিশ্বপ্রাণে মেশা!
আজিও সে নিমেষটুকু দখিন্‌ হাওয়ার মত
মিলন-রাতের গোপন কপাট খুলিয়ে দেখায় কত!

চুম্বনাকুল ঠোঁটের কাঁপন, বিদায় চোখে-চাওয়া,
দুই বিরহের মধ্যে মিলন নিবিড় ঘন পাওয়া,
সজল দুটি মেঘের মাঝে বিদ্যুতেরি হাসি—
নিমেষটি সেই বিশ্বে ফোটায় সত্যে পরকাশি!

*   *   *   *

সুখের তুমি নও তো শুধু আপন-ভোলা কবি—
ভাগ্য-দেবীর হাতের আঁকা শোণিত্-রাঙা ছবি
হৃদয়-পটে ফেল্‌লে ছায়া সত্য-আভাষ মত—
জ্ঞানের আলো ফুট্‌লো না তো পুঁথির মধ্যে যত!

ব্যাকুল হৃদি বৃথাই ঘুরে শান্তি কোথা মাগি'—
চিরন্তনী প্রশ্ন রহে বিশ্ব মনে জাগি';—
চিতার পারে, গোরের মাঝে—চক্রপাণির ডাকে
জীবন—সে কি দিচ্ছে সাড়া ভাগ্য-দুয়ার ফাঁকে!

কোথায় আলো?—জ্ঞানের ভাতি অন্ধকারে ঘেরা,
ভাগ্য-দেবীর রুদ্ধ দুয়ার—রিক্ত হাতে ফেরা;
বৃথাই শুধু হস্ত জুড়ে আকাশ পানে চাওয়া—
আছেন তিনি? থাকুন তিনি—বিফল তাঁরে পাওয়া!

বৃথাই খোঁজা?—বন্ধু, তোমার পেয়ালাটুকুর মাঝে,
তন্বী সাকীর কটাক্ষেতে বিরল মধুর সাঁঝে—
কিছুই কি নাই? জীবন-সুরা অশ্রু দিয়ে মেশা?
প্রণয়-মিলন—আর কিছু নয়—মুহূর্ত্তেকের নেশা?

মর্‌মি মনের হুতাশ বহে বিশ্বে চিরতরে—
শান্তিবারি কোথায় সেঁকার পেয়ালা হ'তে ঝরে!
তীব্র ফেনিল কামের সুরা—প্রেমের নাহি দিশা—
ভণ্ডামিতে বিশ্ব মেটায় ক্ষুদ্র প্রাণের তৃষা!

* * * *

হাজার বছর পরে সে এক বাংলা দেশের কবি,
নিজের মাঝে দেখ্‌ছে তোমার দুঃখ সুখের ছবি।
বেহেস্ততে—জাহান্নমে—শূন্যে—যেথায় থাকো—
অর্ঘ্য-রচা তাহার আজি ব্যর্থ হবে না কো!

শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ

উড়ো চিঠি

—:❀:—

জুন ১৩, ১৯২০

দুষ্টু মিনি

অতঃপর তুমি আর অস্বীকার করতে পারবে না যে, আমি তোমার স্বামী আর তুমি আমার স্ত্রী, কেননা একদা—এ অতি অল্পদিনকার পূর্ব্বের "একদা"—একদা এক শীতের সন্ধ্যায় গোধূলি লগনে কোন এক বিশেষ বিবাহসভায় আমি পুরোহিতের কণ্ঠোচ্চারিত মন্ত্র রীতি-মত আবৃত্তি করেছি, আর ঠিক সেই বিবাহ-সভাতেই—তুমি দুষ্টু মিনি—তোমার ফুলের মত ছোট্ট হাতটুকুকে আমার হাতের উপর দিয়েছিলে। তোমার হাতের সেই প্রথম স্পর্শ! জান কি হয়েছিল? তোমার কি হয়েছিল তা শোন বলছি—যদিও তুমি তোমার দুষ্টুমি মেশানো রাঙা ঠোঁট দুটিকে উল্‌টিয়ে ঘোরতর প্রতি-বাদের সুরে "কক্‌খনো না" বলে আমার কথার সত্যতাটাই প্রমাণ করবে। কিন্তু সে যাই হোক, বলছি শোন। সেই স্পর্শের সঙ্গে সঙ্গে তোমার বুকের টিপ্‌ টিপ্‌ শব্দ তোমার আঙুলের ডগা দিয়ে এসে আমার কানে বাজ্‌ছিল, আর আমি স্পষ্ট দেখছিলুম, তোমার কপাল থেকে বুক পর্য্যন্ত একেবারে তোমার পরা-চেলীর মতই লাল হয়ে উঠেছে। আর আমার কি হয়েছিল জান?—আমার সর্ব্বাঙ্গে আগুন লেগে গিয়েছিল।

সে যাই হোক, ঐ রকম আমার মন্ত্র-পড়া আর তোমার হাত রাখার পর এ কথাটা আর তুমি অস্বীকার করতে পারবে না যে, আমি তোমার স্বামী আর তুমি আমার স্ত্রী, কেননা দশ জনের মতে স্বামীর স্বামীত্ব আর স্ত্রীর স্ত্রীত্ব লাভ করবার এ-ই হচ্ছে একমাত্র উপায়।

তার পর ব্যাপারটা এসে ঐ খানেই কিন্তু শেষ হল না। কেননা তুমি যে এখন কেবলই আমার স্ত্রী তাই নয়—শাস্ত্রানুসারে তুমি আমার শিষ্যাও বটে। সুতরাং যখন তুমি আমার শিষ্যা ও আমি তোমার গুরু তখন তোমার আধিভৌতিক আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক সকল শিক্ষার ভার আমার। কাজেই যখন আমি তোমার গুরু ও ত্রিবিধ শিক্ষার ভার আমার তখন বলছি, এর পর থেকে তুমি আমার সকল উপদেশ মানবে ও সকল আদেশ পালন করবে। তোমার গুরু যে তোমার শিক্ষাসম্বন্ধে কতদূর উৎসাহী তা এখনই দেখবে। কেননা এই চিঠিতেই আমি তোমার শিক্ষা সুরু করে' দিচ্ছি। এখন আমার প্রথম উপদেশ শোন। আমার প্রথম উপদেশ হচ্ছে এই যে, তুমি তোমার ছাত্রীজীবনের অনিলা, প্রমীলা, চপলা, সরলা ইত্যাদি প্রমুখ বন্ধুবর্গকে অকাতরে বিসর্জ্জন দিয়ে 'কায়েনমনসাবাচা' ঊষা থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ও সন্ধ্যা থেকে ঊষা পর্য্যন্ত কেবলমাত্র আমাকেই ভালবাসবে।

ঐটেই হচ্ছে আমার প্রথম উপদেশ ও প্রধান উপদেশ। ঐটে যদি তুমি একান্ত মনে জ্বলন্ত প্রাণে অবহিত চিত্তে সমাহিত হৃদয়ে পালন করতে থাক তাহলে তোমার সকল অবহেলা ও অমনোযোগীতা চাই কি, উপেক্ষা করলেও করতে পারি।

এইখানে—তুমি যেমন দুষ্টু মিনি—আমি জানি প্রতিবাদের সুর তুলবে। তুমি বলবে যে আমার ঐ উপদেশ একান্ত স্বার্থপরতা-দোষ-

দুষ্ট। তোমার ঐ অভিযোগের বিরুদ্ধে আমার দুটি জবাব দাখিল করবার আছে। তা করছি।—

আমার প্রথম জবাব এই যে, আমাকে তুমি প্রকারান্তরে স্বার্থপর বলেছ, তাতে আমি ভয় পাই নে। কেন না এই জগতে স্বার্থপর নয় কে?

কথাটা শুনে তুমি একেবারে আকাশথেকে পড়বে জানি। তুমি বলবে মানুষ সম্বন্ধে আমি নাস্তিক। সেই সত্যযুগের দধীচিমুনি থেকে এই কলিকালের নফর কুণ্ডু পর্য্যন্ত পরের জন্যে জীবন উৎসর্গ করলে, আর আমি বলছি কি না কোন্ লোকটা স্বার্থপর নয়! ঐ যে অমুক চাটুয্যে ধনের মায়া না করে কত কি বড় কীর্ত্তি করে গেল, ঐ যে অমুক মুখুয্যে প্রাণের মায়া না করে নৌকোডুবির সময়ে কত লোককে উদ্ধার করলে—এসব কি কিছুই না?—

সত্যি, কিন্তু তুমি জান আমার চিরকালের ঝোঁক সমস্ত বিষয়ের পিছন থেকে একটা সাধারণ নিয়ম টেনে বের করবার, অর্থাৎ—প্রত্যেক গতির পিছন থেকে একটা common principle বের করা। জড় জগতে যে গতি ও স্থিতি তার পিছনে একটা principle আছে, এ কথা বৈজ্ঞানিকদের কাছ থেকে শুনবে, ও—তিলের পিছনেও যা, তালের পিছনেও তাই। মনোজগতে যে চলা-ফেরা—তার পিছনেও সেই রকম একটা principle থাকাই সম্ভব। সুতরাং যখন সবাই কাউকে স্বার্থপর বলে ঈর্ষা করছে ও আর কাউকে নিঃস্বার্থপর বলে বাহবা দিচ্ছে, তখন আমার চিরদিন কৌতূহল রয়েছে, এমন একটা কিছু বের করা—যা দিয়ে ঐ দুজনকেই ব্যাখ্যা করা যায়, যাতে করে দু'জনকে ব্যাখ্যা করতে দু'টো principle-এর দরকার হয় না। সেই

কৌতূহলের ফলে আমি অশেষ গবেষণার পর বিশেষ আবিষ্কার করেছি যে, স্বার্থপরতাটাই আসল জিনিস, নিঃস্বার্থপরতাটা একটা বাজে কথা, ওটা হচ্ছে ethical world-এর একটা নৈতিক বক্তৃতা—যা চোখ বুঁজে করা হয় ও মুখ বুঁজে শোনা হয়।

এত বড় একটা সাংঘাতিক কথা আমি বললুম আর তুমি অমনি তা গলাধঃকরণ করবে সে আশঙ্কা আমার নেই, সে আশঙ্কা নেই বলেই এমন একটা কথা তোমায় বলতে ভরসা পেলুম। কিন্তু ব্যস্ত হোয়ো না—এর লম্বা ব্যাখ্যাও আমি দাখিল করব। তারপর আমার বিশ্বাস তুমি দেখবে আমার এই কথা একেবারে pure truth, অর্থাৎ—নির্জ্জলা সত্য। আর ঐ সত্যটি যে তেমন সাংঘাতিক নয়, তারও আমি প্রমাণ দেব।

প্রথমেই আমি তোমাকে একটা অতি সোজা কথা ও অতি স্পষ্ট কথা বলছি। আমরা যে কাউকে স্বার্থপর ও কাউকে নিঃস্বার্থপর বলি তার কারণ, আমরা স্বার্থ জিনিসটার একটা অতি সংকীর্ণ অর্থ দিয়ে বসেছি। এই সংকীর্ণ অর্থ দেওয়াটা হচ্ছে আমাদের চর্ম্মচোখে স্পষ্ট দেখার প্রতিফল।

চর্ম্মচোখে স্পষ্ট দেখার একটা মস্ত দোষ হচ্ছে এই যে, যেটা মানুষের চোখে পড়ে সেইটেকেই সে বাড়িয়ে তোলে—সেইটেকেই সে একটা অযথা বড় মূল্য দিয়ে বসে।

তাই, যে মানুষটা আপনার জন্য কোঠাবাড়ী বানাচ্ছে আর যে মানুষটি পরের জন্যে কুটীর তৈরি করে দিচ্ছে এদের একজনকে স্বার্থপর মনে করে সেলাম করে চলি আর একজনকে নিঃস্বার্থপর মনে করে পিঠ চাপড়ে বলি, "বহুৎ খুব"; কিন্তু ঐ দুজনার পৃথক কর্ম্ম

motive এর অন্তরালে রয়েছে কিন্তু একটা জিনিস। সেই জিনিসটির নাম হচ্ছে—চরিতার্থতা। এই চরিতার্থতা জিনিসটাকে গোড়ার বিষয় করে যদি দেখ, তবে দেখবে, ও-দুয়েরই লক্ষ্য সুখ; তবে কেউ বা দেখে দেহের সুখ, কেউ বা খোঁজে মনের সুখ। এই যা প্রভেদ। এইখানে একটা অত্যুত্তম রহস্যের কথা তোমায় বলি শোন। সাধু যে তার পক্ষে অসাধু হওয়া ঠিক ততটা দুঃখের কারণ, অসাধু যে, তার পক্ষে সাধু হওয়া যতটা। তেমনি মনের জগতে যে, তার পক্ষে দেহের জগতে এসে বাস করা ততটা অসুখের, দেহের জগতে যে, মনের জগতে গিয়ে বসে থাকা তার যতটা। সুতরাং ব্যবহারিকক্ষেত্রে যার যে মূল্যই দাও না কেন প্রত্যেকের আসল স্বার্থ হচ্ছে তার স্বধর্ম্ম। এই স্বার্থকে কেউ অতিক্রম করতে পারে না, কেন না স্বধর্ম্মকে কেউ অতিক্রম করতে পারে না। হয়ত তুমি প্রশ্ন তুলবে যে, অসাধু যে সে কি চিরকাল অসাধু থেকেই যাবে? যে যা সে কি জীবনভর জন্ম জন্মান্তরে তাই-ই থেকে যাবে?—তা নয়। কেন না ধর্ম্মের পরিবর্ত্তন করা চলে; কিন্তু এ পরিবর্ত্তন করতে হলে চাই সাধনা। সাধনা অর্থ—পুরুষের ইচ্ছাশক্তির প্রকাশ।

সে যাইহোক, উপরে আমার ঐ বক্তৃতার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে তোমাকে বলা যে, মানুষকে দেখতে হবে তার বাইরের বস্তুজগতের দিক থেকে নয়, তার অন্তরের মনোজগতের দিক থেকে; আর সেইটেই হচ্ছে সত্যিকারের দেখা। মানুষকে যারা বাইরের বস্তু দিয়ে পরিমাপ করতে চায় তারা হচ্ছে জড়বাদী। কিন্তু যখন মানুষকে তার সত্যি-কারের দিকথেকে দেখবে, অর্থাৎ—তার মনোজগতের দিক থেকে দেখবে, তখন দেখতে পাবে যে, ও—রাম রাবণের কীর্ত্তিকলাপের পিছনে

একই principle, অর্থাৎ—একই ধর্ম্ম, আর সেটা হচ্ছে তাদের স্বধর্ম্ম। অবশ্য তুমি অযোধ্যায় বসে গভীর প্রাণের নিবিড় আবেগে শ্রীরামচন্দ্রের গুণগান করতে পার কিন্তু একথা ভুলে যেয়ো না যে, তোমারই মত আর কেউ লঙ্কায় বসে রাবণসম্বন্ধে ঐ একই কথা একই সুরে ভাঁজতে পার। জেনারেল ডায়ার সম্বন্ধে কি হচ্ছে তা ত জানই। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে মনের তৃপ্তি। তবে মনের এ তৃপ্তি কেউ পায় দশ হাজার টাকা কুড়িয়ে, কেউ ছড়িয়ে বা কেউ উড়িয়ে—এই যা প্রভেদ। এ প্রভেদ "ইতরে জনার" দিক থেকে খুবই বড় প্রভেদ সন্দেহ নেই, কিন্তু কর্ম্মকর্ত্তার দিক থেকে ও-তিনের একই উদ্দেশ্য, সে হচ্ছে বৈঠকখানায় হালকাভাবে যদি বলতে হয় ত তবে বলি খেয়ালের চরিতার্থতা, আর তর্কসভায় গম্ভীর ভাষায় যদি বলতে হয় ত বলি স্বধর্ম্মের উদ্‌যাপন।

উপরে লক্ষ্য করবে আমি কখনো আত্মা কথাটার উল্লেখ করি নি। আমার দৌড় মন পর্য্যন্ত, মনোজগত পর্য্যন্ত। এই মনকেই বা মনোজগতকে তুমি টেনে বাড়িয়ে আত্মাতে নিয়ে গিয়ে ফেলতে পার, যদি তোমার ইচ্ছে হয়, তবে আমি যে এতক্ষণ আত্মা কথাটাকে বাদ দিয়ে কথা বলেছি তার কারণ, ও-বস্তুটি আমার কাছে চিরদিনই গোলমেলে। ও-জিনিসটি আমার কাছে মনে হয় জ্যামিতির বিন্দুর মত। বিন্দু, অর্থাৎ—which has position but no magnitude, অর্থাৎ—যার অবস্থিতি আছে কিন্তু পরিমাণ নেই, অর্থাৎ—আত্মা হচ্ছে অপরিমেয়। যে বস্তু অপরিমেয় সে বস্তুকে পাঁচ লাইনে দশবার করে উল্লেখ করতে আমার মন সরে না। বিশেষত উল্লেখ করলে আমার কেবলই মনে হত যে, আমি তোমাকে ধমক দিয়ে ঠিক রাখছি।

সে যাই হোক, মানুষকে তার এই অন্তরের দিক থেকে দেখতে চাই নে বলে আমরা স্বার্থ ও নিঃস্বার্থ এই দুটো কথার মধ্যে একটা আসমান জমিন গরমিল গড়ে তুলেছি। আমাদের এই জড় বুদ্ধিই এই বস্তু-জগতের উপরে মানুষের সকল সুখের উপাদান চাপিয়ে দিয়েছে। তাই সেই বস্তুজগতকে যখন কেউ স্বেচ্ছায় ত্যাগ করছে তখনই আমরা মনে করে বসি যে, সে জীবনে সব সুখকেই পরিহার করেছে। আমরা তখন মোটেই মনে করতে পারি নে যে, দেহের বিলাসের চাইতে মনের বিলাস বড়। এবং যখনই যে দেহের বিলাস স্বেচ্ছায় ত্যাগ করেছে তখনই জানবে যে সে মনের বিলাসের সন্ধান পেয়েছে বা সেই ফিকিরে আছে। তবে মনোজগতের স্বার্থকতার জন্যে মানুষ বস্তুজগতের অনেক দুঃখ কষ্টকে স্বীকার করে নেয়। কিন্তু যারা বস্তু আহরণ করে তাদেরই কি কম কষ্ট স্বীকার করতে দেখা গিয়েছে? অর্থের জন্য আত্মা বিক্রয় ত জগতে বিরল নয়। অর্থের জন্য আত্মা বিক্রয় করে' যদি মানুষ সুখ পায় তবে আইডিয়ার জন্য দেহের বিসর্জ্জন দিয়ে কেবল দুঃখই পাবে এ-কথা দু'শতাব্দী আগেকার ইউরোপও বলবে না। বস্তুর নেশার চাইতে আইডিয়ার নেশা অনেক গুণ বড়। কেননা বস্তুর নেশা স্পর্শ করে' দেহকে, বড় জোর স্নায়ুমণ্ডলকে কিন্তু আইডিয়ার নেশা স্পর্শ করে মনকে আত্মাকে। সুতরাং বস্তুতে আছে দেহের সুখ, বড় জোর প্রাণের সুখ আর আইডিয়াতে আছে মনের সুখ আত্মার সুখ। এখন মনকে যদি দেহের চাইতে বড় বলে' মান তবে এ-কথা ত তোমাকে মানতেই হবে যে, দেহের সুখের দিকে না তাকিয়ে যাঁরা মনের সুখের সন্ধানে ফিরছেন তাঁরাই বড় স্বার্থপর। আসল ভক্ত তাঁকেই বলি যিনি

বলতে পারেন "কৃষ্ণধনে যেই ভজে সে বড় চতুর।" কৃষ্ণধন ভজা ভক্তের কাছে যতদিন এমনি স্বার্থের আকারে না দেখা দিয়েছে ততদিন তার সিদ্ধি নেই। তা শুধু কৃষ্ণভজাই বা কেন, দেশ-সেবা লোক-সেবা বা আর যে-কোন সেবাই হোক।

ভাল কথা, দেশ-সেবার কথায় একটা কথা মনে পড়ে গেল। যখন স্বদেশী রম্‌রমারম্ চল্‌ছিল তখন যখন শুনতুম যে, অমুকে কলমের এক আঁচড়ে হাজার টাকা মাইনের চাকুরী ছেড়ে দিলে দেশের কাজ করবার জন্য আর সেই সঙ্গে সঙ্গে যখন শুনতুম কত লোকের উচ্ছ্বসিত প্রকম্পিত বিকম্পিত কণ্ঠের বাহবা ধ্বনি—ওঃ কি স্বার্থত্যাগ ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি—তখন আমার মনে হ'ত লোকগুলো কি Vulgar! যেন এরা কাম কাঞ্চনকেই জীবনের সার করে' বসে' আছে। যেন কাম কাঞ্চনের চাইতে মানুষের আর কোন বড় সুখের উপাদান নেই। এই যে মানুষের দেহকে বাড়িয়ে তোলা এর মধ্যে আছে একটা বিরাট অজ্ঞানতা। আর মানুষের এই দেহের প্রতি অতিরিক্ত মাত্রায় চোখ রেখেই স্বার্থের সংজ্ঞা তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু সব মানুষই ত দেহাত্মবুদ্ধি নয়। যাঁরা অন্তরের জগতে আপনাকে টেনে তুলেছেন তাঁরা জীবনে সেই অন্তরের জগতের সূক্ষ্মতর সুখেরই আয়োজন করে' চলেছেন। এই দিক থেকে যখন ব্যাপারটা দেখবে তখন স্পষ্ট বুঝবে যে কেবল এক স্বার্থই আছে আর কিছু নেই।

যখনই দেখবে কোন মানুষ স্বেচ্ছায় বস্তুকে ত্যাগ করেছে তখনই জানবে যে, সে বিষয়কে বড় করে' পেয়েছে, অর্থাৎ—সে দেহের চাইতে মনকে বড় করে' প্রতিষ্ঠিত করেছে। এখন দেহের ভোগই ভোগ,

মনের ভোগ ভোগ নয়; দেহের সুখই সুখ, মনের সুখ সুখ নয় এ কথা আজ এই বিংশ শতাব্দীতে গরু গাধাও মনে করবে না। তবে দৈহিক ভোগ আর মানসিক ভোগে একটা প্রকাণ্ড পার্থক্য আছে। এক জনের দেহের সুখ আর এক জনের দেহে সংক্রামিত করে' দেওয়া যায় না, কিন্তু মন জিনিষটা সূক্ষ্ম বলে' এক দেহের সঙ্গে অন্য দেহের সম্বন্ধের চাইতে এক মনের সঙ্গে অন্য মনের সম্বন্ধ সহজ আর সেই জন্যে এক মনের সুখ অন্য মনে অতি সহজে চারিয়ে দেওয়া যায়।

আমার উপরের আবিষ্কারের বৃত্তান্ত শুনে তা সাংঘাতিক বলে' ঠিক করে' বসে থেক না। আমার ওই কথা প্রচার করলেই যে অমনি সবাই দেহাত্মবাদী হ'য়ে উঠবে এ কথা কস্মিন কালেও মনে করো না। আসলে ও-কথা যদি মনে কর তবে তার মানেই হবে এই যে, তোমার মতে মানুষ দেহের জগতকে বর্জ্জন করে কেবল নিঃস্বার্থ-পরতারূপ বাহবা লাভ করবার জন্যে। সুতরাং সেই "নিঃস্বার্থপর"-রূপ প্রশংশার অভাবে সবাই দেহকেই সার করে' বসে' থাকবে। কিন্তু তা নয়। এ কথা কোন দিনও মনে করো না যে, এ জগতে কতগুলো বোকা লোক চাটু বাক্যে মুগ্ধ হ'য়ে তাদের দৈহিক আরাম সুখ সুবিধা ত্যাগ করেছে। মানুষের দেহকে প্রাণকে ডিঙিয়ে উপরের জগতের উঠার মধ্যে কোনরকম ঠকামো নেই। নীতিবিদেরা আত্মপ্রসাদের সঙ্গে গোঁফে তা দিতে দিতে মনে করতে পারেন যে, বিশ্বমানব তাঁদের নৈতিক বক্তৃতার চোটেই মাথাটা কোনরকম ঠিক রেখে চলেছে। কিন্তু আসলে তা নয়। দধীচি মুনিই হোক আর নফর কুণ্ডুই হোক এরা কেউ-ই নীতিগ্রন্থের পাতা থেকে নেমে আসেন নি তা আমি

তোমাকে হলপ করে বলতে পারি। মনে কর যদি কোন মিশনরী মহিলা গ্রিয়ার পার্কে তাঁর চিম্‌টি-কাটা চশমাজোড়া নাকের ডগায় গুঁজে নিম্নলিখিত ষ্টাইলে বক্তৃতা স্থরু করে দেন ঃ—

"হে জননীবৃণ্ড, আপনাডিগকে আজ আমি বলি যে, আপনারা আপনাডের সণ্টানডিগকে ষ্টন ডান করিবেন, পুট্রকন্যাগণকে আপনি আহার না করিয়া পুষ্ট করিবেন তবে প্রভু যিশু আপনাডিগকে প্রেম করিবেন, আপনাডের স্বর্গের পঠ স্থগম হইবে।"

এবং বাড়ী গিয়ে ভাবেন যে তাঁর বক্তৃতার চোটেই সব "জননী-বৃণ্ড" "স্বর্গের পঠ স্থগম" করবার জন্যই সন্তান লালন পালন করছেন তবে সেটা কেমন হাস্যাস্পদ হয় বল দেখি? নিজে না খেয়ে সন্তানকে খাওয়ানোর মধ্যে মায়ের যে কত বড় স্থখ আছে, সে স্থখ সমস্ত নীতিগ্রন্থগুলোকে ভস্ম করে' কীর্ত্তিনাশার জলে ভাসিয়ে দিলেও লোপ পাবে না—যে স্থখের আনন্দ সমস্ত নীতিবিদ্‌মণ্ডলীর চাইতে অমর অক্ষয়। এই আনন্দের লোপ হ'লে লক্ষ কোটী নীতি-বিশারদেরা মিলেও এই জগতকে রক্ষা করতে পারবে না।

এখানে আমি মা ও সন্তানের উদাহরণ দিয়েছি, কারণ ও-ব্যাপারটা আমাদের কাছে এম্‌নি স্পষ্ট যে ও-সম্বন্ধে আর কেউ তর্কই তুলতে পারে না। কিন্তু প্রত্যেক ত্যাগের পিছনে তোমরা যাকে নিঃস্বার্থপরতা বল তার পিছনে ঠিক অম্‌নি একটা প্রক্রিয়া আছে—অম্‌নি একটা লাভ আছে। যে লাভ হচ্ছে একটা বৃহত্তর আনন্দ। স্থতরাং মানুষ তার দেহের জগত থেকে মনের জগতে উঠবেই—পরের খাতিরে নয়, নিজের গরজেই। কারণ সেইটেই তার বড় স্বার্থ।

এইখানে তুমি নিশ্চয় একটা প্রশ্ন করবে। প্রশ্নটা হচ্ছে এই

যে, ত্যাগই যদি বড় স্বার্থ হয়, দেহের জগত থেকে মনের জগতে ওঠাই যদি বৃহত্তর আনন্দ হয় তবে জগতের অধিকাংশ লোকই আপন আপন গণ্ডীতে সংকীর্ণ হ'য়ে আছে কেন—ওই সূত্র অনুসারে ত সবারই বুদ্ধ বা চৈতন্য হয়ে ওঠা উচিত ছিল, ও-পথ যদি অম্নি আনন্দদায়ক হয়?—তার উত্তর সোজা, এর উত্তরে আমি তোমায় প্রশ্ন করব যে, ভোগ অর্থই যদি সবার চাইতে বড় সুখ হয় তবে জগতের সবাই লক্ষপতি হয়ে ওঠে না কেন? এর উত্তরে তোমাকে বলতে হবে যে, কি করে' লক্ষপতি হ'তে হয় তা সবার জানা নেই, জানা থাকলেও তা অনেকের করবার সামর্থ্য নেই, অর্থাৎ—তাদের অজ্ঞানতা ও শক্তির অভাব। তোমার প্রশ্নের উত্তরও ঠিক তাই। অজ্ঞানতা ও শক্তির অভাব। অধিকাংশ লোক এটা অনুভবই পান না যে দেহের বিনাশের চাইতে মনের বিনাশ বড়। অনেকে অনুভব পেলেও সেখানকার জগতে ওঠার মত শক্তি পায় না। আমি তোমার কাছে সংস্কৃত বচন আওড়াব না, নইলে তোমায় শুনিয়ে দিতুম—"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য—শক্তিহীনের অমৃতে অধিকার নেই—এ কথা অতি সত্য অতি সত্য অতি সত্য।

সে যাই হোক, মানুষকে যখন তার দেহের দিক থেকে, তার পশুত্বের দিক থেকে না দেখে তার বড় দিক থেকে তার পরিপূর্ণ ব্রহ্মত্বের দিক থেকে দেখবে তখন স্পষ্ট বুঝবে যে, ত্যাগ বলে' বিশ্বমানবেরই হোক বা ব্যক্তিবিশেষরই হোক কোন আইডিয়াই নেই। কেননা যেখানে যে-কেউ স্ব-ইচ্ছায় কোন কিছু ত্যাগ করেছে সেখানেই জানবে যে সেই ত্যাগের পিছনে সে একটা কিছু, যা ত্যাগ করেছে তার চাইতে বড় লাভের সন্ধান পেয়েছে। আর কোন কোন স্থলে

তোমার আমার মতে সেই “বড় লাভ” আসলে বড় লাভ হ’তে পারে কিন্তু সে লাভের হিসেব আছে নিশ্চয়ই। মানুষ শূন্যের জন্যে কোন দিন হাতের পাঁচ ছাড়ে না, যদি ছাড়ে তবে বুঝবে যে সেই শূন্যকে সে হাতের পাঁচের চাইতে বড় বলে’ বসে’ আছে। এই দিক থেকে দেখলে দেখবে যে, ত্যাগ বলে’ কোন বস্তু নেই; সুতরাং নিঃস্বার্থপরতা বলে কোন আত্মিক অবস্থা নেই।

ও-সম্বন্ধে যে আমি তোমাকে আরও পাঁচ সাত পাতা বক্তৃতা শুনিয়ে দিতে না পারতুম তা নয়। কিন্তু এইখানেই থামলুম। কেননা তোমার অভিযোগের বিরুদ্ধে আমার যে দুটি জবাব তার ঐ প্রথম জবাবটিই আমার প্রথম জবাব নয়। আমার আসল জবাব হচ্ছে দ্বিতীয়টি। সুতরাং ওটার পিছনে ওইখানেই দাঁড়ি টেনে দ্বিতীয় জবাবটি তোমার কাছে দাখিল করছি।

আমার দ্বিতীয় জবাবটি হচ্ছে এই যে, আমি তোমাকে আমায় উষা থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আবার সন্ধ্যা থেকে উষা পর্য্যন্ত ‘কায়েনমনসা বাচা’ ভালবাসতে উপদেশ দিয়েছি সে কেবল আমার দু’ চোখের পূরো দৃষ্টি তোমারই পূর্ণ স্বার্থের উপরে রেখে। আমাকে ভালবাসা তোমারই স্বার্থ। কেননা ভালবাসতে পারার চাইতে বড় সুখ বড় আনন্দ আর কিছুতে নেই। সুতরাং তার চাইতে বড় স্বার্থও মানুষের আর কিছুতে নেই।

যে মানুষটির সঙ্গে তোমাকে সারা জীবন ধরে’ বাস করতে হবে তার সঙ্গে যদি তোমার একটা অবহেলার সম্বন্ধ হয়—কিম্বা অবহেলার না হলেও কেবল সবার সঙ্গে যেমন সেই রকম একটা সহজ সাধারণ আটপৌরে সম্বন্ধ হয়, তবে তোমার জীবনটি কি ভীষণ একটা

drudgery হ'য়ে উঠবে বল দেখি? মনে করতেও আমার প্রাণ শিউরে ওঠে। অপর পক্ষে যে মানুষটির কাছে তুমি থাকবে চব্বিশ ঘণ্টার পাঁচটি মিনিটও হয়ত যাকে এড়িয়ে চলতে পারবে না, যে-মানুষটি, আমি নিশ্চয় করে' বলতে পারি, তোমার কাছে একটা প্রকাণ্ড দাবী নিয়ে হাজির হবে, সেই মানুষটিকে যদি তুমি তোমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে ভালবাসতে পার তবে তোমার জীবনটি কি মধুময়ই না হয়ে উঠবে মনে কর দেখি? সে ভালবাসা যত নিবিড় যত গভীর হবে, জীবনের আনন্দও তত নিবিড় তত গভীর হবে। কল্পনা কর ছুটি অবস্থা। আমার সান্নিধ্যে তোমার দেহের অণু পরমাণু পর্য্যন্ত সঙ্কুচিত হয়ে যাবে, আমার একটি কথায় তোমার সারা মন বিরক্তিতে ভরে' উঠবে—সে কি ভীষণ। এর চাইতে বড় শাস্তি তোমার আর কি আছে? কিন্তু আবার দেখ অন্য অবস্থা। কল্পনা কর আমার একটি দৃষ্টি-সম্পাতে তোমার গণ্ডে গ্রীবায় গোলাপে গোলাপময় হ'য়ে যাবে, আমার একটুকু স্পর্শের আভাসে সমস্ত শিরায় শিরায় তীব্র বিদ্যুৎ চারিয়ে যাবে—একটুকু আদরে মনে হবে—কি মনে হবে?—হয়ত মনে হবে তোমার সমস্ত মন প্রাণ যেন কোন্ এক অতি সুখের মৃত্যু দোলায় দুলতে দুলতে দূর থেকে দূরে আরও দূরে আরও দূরে, সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্ম হ'য়ে আরও সূক্ষ্ম—আরও সূক্ষ্ম—যেন কি একটা পরম নিশ্চিন্ততার মধ্যে একটা পরম শান্তির মধ্যে তন্দ্রার আবেশের মত মিলিয়ে যাচ্ছে। মিনি, স্বর্গে কি এর চাইতে বেশি আর কিছু আছে? বিশ্বাস না হয়, যখন সেখানে যাবে নোট্ মিলিয়ে দেখো। কিন্তু এই মর্ত্ত্যে ঐ স্বর্গের সন্ধান পাবার একমাত্র উপায় হচ্ছে একটা নিবিড় গভীর বিরাট প্রেমের অনুভূতি—মধুর প্রেমের অনুভূতি।

সুতরাং এই সব নানান্ দিক দেখে দাঁড়াচ্ছে এই যে, আমাকে ভালবাসা তোমার নিজেরই স্বার্থ—প্রকাণ্ড স্বার্থ—চরম স্বার্থ।

বিশেষত ভগবান যাকে যে-বস্তু দিয়েছেন তার পক্ষে সে বস্তুর চর্চ্চা না করা মহা পাপ! ভগবান নারী জাতিকে বিশেষ করে' দিয়েছেন হৃদয়; যেমন পুরুষ জাতিকে বিশেষ করে' দিয়েছেন মস্তিষ্ক। সুতরাং নারীজাতির পক্ষে হৃদয়বৃত্তির অনুশীলন করা কেবল যে অবশ্য কর্ত্তব্য তাই নয় আমার মনে হয় ঐ পথেই তাদের সত্যও লাভ হবে।

একাল পর্য্যন্ত মানুষের সভ্যতা ছিল পুরুষের সভ্যতা। সে সভ্যতার মধ্যে নারী-জীবনের বা নারী-আত্মার কোন ছাপ ছিল না, যা ছিল সেটা নিতান্তই হসন্ত রকমের। ঐ যে মানুষের সভ্যতায় নারী এতকাল পর্য্যন্ত কোন ঠাঁই পায় নি, হয় ত তার একটা বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। সে উদ্দেশ্যটা হচ্ছে পুরুষের মস্তিষ্কের অনুশীলনের জন্যে একটা বাধা বিপত্তিহীন মুক্ত পথ উন্মুক্ত রাখা। মস্তিষ্ক জিনিষটাই হচ্ছে নির্ম্মম; সুতরাং সেখান থেকে নারীকে দূরে রাখতেই হয়েছিল, নইলে হয়ত তারা পদে পদে বাধা হয়ে দাঁড়াত।

কিন্তু আজ চারিদিক দেখে শুনে বার বার যে কথাটা মনে হয় সেটা হচ্ছে এই যে, পুরুষের মস্তিষ্কের জন্যে যে সময় ধার্য্য ছিল তা শেষ হয়েছে। এইবার মানুষের যে সভ্যতার পত্তন হবে তা পুরুষের এক হাতে গড়বে না।—তা গড়বে পুরুষ নারীর দু' হাতে। আজ জগতের সভ্যতায় মস্তিষ্কের একটুকুও কোনখানে কমতি নেই, কমতি আছে হৃদয়ের। নারীকে সেখানে সেই হৃদয়ের জোগান দিতে হবে।

ইতিমধ্যে আশীর্ব্বাদ করি যেন প্রতিসন্ধ্যায় পূবগগনে প্রথম তারাটি উঠার সঙ্গে আমারি বিরহে তোমার হৃদয়-তল ব্যথিত হ'য়ে ওঠে, তোমার কালো উজল চোখ দুটো সজল হ'য়ে আসে—আর চাপা দীর্ঘশ্বাসে দীর্ঘশ্বাসে সমস্ত বুকটি ভরে যায়। ইতি

তোমার

স্বামী

গত কংগ্রেস

——:o:——

(ভূমিকা)

ভাদ্র মাসের অকাল কংগ্রেসে আমি "সবুজপত্র"-এর রিপোর্টার-স্বরূপে উপস্থিত ছিলুম। সে-ক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ নোট নিতেও বাধ্য হই, এই অভিপ্রায়ে যে, অবসর মত, সেই নোটগুলোর অন্তরে অনেকখানি পেট্রিয়টিজমের হাওয়া ঢুকিয়ে দিয়ে সেগুলিকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে একটা প্রমাণসই পলিটিক্যাল প্রবন্ধ তৈরি করব। কিন্তু যে-কাজ আমি করতে চেয়েছিলুম, সে-কাজ ইতিমধ্যে এত দেশী বিলাতি, বাঙলা ইংরাজি দৈনিক পত্রে করা হয়েছে যে, মাসিক পত্রে তা আর করবার দরকার নেই। তা ছাড়া আমার বিবেচনায় গত কংগ্রেসের বিপক্ষে বিলাপ ও স্বপক্ষে প্রলাপের পরিমাণ এত বেড়ে গিয়েছে যে, তা আর বাড়ানো যেমন অনাবশ্যক তেমনি অনর্থক। এই সব কারণে, নোটগুলি যেমন আকারে নেওয়া হয়েছিল, সেই আকারেই প্রকাশ করা শ্রেয় মনে করছি। সেগুলি অবিকৃত ভাবে প্রকাশ করার একটু সার্থকতাও আছে। সে সবের আর কোন গুণ না থাক্, সে গুলি যে তাজা ও টাট্কা সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। এই নোটগুলির যদি কিছু মুল্য থাকে ত সে এই কারণে যে, ও-গুলোর ভিতর যুক্তি তর্ক, দর্শন বিজ্ঞান, পলিটিক্স ও ইকনমিক্সের স্পর্শমাত্রও নেই। সুতরাং এ গুলি পড়ে, কোন

পাঠকের মাথা ঘুলিয়ে যাবে না, আর যদি কারও মেজাজ বিগড়ে যায় ত আমি নাচার। মনে রাখবেন, আমার সকল কথাই বাজে কথা। বাজে কথার মহাগুণ এই যে, তা কাজের নয়, আর কাজের কথার মহাদোষ এই যে, তাতে কোনও কাজ হয় না। যে দেশে কাজের কথা বাজে কথা, সে দেশে বাজে কথা কাজের কথা হলেও হতে পারে!

(কংগ্রেসের স্বরূপ)

কংগ্রেস এবার পগ্গধারী। টুপি, পাগড়ির হয় ফার্সি, নয় তুর্কি সংস্করণ, অতএব সংক্ষিপ্ত ও অপভ্রষ্ট পগ্গ। খোলা মাথা খুব কম। পেটে বিদ্যা ও মাথায় বুদ্ধি থাকলে মুখে-চোখে তা ফুটে বেরয়। চেহারায় পরিচয় যে, অধিকাংশ ঢাকা মাথার ভিতরে কিছু নেই, অপর পক্ষে অধিকাংশ খোলা মাথার ভিতরে কিছু আছে। সে কিছু, বোধ হয় মগজ। এ কংগ্রেসে খোলা মাথা হেঁট হবে। ভোটের আদিম অর্থ বাহুবল, প্রমাণ ভোট হাত তুলে করতে হয়। বাহুবলের শক্তি একের সঙ্গে অপরের যোগে, বুদ্ধিবলের শক্তি আত্মগুণে। এ কংগ্রেসে যোগ গুণের উপর জয়লাভ করবে। কলেজস্কোয়ার, বড়বাজারের কাছে মার খাবে।

(প্রথম প্রধান ঘটনা)

শ্রীমতী আনি বেসান্তের কথারম্ভ। চতুর্দ্দিকে শিবারব। মহাত্মা গান্ধীর উত্থান ও শান্তিবচন পাঠ। শ্যাম শ্যাম (shame, shame) হুক্কাহুয়ার তিরোভাব। একটি চিত্রের স্মৃতিপটে আবির্ভাব। তিন বৎসর পূর্ব্বে শ্রীমতী আনি বেসান্তকে মাথায় করে দেশের লোকের

পেট্রিয়টিক নৃত্য। বোঝা গেল পলিটিসিয়ানরা পলিটিক্সের দেব-দেবীদের মাটির ঠাকুরহিসেবে পূজা করে। তিন দিন ধরে ঢাকের বাছি, ধূপ দীপ পুষ্পচন্দন স্তুতি প্রণতির ছড়াছড়ি। তার পর বিসর্জ্জন। বোঝা গেল কংগ্রেস তার ধর্ম্ম বদলে ফেল্‌লে। আন্দাজ করছি, কংগ্রেসের নব-ধর্ম্ম হচ্ছে নারী-পূজার বদলে Hero-worship.

(দ্বিতীয় প্রধান ঘটনা)

যা মনে করেছিলুম হলও তাই। বাঙালীর মস্তকের উপর অ-বাঙালী-কংগ্রেসের আক্রোশ আর চাপা থাকল না। বড়বাজার কর্ত্তৃক কলেজ স্কোয়ারের উপর সহসা আক্রমণ। পগ্গধারী কর্ত্তৃক "লাংঘা শিরের" উপর যষ্টিবৃষ্টি। রক্তপাত। দেখে খুশী হলুম বাঙলার যুবকদের শরীরে রক্ত আছে আর সে রক্ত লাল। কংগ্রেসের কর্ত্তা ব্যক্তিদের যুবকদের প্রতি জোর গলায় আদেশ—"দাঁড়িয়ে মার খাও, হাত তুলো না, শুধু মাথা নীচু করো"। দেখা গেল, কংগ্রেসের বাঙালী-নেতা উপনেতারা সব Tolstoi-র non-resistance মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছেন। "অহিংসা পরম-ধর্ম্ম" এই বৌদ্ধ-জৈন মত, রুশিয়ার মহা-ঔপন্যাসিকের মস্তিষ্কের ভিতর দিয়ে সাফাই হয়ে, "হিংসিত হওয়াই পরম পুরুষার্থ" এই আকার ধারণ করেছে। কিল খেয়ে কিল চুরি করা সকলের ধাতে সয় না। নিরপরাধ বাঙালী যুবকের ফাটা-মাথার রক্ত দেখে জনৈক জাত-বাঙাল অবিবেচক বাঙালী সাহিত্যিক শাস্ত্রের ভাষায় বললেন, "মূর্খস্য লাঠ্যৌষধি"। কংগ্রেস-ক্যাম্পে সে ঔষধের তল্লাস সুরু হল কিন্তু খুঁজে পাওয়া গেল না। সকলকে

অগত্যা passive-resistance শিরোধার্য্য করতে হল। তার পর আততায়ীদের পক্ষ হতে শান্তির প্রস্তাব নিয়ে, তিনটি ভগ্নদূতের আগমন। একটি ভাটিয়া, একটি পাঞ্জাবী, একটি মাড়োয়ারী। তিন জনের মুখেই এক কথা। "হামলোক্‌কা আদ্‌মি তোম্‌লোক্‌কো মারা ত কেয়া হুয়া ? জানে দেও। আবি ত বাঙালী, গুজরাটী, পাঞ্জাবী, মাড়োয়ারী সব এক হো গ্যয়া, সবকোই কানাগারেসাকে সন্তান, সব ভাই ভাই। ভাই ভাইকো শির তোড় দিয়া, ইস্‌মে কেয়া গোস্‌সাকে বাৎ হুয়।" এই হচ্ছে fraternity-র হিন্দি অনুবাদ ! আবিষ্কার করা গেল, নব কংগ্রেসের উহ্য ও গুহ্য সূত্র হচ্ছে বাঙালীর সঙ্গে অ-বাঙালীদের Violent co-operation !

(সর্ব্ব প্রধান ঘটনা)

মহাত্মা গান্ধী কর্ত্তৃক non-violent non-co-operation-এর প্রস্তাব। বক্তৃতার মানে বোঝা গেল না। মোদ্দা কথা—ছ'মাসে স্বরাজ। তার জন্য কিছু করতে হবে না। কিছু না করলেই তা পাওয়া যাবে। পলিটিক্যাল মোক্ষলাভের একমাত্র উপায় সকলের পক্ষে নিষ্ক্রিয় হওয়া। শুনতে কথাটা বৈদান্তিক কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অশাস্ত্রীয়। বেদান্ত-মতে কর্ম্মত্যাগের উদ্দেশ্য জ্ঞানলাভ, সেই জ্ঞানের ফল মুক্তি। এ মত ঠিক উল্টো। জ্ঞান অর্জ্জন, সহযোগীতা বর্জ্জনের বিরোধী। অতএব স্কুল-কলেজ পরিত্যাজ্য। প্রশ্ন—কর্ম্মমার্গ জ্ঞানমার্গ দুই ত্যাগ করে, কোন্ মার্গ ধরে ছ'মাসে স্বরাজ্যে গিয়ে পৌঁছব ? উত্তর—non-violent non-co-operation, পলিটিক্যাল স্ব-রাজযোগের একটি ক্রিয়া ! সে ক্রিয়া হচ্ছে বালকের

চিত্তবৃত্তির ও বাদবাকী সকলের বিত্তবৃত্তির নিরোধ। এ ক্রিয়ার আশু ফল সাযুজ্য। কার সঙ্গে?—অপরাপর স্বাধীন জাতির সঙ্গে। প্রস্তাবটা খুব পরিস্কার নয়, কিন্তু মতলব বোঝা যাচ্ছে। মনে ও চরিত্রে যদি আমরা স্বাধীন হই তাহলে জীবনে নিশ্চিত স্বাধীন হব। কথা ঠিক, কিন্তু "যদি" জিনিষটা এত অনিশ্চিত যে তার উপর কোনই ভরসা নেই। তা ছাড়া মনে স্বাধীন শুধু কথার জোর এক মুহূর্ত্তে হওয়া যায় না। সে যাইহোক বিচার শোনা যাক্।

(বিচার)

কংগ্রেসে উক্ত প্রস্তাবের বিচার সুরু হল। নানা দেশের নানা জাতীয় কংগ্রেসওয়ালা সে বিচারে যোগ দিলেন। কি হল তা বোঝা গেল না, কেননা কারও কথা স্পষ্ট নয়। কারও কারও কথা আবার এতাদৃশ অস্পষ্ট যে, তাঁরা পূর্ব্বপক্ষ কি উত্তরপক্ষ বোঝে কার সাধ্য। ইনি non-co-operation-এর পক্ষে কিন্তু non-violent-এর বিপক্ষে। উনি non-violent-এর পক্ষে কিন্তু non-co-operation-এর বিপক্ষে। কেউ বা উক্ত প্রস্তাবের প্রতি দফার দফারফা করতে প্রস্তুত কিন্তু সমগ্রটি গ্রাহ্য করেন। কেউ বা আবার প্রতি দফাটি গ্রাহ্য করে সমগ্রটি প্রত্যাখ্যান করলেন। দু' এক জন প্রস্তাবটি লম্বা করবার পক্ষে, আর পাঁচ জন সেটি খাটো করবার পক্ষে। দেখা গেল, প্রস্তাবটির অর্থ ও সার্থকতা সম্বন্ধে কারও সঙ্গে কারও মতের মিল নেই, অতএব এ বিষয়ে সকলের পক্ষে একমত হওয়ার কোনও বাধা নেই! যেখানে বুদ্ধিবলে কুলায় না, সেখানে রাহুবলে কুলায়, সুতরাং দেখা যাক ভোটে কি হয়।

(ভোট)

প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট হল ৯৯৯, তার পক্ষ হল এক, অর্থাৎ—মহাত্মা গান্ধীর। তবে সেই এক ভোটেই যে প্রস্তাবটি পাশ হয়ে গেল, তার কারণ সেই একের পিঠে ছিল অনেক গুলি 'শূন্য', সুতরাং গুণ্‌তিতে সে 'এক' অনেক হাজার হয়ে উঠল!

(উপসংহার)

"চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে।" Non-co-operation প্রস্তাব পাশ হবার পর কংগ্রেসের সভাপতি লালা লাজপত রায় কর্তৃক তার উপর অসি চালন, তৎপরে বাঙালীর পরাজয়ের জন্য দুঃখ প্রকাশ। তাঁর দুঃখ বাঙালী কংগ্রেসের নেতৃত্ব খোয়ালে। সত্য কথা এই, এ কংগ্রেসে বাঙালী তার নেতৃত্ব হারায় নি, তা যে তিন বৎসর আগে হারিয়েছে সেই সত্যটা প্রমাণ হল এই কংগ্রেসে। আর এক কথা, আমরা কংগ্রেসের অনুচর ও পার্শ্বচরের দল, (এবং দলে আমরাই পুরু, নেতারা নন) প্রস্তাবটি শুনে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছি। কি কারণ?—তার উত্তরে আমার নিজের কথা বলতে পারি, আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে উক্ত প্রস্তাবের মহত্ত্ব ও মাহাত্ম্য ত দূরের কথা, তার অর্থ সামর্থ্য কিছুই ধরা পড়ল না। ইংরাজি ভাষায় ও-চতুষ্পদ সমাসটির কোনই অর্থ হয় না। অর্থহীন পদের পূর্ব্বে "না" বসিয়ে দিলে তা অর্থপূর্ণ হয় না। আমাদের পলিটিক্সে co-operation-এর কোনও অর্থ নেই, অতএব non-co-operation-এরও কোনো অর্থ নেই। মিছে কথার উল্টো কথা সত্য কথা নয়, মডারেটদের বাজে কথার প্রতিবাদ, কাজের কথা নয়।

তার পর কংগ্রেসের প্রস্তাবে আর যাই থাক, non-co-operation নেই, অর্থাৎ—তার নাম আছে বটে, কিন্তু রূপ নেই। এ ক্ষেত্রে উক্ত প্রস্তাব নিয়ে তর্ক ছাড়া আর কিছু করা যেতে পারে না এবং সে তর্ক কিছুদিন ধরে ভারত জুড়ে হবে। পঞ্জাবের অত্যাহিত অত্যাচারের প্রতিকারের ব্যবস্থা করবার জন্য যে কংগ্রেস আহুত হয়েছিল, সে কংগ্রেস যে শুধু একটি তর্কের প্রতিষ্ঠা করে গেল, এর চাইতে অদ্ভুত আর কি হতে পারে। যে কথায় শুধু কথা বাড়ে, সে কথায় কাজ কমে কি?

কংগ্রেস যদি বুরোক্রাসির সঙ্গে সহযোগীতা বর্জ্জনের প্রস্তাব না করে, বুরোক্রাসির প্রতিযোগীতা অর্জ্জনের সংকল্প করতেন, তাহলে বোধ হয় বাঙালী তার নেতৃত্ব ফিরে পেলেও পেতে পারত। প্রতি-যোগীতা অর্জ্জন কর্ম্মক্ষেত্রে সাধনা সাপেক্ষ, আর বাঙালী গত পোনেরো বৎসরে ঠেকে শিখেছে যে, কোনো মন্ত্রে সিদ্ধ হতে হলে ক্রিয়া চাই। এক বচনসার পলিটিসিয়ান ছাড়া বাঙলার আর কেউ নিষ্ক্রিয় হবার মাহাত্ম্য প্রচার করতে প্রস্তুত হবে না। কংগ্রেসের প্রস্তাবের অন্তরে আছে শুধু নিষেধ, নেই কোন বিধি। আর বিধিই মানুষকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করে, নিষেধ নয়। সমাজে "না"র শাসনে বাস করেই আমাদের এই দুর্গতি। জাতীয়-জীবন গড়ে তোলবার জন্য এখন যার বিশেষ প্রয়োজন সে হচ্ছে "হাঁ"। Don't নয়, Do-ই হচ্ছে নব জীবনের একমাত্র বাণী। কেননা, "Don't" শাসনকর্ত্তার আদেশ ও "Do" মুক্তিদাতার উপদেশ।

আমার এ মত শুনে যদি কেউ ব্যাজার হন, তাঁর কাছে আমার একটি ব্যক্তিগত নিবেদন আছে। মহাত্মা গান্ধীর প্রস্তাব অঙ্গীকার

করবার পক্ষে আমার কোনরূপ বাধা নেই। উপাধি ত্যাগ করতে আমি প্রস্তুত, কেন না আমার কোনরূপ উপাধি নেই। Levee আমি এ যাবৎ শুধু ছাপার হরপেই দেখেছি এবং বস্তুগত্যা দেখবার আমার কোনরূপ অভিপ্রায় নেই। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা আমার পায়ে সয় না, রাত্রি জাগরণ আমার ধাতে সয় না, আর বেশি মাথা নীচু করলে আমার পিঠে ব্যথা হয়। ছেলেদের স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিতে আমি সদাই প্রস্তুত, কেন না আমি নিঃসন্তান। ওকালতি ছাড়তে আমার কোনও আপত্তি নেই, কেন না ওকালতি আমি করি নে। মেসোপোটামিয়াতে কুলিগিরি ও কেরাণীগিরি করতে যাবার আমার কোনরূপ অভিপ্রায় নেই, অতএব সে অভিপ্রায়ও ত্যাগ করতে আমি সদাই প্রস্তুত। বিদেশী মাল আমি অবশ্য আর পাঁচজনের মত কিনি, কিন্তু সে হচ্ছে বেশির ভাগ—বই। কংগ্রেস স্কুল কলেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করলেও, বইয়ের বিরুদ্ধেও যে করেছেন, এ কথা কোথায়ও স্পষ্ট করে লেখা নেই। তা ছাড়া এ দফাটা মহাত্মা গান্ধীর মতের বিরুদ্ধেই তাঁর প্রস্তাবের অন্তরে লুকিয়ে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে আমি বহুকাল থেকে উক্ত প্রস্তাব অনুসারে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করছি। তার পর সত্য কথা বলতে গেলে, এ যাত্রা কংগ্রেস আমার একটু উপকার করে গিয়েছে। আমার হিতৈষী বন্ধুবর্গ আমাকে লেখার রাজ্য থেকে টেনে বার করে, বক্তৃতার রাজ্যে ঠেলে ঢুকিয়ে দেবার অভিপ্রায়ে আমাকে ইলেকসানের ক্ষেত্রে দাঁড় করিয়েছিলেন। উক্ত প্রস্তাবের দোহাই দিয়ে সেখান থেকে আমি সরে পড়েছি। কেন জানেন?—সেখানে গেলে 'পররুচি' কথা কইতে হত। সে বড় কষ্টসাধ্য। আর 'আপরুচি' কথা কইলে আমার

উপর কেউ রাজি হতেন না। কি বুরোক্রাসি, কি ন্যাসানালিষ্ট, কি মডারেট, কি খালিফেট—সবাই সেখানে আমাকে একঘরে করে দিতেন। আর একঘরে যদি হতেই হয়, ত সে নিজের ঘরে হওয়াই শ্রেয়।

আমি যে কংগ্রেসের প্রস্তাবের নীচে ঢেরাসই করতে প্রস্তুত নই, তার প্রথম কারণ, আমি যা বুঝি নে, তা বুঝি বলার অভ্যাস আমার নেই। আর তার দ্বিতীয় কারণ, আমি চাইনে যে, দেশসুদ্ধ লোক আমার মত নিষ্কর্ম্মা হোক। সবাই যদি বীরবল হয় ত দেশ আজ যা আছে কাল তার চাইতে বেশি লক্ষ্মী ছাড়া হবে। তার চাইতে সকলের পক্ষে 'বল' বাদ দিয়ে 'বীর' হওয়া শতগুণে শ্রেয়।

বীরবল

কাব্য ও কল্পনা *

—ঃ*ঃ—

রূপকথার অপরূপ বাহনটির কথা বলিতেছিলাম। কোনও মানাই সে মানে না, কোনও বাধাই সে গ্রাহ্য করে না; রাজকুমারকে পিঠের উপর পাইলে একেবারে আকাশে উধাও হইয়া চলে—সেই পক্ষীরাজ ঘোড়া। মন্ত্রীপুত্রকে সে ফেলিয়া দেয়, কোটালের ছেলে তার কাছেই আসিতে পারে না, সওদাগরের ছেলেও দূরে থাকে, কিন্তু রাজপুত্রকে যদি পৃষ্ঠাসনে পায় ত আনন্দে আবেগে তার গতি হয় বিদ্যুতের মত, মাটীতে তার পা ঠেকে না—নিবিড় বনের ভিতর দিয়া, মেঘস্পর্শী পাহাড়ের উপর দিয়া, লোকালয় পিছনে ফেলিয়া, তেপান্তর মাঠ পলকে অতিক্রম করিয়া, তার রাজপুত্রকে লইয়া গিয়া ফেলে হয় ত সাত সমুদ্র তের নদীর পারে বিজনবাসিনী কোন্ এক অপূর্ব্ব রূপসী রাজকন্যার দেশে।

লোকে মনে করে, সে রাজ্যও নাই, সে রাজপুত্রও নাই, আর সে পক্ষীরাজ ঘোড়াও নাই। মিছে কথা। যুগযুগান্তর পরে মাঝে মাঝে এখনও দেখিতে পাওয়া যায়, রাজার ছেলে তার পক্ষীরাজকে লইয়া উধাও হইয়া চলিয়াছে। দেশ হইতে দেশে, বন হইতে বনে, মন

* শ্রীপ্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের সভাপতিত্বে রামমোহন লাইব্রেরী হলে এক অধিবেশনে পঠিত। —লেখক

হইতে মনে, তার অবাধ গতি। এখনকার দিনে পক্ষীরাজের নাম হইয়াছে কল্পনা, আর রাজকুমারকে, লোকে বলে—কবি।

সত্য কথা। এই কল্পনাকে না পাইলে কবির একদণ্ডও চলে না, অথচ কল্পনাও সর্ব্বক্ষণ হাজির থাকে না। তখন পক্ষীরাজকে ছাড়িয়া আরবী ঘোড়ায় চড়িতে হয়। সে যতই ছুটুক, তবু তার পা, মাটিতে ঠেকে, সাত সমুদ্র তের নদী পার হইবার তার কোনও ক্ষমতাই নাই। বুদ্ধি জিনিসটা অনেকটা আরবীর মত। সে পার্থিব,—কল্পনা তূরীয়। একটু খুঁজিতে হয় বটে, কিন্তু বুদ্ধি জিনিসটার সাক্ষাৎ পাওয়া একেবারে দুর্ঘট নয়। কিন্তু কল্পনা?

কহ কবি-বল্লভ হৃদয় জুড়াইতে
মিলয়ে কোটিমে একি।

বুদ্ধি কেবল জীবনের পরিধিটুকুর মধ্যেই বদ্ধ থাকে। সে জীবনের আলোচনা করে, ভাষ্য করে, কখনও কখনও জীবনকে প্রকাশও করে। গণ্ডীর বাহিরে কিন্তু কখনো সে সীতার মত পা দেয় না—সীতাহরণও হয় না, রামায়ণও রচিত হয় না। কল্পনা কিন্তু বুদ্ধির মত ভীরু নয়। জীবনকে অভিব্যক্ত করিতে করিতে সাহসিকা কল্পনা জীবনকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া যায়। জীবনও তাহার কাছে—জীবনান্তরও তাহার কাছে তুচ্ছ নয়। মরণকে সে মধুর করে এবং মরণাধিক যাহা তাহাকে মধুরতর করিয়া তোলে। সংসার তাহার কাছে অসার নয় কিন্তু সংসার ছাড়াইয়া যাহা তাহাকেও সে আপনার মধ্যে জড়াইয়া লয়। দেশকে সে আপন ভাবে, কিন্তু বিশ্বকে পর মনে করে না। স্বর্গকে সে ভালবাসে, কিন্তু নরককে সে ভয়

করে না। সীমার মধ্যে খেলা করিতে করিতে সে সীমাহীনের রাজ্যে গিয়া পড়ে। নীল আকাশের মধ্যেও সে আপনাকে হারাইয়া ফেলে, এবং নীল চোখের কাছেও সে আত্মহারা হইয়া পড়ে। বর্ত্তমানের মধ্যে অতীত ও ভবিষ্যত তাহার আলিঙ্গনে ধরা পড়িয়া যায়।

বুদ্ধি মনোজগতের মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম মানিয়া চলে। লজিককে সে ছাড়াইয়া যাইতে পারে না। ঊর্দ্ধলোকে উঠিতে গেলে যুক্তির নিয়ম পদে পদে তাহাকে ব্যাহত করে। সে বিচার করিয়া মাপিয়া মাপিয়া চলে। ব্যবহার জগতের বস্তুর মত, দস্তুরমত তাহাকে টানা যায়, ছেঁড়া যায়, মাপা যায়। কল্পনা কিন্তু তড়িতের মত পৃথিবী হইতে আকাশে আনাগোনা করে। এইহেতু কল্পনাকে কোনোরূপেই বস্তুতন্ত্র করা গেল না।

মর্ত্ত্যের সহিত স্বর্গের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। সংসারের মধ্যে থাকিয়াও সংসারকে ছাড়াইয়া যায় বলিয়া স্বর্গকে কখনো কখনো সুদূর বলিয়া মনে হয়। সাধারণ লোক সংসারের লোক। সে কেবল বাইরের জগতের সহিত সম্পর্ক পাতাইয়া রাখে। পরিবর্ত্তন হইতে পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে ক্ষণিকের সহিতই তাহার মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে পরিচয় ঘটিতে থাকে। শাশ্বতের সাক্ষাৎ পাইবার অবসর তাহার নাই। এই বহির্জগতের অন্তরে এবং বাহিরে কিন্তু আর এক জগৎ অদৃশ্যভাবে অবস্থান করিতেছে। তৃতীয় নেত্র যাহার উন্মীলিত হইয়াছে, সেই কেবল এই লোকের সন্ধান পাইয়াছে। দেশ-কালের অতীত বলিয়া এই জগতের জরা নাই। এই মানসলোকে বিচরণ করেন বলিয়া মর্ত্ত্যের মানুষ হইয়াও কবি অমর। সংসার নশ্বর—স্বর্গ চিরন্তন।

এই চিরন্তনের সহিত পরিচয় করাইয়া দিয়া কবি সংসারীকে স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের নিগূঢ় সম্বন্ধটিকে স্মরণ করাইয়া দেন।

আমাদের সারাটি জীবন এক অপূর্ব্ব দ্বন্দ্বের মধ্যে দুলিতেছে। দেহ বস্তুটি মর্ত্ত্যের আইনকানুন মানিয়া চলে, অভাব ও প্রয়োজন তার স্বভাবের নিকট হইতে খাজনার কড়াক্রান্তিটি পর্য্যন্ত আদায় করিয়া নেয়। প্রকৃতির অধীনতা দৈহিক ক্ষণভঙ্গুরত্বের কারণও বটে, ফলও বটে। শরীরের সহিত সংস্রববশত, মনের একটা দিক শরীরকে অনুসরণ করিবার প্রবণতা পাইয়াছে। সাধারণত, মানসজগৎ মর্ত্ত্যের নিয়ম মানে না। দেশ ও কাল অতিক্রম করিয়া যায় বলিয়া মন কেবল স্বর্গের বিধি এবং সীমাহীনের বিধানকেই স্বীকার করে। এই বন্ধন ও মুক্তি, এই স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের মধ্যে জীবন চিরদিন ধরিয়া অবিশ্রাম দুলিতেছে। প্রাকৃতজনের নিকট জীবনের এই আন্দোলন অজ্ঞাত থাকিয়া যায়। তীক্ষ্ণ অনুভূতির প্রভাবে কবিই কেবল জীবনের এই চাঞ্চল্য অনুভব করিতে পারেন। তাই প্রতিযুগের কাব্যেই, এই দ্বন্দ্ব আর এই আন্দোলন, আর এই চিরন্তন সমস্যার সমাধানের চেষ্টা, শান্তির জন্য ব্যাকুলতা এবং নিবৃত্তির জন্য প্রয়াস, কোনও কোনও রূপে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে দেখিতে পাই। তাই পাপ ও পুণ্যের সংগ্রাম, অদৃষ্ট ও চেষ্টার সংঘর্ষ, স্বর্গ ও নরকের বিরোধ, আকাঙ্খা ও আকাঙ্খিতের ব্যবধান—রামায়ণ, মহাভারত, ইলিয়াড, ডিভিনা কমে-ডিয়া, হ্যামলেট হইতে বর্ত্তমানের গীতিকাব্যে পর্য্যন্ত দেশ, কাল ও জাতীয় প্রকৃতির অনুসারে বিচিত্ররূপে অভিব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

এমনি করিয়া জগতের চিরন্তন সত্যসকল, কবির সূক্ষ্ম অনুভূতির ভিতর সাড়া দিয়া যায়। কিন্তু কেমন করিয়া এমন হয়?—

সকলের সঙ্গে এবং সমস্ত কিছুর সঙ্গেই কবির একটি সহধর্ম্মিতা সহমর্ম্মিতা আছে। যাহাকে কবি বলিয়া ডাকি, সেই সামাজিক মানুষটি কবি নহেন। সংসারের সম্পর্কে তাঁহার দৃষ্টি সীমায় আবদ্ধ, সংস্কারে ক্লিষ্ট, বিরাগ-বিদ্বেষে ক্লিন্ন। কবি সেই প্রেমিক—সেই ভাবুক পুরুষ, অনন্যসাধারণ আত্মীয়তার প্রভাবে যাঁহার উন্মীলিত মানসনেত্র অব্যর্থ অন্তঃদৃষ্টি লাভ করিয়াছে, অনুরাগ এবং সমবেদনায় পূর্ণ তাঁহার হৃদয়, বাহিঃপ্রকৃতি এবং মানবপ্রকৃতির দুঃখ সুখ এবং ছায়া-আলোকের সহিত সমান স্পন্দনে স্পন্দিত হইতেছে। এই অন্তঃদৃষ্টি কল্পনার ধর্ম্ম। বুদ্ধির সহিত চর্ম্মচক্ষুর একটা ঘনিষ্টতা আছে, মর্ম্ম-চক্ষুর সহিত কিন্তু হৃদয়েরই সম্পর্ক নিবিড়।

কাব্যের দিক দিয়া থাক্—সমাজের দিক দিয়াই না হয় একবার কল্পনাকে পরীক্ষা করিয়া দেখা যাক্। চারিদিকে দুঃখ দারিদ্র্য, অভাব অত্যাচারের ত সীমা-পরিসীমা নাই। শ্রমীর মুখের গ্রাস ধনী অনা-য়াসে কাড়িয়া লইতেছে; অম্লান বদনে বলী দুর্ব্বলের প্রাণটুকু বৈতরিণীর পর পারে পৌছাইয়া দিতেছে; অজগর যেমন করিয়া ছোট ছোট সাপগুলিকে গিলিয়া ফেলে, বড় বড় রাষ্ট্রগুলি তেমনি করিয়া ক্ষুদ্র রাজ্য সমূহকে আত্মসাৎ করিতেছে—আমরা কয়জনেই বা সেই উত্যক্ত পীড়িত, আর্ত্তদের অন্তর্বেদনা অনুভব করিতে পারি? আমরা যে লোক মন্দ বলিয়া অনুভব করি না, তাহা নহে। মানুষ সাধারণত হৃদয়হীন নয়। পরিবার পরিজনের দুঃখ বিয়োগ সে মনে-প্রাণে অনুভব করে। চোখের সুমুখে যে মৃত্যু ঘটে তাহাতে সে আকুল হইয়া উঠে। সম্মুখে যে অত্যাচার সে ঘটিতে দেখিয়াছে, তাহা তাহাকে অধীর করিয়া ফেলে। অথচ এই সব অবিচার, অনাচার,

মৃত্যু, নিষ্ঠুরতা একটু দূরে গণ্ডীর বাহিরে ঘটিলেই আর তাহার চক্ষে জল আসে না, দুঃখেও নয়, ক্রোধেও নয়। সে হৃদয়হীন স্বার্থপর বলিয়াই যে এমন হয়, তা নয়।—যে বৃত্তির প্রভাবে তাহার অন্তরে এই সব ব্যাপারের চিত্র উজ্জ্বলবর্ণে ফুঠিয়া উঠে তাহার সেই মানসবৃত্তি দুর্ব্বল বলিয়া এমন হয়। কল্পনাশক্তি তাহার যথেষ্ট নাই বলিয়াই, ঘটনাগুলিকে সে ভাল করিয়া অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করিতে পারে না বলিয়াই তাহার অনুভূতির তন্ত্রী সাড়া দিয়া বাজিয়া ওঠে না। অন্য লোক যে-চোখ দিয়া দেখিতেছে, সে-চোখ দিয়া সেই দেখিতে পারে যার আছে কল্পনাশক্তি। তেমনি করিয়া দেখে বলিয়া সে অপরের আনন্দ ও ব্যথা বোধ করিতে, ধারণা করিতে পারে। যে অন্ধ, সৌন্দর্য্যের দর্শনে যে আনন্দ তা' সে উপভোগ করিতে পারে না, কুৎসিতের দর্শনে যে ক্লেশ—তাও তাকে অনুভব করিতে হয় না। চোখ নাই বলিয়া এই হর্ষ-বেদনা সম্পর্কে অন্যের সহিত তাহার সহানুভূতি নাই। কল্পনা বৃত্তিতে বঞ্চিত হইয়া, সংসারের সাধারণ লোক এমনিই অপরের সুখ দুঃখ সম্বন্ধে উদাসীন, কেন না মনের দিক দিয়া সে অন্ধ। অতএব দেখা গেল যে, কল্পনা মানুষের মনকে সহানুভূতি প্রবণ করিয়া তোলে এবং সহানুভূতি অন্তরকে নূতন দৃষ্টি দান করে।

এ ত গেল সামাজিক সহৃদয়তার কথা।

মানব-হৃদয়তা কবিত্বের এক প্রধান লক্ষণ। মানব-হৃদয়ের আশা, আকাঙ্খা, ব্যথা ব্যাকুলতা, তৃপ্তি অতৃপ্তি—কাব্যের ভিতর দিয়া বাণী লাভ করিয়া সার্থক হইয়াছে। কল্পনার বলে সমস্ত মানব-সমাজের বেদনা, কবি আপনার অন্তরে উপলব্ধি করেন। সেই সমবেদনায়

অন্তঃদৃষ্টি উন্মেষ লাভ করিয়া মানব-জীবনের রহস্যগুলি তাঁহার নিকট প্রকাশ করিয়া দেয়। মানব-জীবন কাব্যের শ্রেষ্ঠ উপাদান, কিন্তু একমাত্র উপাদানই নহে। বিশ্বের সকল বস্তুর সহিত কবি সহধর্ম্মিতা লাভ করিয়াছেন—সেও তাঁহার অসাধারণ কল্পনাশক্তির প্রভাবে। তাই শুধু মানব-জীবনের সহিত নহে, বিশ্ব-জীবনের সহিতও তাঁহার সহানুভূতি গভীর। তাই শুধু জীবনের বেদনা নহে, নিখিল বিশ্বের মর্ম্মবাণী কবির কাব্যে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে। হৃদয়ের ভাবনা ও কামনাসমূহের সঙ্গে সঙ্গে স্রোতস্বিনীর কল্লোল, সিন্ধুর ক্রন্দন, অরণ্যের শব্দময় নিস্তব্ধতা, রজনীর মৌন গাম্ভীর্য্য এবং ক্ষণে ক্ষণে প্রকাশিত প্রকৃতির অন্তহীন রহস্যলীলা—কাব্যের মধ্যে ভাষা পাইয়া চরিতার্থতা লাভ করিয়াছে।

কল্পনা কথাটির সহিত অলীকতার ছায়া বড় ঘনিষ্ঠরূপে জড়াইয়া পড়িয়াছে। তথ্যের বিরুদ্ধে দাঁড় করাইতে গিয়া কল্পনাকে তত্ত্বের বিরুদ্ধবাদিনী করিয়া তোলা হইয়াছে। "কথাটা প্রকৃত নহে, কল্পিত" বলিয়া কল্পনার যাথার্থ্যে অযথা সন্দিহান হইয়া অনেকে মনোবেদনা পাইয়াছেন। তথ্য সকল সময়ে সত্য নহে জানিয়াও আমরা ইহার কোন সুব্যবস্থা করি না। ইহার তত্ত্ব অথবা পৃথিবীর সূর্য্য প্রদক্ষিণ ব্যাপারটি বিশেষজ্ঞের গোচরীভূত হইয়াও, অশিক্ষিত সাধারণের কাছে তথ্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। যাহা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য, প্রত্যক্ষ, বাস্তব—তাহাই তাহাদের কাছে সত্য। আবার বৈজ্ঞানিক সত্য ইহার অপেক্ষা উচ্চতর শ্রেণীর সত্য। পরীক্ষা, বিচার এবং বিশ্লেষণের দ্বারা প্রাকৃতিক পদার্থ এবং লীলা সম্বন্ধে যে জ্ঞান লাভ করি তাহা বৈজ্ঞানিক সত্য। কবির যে শক্তি তাহা সৃজনী শক্তি,

যে উন্মাদ সাড়া পড়িয়া গেল, একটি উপমার মধ্যে তাহাই ধরিয়া ফেলিয়া কবি যে সৌন্দর্য্যের আভাস দুটি কথায় ব্যক্ত করিয়া গেলেন, তাহা মানবের সৌন্দর্য্য-প্রিয় অন্তরে অমর হইয়া রহিল। প্রথমটি কাল্পনিকতার ফল। বর্ণনার সূচনা হইতেই আমরা বুঝি যে উপমা সত্যকে ছাড়াইয়া গিয়াছে—রাধার মুখের কাছে হারিয়া যাইবার ভয়ে চাঁদও আকাশে পলায় না, আর চোখের কাছে হারিয়া যাইবার ভয়ে হরিণও বনে পলায় না। এ শুধু অত্যুক্তি এবং এই অত্যুক্তি স্থায়ী ভাবে আমাদের মনের উপরে বিশেষ কোনো রূপের ছায়া ফেলিয়া যায় না। অত্যুক্তি বলিয়া ইহা অগ্রাহ্য নহে—যাহার জন্য এই বর্ণনার আড়ম্বর তাহাই প্রকাশ করিতে পারিতেছে না বলিয়া কল্পনার দিক দিয়া ইহার কোনই মূল্য নাই।

"The Haunted House" Hood-এর একটি ভাল কবিতা। ভূতের বাড়ীর ছবি আঁকিয়া মনের একটি অতি লৌকিক ভাবের ছায়া ফেলিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। ছবিহিসাবে ইহা মন্দ হয় নাই।

ইহার সহিত Coleridge-এর Christabel বা Ancient Mariner-এর তুলনা করিলে বুঝা যাইবে—কল্পনা ও কাল্পনিকতার মধ্যে কি আকাশ পাতাল প্রভেদ। Hood কেবল অলৌকিকের ধারণাটিকে লইয়া খেলা করিয়াছে। আর অলৌকিক রহস্যের চিরন্তন ভাবটি Coleridge-এর কবিতায় মূর্ত্ত হইয়া মানুষের মনে মনে নিবিড় বিস্ময় জাগাইয়া চলিয়াছে।

কল্পনা কবির একটি মানসিক বৃত্তি, তাহার আত্মার একটি স্বাভাবিক শক্তি। এই শক্তি যে শুধু কবির তৃতীয় নেত্র উন্মীলিত

করিয়া দেয়, তাহা নহে। যেটি যাহা, তাহাই দেখাইয়া দিয়া, অথবা কেবল বস্তু, বিষয় ও অবস্থার নিহিত সত্য ও সৌন্দর্য্যের সন্ধান বলিয়া দিয়া ইহা ক্ষান্ত হয়, তাহাও নহে।

সকলেরই হয় ত কল্পনা-শক্তি কিছু আছে, কিন্তু তা এমনি আর্দ্র ও শীতল যে, কবির কাব্য-প্রদীপ-শিখা ভিন্ন তা ক্ষণিকের জন্যও জ্বালাইবার কোন উপায় নাই। বাহিরের শিখায় কিন্তু কবির কোন প্রয়োজন নাই। বিশ্বের সহিত সংস্পর্শে কবির অনুরাগপূর্ণ অন্তরে আবেগের যে স্পন্দন পড়িয়া যায়, তাহারই উত্তাপে এবং উত্তেজনায় প্রজ্জ্বলিত হইয়া কল্পনার যে দীপ্তি চারিদিক উজ্জ্বল করিয়া তোলে, জলে স্থলে সে আলোর সাক্ষাৎ কোথাও মিলিবে না, কোথাও মিলিবে না।

অতএব যে শক্তি হৃদয়ে থাকিয়া কবিকে দিব্যদৃষ্টি দান করে, সেই শক্তিই কাব্যের উপাদান সমূহের সংস্রবে আসিয়া তাহাদিগকে নূতন আলোকে আলোকিত করিয়া তোলে। অর্থাৎ—কল্পনা সেই শক্তি, যাহার বলে কাব্যান্তর্গত বস্তু ও বিষয়, রূপ ও বর্ণে মণ্ডিত হইয়া স্পষ্ট হইয়া উঠে। নানা বৈচিত্র্যকে ঐক্যে বাঁধিয়া সুষমা দিবার যে শক্তি, সেও কল্পনার। মূর্ত্তি ও আকার দিয়া সূক্ষ্ম ভাব-গুলির বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করাও কল্পনার কাজ। আবার স্থূল বাস্তবকে ভাবময় করিয়া তোলা—সেও কল্পনার লীলা। এমনি করিয়া কল্পনার মায়াদণ্ডের স্পর্শে অনঙ্গভাব মূর্ত্তরূপে এবং স্থূল বাস্তব সুকুমার ভাবে পরিণত হইয়া যায়। সুতরাং অজানা এবং অরূপকে রূপ দিয়া অপরূপ করিয়া তোলে যে—সে ঐ কল্পনা।

বিজ্ঞান-সম্পর্কে মানুষ বলবান ; সাহিত্য-সম্পর্কে মানুষ দেবতা।

বিজ্ঞানে সে আবিষ্কার করে, সাহিত্যে সে সৃষ্টি করে। বিজ্ঞানে তাহার সুখ, সাহিত্যে তাহার আনন্দ।

সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ কাব্যে।

অন্য সকল শক্তি দিয়া মানুষ জীবনকে সেবা করিয়াছে, সুস্থ করিয়াছে, সুখকর করিয়াছে। সাহিত্যে সে জীবন সৃষ্টি করিয়াছে। কোটাল-পুত্র জানিত অস্থিসংস্থান করিতে, মন্ত্রী-পুত্র জানিত রক্তে মাংসে সম্পূর্ণ করিয়া আকারটি দিতে, শুধু প্রাণ সঞ্চার করিবার বিদ্যা কারো আয়ত্ত ছিলনা—সে বিদ্যা জানিত শুধু রাজার ছেলে। ঐতিহাসিক নয়, বৈজ্ঞানিক নয়—জীবন যে দেয় সে ঐ কবি। মানুষ সকল অবস্থায় মানুষ—শুধু কাব্যে সে ঈশ্বর।

কবির জীবন্ত সৃষ্টি—কাব্য।

অবহিত-চিত্ত হইলেই কাব্যের মধ্যে প্রাণের স্পন্দন অনুভব করিতে পারা যাইবে। কাব্য জড় নহে, মৃত নহে, যন্ত্রবদ্ধ নহে। কাব্য অবচ্ছিন্ন ভাবপুঞ্জের সমষ্টিমাত্রও নহে। পুষ্পজীবনে কৃতার্থ হইতে, বৃন্তলগ্ন গোলাপের সমস্ত পাপড়িগুলি যেমন একটি মূল উদ্দেশ্যের অনুযায়ী হইয়া আপনাদিগকে বিন্যস্ত করে, তেমনি করিয়া কাব্যের সমস্ত উপাদান কেন্দ্রস্থ ভাবটির চতুর্দ্দিকে আপনাদিগকে ব্যবস্থিত করিয়া, একটি সুসঙ্গত সমগ্রতার মধ্যে চরিতার্থতা লাভ করিয়াছে। সেই সুষমা কেবল প্রাণশূন্য সৌন্দর্য্যেই পর্য্যবসিত হইয়া যায় নাই। ভাবজগতে রূপান্তরিত মানবজীবন কাব্যের অন্তরে স্পন্দিত হইতেছে। ইতিহাস, বিজ্ঞান এবং দর্শন কাব্যের মধ্যে আত্ম-বিসর্জ্জন দিয়া আপনাদের বিশেষত্ব হারাইয়া, কাব্যের উপাদান-রূপে নূতন ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে।

কাব্য প্রাণময়। জীব একদিকে নানা সংগ্রামের ভিতর দিয়া আপনাকে রক্ষা করিতেছে, আর একদিকে বংশবিস্তার করিয়া অমরত্ব লাভের চেষ্টা করিতেছে। এই বর্ত্তমানের প্রয়াস এবং ভবিষ্যতের ভাবনা, এই আত্মরক্ষা করিয়া অমরত্ব-লাভের সাধনা—ইহাই জীবনের লক্ষণ। প্রকৃত সাহিত্য একদিকে যেমন নব নব যুগের চিন্তার ধারার সহিত আপনার নিহিত চিন্তার সামঞ্জস্য বিহিত করিয়া আপনাকে বাঁচাইয়া চলিয়াছে অন্যদিকে তেমনি ভাবুকের মনের সহিত সংঘর্ষে আসিয়া নূতন ভাবের উদ্ভাবনায় আত্ম-নিয়োগ করিয়া আপনাকে অমর করিয়া তুলিতেছে।

কাব্য প্রাণময় এবং কাব্য মনোময়। কাব্যের উপকরণকে আশ্রয় করিয়া একটি অভিপ্রায় ও উদ্দেশ্য ব্যক্ত হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া আছে। সেই অভিপ্রায়টি সার্থক করিবার জন্য কাব্যের মধ্যগত ভাবটি কোন এক সুনির্দ্দিষ্ট অর্থের সীমার মধ্যে বদ্ধ হইয়া থাকিতে চাহে না। এমনি করিয়া কাব্যের উদ্দেশ্যকে সিদ্ধ করিয়া তুলিতে কাব্যের অর্থ অনন্তের মধ্যে আপনাকে সম্প্রসারিত করিয়া দিতেছে। সুতরাং ভাব ও অর্থের দিক দিয়া কাব্য-সাহিত্যের পরিণতির সীমা না থাকিলেও, তাহা একটি অভিপ্রায়ের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। অতএব কাব্য মনোময়।

সাহিত্য প্রাণবন্ত। সাহিত্যকে যখন প্রাণবন্ত বলা হয়, আশা করা যায়, নিশ্চয়ই কেহ তখন তাহাকে ভালুক, শালিখ, সিন্ধু-ঘোটক অথবা শীল মৎস্য জাতীয় জীব বলিয়া মনে করেন না। ঐ সব ভগবানের জীবগুলির একটা প্রমান-নিরক্ষেপ জাগতিক জীবন আছে। সাহিত্যের সে জীবন সে ভাবগত আত্মিক, তাহার অস্তিত্ব শুধু মানুষের

মনে। মানুষের মন বস্তুটি না থাকিলেও সিন্ধু-ঘোটক অথবা শীল মৎস্য পরমানন্দে জল-ক্রীড়া করিত। কিন্তু তেমন অবস্থায় সাহিত্য জিনিস-টার আবির্ভাব কোনরূপেই সম্ভবপর হইত না; এবং জগতের উপর দয়াপরবশ হইয়া, সহসা বীণা-বাদন-বিরত দেবর্ষি নারদ পারিজাত পুষ্পের মত দু'একখানা ভাল বই যদি বা স্বর্গের লাইব্রেরি হইতে ছুঁড়িয়া ফেলিয়' দিতেন ত সেই অমর গ্রন্থগুলি জীবন-ধর্ম্মের প্রভাবে নিশ্চয়ই কোনো রকম অণ্ড প্রসব করিত না—এমন কি কুষ্মাণ্ডও নহে—এ কথা সাহস করিয়া বলা যায়।

কবিতাকে দুই দিক দিয়া বিচার করা চলে—এক তার ভাবের দিক দিয়া, আর এক তার রূপের দিক দিয়া। এই ভাব ও রূপ অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গের মিলনেই কাব্য সম্পূর্ণ, সুসঙ্গত, সজীব। যাঁহারা ভাবের ভক্ত তাঁহারা বলেন—কবি প্রধানত ভাবুক, ভাবই কবিতার প্রাণ ও আত্মা, এই আত্মা আপনিই আপনার রূপ নিয়ন্ত্রিত করিয়া লইবে, রূপের জন্য ভাবিবার প্রয়োজন নাই। যাঁহারা রূপের অনুরাগী, তাঁহারা বলেন—কবি প্রথমত কলাবিৎ, ভাব যেমনই হ'ক না কেন—গুরু হ'ক, লঘু হ'ক, গভীর হ'ক, আবেগময় হ'ক, দেখিতে হইবে কবি তাহার কাব্যের অন্তবর্ত্তী ভাবটিকে প্রকৃত রূপ, যথার্থ আকৃতি দিতে পারিলেন কিনা। এই গুণপনা, এই কলা-নৈপুণ্যেই কবির কবিত্ব। সাহিত্যে আর্টের গৌরব অস্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু যাহার জন্য আর্ট, দেখিতে হইবে কাব্যের অন্তর্গত সেই ভাবপুঞ্জের প্রকৃতি, শক্তি, প্রখরতা অথবা গাম্ভীর্য্য কিরূপ, দেখিতে হইবে নব-ভাব-সৃষ্টির ক্ষমতা কবির কতটা, দেখিতে হইবে মানব-জীব-নের কতগুলি রহস্য-কথা ভাব-কল্পনার আলোকসম্পাতে উজ্জ্বল হইয়া

উঠিল। ভাবের দিক দিয়া কাব্য একটি সৃষ্টি, আর্টের দিক দিয়া তাহা রচনা মাত্র। ভাব ও রূপের সামঞ্জস্যের মধ্যেই রসের পরিপূর্ণতা।

তাই, শকুন্তলা কবির এক পরম সুন্দর সৃষ্টি। কালিদাসের কল্পনা যেমন একদিকে বিরহের ভিতর দিয়া প্রেমের পরিণতি ও কৃতার্থতাকে কিশোরী ও যুবতী শকুন্তলায় মূর্ত্তিমতী করিয়া তুলিয়াছে, একখানি অতুলনীয় সঙ্গীতের মত তেমনি আবার নিতান্ত বাহুল্যহীন একটি পরিপূর্ণ সঙ্গতি সমগ্র নাটকখানিকে নিরুপম সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছে। আর্টের সুষমায় শকুন্তলার সমকক্ষতা লাভ করিতে পারে, এমন কাব্য অথবা নাটক আজ পর্য্যন্ত রচিত হয় নাই, এবং দ্বিতীয় কালিদাস না জন্মিলে যে রচিত হইবে এমন সম্ভাবনা নাই। সেক্সপীয়র সকল অবস্থায় রোমাণ্টিক, ক্ল্যাসিকের এই সমাহিত মহিমা সেক্সপীয়র কোনো দিন আয়ত্ত করিতে পারে নাই। সাধারণত কল্পনাকে 'কোমলে' রাখিয়া চলিতে পারেন বলিয়া 'কড়ি'তে উঠিবার সময় কালিদাসকে কোনো বিকট প্রয়াসের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় নাই।

কল্পনার বিপুলতায় অথবা আবেগের তীব্রতায় ভবভূতি কোন কোন স্থানে কালিদাসকে অতিক্রম করিয়াছেন, কিন্তু সমগ্রের সুষমায় ভবভূতি কোনদিন কালিদাসের নিকটবর্ত্তী হইতে পারেন নাই।

> বিনিশ্চেতুং শক্যো ন সুখমিতি বা দুঃখমিতি বা
> প্রমোহো নিদ্রা বা কিমু বিষবিসর্পঃ কিমু মদঃ।
> তব স্পর্শে স্পর্শে মম হি পরিমূঢ়েন্দ্রিয়গণো
> বিকারশ্চৈতন্যং ভ্রময়তি সমুন্মীলয়তি।

এমন একটি আবেগ-স্পন্দিত শ্লোক সারা মেঘদূতখানা তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলেও মিলিবে না। কিন্তু মেঘদূতের সমগ্রতার ভিতর দিয়া বিরহীজনের উৎকণ্ঠার যে অনুপম অনুভূতি প্রকাশ পাইতেছে, সুষমা এবং সৌকুমার্য্যে তাহা চির-মধুর।

অল্প পরিসরের মধ্যে কল্পনাকে ফুটাইয়া তুলিতে হয় বলিয়া গীতি-কাব্যের অনেক কবিতায় আমরা রসের পরিপূর্ণতা উপলব্ধি করি। বাঙ্গালায় 'উর্ব্বশী' ইহার এক শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। ভাবে, রূপে, উপমায়, রূপকে, শব্দ-সৌষ্ঠবে, চিত্র-সৌন্দর্য্যে 'উর্ব্বশী' অপূর্ব্ব। পুরুষের হৃদয়ের শাশ্বতী কামনা কবির কল্পনার ভিতর দিয়া কাব্যের আকাশ-পথে উর্ব্বশীরূপে আবির্ভূতা হইল।

"মুক্তবেণী বিবসনে, বিকশিত বিশ্ব বাসনার
অরবিন্দ মাঝখানে পাদপদ্ম রেখেছ তোমার
অতি লঘুভার!
অখিল মানস-স্বর্গে অনন্ত রঙ্গিনী
হে স্বপ্ন সঙ্গিনী!"

কিম্বা ইংরাজী হইতে আর একটি উদাহরণ লওয়া যাক। "The Raven" কবিতাটি মার্কিন-কবি Edgar Allan Poe-র একটি অপরূপ সৃষ্টি। জীবনের একান্ত নৈরাশ্যকে, কল্পনা কোন্ তিমির-সাগরের কূল হইতে আগত নিশীথ-অতিথি তামস-কৃষ্ণ পাখীটির রূপে মূর্ত্তিমন্ত করিয়া তুলিয়াছে। ভাব ও রূপের সামঞ্জস্যে এই ভয়ঙ্কর রসের কবিতাটি আশ্চর্য্য সার্থকতা লাভ করিয়াছে।

"And the raven, never flitting, still is sitting,
still is sitting,
On the pallid bust of Pallas, just above my
chamber door;
And his eyes have all the seeming of a demon's
that is dreaming,
And the lamp-light o'er him streaming throws
his shadow on the floor;
And my soul from out that shadow that lies
floating on the floor
Shall be lifted—nevermore!"

প্রাত্যহিক জীবনের প্রয়োজন, প্রয়াস, ক্লান্তি, কোলাহল, দ্বন্দ্ব, বিজিগীষার নিষ্পীড়নে কল্পনা ক্লিষ্ট, মূর্চ্ছিত, আবিষ্ট হইয়া পড়িয়া থাকে। গীতিকাব্যে হৃদয়ের আবেগ সেই কল্পনাকে জাগ্রত, জীবন্ত, সতেজ ও বেগবান করিয়া তোলে। উপন্যাসে অথবা মহাকাব্যে আবার ইহার বিপরীত দেখিতে পাই। সেখানে আবেগ কল্পনাকে উদ্রিক্ত করে নাই—জীবনের সহিত জীবনের সম্পর্ক এবং জীবনের উপর অবস্থা ও অন্তঃপ্রকৃতির প্রভাব কল্পনার ভিতর দিয়া কবির মধ্যে মানস-রূপ লাভ করিয়াছে এবং সেই কল্পনা-সঞ্জীবিত মানস-রূপ হৃদয়কে আবেগ-চঞ্চল করিয়া ভাবসৃষ্টির সহায়তা করিয়াছে। এমনি করিয়া আবেগ কখনো কল্পনাকে সচেতন করিয়া তুলিয়াছে, আবার কল্পনা কখনো হৃদয়াবেগের মধ্যে গতি সঞ্চার করিয়াছে। দৃষ্টান্ত

স্বরূপ 'In a Balcony' কবিতাটি লওয়া যাক। পুঞ্জীভূত গর্ব্ব ও সম্মানের ভিতর হইতে, প্রেমের আশার স্পর্শে জীবন্ত ও চঞ্চল হইয়া যে চির-বুভুক্ষু নারী-হৃদয় বিপুল আবেগে উচ্ছল ও প্রখর হইয়া উঠিল—সে নারী Browning-এর কল্পনার সৃষ্টি। কবিকেও আবেগপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে বলিয়া শুনিতে পাই—

"There is no good of life but love but love!
What else looks good, is some shade flung
from love;
Love gilds it, gives it worth. Be warned by me,
Never cheat yourself one instant! Love,
Give love, ask only love, and leave the rest!"

আবার গীতি-কাব্যের দিকে চোখ ফিরানো যাক। এক আবেগ-ময় অনুভূতি কবির কল্পনাকে আলোড়িত করিয়া তাহাকে দিব্য-দৃষ্টি দান করিয়াছে—চণ্ডীদাস গাহিতেছেন—

"পীরিতি মূরতি পীরিতি রতন
যার চিতে উপজিলা,
সে ধনী কতেক জনমে জনমে
যজ্ঞ করিয়াছিলা।
পীরিতি না জানে যারা
এ তিন ভুবনে জনমে জনমে,
কি সুখ জানয়ে তারা!"

কিম্বা—

"সই, পীরিতি বিষম মানি।
এত সুখে এত দুখ হবে বলে
স্বপনে নাহিক জানি।"

কল্পনা কাব্যের কতখানি যে সৌন্দর্য্য অধিকার করিয়া আছে—আমরা ইচ্ছা করিয়াই সে কথার আলোচনা করি নাই। কল্পনা সুন্দর ও অসুন্দরের ভেদ করে না। কিন্তু আশ্চর্য্য এই—কাব্যের সম্পর্কে আসিয়া কল্পনা সৌন্দর্য্য-চর্চ্চারই বিশেষ অবসর পাইয়াছে। কেননা কাব্য একদিকে যেমন সৃষ্টি আর একদিকে তেমনি আর্ট, এবং মানব-মনের সৌন্দর্য্য বৃত্তিকে চরিতার্থ করাই সমস্ত আর্টের উদ্দেশ্য। এই হেতু কল্পনার দিব্যদৃষ্টি কাব্যসম্পর্কে সৌন্দর্য্যের অন্বেষণ করিয়াই ফিরে। কিন্তু সত্য এবং সত্যকেই সম্পূর্ণরূপে নিরাকরণ করিয়া দেখা এবং দেখানো কল্পনার চিরদিবসের কাজ। কাব্যের দিক দিয়া, কল্পনা শুধু সৌন্দর্য্যের ভিতর সত্যের সন্ধান করে, প্রভেদ এই মাত্র। তাই বলিয়া সত্য যাহা তাহাই সুন্দর এবং সুন্দর যাহা তাহাই সত্য এ কথা বলিলে হয়ত ভুল করা হইবে। সত্য স্বয়ম্ভূ, স্বাধীনভাবে বর্ত্তমান, স্বপ্রকাশ, সে জ্ঞাতা, কর্ত্তা বা বিষয়ীর অপেক্ষা রাখে না। নিতান্ত আধ্যাত্মিকভাবে না ধরিলে, সৌন্দর্য্য কিন্তু দ্রষ্টা বা বিষয়ীর মনের উপর নির্ভর করে। বাস্তব জগতে ক্ষণিক এবং অস্থায়ী হইয়াও ভাব-জগতে সৌন্দর্য্য চিরন্তন আনন্দের কারণ হইয়াছে। ভাবের ভিতর সৌন্দর্য্যকে অমর করিয়া কাব্য নিজেও অমৃত হইয়া উঠিয়াছে। নারী সৌন্দর্য্য-ময়ী, চিরন্তন নারীকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া কবির যে কল্পনা লীলায়িত হইয়া উঠিয়াছে, বর্ণ, মাধুরী, সঙ্গীত,

পরিমল কোমলতায় তাহা অতুলনীয় হইয়া কাব্যে চরম সার্থকতা লাভ করিয়াছে।

এমনি করিয়া কল্পনা অন্তরকে দিব্যদৃষ্টি দান করিয়া দৃষ্টিকে সুদূর প্রসারিণী করিয়া, মন ও প্রকৃতির গোপন ভাণ্ডার আলোর স্রোতে উজ্জ্বল করিয়া পুরাতন ও পরিচিতকে অপরূপ বর্ণে মণ্ডিত করিয়া; নব নব বৈচিত্র্যের বিধান করিয়া এবং সমস্ত বৈচিত্র্যকে একটি সুষমায় সঙ্গত করিয়া, কখনো ভাবকে মূর্ত্তি দিয়া এবং কখনো বা বাস্তবকে ভাব-জীবনে রূপান্তরিত করিয়া—কাব্যকে অনির্ব্বচনীয় করিয়া তুলিয়াছে।

"পাও যদি খুঁজে কোথা অসীমের সীমা,
দেখিবে সেথায় আছে দাঁড়ায়ে প্রতিমা।"

কাব্যের মধ্যে অসীম সীমার সন্ধান পাইয়াছে। বিশ্বের অনন্ত রহস্য, তাই যুগযুগান্তর ধরিয়া, কাব্য-প্রতিমার অন্তর হইতে কখনো দিবসের মত উজ্জ্বল স্ফুটতায়, এবং কখনো বা সন্ধ্যা এবং স্বপ্নের মত সু-মধুর ব্যঞ্জনা ও বিচিত্র ইঙ্গিতে মুহুর্মুহু অভিব্যক্ত হইয়া পড়িতেছে।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

প্রজাস্বত্বের কথা

—:০:—

(৩)

বীরবলজী,

পূর্ব্ব পত্রে আমি দেখিয়েছি যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় প্রজার কাছ থেকে খাজনা বলে যা আদায় করবার কথা হয়, তার মধ্যে অনেকগুলি আবওয়াব ছিল। এগুলি আসল খাজনা নয়, কিন্তু নবাবী-গবর্ণমেণ্টের অমিতব্যয়িতার জন্য রাজকোষের শূন্য স্থান পূরণ করবার উপায়স্বরূপ অস্থায়ী কররূপে স্থাপিত হয়েছিল। প্রজা যখন এতে আপত্তি করলে, ইংরেজ-কোম্পানী প্রজাকে বললেন, যা হয়েছে তা হয়েছে, তার জন্য কিছু মনে কোরো না, নতুন আবওয়াব আর হবে না। এই আবওয়াব-সৃষ্টির বিবরণটা অনেক পুরাণো হয়ে গিয়েছে। আজকালকার প্রজা তা জানে না। তাদের সেটা স্মরণ করিয়ে দেওয়া আবশ্যক। ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে টোডর মল্লের বন্দোবস্ত হয়। তখন বাঙলা দেশের রাজস্বের পরিমাণ হয়েছিল ১,৪৯,৬১,৪৮৩ টাকা। এর মধ্যে কোন আবওয়াব ছিল না। ১৪০ বৎসর পরে ১৭২২ খৃষ্টাব্দে মুরশিদ কুলী খাঁ এর উপর একটি আবওয়াব যোগ করেছিলেন। সেটি হচ্ছে আবওয়াব খাস-নবিসী। রাজস্ব বিভাগের খাসনবিস এবং মুতঃসুদ্দীদের পার্ব্বণী দেবার জন্য এটা স্থাপিত

হয়েছিল। আর দিল্লীর বাদশাহ্-সরকারে একটা বার্ষিক নজর-আনা দিতে হত। এই দুটো মিলিয়ে মোট হত ২,৫৮,৪৫৭ টাকা। এই টাকাটা সমস্ত বাঙলা দেশের ভূ-সম্পত্তির উপর হারাহারি করে আদায় করা হত। চার বৎসর পরেই সুজা খাঁ এই বন্দোবস্তকে পাকা করে এর উপর আর চারটি আবওয়াব স্থাপন করেন। (১) নজর-আনা মোকররী (২) জার মাথট, (৩) মাথট ফিলখানা (৪) আবওয়াব ফৌজদারী। জার-মাথটের মানেটা একটু কৌতূহলজনক। জার মানে টাকা, মাথট কথাটা আরবী "মাৎ হেট" কথার অপভ্রংশ। এর অর্থ এই যে, শস্য-ক্ষেতের উপর দিয়ে অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে গিয়ে শস্য নষ্ট করবে না, এই অনুগ্রহের জন্য ক্ষেতের মালিককে কিছু দিতে হত। পশ্চিম অঞ্চলে কোন কোন স্থানে একে নজর-শওয়ারী বলত, কোন কোন স্থানে নালবন্দীও বলত। ব্যুৎপত্তিগত মানে এই হলেও, যার ক্ষেতের উপর দিয়ে অশ্বারোহী সৈন্য যেত না, তার কাছ থেকেও এটা আদায় করা হত, আর সকলের কাছ থেকেও আদায় করা হত। পুণ্যাহের দিন জমিদার যে তাঁর জমিদারীতে প্রতিষ্ঠিত থাকলেন, তার চিহ্নস্বরূপ তাঁকে একটা খেলাত দেবার প্রথা ছিল। সেই খেলাতের মূল্যটা এই থেকেই দেওয়া হত। আর মুরশিদাবাদে কেল্লার সম্মুখে গঙ্গার উপর পোস্তাবন্দী করবার ব্যয়টাও এই থেকে দেওয়া হত। অন্য তিনটি আবওয়াবের ব্যাখ্যা অনাবশ্যক।

সুজা খাঁর পরে আলিবর্দ্দী খাঁ আর তিনটি আবওয়াব স্থাপন করেন—(১) নজর-আনা মনসুরগঞ্জ, (২) আহুক (৩) চৌথ মারাঠা। আলিবর্দ্দীর প্রিয় দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌলা বাঙলার মসনদে আরোহণ

করবার পূর্ব্বে কিছুদিনের জন্য বিহারের শাসনকর্ত্তা হয়েছিলেন। সেই সময় আলিবর্দ্দী তাঁর স্থলবিহারের জন্য একটি প্রমোদ ভবন আর জলবিহারের জন্য একটি কৃত্রিম হ্রদ এবং একটি বাজার তৈরী করে দেন। প্রমোদ ভবনের নাম মনসুরগদী, হ্রদের নাম হীরাঝিল এবং বাজারের নাম মনসুরগঞ্জ। এই সকলের ব্যয় নির্ব্বাহ করতে একটা আবওয়াবের আবশ্যক হয়, তারই নাম নজর-আনা-মনসুরগঞ্জ। এর পরিমাণ ৫,০১,৫৯৭ টাকা। দ্বিতীয়টি দ্বারা মুরশিদাবাদের কেল্লা ও রাজবাড়ীর জন্য চুণ আনবার খরচ দেওয়া হত। এর পরিমাণ ১,৮৪,১৪০ টাকা। তৃতীয়টি বর্গীর হাঙ্গামা নিবারণের জন্য। হাঙ্গামা হুজ্জত করবার কষ্ট স্বীকার না করে, কিঞ্চিৎ নিয়ে বাঙলা দেশে বর্গীরা আর না আসেন সেইজন্য এটা উপহারস্বরূপ তাঁদের দেওয়া হত। এই কিঞ্চিতের মূল্য ১৫,৩১,৮১৭ টাকা!

মীরকাসিম এর উপর আর চারিটি আবওয়াব স্থাপন করেন—(১) কেফায়েৎ হস্তবুদ (জমা বেশি) (২) কেফায়েৎ ফৌজদারান্ (ফৌজদারী রাজকর) (৩) সায়রাৎ (শুল্কাদি) (৪) তৌজির জায়গীরদারান (জায়গীর মহলের বর্দ্ধিত আয়)। এই সকল আবওয়াবের দ্বারা মীরকাসেম ১,১০,৩৬,০৫৮ টাকা রাজস্ব বাড়িয়েছিলেন! নায়েব সুবাদার রেজা খাঁ এর উপরে আরও কিছু বাড়িয়ে ছিলেন। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী যখন দেওয়ানী নেন তখন বাঙলার রাজস্ব তিন কোটিরও উপর। এর মধ্যে অবশ্য উপরোক্ত আবওয়াবগুলি সবই ছিল।

দেওয়ানী নেবার ছ-মাস পরেই (১৭৬৬ সালের এপ্রিল মাসে)

টাকার উপর। ১৯০০ সালের বাঙলার ভূমি রাজস্বের পরিমাণ সরকারী হিসাব অনুসারে—

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তী জমির	...	৩,২৩,২২,৬১৭
অস্থায়ী বন্দোবস্তী জমির	...	৩৪,২৩,২৬৭
খাস মহলের	...	৪১,০৪,৭৫৩
	মোট	৩,৯৮,৫০,৬৩৭

রেভেনিউ বোর্ডের ১৮৯৯-১৯০০ সালের সেস রিপোর্ট-(Cess Report) অনুসারে বাঙলা বিহার ওড়িষ্যার প্রজার নিকট জমিদার যে খাজনা আদায় করেছিলেন তার পরিমাণ সাড়ে ষোল কোটী টাকা, আর এর মধ্যে উপরে দেওয়া হিসাব অনুসারে গভর্ণমেণ্ট পেয়েছেন প্রায় চার কোটী টাকা, অর্থাৎ—চার কোটী টাকা আদায় করতে গবর্ণমেণ্ট জমিদারকে কমিশন দিয়েছেন সাড়ে বার কোটি টাকা! অথচ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় ধরে নেওয়া হয়েছিল যে, প্রজার কাছে যে খাজানা আদায় হবে তার শতকরা ৯০ টাকা পাবেন গবর্ণমেণ্ট আর ১০ টাকা পাবেন জমিদার। অর্থাৎ—জমিদারের যেখানে পাওয়া উচিত ছিল ৪০ লক্ষ সেখানে তিনি পাচ্চেন সাড়ে বার কোটি! (Land Revenue policy of the Indian Government, published by order of the Governor-General of India in Council, 1902) অর্থাৎ—রাজাকে যা দেওয়া উচিত গরীব প্রজা তার ত্রিশগুণ দিচ্চে! এবং গত দেড়শ' বৎসর ধরে এই রকম দিয়ে আসচে! তার মোট দেওয়াটা হয়েছে আঠার শ' কোটী!! আর যখন কৃষকের ক্লেশ নিবারণের জন্য, কৃষিকার্য্যের উন্নতির জন্য, ম্যালেরিয়া কলেরার

প্রতিকারের জন্য, বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার প্রতিষ্ঠার জন্য, ব্যবস্থাপক সভায় বৎসরের পর বৎসর আবেদন নিবেদন করা হয় তখন কর্ত্তৃপক্ষ অম্লান বদনে বলেন, আমাদের দুঃখে তাঁদের সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে, কিন্তু রাজকোষে অর্থ নাই! কৃষকের অবস্থা ও তার প্রতি জমিদারের ব্যবহার গবর্ণমেণ্ট বেশ জানেন, কারণ, গবর্ণমেণ্টই বলেছেন "as regards the condition of cultivators in Bengal who are the tenants of the landowners instituted as a class in the last century by British Government, there is still less ground for the contention that their position owing to the Permanent Settlement has been converted into one of exceptional comfort and prosperity. It is precisely because this was not the case and because, so far from being generously treated by the Zaminders, the Bengal cultivator was rack-rented, impoverished and oppressed, that the Government of India felt compelled to intervene on his behalf and, by the series of legislative measures that commenced with the Bengal Tenancy Act of 1859 and culminated in the Act of 1885 to place him in the position of greater security which he now enjoys. ("Land Revenue Policy of the India Government, 1902"). ঐ পুস্তিকাতেই আবওয়াব সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট বলেছেন "The subject is one to which

মুরশিদাবাদে কোম্পানীর প্রথম পুণ্যাহ হল। নবাব নজম উদ্দৌলা মসনদে আসীন। দক্ষিণে দেওয়ান-কোম্পানীর প্রতিনিধি ক্লাইব। দেশের আমীর ওমরাহ্, জমিদারগণ যথাযথ স্থানে আসন গ্রহণ করেছেন। সকলেই নজর দিলেন, খেলাত পেলেন। অনেক টাকা আদায় হল। তার মধ্যে এক কোটি চল্লিশ লক্ষ আদায়ের সংবাদ বিলেতে গেল। অন্যান্য আমোদ প্রমোদেরও ত্রুটি হয় নি। এইরূপে মহাসমারোহে কোম্পানীর প্রথম পুণ্যাহ সম্পন্ন হয়ে গেল। কোম্পানীর অংশীদারেরা শতকরা ১২॥৹ টাকা লাভ পেলেন। কোম্পানীর এই আশাতিরিক্ত সমৃদ্ধিতে বৃটিশ-গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি পড়ল। প্রজার একটু অবস্থা ভাল হলেই রাজার নেক নজর পড়ে থাকে। সুতরাং ১৭৬৯ সালে পার্লামেণ্টের এক আইন দ্বারা কোম্পানীর কাছ থেকে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ৪০ লক্ষ টাকা আদায় করে নিলেন। বৃটিশ রাজকোষে ভারতীয় রাজস্বের বোধ হয় এই প্রথম প্রবেশ।

কোম্পানীর পুণ্যাহ কিন্তু দেশের পক্ষে মহাপাপ হল। এক মাস না যেতে যেতেই নবাব নজম উদ্দৌলার নবাব-লীলা সাঙ্গ হল। বসন্ত রোগে তাঁর মৃত্যু হল। তার কিছু দিন পরেই দেশে অনাবৃষ্টি হল। শস্য জন্মাল না। প্রজার ঘরেও কিছু সঞ্চিত ছিল না, আব-ওয়াব দিতে দিতে প্রজা নিঃস্ব হয়ে পড়েছিল। ১৭৭০ সালে দুর্ভিক্ষ হল। সেটা বাঙলা ১১৭৬ সাল। এই সালের নাম অনুসারে এই দুর্ভিক্ষ "ছেয়াত্তরে মন্বন্তর" বলে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। এমন দুর্ভিক্ষ দেশে আর কখন হয় নি। অসংখ্য লোকে অনাহারে মরে গেল। যারা বেঁচে থাকল তাদের মধ্যে অনেকে দেশ ত্যাগ করে পালিয়ে গেল।

দেশের সে দুরবস্থার সবিস্তার বর্ণনা এখানে স্থানোচিত হবে না। কৌতূহলী পাঠক সবিশেষ বিবরণের জন্য Hunter's Annals of Rural Bengal-এ দেখতে পারেন। নবাবী আমলের আরম্ভে সুবাদারী ফরমানে দিল্লীর সম্রাট বাঙলা দেশকে "জেন্নেৎউল বিলেত" অর্থাৎ—পৃথিবীতে স্বর্গতুল্য বলে বর্ণনা করেছিলেন। আর সেই নবাবী আমলের শেষে সেই বাঙলার এই শোচনীয় পরিণাম! সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বাঙলা মহা শ্মশানে পরিণত!!

কিন্তু আমি বোধ হয় আমার মূল বিষয় থেকে একটু দূরে এসে পড়েছি। মূল কথাটা আমার এই যে, এখন জমির খাজানা বলে কৃষক যা দেয় তার মধ্যে এই আবওয়াবগুলি সমস্তই আছে, কিন্তু এমন ভাবে লীন হয়ে আছে যে, স্বতন্ত্র ভাবে আর তাদের চেনা যায় না। সে সিরাজ নাই, মনসুরগন্দী নাই, সে হীরাঝিল নাই, কিন্তু নজর-আনা মনসুরগঞ্জ আছে। সে নবাব নাই, নবাবের সে হাতীশালা নাই, কিন্তু মাথট ফিলখানা আছে। সে সাবেক খাসনবিস নাই, তাদের পার্ব্বনীও আর দিতে হয় না, কিন্তু নজর-আনা-খাসনবিসী আছে। বাঙালার খোকারা, তথা খোকাদের পিতা পিতামহেরা ঘুমিয়ে পড়লেও বর্গী আর দেশে আসে না, কিন্তু চৌথ মারাঠা এখনও আদায় হচ্চে। অন্য অন্য সকল আবওয়াবই আদায় হচ্চে। তবে কাউকেই আর চিনতে পারা যায় না। এখন তারা নামোপাধি ত্যাগ করে আপন আপন স্বতন্ত্র সত্ত্বা খাজানার মহাসত্ত্বায় বিলীন করে দিয়েছে।

এখন একবার তখনকার রাজস্বের সঙ্গে এখনকার রাজস্বের তুলনা করে দেখা যাক। ১৭৬৫ সালের, অর্থাৎ—কোম্পানীর দেওয়ানী নেবার বৎসরের হিসাবে দেখা গিয়েছিল বাঙলার রাজস্ব ছিল তিন কোটি

the friends of the ryot might appropriately devote their concern and in which their exertions might be of much use in supplementing the opposition of Government to a wholly illegimate form of exaction." এর থেকে বেশ বোঝা যায় যে, গবর্ণমেণ্ট জমিদারের অবৈধ কর আদায়ের বিরোধী এবং তার নিবারণকল্পে চেষ্টাও করে থাকেন, কিন্তু রায়তবন্ধুরা এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টকে যথোচিত সাহায্য করেন না। কথাটা অনেক পরিমাণে ঠিক। দেশে যখন প্রথম প্রথম ব্যবস্থাপক সভা হল তখন তাতে প্রজা-প্রতি-নিধির ত কথাই নাই, প্রজাহিতৈষীরও অত্যন্ত অভাব ছিল। অপর পক্ষে প্রবল জমিদারের প্রতিনিধির অসদ্‌ভাব ছিল না। তার উপর জমিদার সভা, জমিদারের সংবাদপত্র প্রভৃতি ত আছেই। এঁদের বিরুদ্ধাচরণের জন্যই বিধিব্যবস্থার দ্বারা যতটা হওয়া উচিত ছিল প্রজার ততটা হিত হয় নি। গবর্ণমেণ্ট সেই জন্য আক্ষেপ করে বলেছেন যে, প্রজার অবস্থার উন্নতি করবার চেষ্টায় প্রজাবন্ধুদের সহযোগিতা পাবার সৌভাগ্য গবর্ণমেণ্টের ঘটে নি—'The Government of India will welcome from their critics upon future occasions a co-operation in these attempts to improve and to safeguard the position of the tenant which they have not hitherto, as a rule, been so fortunante as to receive." (Land Revenue Policy of the Indian Government 1902, Page 10), এখন আমাদের সংস্কৃত পুনর্গঠিত ব্যবস্থাপক সভায় যাঁরা নবজীবনের

মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে প্রবুদ্ধ ভারতের প্রতিনিধিত্ব করতে যাবেন, তাঁরা গবর্ণমেণ্টের এই আক্ষেপ দূর করবেন আমরা এই আশা করি।

কিন্তু একটা বিষয় আমাদের সাবধান হতে হবে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তটা ভেঙ্গে দিতে গবর্ণমেণ্টের আপত্তি নাই। কিন্তু তার স্থানে তাঁরা যা চান তা আরও ভয়ানক। তাঁরা চান তাঁদের এমন ক্ষমতা থাকবে যা দ্বারা আবশ্যক হলে সময়ে সময়ে তাঁরা খাজানা বৃদ্ধি করতে পারবেন। বলা বাহুল্য আমরা সেটা একেবারেই চাই না। আমরা চাই বর্ত্তমান খাজানার মধ্যে যে সকল আবওয়াব আছে সে গুলিকে বাদ দিয়ে খাঁটি খাজানা যা থাকবে প্রজাকে কেবল তাই দিতে হবে, এই রকম পাকা বন্দোবস্ত হোক। আর সেই পাকা বন্দোবস্তটা সাক্ষাৎভাবে প্রজার সঙ্গে হোক। গবর্ণমেণ্ট আর প্রজার মধ্যবর্ত্তী কেউ থাকবে না। সম্প্রতি চীনদেশে এই ব্যবস্থা হয়েছে। প্রজা তার দেয় খাজানাটি একবারে গবর্ণমেণ্টের কাছে পাঠিয়ে দেয়। আমাদের দেশেও তাই করতে হবে। এখন আমরা গবর্ণমেণ্টের খাজানা-খানায় একটি টাকা পোঁছে দেবার জন্য মধ্যবর্ত্তী জমিদারকে তাঁর পারিশ্রমিক স্বরূপ আর তিনটি টাকা দিই। এমন ব্যবস্থা পৃথিবীর আর কোথাও নাই। জমিদারের এই অযৌক্তিক অন্যায়, অবৈধ লাভটা কৃষির ও কৃষকের উন্নতির জন্য পূর্ত্তকার্য্যে, শিক্ষা-দানে, স্বাস্থ্য-বিধানে ব্যয় করা হবে। তবে আবার সেই প্রাচীন কালে সরস্বতী-তীরে ব্যাসদেব ঋষি দেবতার কাছে যে প্রার্থনা করেছিলেন—

মধুমতী রোষধীর্দ্যাব আপো-মধুমন্
নো ভবত্বন্তরীক্ষং।

ক্ষেত্রস্য পতি র্মধুমান্ নো অস্তরিষ্যন্তো

অন্বেনং চরেম ॥ ঋগ্বেদ ৪।৫৭।৩

শস্যসমূহ আমাদিগের জন্য মধুযুক্ত হউক, দ্যুলোকসমূহ জলসমূহ ও অন্তরীক্ষ আমাদিগের জন্য মধুযুক্ত হউক, ক্ষেত্রপতি আমাদিগের জন্য মধুযুক্ত হউন। আমরা অহিংসিত হইয়া তাঁহাকে অনুসরণ করিব।

শুনং বাহাঃ শুনং নরঃ

শুনং কৃষতু লাঙ্গলং।

শুনং বরত্রা বধ্যন্তাং

শুন মষ্ট্রামুদিং গয় ॥

ঋগ্বেদ ৪।৫৭।৪

বলাবর্দ্দসমূহ সুখে বহন করুক, মনুষ্যগণ সুখে কার্য্য করুক, লাঙ্গল সুখে কর্ষণ করুক। প্রগ্রহসমূহ সুখে বদ্ধ হউক এবং প্রতোদ সুখে প্রেরণ কর। (রমেশচন্দ্র দত্তের অনুবাদ)

তা সফল হবে আর আমাদের দেশ হবে—

যত্রানন্দাশ্চ মোদাশ্চ মুদঃ প্রমুদ আসতে।

কামস্য যত্রাপ্তাঃ কামস্তত্র মামমৃতং কৃধি ॥

ঋগ্বেদ ৯।১১৩।১১

যথায় বিবিধ প্রকার আমোদ আহ্লাদ আনন্দ বিরাজ করিতেছে, যথায় অভিলাষী ব্যক্তির তাবৎ কামনা পূর্ণ হয়, তথায় আমাকে লইয়া অমর কর। (রমেশচন্দ্র দত্তের অনুবাদ)

তখন বাঙলা আবার সোনার বাঙলা হবে! গোলাভরা ধান, গোয়ালভরা গরু, ফুলফলভরা গাছ নিয়ে লক্ষ্মী ঘরে ঘরে বিরাজ করবেন। ইতি

চাতরা, হাজারিবাগ
১৭ই শ্রাবণ, ১৩১৭,

শ্রীহৃষীকেশ সেন

রমণী

—:*:—

ঊর্দ্ধ হ'তে ঊর্দ্ধলোকে—আরো ঊর্দ্ধলোকে
লয়ে চল, হে কল্যাণি! আঁখির আলোকে
গ্রীবার হেলনে, কৃষ্ণ কুন্তলের দোলে,
কিঙ্কিণীর কঙ্কনের ঠিনি ঠিনি বোলে
স্বপ্ন রচি' আঁখি-আগে দূর অজানার,
ভরি' দাও দীন বক্ষ—ভোগ কামনার
অন্ত হোক্ এ পৃথ্বীর; নূপুরের তালে,
দূর দিগন্তের গায়ে নভ ভালে ভালে
স্পষ্ট কর জীবনের পরম বিরহ,
সুপ্ত জন্ম জন্মান্তর। দীন অহরহ
যেই জন পরি' ছিল ধরার বন্ধন,
চিত্তে তার ভরি' দিয়া চরম স্পন্দন,
হে কল্যাণি! তব দুটি আঁখির আলোকে
লয়ে চল ঊর্দ্ধ হ'তে আরো ঊর্দ্ধলোকে।

(২)

বিদ্রোহের কণ্ঠে আজি করি অস্বীকার—
নহ নহ নহ তুমি কাম-কামনার,
হে রমণি ; বক্ষ-ঘেরা সৌন্দর্য্য নিবিড়
নহে নহে নহে কভু দুরন্ত ভোগীর
সুপ্ত পশু জাগাইতে ; বলয় নিক্কণ
আজি মোর চক্ষে আনে সুদূর স্বপন,
যেন কোন্ অতি দূর দূর অতীতের
বিস্মৃত সঙ্গীত সনে ; আঁধারের ঘের
মোর রুদ্ধ বক্ষ হ'তে—গ্রীবার হেলন,
চূর্ণিত কুন্তল তব, বাহুর দোলন,
নিমেষে খসায়ে নেয় ; মোর মর্ম্মতল
অনন্তের গীত শোনে, ধরি' তব ছল।
বিদ্রোহের কণ্ঠে তাই করি অস্বীকার—
নহ নহ হে রমণি, কাম-কামনার।

(৩)

তোমার দেহের স্পষ্ট ললিত ভঙ্গিমা
চক্ষে মোর লুপ্ত করে ধরিত্রীর সীমা,
যাদুকরী। বক্ষ 'পরে দোলা স্বর্ণহার,
কোথা মোরে দেয় দোলা আকাশের পার

কোন্ তারাদীপ্ত লোকে ; আষাঢ়-গগনে
আমার মিলন জাগে পুঞ্জ মেঘসনে,
তোমার আঁখির দুটি কৃষ্ণ তারকায়
আষাঢ়ের মেঘসম ; বসন্ত-সন্ধ্যায়
তোমার তনুর দীপ্ত বরণ উচ্ছ্বাসে
আমি মোরে পাই মুক্ত অনন্ত আকাশে
সান্দ্র কৌমুদীতে ভরা ; কুন্তলের ঘ্রাণ
সিন্ধুসম করি' তোলে মোর এ পরাণ।—
যাদুকরী! তব গর্ব্ব তনুর তনিমা
চক্ষে মোর মোছে স্থূল ধরিত্রীর সীমা।

(৪)

আরো কি যে চাই—আমি আরো কি যে চাই—
তোমারে নেহারি' বুকে স্পষ্ট করে পাই,
হে রমণি! তব প্রতি অঙ্গের রেখায়,
মূর্ত্তিমান হ'য়ে যেন কার তুলিকায়,
সমাপ্তিবিহীন এক অবিরাম সুর
নীরবে ঝঙ্কারে ; দূর—দূর—অতিদূর,
তোমার লাবনি যেন অসীমে মিশায়
প্রসারিত দিকে দিকে আকাশের গায় ;
কত যেন অতীতেরে, কত ভবিষ্যত
আলিঙ্গনি' ধায়', তাই মোর মনোরথ

পরমের বেদনায় চরম চঞ্চল,
প্রতিক্ষণে ছিন্ন করে' ধরার শৃঙ্খল।
হে রমণি! যে সঙ্গীত বক্ষে নাহি ফোটে,
তোমার ইঙ্গিতে চোখে স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে।

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

র‍্যাস্কেল

—:•:—

স্কুলে যাবার পথে মোহিতের সঙ্গে দেখা। সে কাল সার্কাস দেখতে গিয়েছিল—কি দেখলে সেই গল্পই আমার কাছে বলছিল।

গল্পের মাঝখানে হঠাৎ থেমে সে আমায় জিজ্ঞাসা করলে, আমি এবছর সার্কাস দেখেছি কি না। আমি মোটেই সার্কাস দেখিনি শুনে সে অত্যন্ত আশ্চর্য্য হয়ে গেল এবং গাঢ় সহানুভূতির সুরে শেষে বলল—আচ্ছা যদি তুই পথ চলতি কারুর কাছে ভোগা দিয়ে অন্তত চারটে পয়সা আদায় করতে পারিস তবে বিকেলে আমি তোকে সার্কাসে নিয়ে যাব।

—ঠিক নিয়ে যাবি ?

—এই সরস্বতী ছুঁয়ে বলচি—

—আচ্ছা তাহলে তুই ওপারে যা—দেখিস কিন্তু—

মোহিত রাস্তার অন্যদিকে চলে গেল। যাবার আগে আমার পকেটে কিছু আছে কি না টিপেটুপে দেখে গেল।

চলতে চলতে শেষে একটি নিরীহগোচের ভদ্রলোককে সামনে পেয়ে আমি বললাম—একটা আনি আছে মশাই, দিতে পারেন ?

ভদ্রলোকটি থমকে দাঁড়ালেন। পরে আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে বললেন—কেন বলত ?

—মা একটা আনি দিয়েছিলেন, ফিরে যাবার সময় মাছ কিনে নিয়ে যাবার জন্য সেটা আর খুঁজে পাচ্চিনে পকেটে—

—পড়ে গিয়েচে কোথায় পথে—

—কিন্তু কোথায় পড়বে, সমস্ত পথ আবার খুঁজে আসচি এই—

হাসতে হাসতে ভদ্রলোকটি বললেন—কি ছেলেমানুষ তুমি, একটা ছোট আনি কোথায় পড়েচে তা কি খুঁজে পাওয়া যায় কলকাতার রাস্তায় ?

—কিন্তু আনিটা যে হারিয়ে গিয়েচে মা একথা বিশ্বাস করবেন না।

—কেন ?

—তিনি মনে করবেন আমি চুরুট খেয়েচি।

—তুমি চুরুট খাও না কি ?

—আগে খেতাম, এখন আর খাই নে।

—তবে কেন মা ভাববেন তুমি চুরুট খেয়েচ ?

—তিনি বিশ্বাস করবেন না আমার কথা।

—তুমি মিথ্যা কথা বল তাহলে ?

—মা'র সামনে বলি নে।

—ঠিক বলচ ?

—এই বই হাতে করে বলচি।

—তাহলে তোমার কথা বিশ্বাস করবেন না কেন ?

—তা জানি নে—

—কিন্তু কেমন করে জানলে যে বিশ্বাস করবেন না ?

—একবার করেন নি—

—তাহলে তুমি আরও অনেকবার এই রকম পয়সা হারিয়েচ ?

—আর একবার হারিয়েচি।

—কিন্তু বারবার পয়সা হারানো ত ভাল নয়।

—তাই ত আপনার কাছে চাচ্চি—

—কিন্তু রাস্তার লোকের কাছে এরকম করে পয়সা চাওয়া, সে যে আরো খারাপ—এ যে ভিক্ষে করা।

—কিন্তু আমি ত ভিক্ষে করচিনে—

—এই ত ভিক্ষে করা। কোন্ ক্লাশে পড় তুমি ?

—ফোর্থ ক্লাশে।—বলে আমি চলে যাচ্ছিলাম, কারণ দেখছিলাম বড়ই বেগতিক, আর হাসিও চাপতে পারছিলাম না মনে মনে। কিন্তু ভদ্রলোকটি আর কিছু না-জিজ্ঞাসা করে আমার হাতে একটি দুয়ানি দিয়ে বললেন, "এই নাও একটা দুয়ানি আছে কিন্তু এমন কাজ আর করো না—ভদ্রলোকের ছেলে তুমি"। আমি তাঁকে নমস্কার জানিয়ে হাসতে হাসতে মোহিতের কাছে গিয়ে সেই দুয়ানি দেখালাম; কিন্তু সে এমনি রাস্কেল যে, আমায় সার্কাসে নিয়ে যেতে চাইলে না।

শ্রীপ্রবোধ ঘোষ

বিলাতের পত্র

—— ঃ*ঃ ——

ব্লুম্‌জ্‌ব্যরিতে আমাদের ছাত্রাবাস। এই পাড়াটী আজকাল লণ্ডনের ছাত্রদের কেন্দ্রস্থল হয়ে দাঁড়িয়েছে। শহরের মাঝখানে এই পাড়া; এর এক বাজুতে ইউনিভার্সিটী কলেজ, আর এক বাজুতে কিংস্‌ কলেজ; এ ছাড়া আরো অনেক শিক্ষার আয়তন এই অঞ্চলে আছে। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিস্তর ছাত্র এই পাড়ায় বাসা ক'রে থাকে। পারিসে যেমন শিক্ষার্থিদের পাড়াহিসেবে লাটিন কোয়ার্টারের নাম, অনেকে মনে করেন লণ্ডনে ব্লুম্‌জ্‌ব্যরি তেমনি হ'য়ে উঠ্‌বে। কলকাতায় পটলডাঙ্গা গোলদীঘি অঞ্চল যেমনি। ব্রিটিশ মিউজিয়ম আমার ঘর থেকে দেখা যায়। ব্রিটিশ মিউজিয়মের পিছনে অনেকটা খালি জমি পড়ে আছে, অনেক জায়গায় অস্থায়ী ঘর হ'য়েছে, সেগুলো ভেঙ্গে জমি করা সহজ; দূর সাউথ কেন্‌সিংটন্‌ থেকে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় উঠিয়ে এনে ব্রিটিশ মিউজিয়মের পিছনে বাড়ী ক'রে বসাবার কথাও নাকি হ'চ্ছে; তা হ'লে এ পাড়াটা পূরোপূরি ইউনিভার্সিটীর ছেলেদের বসতি হয়ে যায়। কিন্তু সে বোধ হয় দূরের কথা।

আমাদের ছাত্রাবাসে আমরা আছি প্রায় পঁয়তাল্লিস জন ছেলে। আমি একা ভারতবাসী। বাকী সব নানা দেশের। ইংরেজ অবশ্য বেশী। এক জন মিসরী—কপ্‌টি খ্রীষ্টান;—একজন গ্রীক, জন সাতেক

রুমানীয়ান; জন তিন সার্বিয়ান তা ছাড়া আছে ফরাসী ইটালিয়ান, সুইস রুষ। প্রায় সবাই ছাত্র।

লণ্ডনের বোর্ডিং হাউস-এ তিনমাস কাটালুম। দেখলুম যে বোর্ডিং হাউস-এর চেয়ে এখানে দেখবার শোনবার সুযোগ বেশী। এক ওয়াই. এম্. সী. এ. রিক্রিয়েশন্ ক্লাব কাছে আছে, সেখানে মেয়েরা আসে। কলেজের ছাত্রী বেশীর ভাগ, হপ্তায় দু'দিন ক'রে নাচ হয়—আমাদের হোস্‌টেলের ছাত্রেরা অনেকেই যায়। এরা আমায় একদিন নিয়ে যায়, তার পর এদের দলে থেকে মাঝে মাঝে যাই। এই ক্লাবে আর নাচের মজ্‌লিসে ইংরেজ-সমাজের একটা মস্ত দিকের সঙ্গে পরিচয়ের সুবিধা পেয়েছি।

বোর্ডিং হাউস্-এর জীবনের পুনরাবৃত্তি করবার ইচ্ছে আপাতত নেই—যদি খুব ভদ্রঘর পাই তো আলাদা কথা। লণ্ডনে পৌঁছুলুম রেল্‌ওয়ে ষ্ট্রাইকের মুখে, গত সেপ্টেম্বার মাসের শেষে। আমাদের লণ্ডনে আগমনটা হ'য়ে ছিল একটু নোতুন রকম ক'রে। মার্সেল্‌সে আমাদের জাহাজ লাগতে বিস্তর সহযাত্রী সতীর্থ নেমে গেল; আমরা বরাবর জাহাজে ক'রেই এলুম, কিন্তু জিব্রাল্টার দেখার লাভ ছাড়া আর কিছু প্রলোভনীয় ছিল না, যাতে জাহাজে আর এক হপ্তা কারাযন্ত্রণা সহ্য করা যেত। যাক, জনকতক আমরা র'য়ে গেলুম। প্লিমাথে নামতে দিলে না; কাগজ পাওয়া গেল, তাতে পড়লুম যে রেলওয়ে ষ্ট্রাইক আপাতত স্থগিত রইল। পরের দিন লণ্ডনে পৌঁছুল আমাদের জাহাজ, মহা উৎসাহ ক'রে মালপত্র বেঁধে ষ্টুয়ার্ডদের বক্‌শিশ চুকিয়ে দিয়ে উপরে উঠ্‌লুম—জাহাজ গ্রেভ্‌সেণ্ডে এসে থেমে গেল। একটা খবর এসে আশঙ্কার ঝড় বইয়ে দিলে—ভীষণ ব্যাপার।

রেল-ষ্ট্রাইক, ভয়ানক গোলমাল বাধ্‌বে। সরকারী লোক এসে আমাদের পাসপোর্ট দেখে গেল, মনে হ'ল এবার সুরাহা হবে। সাত হাজার মাইল এসে লণ্ডনের দোয়ার গোড়ায় এরকম ভাবে আট্‌কে গিয়ে ভারী বিরক্তি ধ'রে গেল। অনেকের আত্মীয় স্বজন নৌকা আর লঞ্চ নিয়ে এল, সব মহা ফুর্ত্তিতে চ'লে গেল। এতে আমরা যারা প'ড়ে রইলুম তাদের মেজাজটা আরও দমে যেতে লাগ্‌ল। আমরা কতকগুলি ভারতবাসী ছাত্র, আর কতকগুলি ইংরেজ। বাঙালী যে ক'জন ছিলুম, কি করা যায় পরামর্শ আঁটতে লাগলুম। ডাঙায় নামলে লণ্ডন অবধি যেতে পারবো কি না সন্দেহ ছিল; রেল চ'লছে না, ট্রাম আর বাস্‌ও নাকি বন্ধ হ'য়েছে বা হ'ল ব'লে শোনা যেতে লাগ্‌ল। তার উপর দাঙ্গা ফেসাদের ভয়। ক'দিনে ব্যাপার মিটবে তা জানা যাচ্ছে না; দু'রাত্তির ডাঙার ধারে জাহাজে কারা-বাসের পর আর থাকবো না ঠিক করলুম। জাহাজের এক ইংরেজ মেট্‌কে জিজ্ঞাসা করলুম—"কিহে, ব্যাপার কি রকম? রলি চুরি ডাকাতি মারামারি হবে না তো?" মেট্‌ ব'ল্‌লে, "মারামারি তো সামান্য কথা, রেভলিউশন হবে।" বড় আশাপ্রদ কথা মনে হ'ল না। বন্ধু ব—ছেলে মানুষ। মেট্‌-কে একটু কাতর ভাবে বল্‌লেন—"কিন্তু বোধ হয় ইংরেজ-কুলী লুটপাট শুরু ক'রলেও নিরীহ বিদেশীর গায়ে হাত তুল্‌বে না"—ইংরেজ কুলীর নৈতিক উৎকর্ষে বন্ধুর অসীম বিশ্বাস! মেট্‌টী হ'চ্ছে একটী আন্‌কোরা সোশালিষ্ট; সে একটু উৎসাহিত হ'য়ে ব'ল্‌লে, "লুট্‌পাট্‌, চুরীডাকতি—এ তো আক্‌ছার ভদ্রলোকে বড়মানুষে ক'রছে! আমায়, আর আমার মত গরীব লোককে খাটিয়ে মারছে, আর আমাদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজকার করা কড়ি

—আমাদের হক—মুখ থেকে কেড়ে নিয়ে বাবুয়ানী ক'রছে। ইংলণ্ডের জন-মজুর আমরা, আমরা দেখিয়ে দেবো যে আমরা ম'রে নেই।" তা তো হ'ল; আমরা এখন করি কি? দ—ব'ল্লেন—"ভায়া হে, সমুদ্র পেরিয়ে কি শেষটা কুলে এসে প্রাণ দেবে? র'য়ে যাও, দুচার দিন বইত নয়—বোঝার উপর শাকের আঁটি।" কিন্তু জি—ঠিক করলেন তিনি আর থাকবেন না—তিনি বেরিয়ে প'ড়বেন। প্রাণ যাক্ বা থাক্, কারণ দেরী হ'লে তাঁর কলেজে ভর্ত্তি হওয়া হবে না, দিন উৎরে যাবে। তাঁর এই ভীষণ পণ শুনে ব—আর আমি মহা উৎসাহ ক'রতে লাগলুম। জি—for ever! কুলে অবতরণ করে, গ্রেভ্‌সেণ্ড্ থেকে যদি ট্রাম কি বাস্ মেলে তো তাতে ক'রে, নয় মোটর ভাড়া ক'রে লণ্ডনে যাবো ঠিক হ'ল। গ্রিণ্ডুলে কোম্পানীর লোক ছিল জাহাজে—সব ভারী মাল ট্রাঙ্ক প্রভৃতি তার কাছে সঁপে দিলুম—আর সপ্তাহখানেকের মত কাপড়চোপড় আর দরকারী জিনিস একটা মস্ত কিট্-ব্যাগ ছিল তাতে পুরে নিলুম। তার পর আমাদের তিন মূর্ত্তিকে ডাঙায় নামিয়ে দেবে, 'এমন নেয়ে আছে কোন্ নায়' দেখতে লাগলুম। এক নৌকাওলাও জুটে গেল; জন পিছু সাত শিলিঙ ছ' পেন্স নিয়ে আমাদের গ্রেভ্‌সেণ্ডের জেটিতে তুলে দিলে। নৌকোয় উঠবার সময় আমাদের এই 'নিরুদ্দেশ-যাত্রা' দেখতে ডেকের রেলিঙে সব যত সহযাত্রী সার করে দাঁড়াল। বন্ধু দ—চেঁচিয়ে ব'ল্লেন 'ভায়া, লণ্ডনে পৌঁছে আমাদের উদ্ধারের ব্যবস্থা ক'রো।' গ্রেভ্‌সেণ্ডে উঠে শুনলুম, ট্রাম আর বাস্ চ'ল্‌ছে। আমার কিট্-ব্যাগটা ছিল বিষম ভারী; জেটী থেকে বাসের কাছ অবধি সেটা ব'য়ে নিয়ে যাওয়া এক বিপদ হ'ল; এমন সময়ে এক জোয়ান ছোকরা এসে ব'ল্লে, 'Say

gurnor, shall I carry it for you ?' জিজ্ঞাসা ক'রলুম, বাস অবধি পৌঁছে দেবে কত নেবে। ব'ললে—one bob অর্থাৎ—এক শিলিঙ্‌। তার হাতে ব্যাগটা দিয়ে আরামের নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচলুম। একজন বৃদ্ধ লোকের কাছে জিজ্ঞাসা ক'রে জেনে নিলুম, বাসে ক'রে যেতে হ'বে ডার্টফোর্ড অবধি, তারপর ডার্টফোর্ডে ট্রাম ধ'রে উলিজ, উলিজ থেকে গ্রীনিজ, তারপর ডেপ্টফোর্ড, তারপর লণ্ডনের সাদার্ক মহাল্লা। আমরা তিনজন বাসের ছাদে চড়লুম। মারামারি দাঙ্গা ফেসাদের কোনও লক্ষণ দেখা গেল না। কিন্তু সকলের মুখেই একটা সন্ত্রস্ত ভাব—সবাই আশঙ্কার সঙ্গে কি দাঁড়ায় তাই অপেক্ষা ক'রছে। বাসে চ'ড়ে যেন একটু ভরসা হ'ল। বাঙলায় কথা ক'চ্ছি, সামনে এক ইংরেজ ব'সেছিল, সে দেখি কান খাড়া ক'রে শোনবার চেষ্টা ক'রছে। লোকটা একটা যেন আস্ত জন-বুল্‌; খুব মোটা চেহারা টক্‌টকে রাঙা, ঘাড়ে মুখে লাল শিরা দেখা যাচ্ছে, গা থেকে যেন রক্ত ফেটে পড়বার মত—গায়ের রঙ কসাইয়ের দোকানে টাঙিয়ে রাখা মাংসের মত। খানিক প'রে ঘাড় ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা ক'রলে—'কি ভাষায় কথা ক'চ্ছ ? আমি ইণ্ডিয়া গিয়েছিলুম, কিন্তু এতো হিণ্ডুস্ট্যানি নয়।' আমি ব'ললুম, 'এ হ'চ্ছে বাঙলা ; তুমি হিন্দুস্থানী জানো ?' লোকটা ব'ললে—'টৌর‍্যা ম্যাল্লোম্‌—অর্থাৎ 'থোড়া মালূম'। হাই-দরাবাদে নাকি সে পাঁচ বছর ছিল এক ইঞ্জিনিয়ারের অধীনে কুলীর সর্দ্দারী কাজে। লোকটা বেশ ভাল মানুষ বোধ হ'ল—লণ্ডনে যাবার পথ আমাদের সব বুঝিয়ে দিতে লাগ্‌ল। বাস্‌ ছেড়ে দিলে; প্রথম বিলেতের মাটীর উপর দিয়ে আমাদের এই প্রয়াণ। ব—একটু ভাবুক গোছের ; বিলেত—শেষটা সত্যিই আমরা বিলেতে পৌঁছেচি !

বিলেতের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি। যেন এই চিন্তা তাকে একটু অভিভূত ক'রে ফেল্লে। জি—ভাবুকতার ধার ধারে না, যাকে stolid common sense-ওয়ালা লোক বলে, ও তাই; বাস চ'লছে—পনেরো কুড়ি বা তিরিশ শিলিঙ খরচ করে লণ্ডন অবধি, মোটর ট্যাক্সি ভাড়া ক'রতে হ'ল না—শিলিঙ খানেকের মধ্যেই সব হ'য়ে যাবে—এই চিন্তায় সে একটু বেশ প্রীতি অনুভব ক'রছে মনে হ'ল। রাস্তার দুধারে ঘর-বাড়ী, বাগান, পথ-চলতি লোক, গাড়ী, মোটর;—মনে হ'য়েছিল এ সব আমার কাছে কতই না জানি আশ্চর্য্য লাগ্‌বে—কিন্তু ও হরি! এ যে দেখি সবই আমার চেনা! বিলেতে আসবার আগে ইংরেজি প'ড়ে, নভেল পড়ে, ছবি দেখে এখানকার লোকজন ঘরবাড়ী রীতি-নীতির সঙ্গে আমাদের আগেই একটা পরিচয় হ'য়ে যায়—আমরা অনেক জিনিস যেন দেখবার জন্যে তৈরী হ'য়েই আসি—সুতরাং নোতুনত্ব তেমন থাকে না। আমার মনে হয়, যখন প্রথম কলকাতার বাইরে পুরী কি কাশী যাই, বা হরিদ্বারে আর মুসুরীতে হিমালয় দেখি তখন যেন নবীন-দর্শনের পুলক আরও বেশী হ'য়েছিল। পুরীর সমুদ্রের ধার, মন্দির, নানা জাতের লোকের সমাগম, স্থানীয় লোকদের সব সেকেলে বাড়ী; কাশীর পাথরের সব ঘাট, সরু সরু গলি, ওড়না গায়ে দেওয়া নথ নাকে পশ্চিমে মেয়ে; হরিদ্বারে গঙ্গার অপূর্ব্ব শোভা—দূরে হিমালয়ের বরফ, লছমন্-ঝোলার পাহাড়, গাছ-পালা আর গঙ্গা মিলে যে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি ক'রেছে—এ সবে যেন একটা অজ্ঞাত জীবন আমার চোখের সামনে খুলে দিয়েছিল—তাতে মনপ্রাণ এক অনির্ব্বচনীয় রসে ভ'রে উঠ্‌ত। কিন্তু লণ্ডনের শহর-তলীর সব যেন অতি common place ধূলি-ধূসরিত, এমন কি কদর্য্য

মনে হ'তে লাগ্‌ল। শহরতলী দিয়ে লণ্ডনে ঢুকলুম—রেলের ষ্টেশন থেকে বেরিয়েই বড় সড়কের চটকে অভিভূত হ'য়ে পড়া বরাতে ঘ'ট্‌ল না। মনে হ'ল, এ তো কলকাতার ভাব দেখ্‌ছি—আর সব ছবিতেও তো ঠিক এমনিটিই দেখিছি। বাস ছুট্‌ছে কানের পাস দিয়ে হাওয়া সোঁ-সোঁ ক'রে যাচ্ছে, সেইটাই যা একটু নোতুন লাগ্‌ল।

ডারট্‌ফোর্ডে বাস ব'দলে ট্রামে যেতে হ'ল। সঙ্গী ইংরেজটীও ট্রামে ঢুকলো। আমরা তিন কালো আদমি যাচ্ছি; ব—এর কৌতুকবিস্ফারিত নেত্র, আমাদের ব্যাগে জাহাজের লেবেল আঁটা, আর খুব সম্ভব আমাদের পোষাক (আমি পরে ছিলুম এক ফ্লানেলের পেন্‌টুলেন, আর এক গলুফ কোট, জি—র সাদা পোষাক, আর ব—এর গলা আঁটা কোট—এখানে দেখছি কেউই সাদা পোষাক পরে না)—দেখে, ট্রামে এক গাদা মেয়ে পুরুষ উঠল, তারা আড়চোখে চাইতে লাগ্‌ল—দুটী ছোট মেয়ে তো হাঁ ক'রে তাকিয়েই রইল। ইংরেজপুঙ্গব একটু অনাবশ্যক পাণ্ডাগিরি ক'রে নিজের প্রতিও আর সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে কৃতার্থ হ'ল; একটা জায়গা খালি হ'তে খামকা চেঁচিয়ে বলে উঠ্‌ল—'য়হান্ ব্যায়টৌ,' কিনা, 'য়হাঁ বৈঠো'। কাজেই গাড়ীর মধ্যে আর সবাই বুঝ্‌লে যে এই ইংরেজটী মস্ত প্রাচ্য-ভাষাবিৎ—দু একজন একটু সম্ভ্রমের সঙ্গে তার প্রতি তাকালে! তাতে সে উৎসাহিত হ'য়ে দুচার মিনিট অন্তর (বোধ হয় মনে মনে কথাগুলো আউড়ে নিয়ে) একটা একটা করে হিন্দুস্থানী বচন আমাদের উপর ছাড়তে লাগল—ডেইক্কৌ (দেখো) আর 'লাম্নন শ্যার বৌট্ বর্‍্যা শ্যার' (লণ্ডন শহর্ বহুৎ বড়া শহর্) 'বৌট ড্রাক্যান, বৌট্

অ্যাড্‌মি'—এই রকম অমূল্য তথ্য আমাদের দিতে লাগল। আমার ভারী মজা লাগ্‌ছিল; আমি একটু শক্ত হিন্দুস্থানীতে তাকে লম্বা একটা কি কথা ব'ল্লুম; দেখলুম বুঝ্‌তে পারলে না, একটু ঠোক্কর খাওয়া ভাবে তাকিয়ে হাস্‌তে লাগ্‌ল মাত্র। তাকে খুশী করবার জন্য আমি শেষটা দু একটি হিন্দুস্থানী শব্দ ওজন ক'রে ক'রে ব'লতে লাগলুম; সেগুলো বুঝতে পেরে সে বিশেষ তৃপ্তিলাভ ক'রলে। যখন নেমে গেল, তখন খুব ঘাড় নেড়ে 'সালাম' 'সালাম' ক'রে গেল।

ডার্টফোর্ড, উলিজ, গ্রানিজ্ ডেপ্‌ট্‌ফোর্ড—বাসে আর ট্রামে চ'ড়ে বায়স্কোপের ছবিতে শহর দেখার মত চোখের সামনে দিয়ে চ'লে গেল। সব গরীব লোকেদের জন-মজুরদের জন্য লম্বা লম্বা বস্তী খুব দেখলুম—সেগুলি বেশ ভাল লাগ্‌ল। ষ্ট্রাইকের লক্ষণ কিছু দেখা গেল না। ডেপ্‌ট্‌ফোর্ডে ট্রাম ছেড়ে বাস ধরতে হবে। এক পাহারাওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করলুম—সাউথ কেন্‌সিংটান্ যেতে চাই, কোন্ বাসে চ'ড়বো? এখন এখানে সব ট্রাম আর বাসের লাইন এত বেশী যে সংক্ষেপে নম্বরে উল্লিখিত হয়; কলকাতায়ও হয়ত এই রকম দাঁড়াবে, ট্রাম আর একটুখানি প্রসার লাভ ক'রলে; যেমন, শ্যামবাজারের লাইনকে একের লাইন, শিয়ালদার লাইনকে দুইয়ের লাইন, কালীঘাটের লাইনকে বারোর লাইন বলা—এই রকম। পাহারাওয়ালা ব'লে দিলে—অমুক নম্বরে চ'ড়ে ওয়াটার্লু ষ্টেশন অবধি যাও; সেখানে বাস্ ব'দ্‌লে অমুক নম্বরে চড়ে হাইড্‌পারক্ কর্ণার; তারপর সেখানে আবার বাস বদ্‌লে সাউথ কেসিংটন। ডেপ্টফোর্ডে বাসে ঠাঁই মিল্‌ল—কিন্তু বড্ড ভিড়, আমার মস্ত কিট্‌ব্যাগ নিয়ে জায়গা করা মুস্কিল হ'ল। ডেপ্‌ট্‌ফোর্ড থেকেই আসল লণ্ডন; ওঃ, কি

ভয়ানক রাক্ষুসে শহর! একেবারে নোতুন আমদানী আমরা; পথ ঘাট কিছুই জানি না; গ্রেভ্‌সেণ্ড ছেড়েছি সকাল এগারোটা, এখন বাজে প্রায় তিনটে; কিছু খাওয়া দাওয়া হয় নি। ক্রমাগত রাস্তার পর রাস্তা দিয়ে বাস্ চ'লেছে। ওয়াটালু ষ্টেশনে যখন পৌঁছুলুম, তখন দেখি, বাস বদ্‌লে অন্য বাসে চড়া মুস্কিল। ভয়ানক ভিড়; টিউব্-রেল চল্‌ছে না, বড় রেল চল্‌ছে না, একমাত্র বাস হ'চ্ছে সাধারণ লোকের আশ্রয়, কাজেই এক এক বাস্ এসে দাঁড়াতেই ৫০।৬০।৮০ জন লোক তাতে উঠবার জন্য ধাক্কা ধাক্কি করতে লাগ্‌ল। আমরা অতি বিপদে পড়লুম; ভারী ব্যাগ নিয়ে ধাক্কা সামলান দায় হ'ল। বাসের প্রত্যাশা ছেড়ে ট্যাক্সীর চেষ্টা দেখতে লাগলুম, মিল্‌ল না; শেষে তিনজনে কোনও রকমে একটা বাসে ঢুকে পড়লুম। হাইড্‌পার্ক করণারে গিয়ে যা দেখলুম তাতে বিভীষিকা লাগ্‌তে লাগ্‌ল! কি ভিড়, আর কি বাস আর মোটরের দৌড়! বিবেচনা ক'রে দেখলুম। আবার বাসে চড়বার চেষ্টা করা সম্ভব নয়। একটী ইংরেজ মহিলা আমাদের রাস্তা-হারিয়ে-যাবার মত ভাব দেখে বুঝতে পারলেন যে আমরা নোতুন আমদানী—কোথায় যাবো জান্‌তে চাইলেন। তাঁর নির্দ্দেশমত একটু দূরে এক ঘোড়ার গাড়ীর আড্ডা থেকে ব—গিয়ে এক ক্যাব নিয়ে এল। আমরা তিন জন তাতে উঠলুম—আর মহিলাটী বাসের জন্য অপেক্ষা করছিলেন, তিনিও ক্রমওয়েল রোডের দিকে যাচ্ছেন শুনে তাঁকে গাড়ীতে তুলে নিলুম। এইরূপে বেলা প্রায় পাঁচটায় ২১ নম্বর ক্রমওয়েল রোডে আমাদের আগমন। সেখানে ন্যাশনাল ইণ্ডিয়ান্ এশোসিয়েশনের সেক্রেটারী শ্রীমতী বেক্ আমাদের অভ্যর্থনা ক'রলেন, সেখানেই থাকবার ব্যবস্থা হ'ল।

এই রকমে লণ্ডন পৌঁছুলুম। গ্রেভ্‌সেণ্ড থেকে ক্রমওয়েল রোড, এই তিরিশ মাইল আন্দাজ পথ আমরা যে করে এসেছি তার একটা অস্পষ্ট ছবি মনের মধ্যে র'য়েছে,—এখন লণ্ডনের অনেক জায়গা ঘুরেচি, এ শহরটার সঙ্গে পরিচয় হচ্ছে, এর উপর একটা কেমন টানও হ'য়ে যাচ্ছে—কিন্তু এই পরিচয়সত্বেও প্রথম দিনের লণ্ডনের ছাপ যা আমাদের মগজে প'ড়েছে সেটা কিন্তু যায় নি—লোক-জন, বাড়ী ঘর, ট্রাম-মোটরের উদ্দাম গতি, গাছপালায় আর মেয়েদের পোষাকে রঙের খেলা, একটা রাক্ষুসে আর অতি ভয়াবহ, সর্ব্বগ্রাসী, জীবন-স্রোত, ধাক্কাধাক্কি, মোটরের ভেঁপুর রব, ঘোড়ার তড়বড়ি এ সব মিলে মিশে একাকার হ'য়ে ফিউচারিস্‌ট বা ফিউবারিস্‌ট্‌ চিত্রকরদের আজগুবী সৃষ্টির মত আব্‌ছা আব্‌ছা ভাবে চোখের সামনে ভাস্‌ছে।

আমাদের লণ্ডনে আসা এই রকম একটু নোতুন ভাবে হ'ল। প্রথম থেকেই লণ্ডনের হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন অনুভব ক'রতে পেরেছি। একটা ভারী অস্বস্তি বোধ হ'ত লণ্ডনের রাস্তায় বার হ'লেই; মনে হ'ত, যেন কি একটা ভয়ানক ঘুর্ণিপাকের টান মানুষকে টেনে নিয়ে ফেলতে চায়, যেন লণ্ডনের যাঁতা-কল সবাইকে পিষে ফেলতে চায়। ক্রমাগত রাস্তা, মাইলের পর মাইল, অফুরন্ত রাস্তা, বড় বড় বাড়ী—পা ব্যথা করত হেঁটে, চোখ ব্যথা ক'রত দেখে। রাস্তায় চ'ল্‌তে চ'ল্‌তে খালি যে পা খাটত তা নয়, চোখেরও বিরাম ছিল না, কান-কেও সজাগ থাক্‌তে হ'ত, মনও ভ্রমণের কাজে নিবিষ্ট হ'তে পারত না—নানা বিষয়ে তাকে টানাটানি ক'রে ব্যতিব্যস্ত ক'রে ফেলত। পাড়াগাঁ থেকে কোন ছেলেকে এনে চিৎপুর আর বড়বাজারে ছেড়ে দিলে বোধ হয় তার এমনি অবস্থাই হয়। ক্রমে কিন্তু সব বরদাস্ত

হ'য়ে গেছে; শহরের ধাত বুঝ্‌তে পাচ্ছি; এখন একে ভালই লাগ্‌ছে।

ক্রমওয়েল রোডে আমরা পৌঁছুতে আমাদের বাহাদুরীকে দু এক জন তারিফ ক'রলেন। জাহাজের বন্ধুদের নামিয়ে আনবার জন্য এঁরা কত চেষ্টা ক'রছিলেন, কিন্তু কিছুই ক'রতে পারেন নি। ষ্ট্রাইকের জন্য লণ্ডনে খাবার আমদানি বন্ধ হ'ল; আমাদের তো ক'দিন সেপাইয়ের রসদের মত ওজন ক'রে জিনিস দেবার ভাব ক'রলে। আমাদের adventure-এর দুদিন পরে জাহাজ থেকে বন্ধুরা মুক্তিলাভ ক'রে এসে পড়লেন। কিন্তু ষ্ট্রাইক তখনও থামে নি।

লণ্ডন,
ফেব্রুয়ারী, ১৯২০

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

বাঙলার কথা

——:*:——

ইংরাজেরা বলেন—the way to hell is paved with good resolutions, অর্থাৎ—নরকের পথ সাধু-সংকল্প দিয়ে বাঁধানো। কথাটা একেবারে মিথ্যে নয়। যিনি মানুষ চেনেন তিনিই জানেন যে, মানুষে থেকে থেকেই নানারূপ সাধু সংকল্প করে, কিন্তু কাজে সে তা রাখতে পারে না। তার কারণ মানুষের ইচ্ছা, হয় তার প্রকৃতি, নয় তার শক্তির মাপকাটি নয়। শুধু সাংসারিকহিসেবে নয়, আধ্যাত্মিকহিসেবেও বড়-লোক হবার সাধ আমাদের প্রায় সবারই আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় ভালয় মন্দয় মিশিয়ে মাঝারি গোছের লোক হবার সামর্থ্যমাত্র আমাদের প্রায় অনেকেরই আছে কিন্তু ষোলআনা ভাল কিম্বা ষোল আনা মন্দ হবার শক্তি আমাদের সকলের ধাতে নেই। এই কারণে আমাদের শুভকামনা কামনামাত্রই থেকে যায়—বড় জোর কথায় প্রকাশ পায়। বর্ত্তমান যুগ সংবাদপত্র ও বক্তৃতার যুগ, এক কথায় কথার যুগ; সুতরাং এ যুগে, আমাদের মনে কোনরূপ ইচ্ছা উদয় হতে না হতেই তা কথায় পরিণত হয়। ফলে আমরা আমাদের অনেক কথা যে রাখতে পারি নে, তার কারণ, আমাদের মুখের কথা আমাদের মনের কথা নয়। এ যুগে আমরা যে জেনেশুনে মিথ্যে কথা বলি তা নয়, তবে আমাদের অনেক কথাই যে মিছে হয়, তার কারণ আমরা আমাদের মন জানি নে এবং তা জানবার চেষ্টাও আমরা করি নে, কারণ সে চেষ্টা

করতে হলে আমাদের কথা বলাটা মুলতবি থেকে যায়। আমরা ভুলে গিয়েছি যে, বাসনা মনের একটা বিশেষ ধর্ম্মমাত্র, সমগ্র মন নয়। ভাঙ্গা সাধু-সংকল্প নরকের পথের খোয়া হোক আর নাই হোক, স্বর্গের যে সোপান নয়, এ কথা জোর করে বলা যেতে পারে। এই সহজ সত্যের জ্ঞান সেকালের লোকের ছিল। তাই ভারতচন্দ্র বলে গিয়েছেন—"ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন"। একালের লোকের নেই বলে আমাদের কথা হচ্ছে "ভাবনা উচিত নয় প্রতিজ্ঞা যখন"। সংস্কৃতের যুগে মীমাংসকেরা বলতেন, কথারও কেবলমাত্র কথাহিসেবেই একটা শক্তি আছে, আমাদের বিশ্বাসও তাই। তবে তাঁদের সঙ্গে আমাদের প্রভেদ এইটুকু যে, তাঁরা মন্ত্রশক্তিতে বিশ্বাস করতেন, আমরা করি বক্তৃতা শক্তিতে।

(২)

প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করাটা, যে প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গে সে ছাড়া অপর কেউই পছন্দ করে না। ব্যাপারটা সেকালে ছিল নিন্দনীয়, এ কালে হয়েছে হাস্যাস্পদ। তার পর ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে যে কাজ নিন্দনীয়—জাতি-বিশেষের পক্ষে সে কাজ যে প্রশস্ত, এ মতের মাহাত্ম্য আমি অদ্যাবধি আবিষ্কার করতে পারি নি। কাজেই আমাকে কংগ্রেসের non-co-operation resolution সম্বন্ধে বলতে হচ্ছে—"ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন"। উক্ত সংকল্প যে মুখের কথাই রয়ে গেছে, কাজে পরিণত হচ্ছে না, এ সত্য এতই প্রত্যক্ষ যে, তার প্রমাণের আবশ্যক নেই। উক্ত রিজলিউসনের সাতটি দফার ভিতর পাঁচটি ভূমিষ্ঠ হতে না হতেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়েছে। অবশিষ্ট দুটির মধ্যে,

যেটি অবলম্বনে কোনরূপ স্বার্থত্যাগ নেই, অর্থাৎ—কাউন্সিল বয়কট করা, একজাতের পলিটিসিয়ানরা সেইটি শিরোধার্য্য করে নিঃস্বার্থ প্রেট্রিয়টিজমের পরিচয় দিচ্ছেন। তার পর মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত নেহ্‌রু, মৌলানা মহম্মদ আলি আর মৌলানা শৌকত আলি স্কুল কলেজ থেকে ছাত্রদের বার করে আনবার চেষ্টায় ফিরছেন। স্কুল কলেজের দ্বারস্থ না হয়ে এঁরা যদি আইন-আদালতের দ্বারস্থ হয়ে উকিলবাবুদের সে স্থান থেকে বহিষ্কৃত করতে চেষ্টা করতেন, তাহলে আমি সত্য সত্যই খুশী হতুম। তাতে আর কিছু না হোক্—আমাদের পলিটিক্স উকিলি-বুদ্ধির হাত থেকে মুক্তি পেত। ছেলেদের স্কুল কলেজ ছাড়িয়ে নিলে তাদের জন্য আবার স্কুল কলেজ তয়ের করতে হবে, তার জন্য ঢের কাঠ-খড় চাই, শুধু কাঠ-খড় নয় ঢের ভাবনা চিন্তেও চাই। স্কুল কলেজ ভাঙ্‌তে যে খুশী সেই পারে কিন্তু ও-সব জিনিস গড়তে পারে শুধু সেই সব লোক, যারা শিক্ষা বিষয়ে ব্যবসায়ী ও কারিগর। মনে রাখবেন শিক্ষা জিনিসটে একসঙ্গে বিজ্ঞান ও আর্ট। স্কুলের বাড়ী-গড়ার চাইতে স্কুল গড়া কিছু কম শক্ত নয়। যাঁরা পলিটিক্সে হাত পাকিয়েছেন তাঁরা নিজহাতে একটা বিদ্যালয় গড়ে তুলতে চেষ্টা করুন না, দেখতে পাবেন যে, সে আলয় অর্দ্ধেক উঠতে না উঠতেই ভেঙ্গে পড়বে।

(৩)

কংগ্রেসের উক্ত রিজলিউসনের বিরুদ্ধে বাঙালী যে ভোট করেছিল তার কারণ, বোধ হয় বাঙালীর মনের ভিতর এই রকম একটা অস্পষ্ট ধারণা ছিল যে, তারা উক্ত প্রস্তাব মুখে গ্রাহ্য করলেও কাজে অমান্য

করতে বাধ্য হবে। এ ধারণা তাদের মনে জন্মানো অসম্ভব নয়। গত পোনেরো বৎসর ধরে যে বাঙালী কঠোর রাজনৈতিক স্কুলে মানুষ হয়েছে তাতে আশা করা যায়, তার বাহ্যজ্ঞান ও আত্মজ্ঞান দুই-ই কতকটা বেড়ে গিয়েছে। প্রবৃত্তি ও শক্তির ব্যবধানের জ্ঞানটা আত্ম-জ্ঞানেরই অংশ, আর কার্য্যকারণের সম্বন্ধজ্ঞানটা বাহ্যজ্ঞানেরই অংশ। সুতরাং মৌলানা আজাদ কালাম-কল্পিত এবং মহাত্মা গান্ধী কর্ত্তৃক প্রচারিত উক্ত রিজলিউশন শিরোধার্য্য করবার পক্ষে সম্ভবত বাঙালীর মস্তক প্রতিবাদী হয়েছিল।

কিন্তু আমি ইতিমধ্যে প্রমাণ পেয়েছি যে অপর প্রদেশের কংগ্রেসি-নেতাদের মতে বাঙালীর মস্তিষ্কের অসদ্ভাব নয়, বাঙালীর হৃদয়ের অভাবই হচ্ছে আমাদের পশ্চাৎপদ হবার কারণ। রাজনীতির ক্ষেত্রে আমরা যে পিছিয়ে পড়েছি এ বিষয়ে বাকী ভারতবর্ষের কংগ্রেসি-পলিটিসিয়ানরা একমত।

কেন যে আমরা পিছু হটলুম, তার কারণ কোনও বড় বঁড় বিদেশী নেতা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছেন। সে প্রশ্নের ভিতর একটা স্পষ্ট তিরস্কারের সুর ছিল। আমি যথাসাধ্য স্বজাতির হয়ে সাফাই সাক্ষী দিতে চেষ্টা করেছি। তার ফলে তাঁরা আরও অসন্তুষ্ট হয়েছেন। তাঁরা বলেন, "তোমরা বাঙালীরা নিজের অহঙ্কারেই মারা গেলে, তোমরা ভাব যে বাঙলা ছাড়া ভারতবর্ষে আর কোনও দেশ নেই আর বাঙালী ছাড়া ভারতবর্ষে আর কেউ মানুষ নয়"। এ কথার অবশ্য উত্তর এই যে,—বাঙালীর ভিতর যদি পদার্থ না থাকে তাহলে বাঙালীকে দলে টানবার এত চেষ্টা কেন? বাকী ভারতবর্ষ যদি ছ'মাসে স্বরাজ লাভ করে তাহলে আমরা সেই স্বরাট-ভারতবর্ষের কেরাণীগিরি

করব, আর তোমরা যদি স্বাধীন ভারতবর্ষ থেকে শিক্ষার পাট একেবারে তুলে না দেও তাহলে তোমাদের প্রতিষ্ঠিত জাতীয়-বিদ্যালয়ে স্কুল-মাষ্টারি করব—আর যদি স্বরাট-ভারতবর্ষে সংবাদপত্র বলে কোনও জিনিস থাকতে দাও তাহলে তারও এডিটারি করব!

আর তোমাদের সৃষ্ট কৃষ্ট-ব্যুরোক্রাসি যদি ভারতবর্ষে আবার অন্ধকারের যুগ ফিরে আনে, তাহ'লে আমাদের ছেলেরা আতসবাজি তৈরি করবে, আর কোনও কারণে না-হোক সমগ্র ভারতবর্ষকে একটু আলোর চেহারা দেখিয়ে দেবার জন্য। এ সব কথা তাঁদের শোনাই নি, কেননা ভয় ছিল, হয় ত ও-কথা শুনে তাঁরা খুশী হবেন না। অগত্যা বাঙালী যে একদম মরে যায় নি, এই কথাটা নানা রকম যুক্তি তর্কের সাহায্যে তাঁদের বোঝাতে চেষ্টা করেছি।

সে সব যুক্তি তর্কের আর পুনরুল্লেখ করব না। এই কয় বৎসর ধরে লেখালিখির ফলে আমার একটি জ্ঞানলাভ হয়েছে। বাঙালীর বিদ্যাবুদ্ধির নিন্দে করলে একদল বাঙালী যেমন ভারি চটে যায় তেমনি তার চাইতে ঢের বেশি চটে যায় আর একদল বাঙালী যদি তাদের বিদ্যাবুদ্ধির প্রশংসা করা যায়। তাঁরা মনে করেন ও-রূপ প্রশংসায় প্রকারান্তরে তাঁদের মহাপ্রাণতা অস্বীকার করা হয়। হিন্দিতে একটি গান আছে যার প্রথম চরণ এই, "মাতোয়ারা হুয়া ত কেয়া হুয়া, বাউরা হুয়া ত কেয়া হুয়া"। গায়ক প্রশ্ন করছেন, "মাতাল হয়েছি ত কি হয়েছে, পাগল হয়েছি ত কি হয়েছে"? উত্তর অবশ্য খুব ভাল হয়েছে। বলা বাহুল্য এটি প্রেমের গান। যে ভালবাসায় মানুষ মাতাল না হয় পাগল না হয়, সে ভালবাসার আর তেজ কি? আমাদের স্বদেশ-প্রেমের কারবারীরাও প্রমাণ করতে চান যে, তাঁরাও

স্বদেশে-প্রেমে মাতোয়ারা হয়েছেন বাউরা হয়েছেন, অতএব তাঁদের কাণ্ডজ্ঞান আছে এ অপবাদ তাঁরা কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারবেন না। যাঁরা সত্যসত্যই কোনও ভাবের নেশায় চুর হয়েছেন, তাঁদের আমি যত না ভয় করি তার চাইতে ঢের বেশি ভক্তি করি। তাঁরা কে কি বলে তাতে ভ্রুক্ষেপও করেন না। কিন্তু ছেরেপ ভয় করি সেই সব লোককে, যাঁরা প্রেট্রিয়টিজমের বিলেতি মদ গোঁফে মেখে মাতাল সাজেন। এঁরা যা মুখে আসে তাই বলতে বাধ্য, নচেৎ তাঁরাও যে স্বদেশ-প্রেমে মাতোয়ারা এ সত্য আর কি উপায়ে প্রমাণ করা যায়! এঁরাই হচ্ছেন দলেপুরু, এবং এঁদের পেট্রিয়টিক উপদ্রব আমি পারৎ পক্ষে এড়াতে চাই। সে যাইহোক—এ কথা নিঃসন্দেহ যে, অন্য প্রদেশের পলিটিক্যাল-নেতারা বাঙালীকে আজকের দিনে নিতান্ত অবজ্ঞার চক্ষে দেখছেন।

(৪)

কংগ্রেসের রিজলিউসনের প্রসাদে বাঙালীর যে ছুঁচোধরা সাপের অবস্থা হয়েছে তা ত সর্ব্বজনবিদিত। কিন্তু কি কারণে আমরা নন-কো অপারেশন গিলতেও পারছি নে, ফেলতেও পারছি নে—তার কারণ আবিষ্কার করা আবশ্যক। কেন না আমাদের বর্ত্তমান অবস্থাটা গৌরবেরও নয় আরামেরও নয়।

আমরা কেন যে এই উভয় সঙ্কটে পড়েছি—তার খুব স্থূল কারণ-গুলি নির্ণয় করতে চেষ্টা করছি। বলা বাহুল্য যে, এখানে আমি আমার নিজের ধারণাই প্রকাশ করব, সে ধারণা অপরের সঙ্গে মিলতেও পারে নাও মিলতে পারে।

উক্ত প্রস্তাবে যে আমরা মোহপ্রাপ্ত হই নি, তার কারণ ওর ভিতর নূতনত্বের মোহ নেই। ভাবের নেশায় পাগল হতে বাঙালী জানেও চায়ও। রবীন্দ্রনাথ* একসময়ে প্রশ্ন করেছিলেন, "আবার মোরে পাগল করে দেবে কে"? মনের এ সাধ রবীন্দ্রনাথের স্বজাতিরও আছে, আমরা চিরজীবন শুধু লাভ লোকসানের হিসেব কিতেব নিয়ে থাকতে পারি নে, আমরা আর যা হই, মাড়োয়ারী নই। কিন্তু যিনি যত বড়ই প্রেমিক হন না কেন, একই স্ত্রীলোকের সঙ্গে ফিরে ফির্তি দুবার ভালবাসায় পড়া কারও পক্ষে সম্ভব নয়; বিশেষত সে ভালবাসার সকল আনন্দ সকল বেদনা পূর্ণমাত্রায় উপভোগ আর ভোগ যে করেছে তার পক্ষে ত নয়ই। আমাদের সেই পুরোনো ভাব যদি নূতন রূপ ধরে আসত তাহলেই হয়ত আমাদের ক্ষণিকের জন্যও ভোলাতে পারত। কিন্তু এসেছে শুধু নূতন নাম ধরে। যা ছিল "স্বদেশী," তাই হয়েছে non-co-operation. ভাষান্তরে অবশ্য তার যথেষ্ট রূপান্তরও ঘটেছে কিন্তু সে বিরূপতার দিকে। বাঙলার পদ্য— অ-বাঙালীর হাতে পড়ে গদ্য হয়ে উঠেছে। এই non-co-operation-এর ভিতর যদি কিছু থাকে ত ছেরেপ পলিটিক্স—আর তার ভিতর যা আদপে নেই তা হচ্ছে idealism, অবশ্য যদি reality-কে অস্বীকার করার নাম idealism না হয়। বাঙলার স্বদেশীয়তার গায়ে রূপ ছিল রঙ ছিল, তার অন্তরে কল্পনা ছিল কবিত্ব ছিল। আমাদের স্বদেশী-মনের ভিতর একমাত্র পলিটিক্যাল বিদ্বেষের তীব্রতা ছিল না, সেই সঙ্গে ছিল একটা আনন্দ ব্যাকুলতা!। তাই না সেদিন বাঙলার স্বদেশী সহস্র গানে মুখরিত, শতছন্দে মূর্ত্ত হয়ে উঠেছিল! Non-co-operation-সম্বন্ধে কেউ একটি কবিতা লিখতে চেষ্টা করে দেখুন ত কি ফল

দাঁড়ায়? তার পর তার সঙ্গে সুর সংযোগ করে একবার দেশের লোককে শোনান। দেখতে পাবেন বাঙলার এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত হাসির বন্যায় ভেসে যাবে। Non-co-operation এ যে আমাদের নেশা ধরছে না, তার কারণ ও-বস্তু জাতীয় ভাবের সুরা নয়। আজ পোনেরো বৎসর পূর্ব্বে যে ভাবের আন্দোলনে বাঙলার মন মথিত হয়েছিল তাতে করে সে মনের ভিতর হলাহল ও অমৃত দুই-ই উত্থিত হয়েছিল। আর ও-দুয়ের মিশ্রণে যা জন্মলাভ করে তারই নাম না সুরা!

অপর পক্ষে non-co-operation হচ্ছে জাতীয় সর্ব্বরোগের মহৌষধ। ও-ঔষধ সেবন করামাত্র আমরা না কি যুগপৎ সুস্থ সবল মহাপ্রাণ মহাজ্ঞান, স্বরাট ও বিরাট হয়ে উঠব। সম্ভব তাই হব। কিন্তু ঔষধ সহজে কেউ গিলতে চায় না। তাই কংগ্রেসের হকিম-কবিরাজেরা জোর করে দেশের লোককে তা গেলাতে চাচ্ছেন।

(৫)

আমার বাঙালী পেট্রিয়টিজম যতই প্রবৃদ্ধ হোক, আমি নিতান্ত দুঃখের সঙ্গে এ কথা স্বীকার করতে বাধ্য যে আমাদের প্রতি অপর জাতির এই অবজ্ঞা অযথা হলেও অভক্তি অমূলক নয়। জীবনের যে কোনও কর্ম্মক্ষেত্রে আমাদের এক পক্ষ না আর এক পক্ষ অবলম্বন করতেই হবে। যে জাতি কার্য্যকালে মনস্থির করতে পারে না, সে জাতির উপর কেউ নির্ভর করতে পারে না। আর এই কংগ্রেসের non-co-operation রিজলিউসন নিয়ে আমরা অসামান্য অব্যবস্থিত-চিত্ততার প্রমাণ দিয়েছি।

গত কংগ্রেসে যাঁরা যোগ দিয়েছিলেন তাঁরা সবাই জানেন, বাঙালী ডেলিগেটদের মধ্যে শতকরা নিরনব্বই জন non-co-operation-এর বিরুদ্ধে ছিলেন কিন্তু তাঁরা তাঁদের সেই বিরুদ্ধমতের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারেন নি। আমাদের নেতৃবৃন্দ এ ক্ষেত্রে দু'নৌকায় পা দিয়েছিলেন, কাজেই অপদস্থও হয়েছেন। মহাত্মা গান্ধীর রিজলিউ-সনকে চাপা দেবার জন্য শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল যে amendment খাড়া করেন, সে amendment-এর স্পষ্ট উদ্দেশ্য ছিল, ঐ সূত্রে কংগ্রেসকে ভোগা দিয়ে, মাহাত্মা গান্ধীর রিজলিউসনটিকে এ-ফেরা মুলতবি রাখা। উকিলিবুদ্ধি রাজনীতির ক্ষেত্রে সব সময়ে খাটে না, এবং এ ক্ষেত্রে খাটবার কোনই সম্ভাবনা ছিল না। মহাত্মা গান্ধী তাঁর প্রস্তাবের মহাত্ম্যে যে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই, অপরপক্ষে বাঙলার তরফ থেকে উত্থাপিত প্রস্তাবের মাহাত্ম্যে যে কোনও বাঙালী বিশ্বাস করেন নি, এবং স্বয়ং বিপিনচন্দ্র পালও যে করেন নি, এ বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই। যদি প্রথমে উক্ত amendment এবং তৎপরে উক্ত রিজলিউসন সম্বন্ধে ভোট নেওয়া হত, তাহলে আমার বিশ্বাস অধিকাংশ বাঙালী উক্ত উভয় প্রস্তাবের বিরুদ্ধেই ভোট দিতেন। ফলে শুধু যে বাঙলার প্রস্তাব অগ্রাহ্য হল তাই নয়, বাঙালী বেয়কুবও বনে গেল।

মাহাত্মা গান্ধীর প্রস্তাব আমরা যদি যোল আনা গ্রাহ্য করতে পারতুম কিম্বা ষোল আনা অগ্রাহ্য করতে পারতুম তাহলে বাকী ভারতবর্ষের কাছে আমরা এতটা খেলো হয়ে পড়তুম না। যে ক্ষেত্রে রফাছাড়ের প্রসঙ্গে উভয়পক্ষের ভিতর আপোষ মীমাংসার কোনরূপ সম্ভাবনা নেই, সেখানে সুবুদ্ধির কাজ হচ্ছে—নিজের

কোট ষোল আনা বজায় রাখবার চেষ্টা করা। আর এ কথা বলাই বাহুল্য যে, মহাত্মা গান্ধী তাঁর মতের একচুলও পরিবর্ত্তন করতে প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি ত স্পষ্ট করেই বলেছিলেন যে, সমগ্র কংগ্রেস যদি তাঁর বিরুদ্ধেও যায় তাহলেও তিনি তাঁর non-co-operation-এর ধর্ম্ম প্রচার করবেনই এবং দেশসুদ্ধ লোককে সেই ধর্ম্মে দীক্ষিত করতে চেষ্টা করবেন। যে ব্যক্তির কাছে সমগ্র কংগ্রেসের মত তুচ্ছ এবং নগণ্য, অবশ্য সে মত যদি তাঁর মতের তিলমাত্রও বিরোধী হয়, সে ব্যক্তির কাছে হয় মাথা নীচু করা, নয় তাঁর সুমুখে নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ানো ছাড়া অপর কোনও ভঙ্গী অবলম্বন করা যেমন নিরর্থক তেমনি হাস্যকর।

যদি এ কথা সত্য হয় যে, অধিকাংশ বাঙালীই মহাত্মা গান্ধীর প্রস্তাবিত non-co-operation-এর বিরোধী পক্ষ ছিলেন তাহলে বাঙলার কর্ত্তব্য ছিল, উক্ত প্রস্তাব আদ্যোপান্ত প্রত্যাখ্যান করা। তাহলে আর যাইহোক বাকী ভারতবর্ষ আমাদের অবজ্ঞার চোখে দেখতেন না, এবং তার পর বাঙলাকে পলিটিক্যালী এক ঘরেও করে দিত না। কেননা আজকের দিনে বাঙলাকে বাদ দিয়ে ভারতবর্ষে ন্যাসনালিজমের অভিনয় করা, হ্যামলেটকে বাদ দিয়ে হ্যামলেট অভিনয় করারই তুল্য।

তবে গত কংগ্রেসে বাঙলা যে শ্যাম ও কুল দুই রাখবার বৃথা চেষ্টা করেছিল এখন বুঝছি তার কারণ বাঙালী আজ নিজের মন জানে না, অতএব এ ক্ষেত্রে তার হয় এদিক, না হয় ওদিক, কোন দিকেই মনস্থির করা সম্ভব ছিল না।

পলিটিক্যাল-হিসেবে—আমরা যে কতদূর অব্যবস্থিতচিত্ত হয়ে

পড়েছি তার প্রমাণ, যাঁরা কংগ্রেসের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিলেন, তাঁরাই আবার উক্ত প্রস্তাব শিরোধার্য্য করবার জন্য ক্ষেপে উঠলেন। তাঁরা কেন যে এইরূপ উল্‌টো ডিগবাজি খেলেন, তার কোনই যুক্তিযুক্ত কারণ অদ্যাবধি তাঁরা দেখাতে পারছেন না। এ বিষয়ে সংবাদপত্রে যা সব লেখালিখি চলছে তার তুল্য হ য ব র ল দেশে ইতিপূর্ব্বে কখনো শোনা যায় নি। এতে আশ্চর্য্য হবার বাঙলা কোনই কারণ নেই। ডিক্রী, যদি রায়ের ঠিক উল্‌টো করতে হয় তাহলে তার সঙ্গত কারণ দেখানো উকিলী বুদ্ধিতেও কুলোয় না। এই দেখুন না, যাঁরা বলছেন যে কংগ্রেসের রিজলিউসন, কংগ্রেসের রিজলিউসন বলেই মান্য, তাঁরা নিজে আদালত বয়কট না করে অপর সকলকে কাউন্সিল বয়কট করবার জন্য তাড়না করছেন। কথায় ও কাজের এতাদৃশ গরমিল এদেশেও ইতিপূর্ব্বে দেখা যায় নি।

বাঙলার "স্বদেশী" কিন্তু কোনও বাঙালীকে জোরকরে গেলাতে হয় নি। কংগ্রেসের মত ভাড়াটে ভোটারের সাহায্যে রিজলিউসন পাস করে, আমরা স্বদেশী আন্দোলন সুরু করি নি। আমরা আগে সে আন্দোলন পুরোমাত্রায় চালিয়ে তারপর কংগ্রেসের রায় ও সই নিতে চেয়েছিলুম। ফল কি হয়েছিল তা ত সুরাট-কংগ্রেসের কথা স্মরণ করলেই মনে পড়বে।

অতএব নির্ভয়ে বলা যায় যে "স্বদেশী" ব্যাপারটা ছিল যেমন স্বভাবিক, non-co-op ration-বস্তুটা তেমনি কৃত্রিম। কংগ্রেসে রিজলিউসন পাস করে, তার প্রভাবে দেশের লোকের মন গড়ে তোলবার চেষ্টা তাঁরাই করতে পারেন যাঁরা মানুষের মন কি বস্তু জানেন না, এবং যাঁদের বিশ্বাস—মনের নিজের কোনও শক্তি গতি

কি ধর্ম্ম নেই, অতএব যে উপায়ে জড়পদার্থের রূপান্তর ঘটানো যায় সেই উপায়ে মনেরও রূপান্তর ঘটানো যায়, অর্থাৎ—বাইরের চাপে এই materialistic প্রচেষ্টার ফলে যা জন্মলাভ করে তার নাম হুজুগ, অর্থাৎ—তাতে লোকের মনে ক্ষণিক চাঞ্চল্য এনে দিতে পারে কিন্তু তার কোন স্থায়ী পরিবর্ত্তন ঘটাতে পারে না।

স্বদেশী বাঙলার ঘাড়ে কেউ চাপিয়ে দেয় নি, বাঙালীর মন থেকে তা স্বত-উদ্ভূত হয়েছিল। গত এক শতাব্দী ধরে: আমাদের জাতের মনের কোনও নিভৃত কোণে যে ভাবের বীজ, বাঙালী-মনের রসে ও তেজে পুষ্ট হচ্ছিল, স্বদেশী যুগে সেই ভাব ফুলের মত ফুটে উঠেছিল আর তার বর্ণে গন্ধে দেশের মন প্রাণকে মাতিয়ে তুলেছিল। সে ফুল আজ ঝরে গিয়েছে কিন্তু তার রস আমাদের রক্তে মিশে গিয়েছে, তার বর্ণ গন্ধ আমাদের মনের ভিতর সঞ্চিত রয়েছে। স্বদেশী আন্দোলন থেমে গিয়েছে কিন্তু তার ফলে দেশের মনকে স্থায়ী ভাবে স্বদেশী করে রেখে গিয়েছে। প্রকৃত ফুলের সঙ্গে কাগজের ফুলের যে প্রভেদ স্বদেশীর সঙ্গে non-co-operation-এর সেই প্রভেদ। তাই এই কাগজের ফুল পূজোর ফুল বলে আমরা শিরোধার্য্য করতে পারছি নে।

এখন ভাবের কথা ছেড়ে দিয়ে কাজের কথায় আসা যাক। মহাত্মা গান্ধীর প্রস্তাবিত non-co-operation-এর যদি কোনরূপ সার্থকতা থাকে ত সে practical-হিসেবে। নগদ বিদায়ের লোভে যে-কাজে হাত দেওয়া যায় তা যে ideal কাজ নয় সে কথা বলাই বাহুল্য।

মহাত্মা গান্ধী আমাদের একটা বিরাট লোভ দেখাচ্ছেন। আমরা যদি নির্ব্বিচারে তাঁর কথা শুনে চলি তাহলে বছর না পেরুতে

তিনি আমাদের স্বরাজ দান করবেন। কোনরূপ দাম না দিয়ে গোটা ভারতবর্ষের হাজার বৎসরের হারানো স্বরাজলাভ করতে কে না রাজি? উপাধি ছাড়া স্কুল ছাড়া আর ওকালতি ছাড়ার ভিতর কোনরূপ পৌরুষ থাকলেও ত পৃথিবীর লোক আজ পর্য্যন্ত তাকে বীরত্ব বলতে শেখে নি। আমার কানে এ হেন কথা রূপকথার মত শোনায়। তবে এদেশে একালে সম্ভব ও অসম্ভবের ভেদজ্ঞান থাকাটা একটা দোষের মধ্যেই গণ্য। সুতরাং কিছুই অসম্ভব নয়; এ কথা মেনে নিয়েও কথাটা কতদূর অসম্ভব তার কিঞ্চিৎ আলোচনা না করে আমি থাকতে পারছি নে। কিন্তু এ স্থলে আমি বলে রাখি যে, আমি মনে মনে কামনা করছি যে মহাত্মা গান্ধীর মুখে ফুল চন্দন পড়ুক, তাঁর হাততোলা স্বরাজ্য আসছে বছর আমরা যেন দানে পাই। আপাতত বিচার সুরু করা যাক।

সংকল্প মাত্রেরই জন্মের একটা না-একটা কারণ আছে। এই non-co operation-সংকল্পের জন্মের কারণটা কি? জালিয়ানা-বাগের হত্যাকাণ্ড, না তুর্কির সুলতানের সাম্রাজ্যের অঙ্গচ্ছেদ? যদি কেউ বলেন যে, এ দুই-ই, তাহলেও প্রশ্ন ওঠে, এ দুয়ের ভিতর কোন্‌টি মুখ্য আর কোন্‌টি গৌণ। কেননা একসঙ্গে ও-দুইকে মেলানো যায় না, এক গোঁজা মিলন দেওয়া ছাড়া। যেহেতু ও-দুটির জন্ম হচ্ছে দুটি সম্পূর্ণ পৃথক মনোভাব থেকে। একটির মূলে আছে সম্প্রদায়-বিশেষের ধর্ম্ম বুদ্ধি আর একটির মূলে আছে সমগ্র ভারতবাসীর পলিটিক্যাল বুদ্ধি। দ্বিতীয়টি বিচার সাপেক্ষ, প্রথমটি নয়। যদি কেউ বলেন যে, এ হচ্ছে আমার ধর্ম্মের কথা তাহলে আমাদের নীরব থাকতে হয়। কেননা সে স্থলে কোনরূপ তর্ক তুলতে গেলে, তাঁর

ধর্ম্মজ্ঞানে আঘাত লাগতে পারে। ফলে দাঁড়িয়েছে এই যে, খিলাফৎ সম্বন্ধে বিচার করবার আমাদের কোনরূপ অধিকার নেই। কিন্তু মুখে বিচার করবার অধিকার না থাক, মনে মনে আলোচনা করবার অধিকারে ত কেউ বঞ্চিত নয়। তুর্কির সুলতানের গোটা সাম্রাজ্য তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়া উচিত কি না সে বিচার অবশ্য আমরাও করতে পারি কিন্তু সে একমাত্র পলিটিক্যালহিসাবে, ভারত-বর্ষের লাভ লোকসানের দিকে লক্ষ্য রেখে। এবং সেই পলিটিক্যাল বিচার তুললে আমাদের পরস্পরের মতভেদ হওয়া কিছু অসম্ভব নয়, এবং তাহলেই আমাদের মধ্যে মনান্তর ঘটবারও সম্ভাবনা।

তবে এ সত্যটি প্রত্যক্ষ যে, Indian Nationalism এবং Pan-Islamism এক মনোভাব নয়। একটির মূলে আছে স্বদেশ-বাৎসল্য আর একটির মূলে আছে স্বজাতি-বাৎসল্য। Indian Nationalism এর স্বদেশ-বাৎসল্য হচ্ছে বর্ণ ধর্ম্ম নির্ব্বিচারে স্বদেশী-বাৎসল্য আর Pan-Islamism-এর স্বজাতি-বাৎসল্য হচ্ছে স্বদেশী বিদেশী নির্ব্বিচারে স্বধর্ম্মী বাৎসল্য। জাতীয়তার দিক থেকে দেখতে গেলে, এ দুয়ের পার্থক্য এতই স্পষ্ট যে, কাউকে তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হবে না।

অবশ্য এমন কথা আমি বলি নে যে, কংগ্রেস ও খিলাফতের এই মিলনটার ভিতর সহৃদয়তা আদপেই নেই। ভারতবর্ষের মুসলমানের পক্ষে ন্যাসনালিষ্ট হওয়ার কোনই বাধা নেই, কেননা পলিটিক্যালহিসেবে হিন্দু মুসলমানের স্বার্থ এক, অপর পক্ষে হিন্দুদের পক্ষে খিলাফৎ-বিষয়ে মুসলমানদের ব্যথার ব্যথী হওয়াও স্বাভাবিক। কেননা আমাদের উভয়ের মধ্যে একমাত্র স্বার্থের নয় সমবেদনারও বন্ধন

আছে। আমার বক্তব্য এই যে, পলিটিক্সের সঙ্গে ধর্ম্ম জড়িয়ে গেলে, পলিটিক্যাল-সমস্যার পলিটিক্যাল-মীমাংসা করা কঠিন হয়ে পড়ে।

পলিটিক্সের সঙ্গে ধর্ম্মের যোগ করাটা পৃথিবীর সকল দেশেই বিপজ্জনক এবং আমাদের এই নানা ধর্ম্মের দেশে বিশেষ আশঙ্কার কথা। পাঠক মনে রাখবেন যে পলিটিক্স ব্যাপারটা হচ্ছে আগাগোড়া সাংসারিক। তার পর আমার জিজ্ঞাস্য এই যে ইংরাজ-রাজের সাহায্য ব্যতীত এই দুই বিষয়ে কি আশু প্রতিকার হতে পারে? এ দুই ক্ষেত্রে ইংরাজ-রাজ কোনরূপ প্রতিকার করেন নি বলেই ত আমাদের এই অভিমান।

(৬)

সম্ভবত মহাত্মা গান্ধীর কথা এই যে, স্বরাজ্যলাভই হচ্ছে non-co-operation-এর মুখ্য উদ্দেশ্য। পঞ্জাবের ও তুর্কির প্রতি ইংরাজের ব্যবহার আমাদের শুধু এই বিষয়ে চোখ ফুটিয়ে দিয়েছে মাত্র।

এস্থলে আমি জিজ্ঞাসা করি যে, উক্ত দুই ঘটনা যদি না ঘটত তাহলে কি স্বরাজের পুরো দাবী আমাদের পক্ষে করাটা, হয় অন্যায় নয় অনাবশ্যক হত? মনে রাখবেন—স্বরাজের কথাটা স্বদেশী যুগেও ওঠে এবং সে গত যুদ্ধের বহুপূর্ব্বে।

এর উত্তর অবশ্য এই যে, পূর্ব্বে স্বরাজলাভের আমাদের ত্বর সইত, এই দুই ঘটনার পর আর ত্বর সয় না। মেনে নেওয়া যাক্ যে আমাদের মনের অবস্থা এই রকমই দাঁড়িয়েছে। তাহলে প্রশ্ন ওঠে, ছ'মাসে স্বরাজলাভের পক্ষে non-co-operation যথার্থ উপায় কি না?

দুশ' চারশ। উপাধিধারীর উপাধি ত্যাগ, পাঁচ সাত হাজার উকিলের ওকালতি ত্যাগ এবং লাখ দেড়লাখ ছেলের স্কুল ত্যাগের ফলে এদেশ থেকে ইংরাজ বণিকও চলে যাবে না, ইংরাজ সৈনিকও চলে যাবে না। অতএব non-co-operation-এর প্রসাদে কি রকম স্বরাজ যে আমরা লাভ করব তা আমার কল্পনার অতীত। তবে এ কথা নিশ্চয় যে সে স্বরাজ ৵ দাদাভাই-কল্পিত স্বরাজ নয়, স্বাধীনতাও নয়। স্বদেশীযুগে লোকে যাকে Self-Government within the Empire বলত, তা লাভ করতে হলে ইংরাজ-রাজের সংস্রব ত্যাগ করবার কথা ওঠে না—আর যাকে autonomy outside the Empire বলত, তা লাভ করবার জন্য না হোক, অন্তত রক্ষা করবার জন্য army এবং navy চাই। বলা বাহুল্য যে—ছ'মাসে আর যাই করা যাক্, army এবং navy আমরা গড়তে পারব না, অন্তত non-co-operation-এর সাহায্যে ত নয়ই। স্কুল পালানো ছেলেরা সৈনিক হলেও হতে পারে কিন্তু আদালত পালানো উকিলবাবুরা যে general এবং উপাধিত্যাগীরা যে admiral হবেন, এ বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ আছে। Non-co-operation-এর যদি কোনও উদ্দেশ্য থাকে ত সে হচ্ছে ইংরাজ-রাজকে চালমাৎ করা। বলা-বাহুল্য যে বিপক্ষকে চালমাৎ করবার জন্য কেউ খেলা সুরু করে না, ও হঠাৎ হয়, এবং ও হচ্ছে হারের-ই সামিল। "ঢাল নেই তলোয়ার নেই নিধিরাম সর্দ্দারদের" নিয়ে কংগ্রেস করা চলতে পারে কিন্তু স্বরাজ্য সৃষ্টি স্থিতি করা চলে না। সুতরাং এ কথা নির্ভয়ে বলা যায় যে মহাত্মা গান্ধী যে স্বরাজের লোভ আমাদের দেখাচ্ছেন তাতে যে আমরা তাদৃশ প্রলোভিত হচ্ছি নে তার কারণ, সে স্বরাজের স্বরূপ

আমাদের বুদ্ধির অগম্য। এক কথায় non-co-operation-এর প্রস্তাব গ্রাহ্য করার পক্ষে আমাদের প্রধান বাধা intellectual বাধা। যার intellect-এর বালাই নেই তার পক্ষে উক্ত প্রস্তাব শিরোধার্য্য করা যত সহজ বাঙালীর পক্ষে তত সহজ নয়। বাঙালী যে intellectual জাত এ সত্য তার মহাশত্রুও অস্বীকার করে না।

এই সব কারণেই আমার বিশ্বাস, বাঙালী non-co-operation গিলতে পারছে না।

(৭)

অপর পক্ষে তারা যে তা ফেলতেও পারছে না, তার কারণ, আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় কি করা কর্ত্তব্য সে বিষয়ে বাঙালীর কোনও স্পষ্ট ধারণা নেই।

পঞ্জাবের উপর অত্যাচারের কি প্রতিকার করা যায় তাই স্থির করবার জন্যই সেদিন কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন হয়েছিল। জেনেরাল Dyer জালিয়ানাবাগের খোঁয়াড়ে পুরে যদি দশ হাজার বাঁদরের উপর গুলি চালাতেন তাহলে তাঁর এই অমানুষিক নিষ্ঠুরতায় পৃথিবীর লোক স্তম্ভিত হয়ে যেত। এবং আমার বিশ্বাস যে তাহলে House of Commons ও House of Lords তাঁকে মহাবীর বলে পূজা করতে ইতস্তত করতেন, এমন কি হয় ত তাঁকে শস্তিও দিতে পারতেন, কেননা ইউরোপীয় সভ্যতা Cruelty to animals-এর ভয়ঙ্কর বিরোধী। ঘটনা যে ঘটেছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে, সেই সভ্যতার কাছে ভারতবাসীর জীবনের মূল্য পশুর জীবনের চাইতেও ঢের কম। এর পর, ভারতবাসীরা একত্র হয়ে যদি এই মর্ম্মের একটি

রিজলিউসন পাস করতেন যে, উক্ত ঘটনা তাঁদের অতি মনোকষ্টের কারণ হয়েছে, যেহেতু এ কার্য্য ইংরাজ-চরিত্র এবং ইংরাজী-সভ্যতার উপযুক্ত হয় নি, তাহলে সেটা যে ভারতবাসীর পক্ষে খুব গৌরবের কাজ হত না সে কথা বলাই বাহুল্য। অতএব গত কংগ্রেস যদি কোনও কার্য্যের কথা বলতে না পারত তাহলে কংগ্রেসের উক্ত বৈঠক বসাবার কোনও আবশ্যক ছিল না। মহাত্মা গান্ধী যাহোক এমন একটি প্রস্তাব তুলেছেন যা মেনে নিলে দেশের লোককে কিছু করতে হবে, আর কিছু না-হোক কিঞ্চিৎ ব্যক্তিগত স্বার্থ ত্যাগ করতে হবে। অপর পক্ষে সে ক্ষেত্রে কি বাঙালী কি মারহাট্টি কোনও কাজের কথা বলতে পারেন নি। উক্ত প্রস্তাব ছিল একমাত্র প্রস্তাব, তাই ওটিকে একেবারে ফেলাও কঠিন। মহাত্মা গান্ধী আর কিছু না করুন, দেশের লোককে এই সত্যটি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, যাঁরা স্বরাজের জন্য চীৎকার করছেন, তাঁদের তা লাভের জন্য কিঞ্চিৎ কষ্টস্বীকার করতেই হবে। আমাদের দেশের পলিটিক্স যে কত শূন্যগর্ভ, অর্থাৎ—আমাদের বড় বড় কথার পিছনে যে বড় বড় মন বড় বড় চরিত্র নেই, এই সত্যটিই মহাত্মা গান্ধী দেশের লোকের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। এ কারণেও দেশের লোক মহাত্মা গান্ধীর প্রস্তাবকে একেবারে প্রত্যাখ্যান করতে পারছে না, তাদের বিশ্বাস যে এই সূত্রে আমাদের নেতাদের পেট্রিয়টিজমের পরীক্ষা হয়ে যাবে।

এখন আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে, কোনও জাতের পক্ষে বহুদিন ধরে দো-মনা করাটা, তার কি আত্মা কি স্বার্থ, কিছুরই পক্ষে শ্রেয় নয়। অতএব বাঙালী পলিটিক্যালি তার মনস্থির করেছে এর পরিচয়

পেলে খুশী হব। তবে এ কথা নিশ্চিত যে, non-co-operation-এর পক্ষ কিম্বা বিপক্ষ হওয়ায় কোনও লাভ নেই। উক্ত প্রস্তাব গ্রাহ্য করলে আমরা নিজেদের ভিতর শুধু নূতন দলাদলীর সৃষ্টি ছাড়া আর কিছুই সৃষ্টি করতে পারব না—আর বিপক্ষ হলে যেমন নিষ্কর্ম্মা হয়ে বসে আছি তেমনি থাকব।

আসল কথা এই যে, কংগ্রেসি পলিটিক্সের আয়ু শেষ হয়ে এসেছে। ব্যুরোক্রাসির মামলা আর বেশি দিন চালানো যাবে না। ভবিষ্যৎ পলিটিক্সে bourgeois-এর একাধিপত্য আর থাকবে না, কেননা পৃথিবীময় demos জেগে উঠেছে। আজকের দিনে, এ জ্ঞান আমাদের হওয়া উচিত যে, পতিত ভারত উদ্ধারের আসল কথা হচ্ছে ভারতের পতিত উদ্ধার।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

ভুল স্বীকার

রামমোহন রায় সম্বন্ধে আমার লেখা যে প্রবন্ধটি গত মাসের সবুজপত্রে প্রকাশিত হয়েছে তাতে আমি শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে-র উপর এই বলে' দোষারোপ করি যে, তাঁর History of Bengalee Literature-এ রামমোহন রায় একেবারে উপেক্ষিত হয়েছেন।

সম্প্রতি আমার কোন বন্ধু আমাকে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, দে-মহাশয় তাঁর গ্রন্থের মুখপত্রে রামমোহন রায় সম্বন্ধে নীরব থাকবার কারণ উল্লেখ করেছেন। তাঁর নিজের কথা আমি এস্থলে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি।

"Some of the works of Raja Rammohan Ray and his Colleagues belong chronologically to this period but from the standpoint of literary history, they embody a subsidiary movement which comes into relief a little later, and are, therefore, deliberately reserved for later treatment."

তাঁর গ্রন্থের মুখপত্রটি আমি পূর্ব্বে পড়ি নি, সেই কারণেই আমি তাঁর উপর এই অন্যায় দোষারোপ করেছিলুম। এর জন্য আমি যথার্থ দুঃখিত ও লজ্জিত। শ্রীযুক্ত সুশীলকুমারের উপর আক্রমণ করবার আমার অবশ্য কোনরূপ অভিপ্রায় ছিল না, আমি কেবল

রামমোহন রায়ের রচনা সম্বন্ধে বাঙালী সমাজের অজ্ঞতার একটি উদাহরণস্বরূপ উক্ত গ্রন্থের উল্লেখ করি। শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার আমার নিকট সুপরিচিত, এবং তিনি জানেন যে সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁর লেখার আমি কতদূর পক্ষপাতী, সুতরাং আমার কথা যদি তাঁর এবং তাঁর বন্ধুবর্গের মনোকষ্টের কারণ হয়ে থাকে, তার জন্য আমি তাঁদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। ইতি—

১০ অগ্রহায়ণ, ১৩২৭

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

বাঙালী-পেট্রিয়টি

(জনৈক বন্ধুকে লিখিত)

—:*:—

আজ বিজয়া। এই শুভ দিনের শুভকামনা জানিয়ে এই পত্র আরম্ভ করছি। আজকের দিনে আত্মীয়স্বজনের বন্ধুবান্ধবের শুভ-কামনা করাটা আমাদের মধ্যে আবশ্য একটা সামাজিক প্রথা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। যেমন ইংলণ্ডে নূতন বৎসরের প্রথম দিনে পাঁচজনকে অন্তরের শুভকামনা জানানোটা হচ্ছে সে দেশের ভদ্রসমাজের একটা অলঙ্ঘনীয় নিয়ম, তেমনি এদেশেও পাঁচজনকে বিজয়ার, হয় প্রণাম নয় আশীর্ব্বাদ জানানো, সর্ব্বসাধারণের মধ্যে একটা অলঙ্ঘনীয় নিয়ম।

তবে এ উভয় প্রথা মামুলি হলেও এ দুয়ের ভিতর একটু প্রভেদ আছে। বিজয়ার সঙ্গে আমাদের ধর্ম্মের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ, পয়লা জানুয়ারীর সঙ্গে খৃষ্টধর্ম্মের কোনরূপ সাক্ষাৎ সম্বন্ধ আছে বলে ত জানি নে, যদি থাকে ত সে এত দূর সম্পর্ক যে, তা না থাকারই সামিল। ফলে এই বিজয়ার দিনে আমরা পরস্পারের যে শুভকামনা করি তার ভিতর শুধু ভদ্রতা নয়, আন্তরিকতাও থাকে।

আমি এ কথা স্বীকার করতে মোটেই কুণ্ঠিত নই যে, আমার পক্ষে এ দিন, তিনশ' পঁয়ষট্টির ভিতর একটা দিন নয়, কিন্তু তিনশ' চৌষট্টি ছাড়া আর একটা দিন, অর্থাৎ—এ দিনে অকারণে মনের ভিতর আশা ও আনন্দ যেমন সজাগ হয়ে ওঠে, বৎসরের অপর কোনও দিনে সকারণেও ঠিক তেমনটি হয় না। এই একটি মাত্র দিনেই

আমরা বাঙালীরা বিশেষ ক'রে নিজের অন্তরে একটা জাতীয় আনন্দের আস্বাদ পাই।

এতে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই। ভুলে যেয়ো না যে আমি একে বাঙালী, তার উপর আবার শাক্ত-ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছি। বালক কাল হতে সাবালক হওয়া পর্য্যন্ত বছরের পর বছর দুর্গোৎসবই ছিল আমার কাছে বৎসরের সব চাইতে বড় উৎসব। ধূপ দীপ শঙ্খ ঘণ্টা পুষ্প চন্দন অর্ঘ্য নৈবেদ্য এই সকলের বর্ণ গন্ধ ও শব্দের সংশ্রবে শৈশবে বাল্যে ও কৈশোরে আমার সকল ইন্দ্রিয় যুগপৎ তুষ্ট ও পুষ্ট হয়েছে। এর থেকে মনে ভেবোনা যে দুর্গোৎসবের সঙ্গে আমার শুধু ইন্দ্রিয়েরই সম্পর্ক ছিল, মনের কোনও সম্পর্ক ছিল না। প্রথমত ইন্দ্রিয়ের রাজ্য কোথায় শেষ হয় আর মনের রাজ্য কোথায় আরম্ভ হয় তার পাকা সীমানা আজও কেউ নির্দ্ধারণ ক'রে দিতে পারেন নি। দ্বিতীয়ত ভক্তি জিনিসটে হচ্ছে সংক্রামক, বিশেষত অর্ব্বাচীনের মনের পক্ষে। সুতরাং তুমি ধরে নিতে পারো যে, দুর্গা-প্রতিমার প্রতি আমার মনেরও ভক্তি ছিল। ভক্তি যে ছিল তার প্রমাণ আমি আরতির সময় মাটির প্রতিমার মুখে হাসি দেখেছি। হাসি কথাটা বোধ হয় ঠিক হল না, সে-কালের প্রতিমার মুখের যে ভাব আমাদের চোখে পড়ত সে ভাব হচ্ছে প্রসন্ন-করুণ।

দেবগণকর্ত্তৃক দেবীর স্তবের একটি শ্লোক উদ্ধৃত করে দিচ্ছি :—

"কেনোপমা ভবতু তেঽস্য পরাক্রমস্য,
রূপঞ্চ শত্রুভয় কার্য্যাতিহারি কুত্র।
চিত্তে কৃপা সমরনিষ্ঠুরতা চ দৃষ্টা।
ত্বয্যেব দেবী। বরদে। ভুবনত্রয়েপি॥

আমরা দেবীর দৃষ্টিতে যার সাক্ষাৎ পরিচয় পেয়েছি সে "সমর-নিষ্ঠুরতার" নয়, চিত্ত-কৃপার।

আমার এ কথা শুনে তুমি যা উত্তর দেবে তা জানি। তুমি বলবে ও সব হচ্ছে illusion আর delusion. অবশ্য তাই। কিন্তু এ সত্যটিও মনে রেখো যে illusion আর delusion থেকে আমরা কেউ মুক্ত নই। আজীবন এই দুটিকে নিয়েই আমরা ঘর করি, একরকম delusion-এর হাত থেকে মুক্তিলাভ ক'রে আর এক রকম delusion-এর বশীভূত হই। এক ঠাকুরকে বিসর্জ্জন দিয়ে আর এক ঠাকুরের পূজো করতে সুরু করি। তা ছাড়া যে সকল ভুলবিশ্বাস আমাদের মন থেকে চলে যায়, মনের উপর সে সকল তাদের ছায়া আলো দুই রেখে যায়, স্মৃতি আজীবন তার জের টেনে চলে। আমরা যাকে মন বলি তার ভিতর কাঁটা ছাঁটা হিরকখণ্ডের মত নিরেট কঠিন জ্বলজ্বলে সত্য খুব অল্পই আছে, তার বেশির ভাগ জায়গা জুড়ে বসে আছে যত অস্পষ্ট অনির্দ্দিষ্টভাব। আর আমাদের মতামত কার্য্যকলাপের উপর এই সকল অস্পষ্ট মনোভাবের প্রভাব বড় কম নয় এবং সে প্রভাবকে দূর করা কঠিন, কারণ তা অলক্ষিত। আমার এ সব কথা শুনে ভয় পেয়ো না যে, আমি আবার কেঁচে পৌত্তলিক হতে যাচ্ছি। আমার চিরজীবনের শিক্ষা, সে ফেরবার পথে কাঁটা দিয়েছে। ইতিমধ্যে আমার মন তিন বিদেশের—ইংলণ্ড ফ্রান্স ও ইতালির বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকদের হাতে ধোলাই হয়েছে। তা ছাড়া আমাদের মনের পক্ষে কালাপানি পার হবারও কোনই দরকার নেই, স্বদেশের মনোজগতে কিঞ্চিৎ পিছু হটলেই এমন জায়গায় পৌঁছনো যায়, যেখানে যাবামাত্র আমাদের প্রতিমা-ভক্তি উড়ে যায়। "ন প্রতিকে ন হি স"

এ সূত্র ত বেদান্তেই আছে। আর বলা বাহুল্য যে, এ যুগে আমরা সবাই বৈদান্তিক, অর্থাৎ—আমরা ধর্ম্ম মানি, কিন্তু কোন ধর্ম্মই মানি নে।

আমার মনের কথা তোমাকে এতটা খুলে বলবার উদ্দেশ্য এই সত্যটা স্পষ্ট করা যে, আমার পুঁথিপড়া মন সংস্কৃত-বিলেতি হলেও তার নীচে যে মন আছে তা মূলত বাঙালী। বাঙালী হিন্দুর মনের ধর্ম্মের পরিচয় নিতে হলে বাঙালীর চিরাগত ধর্ম্মের পরিচয় নিতে হয়। তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে, বাঙলা ছাড়া ভারতবর্ষের আর কোথায়ও দুর্গোৎসব জাতীয়উৎসব নয়। এ বিষয়ে আমার শেষ কথা এই যে, আমাদের পারিবারিক ও সেই সঙ্গে আমাদের সামাজিক ধর্ম্ম আমাদের মনের ঘরে যে রূপ রস গন্ধ ও তেজ সঞ্চিত রেখে গিয়েছে তার জন্য আমি মোটেই দুঃখিত নই। ষোড়শোপচারে এই মূর্ত্তি-পূজার প্রসাদেই বাঙালী জাতির মনের poetic এবং æsthetic অংশ গড়ে উঠেছে। কোনও ধর্ম্মবিশ্বাস মানুষের মন থেকে চলে গেলেও তার রূপটুকু, তার সৌরভটুকু সেখানে রেখে যায়। এটা কখনো লক্ষ্য করেছ যে, দর্শন বিজ্ঞানের আক্রমণে ধর্ম্ম কখনো মারা যায় না, হয় শুধু রূপান্তরিত? কোনও বিশেষ ধর্ম্মমতকে যখন আর সত্য বলে বিশ্বাস করা চলে না, তখন বৈষয়িক লোকের কাছে তা শিব বলে গ্রাহ্য হয়, আর অবৈষয়িক লোকের কাছে সুন্দর বলে। রবীন্দ্রনাথ পৌত্তলিক ধর্ম্মের আবহাওয়ায় মানুষ হন নি, অথচ তাঁর কবিতা আদ্যোপান্ত ধূপবাসিত, দীপালোকিত পুষ্পচন্দনে সুরভিত, শঙ্খঘণ্টায় মুখরিত। এই প্রকৃষ্ট প্রমাণ যে, যার পারিবারিক ধর্ম্ম যাই হোক না কেন, বাঙালীর জাতীয়পূজার প্রভাব বাঙালীর সৌন্দর্য্যজ্ঞানকে পরিচ্ছিন্ন করেছে, বাঙালীর হৃদয়বৃত্তিকে পরিপুষ্ট করেছে।

তুমি মনে ভাবতে পারো যে, আমি এ উৎবের একটি কলঙ্কের কথা, বলিদানের কথা চেপে গিয়েছি। ধর্ম্মের নামে পশুহত্যা আমরা ছাড়া ভারতবর্ষের অপর কোনও সভ্য জাতি করে না। আর এ হত্যা যে, যেমন অনর্থক তেমনি বর্ব্বর, আজকের দিনে কোনও শিক্ষিত বাঙালী তা স্বীকার করতে তিলমাত্র দ্বিধা করবেন না। নিরীহ ছাগ-শিশুকে হাড়কাঠে ফেলে বলি দিয়ে যাঁরা মনে করেন যে তাঁরা 'সমর নিষ্ঠুরতা'র অভিনয় করছেন— তাঁদের পৌরুষের বালাই নিয়ে মরতে ইচ্ছে যায়। তাঁদের বীরত্ব প্রকাশের উপযুক্ত ক্ষেত্র হচ্ছে পলিটিক্সের বাকযুদ্ধ। হত্যাকে ধর্ম্ম বলতে আমরা অবশ্য কেউ প্রস্তুত নই। তবে সত্যের খাতিরে আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে যারা বৈদিক তান্ত্রিকসমাজে মানুষ হয়েছে, সে সকল বাঙালীর পক্ষে জবাফুল চক্ষুঃশূল নয়, আর রক্তচন্দনের ফোটায় তাদের কপালও চড় চড় করে না। এ জ্ঞান তাদের আছে যে মানুষের জীবন-রাগিণীতে কড়ি ও কোমল দুই রকম সুরই সমান লাগে। এই রাজসিক পূজা আমাদের মনকে সকল প্রকার রাজসিক ধর্ম্মের প্রতি অনুকূল করেছে। তা সে ধর্ম্ম সহিত্যেরই হোক, আর সমাজেরই হোক। এই লম্বা বক্তৃতার উদ্দেশ্য তোমাকে বোঝানো যে, আমার ঐ বিজয়ার প্রীতিসম্ভাষণ শূন্যগর্ভ নয়, অস্পষ্ট আশার স্পর্শে তা মুকুলিত, অহৈতুকী আনন্দের বর্ণে তা রঞ্জিত।

(২)

এই সূত্রে এই সুযোগে আমি তোমার কাছে আমার সাহিত্যিক ঋণ পরিশোধ করতে চাই। তোমার কাছে আমার বকেয়া কৈফিয়ৎটি

আজ সুদ-শুদ্ধ শুধে দেবার জন্য কৃতসংকল্প হয়েছি। অমৃতশহর কংগ্রেসের পিঠ পিঠ তুমি আমাকে যে চিঠি লেখ, তার উত্তর আমি দিই নি, কেননা উত্তর যে কি দেব তা তখন ভেবে পাই নি। তুমি আমার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনো যে, আমার অন্তরে যা আছে সে হচ্ছে বাঙালী-প্রেট্রিয়টিজম। এ অভিযোগে আমি কবুল জবাব দিতে বাধ্য। বাঙালী-পেট্রিয়টিজমকে মনে আশ্রয় ও প্রশ্রয় দেওয়াটা বাঙালীর পক্ষে যদি দোষের হয়, তাহলে সে দোষে আমি চিরদিনই দোষী আছি। আমার গত আট বৎসরের লেখার ভিতর এ অপ-রাধের এত প্রমাণ আছে যে, সে সকল একত্র সংগ্রহ করলে একখানি নাতিহ্রস্ব পুস্তিকা হয়ে ওঠে।

তবে জিজ্ঞাসা করি, একজন বাঙলা-লেখকের কাছ থেকে তুমি আর কোন্ পেট্রিয়টিজমের প্রত্যাশা কর? আমি যে ইংরাজি লিখি নে তার থেকেই বোঝা উচিত যে অবঙ্গ পেট্রিয়টিজম আমার মনের উপর একাধিপত্য করে না। যে ভাষা ভারতবর্ষের কোন দেশেরই ভাষা নয়, সেই ভাষাকে সমগ্র ভারতবর্ষের ভাষা গণ্য ক'রে সেই ভাষাতে পেট্রিয়টিক বক্তৃতা করতে হলে আমি সেই পেট্রিয়টিজমের বাহানা করতে বাধ্য হতুম যে, দেশপ্রীতি ভারতবর্ষের কোন দেশের প্রতি ভালবাসা নয়, কিন্তু সমগ্র ভারতবর্ষের প্রতি প্রীতি। মুখস্থ ভাষায় শুধু মুখস্থ ভাবই প্রকাশ করা যায়। তার প্রমাণ আমাদের কনফারেন্স কংগ্রেসে নিত্যই পাওয়া যায়, দেশের যত মুখস্থবাগীশ ও-সকল সভার তাঁরাই হচ্ছেন যুগপৎ নায়ক ও গায়ক। সে যাই হোক, কোনরূপ ভালবাসার-কৈফিয়ৎ চাওয়াও যেমন অন্যায়, দেওয়াও তেমনি শক্ত, তা সে অনুরাগের পাত্র ব্যক্তিবিশেষই হোক, জাতিবিশেষই

হোক। এ বলে রাখা ভাল যে, আমরা যাকে স্বদেশপ্রীতি বলি আসলে তা স্বজাতি-প্রীতি। দেশকে ভালবাসার অর্থ দেশবাসীকে ভালবাসা—কেননা মানুষে শুধু মানুষকেই ভালবাসে। যদি এমন কেউ থাকেন যিনি মানুষকে নয় মাটিকে ভালবাসেন, তা হলে ধরে নেওয়া যেতে পারে তিনি মানুষ নন—জড়পদার্থ, কেননা জড়ের প্রতি জড়ের যে একটা নৈসর্গিক ও অন্ধ আকর্ষণ আছে, এ সত্য বিজ্ঞানে আবিষ্কার করেছে।

যাক্ ও সব অবান্তর কথা। আসল কথা এই যে, স্বজাতি-প্রীতির কৈফিয়ৎ কারো কাছে চাওয়া অন্যায়, কারণ ও-হচ্ছে মনের একটা দুর্ব্বলতা। স্বজন-বাৎসল্যরূপ ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্ব্বল্য যখন অর্জ্জুনেরও ছিল তখন আমাদের মত ক্ষুদ্র ব্যক্তিদেরও যে থাকবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি? আর বাঙালী বাঙালী মাত্রেরই স্বজন, তার কারণ—ভাষার যোগ হচ্ছে, মানস কায়ে রক্তের যোগ। সুতরাং বাঙালীদের পরস্পরের প্রতি নাড়ীর টান থাকাই স্বাভাবিক, না থাকাটাই অদ্ভুত।

তার পর এ প্রীতির পূরো কৈফিয়ৎ দেওয়া শক্ত, কেননা তার মূল আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ নয়। ছেলে বেলায় গুরুমহাশয়েরা আমাদের একটা ভারি শক্ত অঙ্ক কসতে দিতেন, যা আমরা সকলে কসে উঠতে পারতুম না। সে অঙ্ক হচ্ছে এই:—

"আছিল দেউল এক পর্ব্বত প্রমাণ
তেহাই সলিলে তার,.........

তার পর কি আছে ঠিক মনে পড়ছে না। কবিতা আমার কণ্ঠস্থ থাকে না। তবে এটুকু মনে আছে যে, সে মন্দিরের মাটির ভিতর

কতটা পোঁতা আছে আঁক কসে তাই আমাদের বার করতে হত। এখন আমার কথা এই যে, মানুষের মন পর্ব্বত প্রমাণই হোক আর বল্মিক প্রমাণই হোক, তার সমস্তটা জেগে নেই। তার অনেকটা স্বজাতির মনের জমির নীচে পোঁতা আছে, আর অনেকটা নিজের অন্তরের তরল ভাবে ডুবে আছে, যেটুকু জেগে আছে সেইটুকু আমরা নিজে দেখতে পাই, অপরকেও দেখাতে পারি; কিন্তু সেই আংশিক মন দিয়ে আমাদের সমগ্র মনের পুরো পরিচয় আমরা দিতে পারি নে। সুতরাং আমাদের রাগদ্বেষের সঠিক কারণ আমরা সব সময়ে নিজেও জানি নে, অতএব পরকেও জানাতে পারি নে। এ ক্ষেত্রে নিজের কোট বজায় রাখবার জন্য মানুষে যে সব তর্কযুক্তি দেখায় সে সব ষোলআনা গ্রাহ্য নয়। কেননা যুক্তিতর্কের দোষ এই যে, তার দ্বারা আমরা অপরকে প্রবঞ্চিত করতে না চাইলেও অনেক সময় নিজেকে প্রবঞ্চিত করি। কে না জানে যে, পৃথিবীতে যে সকল নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বড় বড় কথার সৃষ্টি হয়েছে সে সকল অধিকাংশ লোকের শুধু আত্মপ্রবঞ্চনার কাজেই লাগে। আমি একজন মহাধার্ম্মিক, উপরন্তু মহা পেট্রিয়ট, এ কথা মনে ক'রে কে না আত্মপ্রসাদ লাভ করে ?

এতক্ষণে বুঝতে পারছ যে আমি আমার বাঙালী-পেট্রিয়টিজম সমর্থন করে, তোমার কাছে কোনো লিখিত জবাব কেন দাখিল করি নি। তা করলে নিজের না হোক, নিজের জাতের জাঁক আমাকে নিশ্চয়ই করতে হত।

কিন্তু সেদিন তোমার মুখে যা শুনলুম তাতে ক'রে আমার এই মৌনতার জন্য অনুতাপ করছি। 'সবুজপত্রে' তোমার অনুরোধ মত

আমার কৈফিয়ৎ-সহ তোমার পত্র প্রকাশ না করার দরুণ, সে পত্র তুমি হিন্দিতে অনুবাদ ক'রে মহাত্মা গান্ধীর কাগজে প্রকাশ করেছ। যদি জানতুম, "রাজেন্দ্র সঙ্গমে দীন যথা যায় দূর তীর্থ দরশনে" সেই ভাবে আমার কৈফিয়ৎ তোমার পত্রের অনুচর হ'য়ে মহাত্মা গান্ধীর কাগজে প্রবেশ লাভ করবে, তাহলে আমার মরচে-পড়া ওকালতি-বুদ্ধি মেজে ঘসে তার সাহায্যে এমন একটি বর্ণনাপত্র তৈরি করে দিতুম, যাতে সত্য মিথ্যা একাকার হয়ে যেত, আর যা পড়ে পলিটিক্যাল-হাকিমের দল আমার বিরুদ্ধে একতরফা ডিক্রী দিতে পারতেন না।

(৩)

সংস্কৃতে বলে 'গতস্য শোচনা নাস্তি' কিন্তু ইংরাজিতে বলে, 'it is never too late to mend', আমি ইংরাজি-শিক্ষিত, অতএব ঐ ইংরাজি বচন শিরোধার্য্য ক'রে, এ কৈফিয়ৎ লিখতে বসেছি এই আশায় যে সেটি হিন্দিতে, অর্থাৎ—আগামী স্বরাজের, lingua franca-য় প্রমোশন পাবে।

আমার প্রথম বক্তব্য এই যে, বাঙলা দেশে বাঙালীর ঘরে জন্মালেও আমি খাঁটি বাঙালী নই। একছত্র, একদণ্ড, ইংরাজ শাসনের অধীনে বাস ক'রে, আর পাঁচথেকে পঁচিশ বৎসর বয়েস পর্য্যন্ত ইংরাজি-শাসিত স্কুল কলেজে ইংরাজি শিক্ষা লাভ করে, আমি হয়ে উঠেছি একজন neo-Indian ওরফে non-Indian, অর্থাৎ—কংগ্রেস-ওয়ালারা যে জাত আমিও সেই জাত। পলিটিক্সের সুরা আমিও যথেষ্ট পান করেছি এবং তার নেশা আজও ছাড়াতে পারি নি,

আর ভারতবর্ষের ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান অদ্যাবধি আমি সেই নেশার ঝোঁকে না হোক সেই নেশার চোখেই দেখি। সুতরাং প্রাদেশিক পেট্রিয়টিজমের স্বপক্ষে ভারতবর্ষীয় পলিটিক্সের দিক থেকে যদি কিছু বলবার থাকে ত তাই বলব। বাঙালী পেট্রিয়টিজমের মূলে আছে বাঙালী জাতির স্বীয় স্বাতন্ত্র্যজ্ঞান। Self-determination of small nations এর মতানুসারে বাঙালী পেট্রিয়টিজমের বিশেষ সার্থকতা আছে। প্রথমত আমরা একটি বিশেষ জাতি, তার পর আমরা একটি ক্ষুদ্র জাতি, সুতরাং আমাদের self-determination বিরোধী হচ্ছে Indian Imperialism. আর গতযুদ্ধে প্রমাণ হয়ে গেছে যে, Imperialism সর্ব্বনেশে জিনিস, তা সে স্বদেশীই হোক আর বিদেশীই হোক। ইংরাজের সাম্রাজ্যের ভিতর বিদেশ আছে জর্ম্মাণীর ছিল শুধু স্বদেশ। আর জর্ম্মাণীর এই স্বদেশী imperialism, জর্ম্মাণ জাতির নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক অধঃপাতের যে একমাত্র কারণ, তার খোলা-দলিল ত আজকের দিনে সকলের চোখের সুমুখেই পড়ে রয়েছে। বহুকে এক করবার চেষ্টা ভাল, কিন্তু একাকার করবার চেষ্টা মারাত্মক, কেন না তার উপায় হচ্ছে জবরদস্তি। যদি বলো যে ভারতবর্ষের সম্বন্ধে এ কথা খাটে না। তার উত্তর আমাদের সম্বন্ধে self-determination যদি না খাটে ত ইউরোপে মোটেই খাটে না। ইউরোপে কোন জাতির সঙ্গে অপর কোন জাতির সে প্রভেদ নেই, আমাদের এক জাতির সঙ্গে অপর জাতির যে প্রভেদ আছে। বাঙলার সঙ্গে মাদ্রাজের যে প্রভেদ ইংলণ্ডের সঙ্গে হল্যাণ্ডের সে প্রভেদ নেই, এমন কি ফ্রান্সের সঙ্গে জর্ম্মাণীরও সে প্রভেদ নেই। তবে যে প্রাদেশিক পেট্রিয়টিজমের নাম শুনলে এক

দলের পলিটিসিয়ানরা আঁতকে ওঠেন তার কারণ, তাঁদের বিশ্বাস ও-মনোভাব জাতীয় সঙ্কীর্ণ স্বার্থপরতার পরিচয় দেয়। নিজের সন্তান-কে স্তন দিলে, কোনও মায়ের উপর যদি এই অভিযোগ আনা হয় যে, সে মাতা অতি স্বার্থপর যেহেতু তিনি পাড়াপড়শির ছেলেদের নিজের স্তন্যক্ষিরে বঞ্চিত করছেন তাহলে সে অভিযোগের কি কোনও প্রতিবাদ করা আবশ্যক? মানুষের পক্ষে যা অস্বাভাবিক তাই করার ভিতর যে আসল মনুষ্যত্ব নিহিত, এ কথা বলে অতিমানুষে আর শোনে অমানুষে। ধরো যদি কোনও জননী নিজেকে জগজ্জননী জ্ঞানে পাড়াসুদ্ধ ছেলে-মেয়েদের নিজের স্তনের দুধ যোগাতে ব্রতী হন, তাহলে কাউকে বঞ্চিত না করে সবাইকে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দিতে হলেও সে দুধে এত জল মেশাতে হবে যে তা পান ক'রে কারও পেট ভরবে না, সকলের পেট ভরবে শুধু যকৃতে। আমার বিশ্বাস আমাদের পলিটিসিয়ান্‌রা অদ্যাবধি পেট্রিয়টিজমের উক্তরূপ জলো-দুধের কারবার করছেন, এবং আর সকলকেও তাই করতে পরামর্শ দিচ্ছেন।

(৪)

যদি জিজ্ঞাসা করো যে, এই সহজ সত্যটা লোকের চোখে পড়ে না কেন?—তার উত্তর আমাদের অবস্থার গুণে। সমগ্র ভারতবর্ষ আজ বিদেশী রাজার অধীনে, সুতরাং ভারতবর্ষের কোন প্রদেশেরই আজ রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য নেই। আমাদের পরস্পরের মধ্যে আজ প্রধান বন্ধন হচ্ছে পরাধীনতার বন্ধন, এবং এ অধীনতার পাশ হতে কোনও প্রদেশবিশেষ নিজ চেষ্টায় নিজ কর্ম্মগুণে মুক্ত হতে পারবে না। এ অবস্থায় আমাদের সবারই পলিটিক্যাল-সমস্যা একই সমস্যা। সে

সমস্যা হচ্ছে এই যে, অধীনতা কি করে স্বাধীনতায় পরিণত করা যায়। সুতরাং আজকের দিনে ত্রিশকোটি ভারতবাসীকে 'সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং' এই উপদেশ কিম্বা আদেশ দিতে আমরা বাধ্য। আমাদের সকলেরই তাই একই বাদ, সে হচ্ছে অধীনতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, আর আমাদের সকলেরই গম্যস্থান একই—স্বরাজ্যে।

প্রাদেশিক পেট্রিয়টিজমের মূল্য যে কি, তা দেশের লোক স্বরাজ্যে পৌঁছিবামাত্র টের পাবে। অধীনতার যোগসূত্র স্বাধীনতার স্পর্শে ছিঁড়ে যাবে। প্রভুত্বের চাপে দাসের দল একাকার হয়ে যেতে পারে, কিন্তু স্বাধীন মানব তার স্বধর্ম্মের চর্চ্চা ক'রে তার স্বাতন্ত্র্য ফুটিয়ে তুলবে। তখন ভারতবর্ষের নানা জাতি একাকার হবার চেষ্টা করবে না, পরস্পরের ভিতর ঐক্য স্থাপন করবার চেষ্টা করবে। আজকের দিনের কংগ্রেসী-ঐক্যের সঙ্গে সে ঐক্যের আকাশ পাতাল প্রভেদ হবে। বাইরের চাপে মিলিত হওয়া, আর প্রীতির প্রভাবে মিলিত হওয়া একবস্তু নয়। এক জেলে পাঁচজন কয়েদির মিলন আর এক সমাজের পাঁচজন স্বাধীন লোকের মিলনের ভিতর যে প্রভেদ আছে, আজকের ভারতের নানা জাতির কংগ্রেসী-মিলনের সঙ্গে কালকের স্বরাজ্যবাসী জাতিদের মিলনের সেই প্রভেদ থাকবে। তখন প্রাদেশিক পেট্রিয়টিজমের ভিত্তির উপরেই বাক্যগত নয় বস্তুগত ভারতবর্ষীয় পেট্রিয়টিজম গড়ে উঠবে।

ছেলেবেলায় হিতোপদেশে পড়েছি :—

"অস্তি গোদাবরি তীরে বিশাল শাল্মলী তরুঃ। তত্র নানা দিগ্দেশাৎ আগত্য রাত্রৌ পক্ষীনঃ নিবসন্তি-স্ম।" রাত্রিকালে নানা দিগেদশ হতে পাখীরা এসে গোদাবরী তীরে সেই শিমুল গাছে জড় হত কেন

কিছুক্ষণ কচায়ন করে তার পর আরামে নিদ্রা দেবার জন্য। এ বিষয়ে সকল পক্ষীর স্বার্থ একই। কচায়ন শব্দের মানে বোধ হয় জান না। পক্ষীর ভাষায় ও-শব্দের অর্থ পক্ষী-সভার রাজনৈতিক আলোচনা।

আমরাও যে ভারতবর্ষের এই রাত্রিকালে কংগ্রেসে গিয়ে দিন তিনেক ধরে কচায়ন করে তার পর নিদ্রা দিই, সেও ঐ একই কারণে। এ কচায়ন করা যে সম্ভব হয়, তার কারণ ইংরাজ-দত্ত শিক্ষার গুণে আমাদের সকলের মুখেই এক বুলি। এ বুলি যে শুধু আমাদের মুখের কথা, মনের কথা নয়, এ অপবাদ আমি দিচ্ছি নে। আমি শুধু এই সত্যটি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, কংগ্রেসি-পেট্রিয়টিজমের পিছনে যে মন আছে, সে হচ্ছে আমাদের সকল জাতের বিলেতি পুঁথিপড়া মন। সে মন আমাদের সবারই এক। কিন্তু তার নীচে যে মন আছে সে মন প্রতি জাতির নিজস্ব এবং পরস্পর পৃথক। আর আমাদের ভবিষ্যত সভ্যতা গড়ে উঠবে আমাদের মনের এই গভীর অন্তস্তল হতে। বিদেশী-শিক্ষার ফলে এই সত্যটা ভুলে যাবার সম্ভাবনা অত্যন্ত বেড়ে গিয়েছে বলে, আজকের দিনে ভারতবর্ষের প্রতি জাতিকে বলা আবশ্যক know thyself এবং প্রাদেশিক পেট্রিয়টিজমের সার্থকতাই এইখানে। স্বজাতীয় স্বার্থসাধনের জন্য আমাদের সকলেরই আজ প্রস্তুত হতে হবে।

(৫)

আর বেশি এগোবার আগে একটা কথার অর্থ পরিষ্কার করা দরকার, সে কথাটা হচ্ছে স্বার্থ। ও-কথাটা উচ্চারণ করবামাত্র

আমাদের চোখের সুমুখে ধন-ধান্যের সোনার ছবি এসে দাঁড়ায়। এ ত হবারই কথা। আমরা যখন প্রাণী ও প্রাণের সর্ব্বপ্রধান চেষ্টা যখন আত্মরক্ষা করা, তখন অন্ন আমাদের চাই-ই চাই।

আর পলিটিক্সের যত বড় বড় কথা আছে তার আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক খোলস ছাড়িয়ে নিলে কি দেখা যায় না যে, তার ভিতরকার মোটা কথা হচ্ছে অন্ন? আজকের দিনে পৃথিবীতে পলিটিক্সের দুটি বড় কথা হচ্ছে capitalism, এবং bolshevism বাদবাকী আর যত রকম 'ism' আছে সে সবই হয় capitalism নয় bolshevism-এর কোঠায় পড়ে। হাল পলিটিক্সের এই দুই ধর্ম্ম এতই পরস্পর বিরোধী যে উভয়ের মধ্যে অর্দ্ধেক পৃথিবী জুড়ে আজ জীবন-মরণের যুদ্ধ চলছে। অথচ এই উভয় পলিটিক্যাল ধর্ম্মের ভিতর একই জিনিস আছে এবং সে জিনিস হচ্ছে অন্ন। তবে মানব জাতি যে দুভাগ হয়ে পড়েছে সে ঐ অন্নের ভাগ নিয়ে। Capitalism-এর মূল সূত্র হচ্ছে অল্প লোকের বহুঅন্ন আর bolshevism-এর মূল সূত্র হচ্ছে বহুলোকের যথেষ্ট অন্ন। আমার বিশ্বাস এ দুয়ের কোনটিই টিঁকবে না। কেননা Capitalism ভুলে গিয়েছে যে রুটি সকলেরই চাই, আর bolshevism মনে রাখে নি man does not live by bread alone, অর্থাৎ—মানুষের মন বলেও একটা জিনিস আছে, অতএব পেটের খোরাক ছাড়া মানুষের মনের খোরাকও চাই, নচেৎ মানুষ পশুর সঙ্গে নির্বিশেষ হয়ে পড়ে।

এ কথা যদি সত্য হয়, তাহলে স্বীকার করতেই হবে যে, স্বার্থের মোটা অর্থ হচ্ছে পেটের স্বার্থ, আর পলিটিক্স ও ইকনমিক্স প্রভৃতি মুখ্যত এই স্বার্থসিদ্ধির মন্ত্রতন্ত্র। মনের স্বার্থের সঙ্গে এ মন্ত্রতন্ত্রের

সম্বন্ধ গৌণ। তবে যে পেটের কথাকে আমরা আত্মার কথা বলে ভুল করি, তার কারণ অন্নের সঙ্গে প্রাণের, প্রাণের সঙ্গে মনের, সংক্ষেপে উদরের সঙ্গে হৃদয়ের এবং হৃদয়ের সঙ্গে মস্তিষ্কের যোগ অতি ঘনিষ্ঠ। মানুষের সুখ মানুষের উন্নতি এই অন্ন ও মনের যোগাযোগেরই উপর নির্ভর করে। একমাত্র ভৌতিক ভাত খেয়ে মানুষ তার সৎ রক্ষা করতে পারলেও, তার চিৎ ও আনন্দ রক্ষা করতে পারে না। অপর পক্ষে একমাত্র স্বরীতানন্দ সেবন করে মানুষ তার আনন্দ রক্ষা করতে পারলেও তার চিৎ ও সৎ রক্ষা করতে পারে না। আর সচ্চিদানন্দ হওয়াই ত মানবজীবনের সার্থকতা। অতএব দাঁড়াল এই যে, মানুষের পক্ষে যেমন লাঙ্গল চাই তেমনি লেখনীও চাই, যেমন হাতুড়ি চাই তেমনি তুলিও চাই, জাতীয় জীবনে যেমন পলিটিক্স ও ইকনমিক্স চাই, তেমনি বিজ্ঞান ও আর্ট, কাব্য ও দর্শনও চাই।

সুতরাং একজাতের nationalism-এর নাম শোনবামাত্র আমরা যখন সেটি অপরের nationalism-এর বিরোধী মনে করে ভীত হয়ে উঠি তখন বুঝতে হবে যে আমরা nationalism শব্দটা তার শুধু ঔদরিক অর্থে বুঝি, কেননা মানুষ মানুষের সঙ্গে শুধু অন্ন নিয়েই মারামারি কাড়াকাড়ি করে, কিন্তু মানুষের মনোজগতের বস্তু হচ্ছে পরস্পরের আদানপ্রদানের বস্তু, এক কথায় বিশ্বমানবের সম্পত্তি কোনও জাতিবিশেষের স্থাবর সম্পত্তি নয়। যখন কোনও ব্যক্তি অপর জাতের সঙ্গে মনের কারবার বন্ধ করবার প্রস্তাব করেন, তখন বুঝতে হবে যে তিনি হচ্ছেন ঘোর materialist, কেননা তাঁর বিশ্বাস যে mind-ও matter-এর মত দেশের গণ্ডীতে বদ্ধ। এ কথাটা এখানে উল্লেখ করলুম এইজন্যে যে, এ দেশে নিত্যই দেখা যায় যে, আধ্যাত্মিকতার

বেনামিতে জড়বাদ, যেমন শতমুখে প্রচার হচ্ছে তেমনি দেশময় নির্ব্বিচারে গ্রাহ্যও হচ্ছে। এইখানে একটা কথা বলে রাখি। ঔদরিক-স্বার্থসাধন করবার চেষ্টাটা মোটেই নিন্দনীয় নয়, ব্যক্তিবিশেষের পক্ষেও নয়, জাতিবিশেষের পক্ষেও নয়। সুতরাং পলিটিক্সের প্রথম কর্ত্তব্য হচ্ছে জাতীয় অন্ন-সমস্যার সমাধান করা। আর বলা বাহুল্য, এ সমস্যার মীমাংসা জাতীয় অবস্থার জ্ঞান স্বাপেক্ষ। কথার রাজ্যথেকে কাজের রাজ্যে নেমে এলেই আমাদের বস্তুজগতের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে অনেকটা আবদ্ধ হয়ে পড়তে হয়। দেশশাসনের ভার যখন আমাদের হাতে আসবে তখনই দেখা যাবে যে, প্রতি প্রদেশ তার নিজের সামাজিক ঘরকন্না নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। তখন যা আমাদের বিশেষ কাজে লাগবে সে হচ্ছে প্রাদেশিক পেট্রিয়টিজম। যে রুসোর পলিটিক্যাল মতামতের ঘসা-পয়সা নিয়ে আমাদের পেট্রিয়টিজমের আগাগোড়া কারবার তিনিই বলে গেছেন যে, কর্ম্মক্ষেত্রে পেট্রিয়টিজমকে অনেকটা সঙ্কুচিত করে আনতে হয়।

সে যাইহোক আমার বাঙালী nationalism মুখ্যত মানসিক এবং গৌণত রাজনৈতিক। আমাদের মনের স্বরাজ্য লাভ করা ও রক্ষা করা এবং তার ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করাই হচ্ছে আমার প্রধান ভাবনা। রাজনৈতিক স্বরাজ্য মনে স্বরাট হবার একটি উপায়মাত্র, তা ছাড়া আর কিছুই নয়।

(৬)

এখন বাঙালীর মনের বিশেষত্ব যে কোথায় তার কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া যাক্। এ পরিচয় দেওয়াটা একেবারে অসম্ভব নয়, কেননা

বাঙালীর national-self-consciousness কতকটা প্রবুদ্ধ হয়েছে। এই national-self-consciousness কথাটা আমাদের স্বদেশীযুগে মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। সেকালে অবশ্য দেশের লোক এ কথাটা তার পলিটিক্যাল অর্থেই বুঝত। তখন আত্মজ্ঞান অর্থে আমরা বুঝতুম আমাদের পরাধীনতা সম্বন্ধে জাতীয় চৈতন্য ও বেদনা। বলা বাহুল্য, এই সংকীর্ণ অর্থে, সমগ্র ভারতবর্ষের আত্মজ্ঞান ও বাঙলার আত্মজ্ঞান একই বস্তু। কিন্তু এ বোঝাটা ভুল বোঝা। কেন না তা হলে স্বাধীন জাতের পক্ষে—জাতীয় আত্মজ্ঞান বলে কোনও জিনিসই নেই। কিন্তু তা যে আছে তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই যে, ঐ সমস্ত পদটি ইউরোপ থেকে এ দেশে আমদানি করা হয়েছে, ও-পদের বিলেতে জন্ম। কথাটা এতই বিলেতি যে, আমাদের কোনও ভাষায় ওটির সঠিক তরজামা করা চলে না।

মানুষমাত্রেই মুখ্যত এক হলেও সকলের শরীরের চেহারাও যেমন এক নয়, সকলের মনের চেহারাও এক নয়। ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির যেমন প্রকৃতির ও শক্তির প্রভেদ আছে, জাতির সঙ্গে জাতিরও তেমনি প্রকৃতির ও শক্তির প্রভেদ আছে আর ব্যক্তিই বল আর জাতিই বল, উভয়েরই উন্নতির মানে হচ্ছে এই স্বাতন্ত্র্যকে বিকশিত করে তোলা, কেননা সেই চেষ্টাতেই তার সুখ সেই চেষ্টাতেই তার মুক্তি। যাতে করে এই স্বাতন্ত্র্য চেপে দেয় তাই হচ্ছে বন্ধন। জীবনের বন্ধনের চাইতে মনের বন্ধন কম মারাত্মক নয়। আর আমাদের মনের যে একটা বিশেষ ধাত আছে সে কথা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না। একটা জানা-দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক্। জাতীয় মনের আসল প্রকাশ সাহিত্যে। বর্ত্তমান ভারতবর্ষে

বাঙলা সাহিত্যর তুল্য দ্বিতীয় সাহিত্য নেই। ভারতবর্ষের অপর কোনও জাতি দ্বিতীয় বঙ্কিমচন্দ্র কিম্বা দ্বিতীয় রবীন্দ্রনাথের জন্মদান করতে পারে নি। অতএব এ কথা নির্ভয়ে বলা যেতে পারে যে, মনোজগতে আমরা বাকী ভারতবর্ষের সঙ্গে এক লোকে বাস করি নে। আমাদের অন্তরে জ্ঞানের ক্ষুধা আছে, কাব্যরসের পিপাসাও আছে। এর ফলে মনোজগতে আমাদের কাছে 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' এবং সেই কারণে ইউরোপের সাহিত্য বিজ্ঞানের শিক্ষা আমরা যতটা আত্মসাৎ করেছি ভারতবর্ষের অপর কোনও জাত তদনুরূপ পারে নি।

ইউরোপীয় শিক্ষা যে ভারতবর্ষের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনের অল্প বিস্তর বদল করেছে এ কথা আমি মানি, কেননা না-মেনে উপায় নেই। আমাদের পলিটিক্যাল-মতামত যে, 'ক' থেকে 'ক্ষ' পর্য্যন্ত আগাগোড়া বিলেতি জিনিস, এ ত সবাই জানে। দেশসুদ্ধ লোকের পলিটিক্যাল-আত্মা যে ইউরোপের হাতে গড়ে উঠেছে, এ কথা এক পেশাদার-ন্যাসনালিষ্ট ছাড়া আর কারো অস্বীকার করবার প্রয়োজন নেই।

তবে অপর ভারতবাসীর সঙ্গে আমাদের প্রভেদ এই যে, আমরা ইউরোপের কাছে এক পলিটিক্স ছাড়া আরো কিছু বিদ্যা আদায় করেছি। ইউরোপের কাব্য বিজ্ঞানের প্রভাব আমাদের মনের উপর নিতান্ত কম নয়। Lafcadio Hern-এর বইয়ে পড়েছি যে সেক্সপিয়ারের নাটক—জাপানিদের মনের কোনখানে স্পর্শ করে না। অপর পক্ষে সেক্সপিয়ারের কাব্য আমাদের মনের সকল তারে ঘা দেয়। সে কাব্য আমাদের মর্ম্ম স্পর্শ করে এবং সে স্পর্শে আমাদের অন্তরাত্মা পুলকিত হয়ে ওঠে।

শুধু কাব্য নয় ইউরোপের বিজ্ঞানও আমাদের অতি প্রিয় সামগ্রী। এ বিশ্ব আমাদের কাছে শুধু জড়জগৎ নয়, ভাবের জগৎও বটে, ইন্দ্রিয়ের দর্শনের স্পর্শনের, মনের ধ্যান ধারণার বস্তু। আমরা জানি রস খালি কথায় নেই, বিশ্বেও আছে; রূপ খালি আর্টে নেই, প্রকৃতিতেও আছে। এ বিশ্বের অসীমতা ও অসীম বৈচিত্র্য, তার অন্তর্নিহিত শক্তির ছন্দোবদ্ধ লীলা আমাদের মনকে মুগ্ধ করে। এই বিশ্ব-নামক মহাকাব্যের রসাস্বাদ করবার কৌতূহল আমাদের অনেকেরই মনে আছে। তাই না বাঙালী-যুবক Einstein-এর নবাবিষ্কৃত আলোক-তত্ত্বের পরিচয় নিতে এত ব্যাকুল, যদিচ তারা সবাই জানে এই নবাবিষ্কৃত তত্ত্ব কর্ম্মে ভাঙিয়ে নেবার আশু সম্ভাবনা নেই। আমাদের জাতীয় মন জ্ঞানমার্গের পথিক বলেই বাঙলায় জগদীশ বসু প্রফুল্ল রায়ের আবির্ভাব হয়েছে। মনোজগতের বস্তুর প্রতি আমাদের এই আন্তরিক অনুরাগ আছে বলেই বিজ্ঞানের মন্ত্রভাগ আয়ত্ত করবার দিকে বাঙালীর এতটা ঝোঁক।

এ সব কথা শুনে অনেকে হয়ত বলবেন যে, বাঙালীর জ্ঞান, জ্ঞানমাত্রই থেকে যায়, তা কোনও কাজে লাগে না। বিজ্ঞানের যন্ত্রভাগ যে বাঙালী ততটা করায়ত্ত করতে পারে নি এ কথা সত্য। আমার বিশ্বাস এ অক্ষমতার জন্য যত না দায়ী আমাদের প্রকৃতি, তার চাইতে ঢের বেশি দায়ী আমাদের অবস্থা। কল কারখানা গড়বার শক্তির অভাব সম্ভবত বাঙালীর নেই, অভাব আছে শুধু সুযোগের। সে যাই হোক যা সত্য ও যা সুন্দর তার প্রতি বাঙালী মনের এই সহজ আনুকূল্যের প্রশ্রয় দিয়েই তার জাতীয় জীবন সার্থক করে তোলা যেতে পারে। যেমন ব্যক্তিবিশেষের তেমনি জাতিবিশেষের

প্রকৃতির উল্টো টান টানতে গেলে তার জীবনকে ব্যর্থতার দিকে অগ্রসর করা হয়। আজ ইউরোপীয় শিক্ষা বয়কট করবার যে হুজুগ উঠেছে তাতে যে বাঙালী সোৎসাহে যোগদান করতে পারছে না, তার কারণ যে-বাঙালীর চিন্তা করবার অভ্যাস আছে, সেই জানে যে উক্ত শিক্ষাই হচ্ছে আমাদের জাতীয় শক্তি উদ্বোধিত করবার সর্ব্বপ্রধান উপায়। কোনও জাতির পক্ষে স্বধর্ম্ম হারিয়ে স্বরাট হবার চেষ্টাটা বাতুলতা মাত্র। ভারতবাসী যখন স্বরাজ্য লাভ করবে তখন ভারতবর্ষের কোনও প্রদেশই তার শিক্ষা দীক্ষার উপর অপর কোনও প্রদেশকে হস্তক্ষেপ করতে দেবে না। প্রতি স্ববশ সজ্ঞান জাতির একটা না একটা বিশেষ জাতীয় আদর্শ থাকে এবং সেই আদর্শ অনুসারেই সে জাতি তার শিক্ষার ব্যবস্থা করে। যার নিজত্ব বলে কোনও জিনিস নেই; অথবা সে নিজত্ব যে রক্ষা করতে বিকশিত করতে না চায় তার পক্ষে স্বাধীনতার কোন প্রয়োজন নেই, শুধু তাই নয়, তার কাছে উক্ত শব্দের কোন অর্থও নেই। স্বত্বস্বাব্যস্ত করবার জন্যই ত স্বাধীনতার আবশ্যক।

আমার শেষ কথা এই যে, আমাদের পুঁথিপড়া-মনের সঙ্গেও বাকী ভারতবর্ষের পুঁথিপড়া মনের কিঞ্চিৎ প্রভেদ আছে। সুতরাং আমাদের পলিটিক্যাল-মনও অন্য প্রদেশের পলিটিক্যাল-মনের ঠিক অনুরূপ নয়। মনে রেখো, মানুষের পলিটিক্যাল-মন তার সমগ্র মনের বহির্ভূতও নয়, তার সঙ্গে নিঃসম্পর্কিতও নয়। অবশ্য একদলের কংগ্রেস-ওয়ালা আছেন যাঁরা এ কথা মানেন না, যদি মানতেন তাহলে তাঁদের দলে টিকিওয়ালা-ডিমোক্রাট-রূপ অদ্ভুত জীবের এতটা প্রাধান্য হত না।

ডিমোক্রাটিক স্বরাজ্য লাভ করতে হলে আমাদের মনের যে বদল আবশ্যক, এ জ্ঞান আমাদের যুবক শ্রেণীর মনে যে প্রবেশ করেছে তার পরিচয় আমি পাঁচজনের সঙ্গে কথায় বার্ত্তায় নিত্যই পাই। মানুষকে মানুষ জ্ঞান করব না, শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে দেশের অধিকাংশ লোককে দাস ও স্ত্রীলোককে দাসী করে রাখব অথচ পৃথিবীর ডিমোক্রাটিক জাতিদের মত রাজনৈতিক জগতে স্বরাট হব, এরূপ মনোভাব যে যুগপৎ লজ্জাকর ও হাস্যকর, এ ধারণা এ যুগের বহু-বাঙালীর মনে জন্মেছে। তবে এ মনোভাব যে আমাদের দৈনিক সংবাদ পত্রে ও বক্তৃতার রঙ্গমঞ্চে গর্জ্জে ওঠে নি, তার কারণ নিজের বিরুদ্ধে হুজুগ করা চলে না। যে ভাব মনে পোষণ করবার জন্য, যে কাজ করবার জন্য আমরা মনে মনে লজ্জিত হই তা নিয়ে প্রকাশ্য ঢাক পেটানো অসম্ভব, আমরা ঢাক পেটাতে পারি শুধু আমাদের কাল্পনিক আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠতা নিয়ে। কতকটা শিক্ষার বলে কতকটা পরীক্ষার ফলে আমরা আমাদের প্রকৃতি ও শক্তি দুয়েরই কিঞ্চিৎ জ্ঞানলাভ করেছি। নিজের ত্রুটির জ্ঞানও আত্মজ্ঞানেরই একাংশ। এবং আত্মজ্ঞান আমাদের মনে জন্মেছে বলে, তারই উপর আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ জাতীয় জীবন গড়ে তুলতে চাই। আমাদের অন্তরের বল আমরা পুষ্ট পরিপুষ্ট করতে চাই, তাই আমরা শিক্ষার জাতি-বিচার করে তাকে আচরণীয় কিম্বা অনাচরণীয়ের কোঠায় ফেলতে চাই নে, আর আমাদের দুর্ব্বলতা আমরা পরিহার করতে চাই বলে, আমরা লোকের জাতিবিচার করে তাকে আচরণীয় কিম্বা অনাচরণীয় করে রাখা, পেট্রিয়টিক কাজ বলে মনে করি নে। কোন জাতির পক্ষে তার চিরাগত সংস্কার থেকে মুক্তিলাভ করে নবজীবন ও নব-

শক্তি লাভ করা সহজসাধ্য নয় এবং সে বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করবার সাধন-পদ্ধতির নাম রাজনৈতিক হুজুগ নয়, কেননা ক্ষণিক উত্তেজনার পিঠ পিঠ আসে স্থায়ী অবসাদ। জাতীয় ঐশ্বর্য্য অবশ্য জাতীয় কৃতিত্বের উপর গড়ে ওঠে। এবং সে কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়, সাহিত্যে ও সমাজে, দর্শনে ও ধনে, বিজ্ঞানে ও আর্টে। মানুষের পক্ষে কিছু ত্যাগ করা, যথা—উপাধি কিম্বা ওকালতি, শুনতে পাই মহা কঠিন; কিন্তু তার চাইতে ঢের বেশি কঠিন, কিছু করা, অর্থাৎ—কৃতী হওয়া। জীবনের কাছথেকে পালানো সহজ, তার সঙ্গে লড়ে জয়ী হওয়াই কঠিন, কেননা এ লড়াই চিরজীবন ব্যাপী, এক মুহূর্ত্ত তার বিরাম নেই। দেখতে পাচ্ছ আমি রাজসিক মনোভাবের পরিচয় দিচ্ছি। একে আমি বৈদিক-তান্ত্রিকসমাজে জন্মগ্রহণ করেছি, তার উপর আবার ইউরোপের রাজসিক সভ্যতার আব্‌হাওয়ায় মানুষ হয়েছি, সুতরাং আমার কাছথেকে তুমি অন্য কোনও মনোভাবের পরিচয় পাবার আশা করতে পার না। রাজসিক মন সাত্বিক মনের চাইতে নিকৃষ্ট কি না বলতে পারি নে, তবে তা যে, তামসিক মনের চাইতে শ্রেষ্ঠ, সে বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ নেই। আর এ বিষয়েও সন্দেহ নেই যে, দেশে আজ কাল যে সকল মনোভাব সাত্বিক বলে চলছে, সে সব পুরোমাত্রায় তামসিক। সে সবের মূলে আছে, অজ্ঞতা আর ঔদাসিন্য,*এক কথায় মনের জড়তা।

আমি বিশ্বাস করতে ভালবাসি যে আমার মন এ যুগের বাঙলার মন। যদি তাই হয় তা বাঙালীর nationalism-এর আদর্শ যে কি তা অনুমান করা কঠিন নয়। সমগ্র ভারতবাসীকে ডোরকৌপীন

পরানো আমাদের আদর্শ হতে পারে না। আজকের দিনে বাঙালীর যদি কোনও আন্তরিক প্রার্থনা থাকে ত সে এই—

"বিদ্যাবন্তং যশস্বন্তং লক্ষ্মীবন্তঞ্চ মাং কুরু
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি।"

কিন্তু এ প্রার্থনা, কোনও বাইরের শক্তির কাছে নয়। নিজের অন্তরনিহিত শক্তির কাছে। কারণ এ সত্য আমরা আবিষ্কার করেছি যে, বিদ্যা যশ লক্ষ্মী রূপ জয় এ সকলই আত্মবলে অর্জ্জন করতে হয়, প্রার্থনা বলে নয়। যদি কেউ বলেন যে, এ Ideal-এর মধ্যে ত self-sacrifice-এর কথা নেই, তার উত্তর আমি দেব, self-sacrifice কোনও জাতির আদর্শ হতে পারে না, জাতির পক্ষে একমাত্র আদর্শ হচ্ছে self-realisation. আর তার একমাত্র উপায় হচ্ছে বহু-লোকের পক্ষে self-realisation-এর ব্রত অবলম্বন করা।

আমার শেষ কথা এই যে, যে-দেশকে আমি অন্তরের সহিত ভালবাসি, সে বর্ত্তমান বাঙলা নয়, অতীত বাঙলাও নয়, ভবিষ্যৎ বাঙলা, অর্থাৎ—যে-বাঙলা আমাদের হাতে ও মনে গড়ে উঠছে। সুতরাং আমার বাঙালী-পেট্রিয়টিজম বর্ত্তমান ভারতবর্ষীয় পেট্রিয়-টিজমের বিরোধী নয়। আর এক কথা, যে-ন্যাসনালিজম বিদ্বেষবুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত সে ন্যাসনালিজমের ফলে শুধু পরের নয়, নিজেরও যে সর্ব্বনাশ হয়, গত ইউরোপীয় যুদ্ধ এই সত্য যার চোখ আছে তারই চোখের সুমুখে ধরে দিয়েছে।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

রামমোহন রায় ও যুগধর্ম্ম

—:*:—

রাজনৈতিক শান্তির ছায়ায় বাঙালার পল্লিগ্রাম যখন ছেয়ে পড়েছিল তেত্রিশ কোটী দেবতার বিগ্রহে এবং পরাধীন নরনারীর চিত্ত যথ নঅভিভূত হয়েছিল পারলৌকিক সদ্‌গতির লোভে,—উনবিংশ শতাব্দীর বয়ঃসন্ধিকালে রামমোহন কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেছিলেন সকল ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা, সকল সমাজের সহিত সদ্‌ভাব নিয়ে। বিশ্ব-সভ্যতার বীজ এইরূপেই অখ্যাত অজ্ঞাত এক বাঙালীর চিত্তে রোপিত হয়েছিল।

ভারতবর্ষ কি এর জন্য প্রস্তুত ছিল? রাজপুতনায়, দাক্ষিণাত্যে শান্তি তখনও স্থাপিত হয় নি, মারহাট্টার দস্যুতায় মেবার মরুভূমি হচ্ছিল, পিণ্ডারীদের উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব্ব-পশ্চিম থেকে বেষ্টন করে সমূলে ধ্বংস করবার জন্য কলিকাতার কোম্পানী বাহাদুর রাজপুতনার রাণা মহারাজকে আহ্বান করেছিলেন, ভারতে শান্তি স্থাপনের জন্য ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে মার্কুইস্‌ অফ্‌ হেষ্টিংসকে দুইলক্ষ সৈন্য সংগ্রহ করতে হয়েছিল।

রামমোহন যখন ভূমিষ্ট হন, তখন ফরাসীবিপ্লব ধীরে ধীরে বৈশাখের উত্তাপের মধ্যে ঝটিকার ন্যায় জন্মমুহূর্ত্তের প্রতীক্ষা করছিল; ফ্রান্সের কবি, বৈজ্ঞানিক মধ্যযুগের সভ্যতাকে প্রকৃতির ধর্ম্মাধিকরণে অসংখ্য অপরাধে অভিযুক্ত করে বিচার করছিলেন; রুসোর, ভলটে-

রায়ের লিপিকুশলতায় তার অপরাধও প্রমাণ হয়ে গিয়েছিল; দেশ হতে নির্ব্বাসন এবং প্রাণদণ্ডের আজ্ঞাও ঘোষিত হয়েছিল; উৎপীড়িত ফ্রান্স পৃথিবীর সকল জাতি, সকল সমাজ, সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়কে সাম্য মৈত্রী ও স্বাধীনতা-অঙ্কিত তিন রংআ পতাকার ছায়ায় আহ্বান ক'রে এক বিশ্বসমাজ গঠন করতে চেয়েছিল যার অবাস্তব মন্দিরের কুহেলিকাচ্ছন্ন তোরণদ্বারের শীর্ষে মানবজাতির উত্তপ্তশোণিতে লেখা ছিল,—Patriotism.

রামমোহন যখন কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেন, তখন ইংরাজের অধিনায়কত্বে য়ুরোপের নৃপতিগণ মধ্যযুগের feudalism-কে য়ুরোপে আরো একশত বৎর প্রতিষ্ঠিত রাখবার জন্য ফরাসী জাতির তিন রংআ পতাকাটিকে ওয়াটালু ক্ষেত্রে সত্তর আশী হাজার মানুষের এক রংআ রক্তে ছুপিয়ে জয়োল্লাস করছিল;—য়ুরোপ তখন বিশ্বসভ্যতার জন্য প্রস্তুত ছিল না।

মার্কিন-সভ্যতা তখনও কালের গর্ভে বিলীন ছিল; এমারসন্, থিয়োডর পার্কার তখনও বিশ্বগুরুর পাঠশালায় বর্ণ-পরিচয়ের প্রথম ভাগ শিখছিলেন।

ইতিহাসের এই দুর্য্যোগ-রাত্রিতে সামাজিক অধীনতা, রাজনৈতিক অশান্তি, বিজ্ঞানের সহিত ধর্ম্মের বিচ্ছেদকালে রামমোহনের কণ্ঠেই প্রথম ধ্বনিত হয়েছিল—"ভাব সেই একে"। তাঁর জীবনেই প্রথম ব্যক্ত হয়েছিল বিজ্ঞানের সহিত ধর্ম্মের সামঞ্জস্য, বিশ্বহিতেই ব্যক্তিত্বের বিকাশ।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান প্রকৃতির এতদিন অনাবিষ্কৃত ভাণ্ডার হতে যে সকল অসংখ্য শক্তি আবিষ্কার করেচে, তার মধ্যে এই

সবার চাইতে প্রধান আবিষ্কার বলে মনে হচ্চে—জনসমাজের,—গণ-তন্ত্রের ইচ্ছা। ভারতবর্ষের পৌরাণিকযুগে এবং য়ুরোপের মধ্যযুগে ইচ্ছা প্রকাশ হত এক একজন কর্ম্মীর অন্তরে ন'মাসে ছ'মাসে, এ দেশে সে দেশে। মধ্যযুগের ইতিহাসে মহারথী ভূস্বামীগণের জীবনকাহিনীই দেখা যায়, জনসাধারণের ইচ্ছার রাঙিমা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় ফুটে উঠতে দেখা যায় না; কবি, শিল্পী, বৈজ্ঞানিক এঁরা কোনো না কোনো ভূ-স্বামীর আশ্রয়ে থাকতেন,—মাটীর মালিকই ছিলেন সভ্যতার মেরুদণ্ড।

কিন্তু যে যুগের প্রবর্ত্তক রামমোহন এবং গত এক শত বৎসরে যে যুগ এখনও পূর্ণ-যৌবনকাল পেয়েচে বলা যায় না, এই যুগের ইতিহাসে প্রথমেই চোখে পড়ে গণ-তন্ত্রাবলম্বী ব্যক্তির ইচ্ছা; এক দিকে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য এবং স্বাধীনতা, অন্যদিকে বিশ্বমানবকে জ্ঞান দেবার, আনন্দ দেবার, অত্যাচারীর হাত থেকে উৎপীড়িতকে রক্ষা করবার অহেতুকী আকাঙ্ক্ষা। গত মহাযুদ্ধে এই নব আবিষ্কৃত ইচ্ছা-শক্তিরই জয় হয়েচে। ব্যক্তির এবং জাতির ব্যক্তিত্ব এখন আর সম্রাটের, ষ্টেটের, ধর্ম্মযাজকের, কিম্বা দেশাচার, লোকাচারের অধীন নয়। সকল দেশে এই ইচ্ছা জেগে উঠেচে, ইচ্ছা সকলরূপেই মঙ্গল-কারিনী।

একশত বৎসর পূর্ব্বে বাঙলার রামমোহন সেই ইচ্ছাকে পরিচালনা করেছিলেন বিশ্বাত্মার, বিশ্ব-সভ্যতার দিকে, তার কর্ম্মক্ষেত্র দেখিয়ে দিয়েছিলেন সসাগরা ধরণী।

ইংরাজের অধিনায়কত্বে আজ পৃথিবীতে শান্তি স্থাপিত হয়েচে। কিন্তু ভক্তিহীন জ্ঞান এবং বিজ্ঞানহীন ভক্তি, ধর্ম্মযাজকগণের কুসংস্কার

বিশ্ব-সভ্যতাকে সোজাপথে চলতে এবং সমানভাবে দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়তে এখনও বাধা দিচ্চে। রাষ্ট্রীয় বৈরী-বুদ্ধি মানুষকে এখনও বিচ্ছিন্ন করে রেখেচে, কাচের খেলানা দুনিয়ার বাজারে বিক্রী করে ধনী হবার জন্য স্বাধীন জাতিগণের মধ্যে রেষারেষি এখনও চলচে ; ব্যক্তির অহঙ্কার বিশ্বাত্মার আলোককে স্বচ্ছ পথে সোজা-ভাবে এখনও আসতে দিচ্চে না।

সেইজন্য মনে হয় রামমোহনের জীবন-কাহিনী শ্রবণ মনন করবার সময় এখনও যায় নি। কেননা তাঁর সাধনার ভিতরই আমরা দেখতে পাই গণ তন্ত্রের সহিত ব্যক্তিত্বের সামঞ্জস্য।

(২)

ইতিহাসে দেখা যায় সকল ধর্ম্মই প্রচার হয়েচে কোনো-না-কোনো শক্তিশালী রাজশক্তির আশ্রয়ে এবং পৃষ্ঠপোষকতায়। বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতে এবং ভারতের বাহিরে প্রচার হয়েছিল অশোক, কণিস্কের দ্বারা; খৃষ্টধর্ম্ম রোমসম্রাটের, ইস্‌লামধর্ম্ম খালিফের দ্বারা। ইংরাজ রাজ-শক্তির সহিত এই যুগ-ধর্ম্মের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ ; ইংরাজ রাজশক্তির শান্তিময়ী ছায়ায় ইহার উৎপত্তি, গত পঞ্চাশ বৎসর ইংরাজি ভাষার সাহায্যে এই নবধর্ম্ম ভারতে এবং ভারতের বাহিরে য়ুরোপে, এ্যামেরিকায় প্রচার হচ্চে। এই বাহনকে কি করে এই যুগধর্ম্ম ত্যাগ করবে ? এটি আমাদের মনে রাখতেই হবে।

(৩)

এই প্রবন্ধে রামমোহনকে ভারতবর্ষের কর্ম্মক্ষেত্রে নব-যুগপ্রবর্ত্তক-রূপেই আলোচনা করব। কিন্তু তার আগে রামপ্রসাদের নামোল্লেখ

না করলে আমাদের ধর্ম্মসাধনার যে ঐতিহাসিক ধারা মাঝে মাঝে উত্তরমুখী হয়েও একটানা বয়ে আসচে, তা' অস্বীকার করা হবে। সংসারে কিছুই চিরদিন থাকে না—ইহাই সংসারসম্বন্ধে সত্য কথা নয়; কেননা আমরা এখনও দেখচি অতীতের ইতিহাস আমাদের কাছে এখনও বিলুপ্ত হয় নি। রামপ্রসাদের গান এখনও আমাদের হৃদয়মনকে আঘাত করে, আলোড়িত করে। সংসারীর কাছে অতি তুচ্ছ কাজ করতে করতে তাঁর ভক্ত-হৃদয় গান করে উঠেছিল—

"ধাতু পাষাণ মাটীর মূর্ত্তি কাজ কি রে তোর সে গঠনে।
তুমি ভক্তি-সুধা খাইয়ে তারে তৃপ্ত কর আপন মনে॥"

পৌরাণিক যুগের আড়ম্বর-দেবতার হৃদয় সেই দিন সন্ত্রাসিত হয়েছিল যে দিন রামপ্রসাদ জমিদার বাবুর দোল দুর্গোৎসবের হিসাব মিলাতে মিলাতে গান করেছিলেন—

"জাঁক জমকে করলে পূজা অহঙ্কার হয় মনে মনে।
তুমি লুকিয়ে তারে করবে পূজা, জানবে না রে জগৎ-জনে॥"

যে দিন প্রমীত পশুগণের শোণিতে বালক যুবাদের নৃত্য করতে দেখে ভক্ত-কবি আক্ষেপ করেছিলেন—

"মেষ ছাগল মহিষাদি কাজ কি রে তোর বলিদানে।
তুমি জয়কালী, জয়কালী বলে বলি দাও ষড়্‌রিপুগণে॥"

সেই দিনই পৌরাণিক যুগ বিদায় নিল। আমাদের রামপ্রসাদ স্বধর্ম্মে নিষ্ঠাবান হয়েই সেই যুগকে বিদায়পত্র দিয়েছিলেন।

রামমোহন বিধাতার অনন্তঐশ্বর্য্য ভাণ্ডার হতে আর একটি নব-যুগ আনলেন। ক্ষণিকের জন্য উত্তরমুখী ধারাকে আবার দক্ষিণ দিক দেখিয়ে দিলেন। যে বৎসর রামপ্রসাদের মৃত্যু হয়, সেই বৎসরের শেষভাগে রামমোহন জন্মগ্রহণ করেন।

(৪)

আমাদের সাহিত্যে রামপ্রসাদের গানগুলি কিরূপ? প্রথমত তাঁর সুর এত সহজ যে সে গান শেখবার জন্য কালোয়াতের দ্বারস্থ হতে হয় না। আর্টের যদি উদ্দেশ্য হয় ধনী দরিদ্র, শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলের হৃদয়কে অভিভূত করা আনন্দে বিহ্বল করা, তা হলে স্বীকার করতেই হবে যে রামপ্রসাদের ন্যায় সফলতা অল্প কবিই পেয়েছেন।

নবযুগ এবং পৌরাণিক যুগের মাঝে দাঁড়িয়ে তিনি যে গান গেয়েছিলেন তা অতি নির্ম্মল, অতি তরুণ শিশুকণ্ঠে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে "মা" "মা" ধ্বনির ন্যায়।

(৫)

যে সময়ে সমাজ অশন বসনের, এমন কি গৃহনির্ম্মাণ গৃহপ্রবেশেরও নিয়ম বেঁধে দিয়েছিল, (রামমোহনের পথ অনুসরণ করলে দিয়েছিলেন বলাই উচিত) যে সময়ে রাজনৈতিক পরাধীনতা এবং জ্ঞানে, ধর্ম্মে, কর্ম্মে শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বীর অভাবে আত্মোন্নতির, সুখস্বাচ্ছন্দের প্রতি সজাগদৃষ্টি, সমাজের হিতাহিত চিন্তা অপ্রচলিত এমন কি অকর্ত্তব্যও ছিল, সেই সময়ে আমরা রামমোহনকে চিন্তা করতে দেখি, স্বজাতীয় সমাজ-পরিচালকগণের হাতে-গড়া বিধি-ব্যবস্থাকে পরীক্ষা

করতে দেখি তখন তাঁর বয়স মাত্র ষোল বৎসর। জ্ঞানের প্রথম উন্মেষ থেকে তিনি যে প্রতিমাকে ধর্ম্মপরায়ণা জননীর শিক্ষায় সর্ব্ব মঙ্গলদায়িনী দেবী জ্ঞান করতেন, নিষ্ঠাবান পিতৃদেবের আদেশে নির্ম্মল সলিলে স্নান ক'রে, পট্টবাস পরিধান ক'রে প্রশস্ত ললাট চন্দনে চর্চ্চিত ক'রে যাঁর চরণে বাল্যকাল হতে অর্ঘ্য দিতেন, তিনি তাঁর ষোড়শবর্ষে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে প্রণাম করবার সময় হৃদয়ে প্রসন্নতা লাভ করলেন না; একটা অভাব অনুভব করলেন; প্রতিমার খড় মাটি তাঁর ভক্তিতে আঘাত দিতে লাগল। প্রচলিত ধর্ম্মের অসারতা তিনি সেই সময়েই হৃদয়ে অনুভব করলেন; ঘরের দরজা বন্ধ করে তিনি যা' লিখেছিলেন তা' তাঁর পিতার নজরে পড়ে; ঐ সূত্রে পিতা পুত্রে অন্তরের বিচ্ছেদ ঘটল; পিতার আদেশে এবং জ্ঞানের পিপাসায় তিনি তাঁর পিতৃগৃহ হতে বহিস্কৃত হলেন।

(৬)

মুমুক্ষু মানুষ সত্য চায়, শিল্পী মানুষ সুন্দর প্রতিমা চোখে দেখতে চায়, কর্ম্মী মানুষ স্বাধীনতা চায়। প্রতিমা-কল্পনায় আমাদের কলা-বিদ্যার এবং শিল্পচাতুর্য্যের চরম উন্নতি হয়েছিল, অদ্বিজ হিন্দুগণের মধ্যে ধর্ম্মপ্রচারের সহজ উপায় হয়েছিল কি ধর্ম্মচেতনা অধোমুখী হয়েছিল, এ সম্বন্ধে বাদানুবাদ এখনও চলচে। তর্কের দিক থেকে না দেখে ইতিহাসের দিক থেকে দেখলে দেখা যায় যে, শঙ্করাচার্য্য চৈতন্য রামানুজ রামমোহন রামকৃষ্ণ পরমহংস—এঁরা সকলেই প্রতীকোপাসক সমাজের গর্ভ থেকেই ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন। জাতির ধর্ম্মচেতনার সহিত এঁদের ধর্ম্মসাধনার নাড়ির যোগ নেই, এটা যুক্তি-

তর্কের দ্বারা প্রমাণ করতে যাওয়া নিতান্তই দুঃসাহসের কাজ। যাঁরা বলেন বাইবেল হতে, কোরাণ হতে, একেশ্বরবাদের আলোক এঁরা পেয়েছিলেন তাঁদের জিজ্ঞাসা করতে পারি, শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা এঁদের এল কেন?

(৭)

ভক্ত কবির চিদাকাশে বিশ্ব-শক্তির প্রথম প্রতিবিম্ব স্মরণাতীত অতীত কালের যে মুহূর্ত্তে পড়েছিল, তারপর কত শতাব্দী কেটে গেছে; ভারতবর্ষে কত সাম্রাজ্যের উত্থান পতন হয়েছে। কত শিল্পী সেই চিন্ময়ী শক্তি দেবীকে মৃন্ময়ী মূর্ত্তিতে গড়বার জন্য তাঁদের জীবন উৎসর্গ করেছেন, কিন্তু সে সময়েও তাঁদের মন থেকে একটা আক্ষেপ উঠেছিল—

রূপং রূপবিবর্জ্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যদ্বর্ণিতং
স্তুত্যানির্ব্বচনীয়তাঽখিলগুরো দূরীকৃতা যন্ময়া।
ব্যাপিত্বঞ্চ বিনাশিতং ভগবতো যত্তীর্থ যাত্রাদিনা
ক্ষন্তব্যং জগদীশ তদ্বিকলতা দোষত্রয়ং মৎকৃতং॥

রামমোহন অসহিষ্ণু উদ্ধত যুবকের ন্যায় দালান-আলো-করা প্রতিমাকে গায়ের জোরে অকালে বিসর্জ্জন দিতে চান নি; তিনি খড়-মাটির বহিরাবরণ ভেদ করে সর্ব্বসাক্ষী, সর্ব্বব্যাপী বিশ্বাত্মাকে দেখবার জন্য ব্যাকুল হয়েছিলেন। খড়-মাটি জলে গ'লে যায়, কিন্তু শিল্পীর মানস-পটে বিশ্ব-শক্তির যে প্রতিবিম্ব প'ড়ে বিশ্বরূপ ধারণ করে

তা ত সহজে মুছে যায় না। "ব্রহ্মোপাসনার সংক্ষেপ ক্রমে" দেখতে পাই—

নমস্তে সতে সর্ব্বলোকাশ্রয়ায়
নমস্তে চিতে বিশ্বরূপাত্মকায়

তিনি স্তবটিকে মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে যেমন পেয়েছিলেন, সেইরূপই গ্রহণ করেছিলেন। সাধকগণ হৃদয় মন উন্মুক্ত রাখেন বলে অল্প বিস্তর সকলেই কবি হয়ে থাকেন; বিশ্বশক্তি সৃষ্টির তরুলতা নদ নদীকে যেমন, তাঁদের মনকেও সেইরূপ আঘাত করে, সৌন্দর্য্য তৃষ্ণাকে, রূপজ্ঞানকে জাগিয়ে দেন। অনন্ত আকাশে এই বিশ্বশক্তি শতদল পদ্মের ন্যায় ভাসচে, কত শক্তির তরঙ্গ কত দিক হতে এসে এই পদ্মটিকে যুগে যুগে ফুটিয়ে তুলচে। এই বিশ্বশক্তিসম্বন্ধে ভাবলে বিস্ময়ে অভি-ভূত হতে হয়, এর আমরা কতটুকু জানি! অতীতকালের ইতিহাস, আমরা অমাদের দেহের গঠনে, মনের বিকাশে, আচার অনুষ্ঠানের বৈচিত্র্যে বহন করচি, পঞ্চভূতের বড় বড় অবিকৃত শক্তির সহিত আমাদের নিত্য সম্বন্ধ প্রতি মুহূর্ত্তেই রয়েচে, অথচ সৃষ্টির নব নব পর্য্যায়ের বিচিত্র ঘটনার ইতিহাস আমরা কখনই মনে আনতে পারি নে। তাহলে একজন এমন নিশ্চয়ই আছেন যিনি বিশ্বজগতের অতীত কালের সকল ঘটনা এখনও নির্ণিমেষ নেত্রে দেখচেন। তাঁর নিকট কিছুই অতীত হতে পারে না। এবং তিনি আমাদের ধ্বংসও ইচ্ছা করেন না। যে বর্ত্তমান বিচিত্র রূপে আমাদের জ্ঞান তৃষ্ণা, কর্ম্মচেষ্টা, ভোগাকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলচে, আমাদের চিত্তকে নানাদিকে বিক্ষিপ্ত করচে, যার আদি আজীবন চেষ্টা করলেও জানতে পারি নে,

যার অন্ত সূক্ষ্ম বিচার বিবেচনা করেও অনুমান করতে পারি নে—স্থান হতে স্থানান্তরে শক্তির তরঙ্গ বয়ে যাওয়াতে যার আকৃতি দিনে দিনে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তিত হচ্চে, যেখানে জড়তা সেখানে প্রাণ-সঞ্চার করচে, যেখানে অবসাদ সেখানে বলে দিচ্চে, যে বর্ত্তমান মৃত্যুকে স্বীকারই করে না—এই আশ্চর্য্য রহস্যময়, আকারে বর্ণে সুস্পষ্ট বর্ত্তমান, আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞানের দুজ্ঞেয়—অবশ্য একজন আছেন যিনি এই বিরাট বিশ্বশক্তির উত্থান পতনের লীলা নির্নিমেষ নেত্রে দেখচেন। আমাদেরই ইন্দ্রিয়ের দ্বারে তিনি সকল প্রকার ভোগের বস্তু এনে দিচ্চেন—তিনি স্নেহময়ী জননী। যে সুদুর ভবিষ্যৎ কুহেলিকার মত এই বর্ত্তমানের প্রান্তে রয়েচে, যার সুন্দর তরুণ আবছায়া মূর্ত্তিটি দেখলে আমরা দুঃখ ভুলে যাই, শোক ভুলে যাই, অথচ যে ভবিষ্যৎ আমাদের তৃষ্ণার্ত্ত মুঠো এড়িয়ে চিরকাল দূরেই থেকে যায়—অবশ্য একজন আছেন যাঁর নিকট ঐ ভবিষ্যৎ অজ্ঞাত নয়। জন্ম মৃত্যু উত্থান পতনের ভিতর দিয়ে প্রাণী নানা যুগের ইতিহাস বহন করে যাঁর অঙ্গুলি-চালনায় লীলাভিনয় করচে, আর্য্যসভ্যতার শিল্পী তাঁরই প্রতিমা গড়ে গেছেন শস্য-শ্যামল পল্লিগ্রামে দশপ্রহরণধারিনী ত্রিনয়না মহামায়া রূপে; তরঙ্গক্ষুব্ধ সমুদ্রতীরে হস্তপদহীন জগন্নাথ দেবের মূর্ত্তিতে।

সুন্দর সুন্দর মূর্ত্তি গড়বার আকাঙ্ক্ষায় চির-চঞ্চল শিল্পী মানুষের ধর্ম্মতৃষ্ণাকে তৃপ্ত করবার জন্য আরাধ্য দেবতাকে এইরূপেই সকলের সুমুখে ধরে থাকেন। রামমোহন বিশ্বাস করতেন মানব হৃদয়ের এই আকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত সত্য, তিনি ধর্ম্মপ্রচার করবার যে পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন তা হতে এ স্পষ্টই বুঝা যায়। ব্রাহ্মসমাজের

Trust Deed-এ সেই জন্যই তিনি স্পষ্ট নিষেধ করে গিয়েছেন যে, "no object animate or inanimate that has been or is or shall hereafter become or be recognised as an object of worship by any man or set of men shall be reviled or slightingly or contemptuously spoken of or alluded to either in preaching praying or in the hymns or other mode of worship that may be delivered or used in the said Messuage or Building......the strengthening the bonds of union between men of all religious persuasions and creeds." এ যে তাঁর পরিণত বয়সের ফল তা' নয়; অল্প বয়সে পারস্য ভাষায় তিনি যে প্রবন্ধ (Tuhfatul Muwahhiddin) লিখেছিলেন, তাতে আমরা তাঁর এই উদার মত দেখতে পাই।—

"Although each individual without the instruction or guidance of anyone, simply by *keen insight into, and deep observation of*, the mystiries of nature such as different modes of life fixed for different kinds of animals and vegetables and propagation of their species and the rules of the movements of the planets and stars and endowment of innate affection in animals towards their offspring without expecting any return, and without knowing the conditions which favour the growth and decay of the mineral, vegetable

and animal kingdoms, has an *innate faculty* in him by which he can infer that there exists a Being who (with His wisdom) governs the whole universe; yet ***it is clear*** that every one in imitation of the nation in which he has been brought up, ***believes the tenets of that creed in their entirety.***"

উক্ত প্রবন্ধের ভূমিকায় রামমোহন লিখেছেন—"I travelled in the remotest parts of the world, in plains as well as in hilly lands and found the inhabitants thereof agreeing generally in believing in the personality of One Being who is the source of all that exists and its governor, and disagreeing in giving peculiar attributes to that Being and in holding different creeds consisting of the doctrines of religion and precepts of *hárám* (forbidden) and *háldl* (lawful). From this Induction it has been known to me that ***turning generally towards One Eternal Being, is like a natural tendency in human beings and is common to all individuals of mankind equally.***"

(৭)

ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে দেখা যায় যে, মানুষের মূর্ত্তিগড়া স্বভাব-টিকে নিয়ে তাঁরা যে কেবল বিব্রত হয়েছিলেন তা-ই নয়, মতান্তর হতে

মনান্তর, দলাদলির সৃষ্টিও ঐ উপলক্ষে হয়েছিল। প্রত্যেক মানুষের স্বাধীনতাকে একদিকে শ্রদ্ধা করতে হবে, আর একদিকে সত্য পথ দেখিয়ে দিতে হবে, রামমোহন-প্রবর্ত্তিত নব-যুগধর্ম্মের ইহাই বিশেষত্ব। ধর্ম্মসম্প্রদায়ের বৈচিত্র্য, রামমোহন দেখেছিলেন, পৃথিবীতে চিরকালই থাকবে; মানুষের মন গঠিত হয় তার স্বদেশের জলবায়ুর দ্বারা, স্বদেশের ইতিহাসের দ্বারা, তার স্বাধীন অনুসন্ধিৎসার দ্বারা, তার স্বোপার্জ্জিত সফলতার দ্বারা।

মুমুক্ষু মানুষ, শিল্পী-মানুষ, কর্ম্মী মানুষ বিভিন্ন পথ ধরেও একই গন্তব্যস্থানে স্বাধীনচিত্তে যেতে পারে, নবযুগের জ্ঞানী, শিল্পী, কর্ম্মী-গণের জীবনে এর সমর্থন পাওয়া যায়। বিশ্বসভ্যতা, বিশ্বজগতেরই ন্যায়, বৈচিত্র্যপূর্ণ।

(৮)

তরুণ যুবক রামমোহনের আধ্যাত্মিক তৃষা প্রতিমার খড়মাটি হতে বয়ে-আসা চরণামৃত পান করে সে বৎসর শান্ত হল না। এ কি পাটনায় আরবীভাষায় কোর্আন পড়বার দরুণ? মুসলমানগণ তাঁকে ইস্লামধর্ম্মাবলম্বী বলে বিশ্বাস করতেন। আমরাও আজ একশ' বৎসর তাঁকে বৈদান্তিক বলেই দাবী করে আসচি। খৃষ্টানগণও তাঁকে খৃষ্টান বলেই জানতেন, সাম্য-মৈত্রী-সাধীনতাপন্থী ইউরোপের বৈজ্ঞানিক কিম্বা নৈয়ায়িক তাঁকে তাঁদেরও বন্ধু বলতে পারেন। বাঙলার সাহিত্যে তিনি যে কেবলমাত্র মূল সুরটি ধরিয়ে দিয়েছেন, তা-ই নয়, অলীক কাল্পনিকতা হতে প্রত্যক্ষ জগতের সুখদুঃখ, ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে সাধনার পথ দেখিয়ে দিয়েচেন। গদ্যরচনার প্রবর্ত্তকও

রামমোহন ; বাঙলা সাহিত্যে, সংস্কৃত সাহিত্যের ঐশ্বর্য্য, আর্য্যসভ্যতার, সম্পদ, খৃষ্টজীবনের মূলমন্ত্র এবং য়ুরোপের বৈজ্ঞানিকপ্রথা তিনিই এনেছেন, ভারতবর্ষের সমাজসংস্কারক, রাজনীতিবিশারদ তাঁকেই প্রথম পথপ্রদর্শক বলে স্বীকার করেন। এমন কি আচার্য্য বসু মহাশয়ও বিজ্ঞানের যে নূতন পথ আবিষ্কার করেছেন সেখানেও আমরা রামমোহনের "ভাব সেই একে"-কে দেখতে পাই।

লর্ড বেণ্টিঙ্ক তাঁর সখ্যতা আকিঞ্চন করতেন, ভারতশাসনসম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করবার জন্য ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট তাঁর সাক্ষ্য চেয়েছিলেন এবং ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে যে উদারনীতি ঘোষিত হয়েছিল সেখানেও আমরা রামমোহনের প্রতিভা দেখতে পাই। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তাঁকে তাঁদের মিত্র বলেই জানতেন, সেইজন্য চতুর্থ জর্জ্জের রাজ্যাভিষেক কালে তিনি আসন পেয়েছিলেন বিদেশী প্রতিনিধিগণের মধ্যে।

কেন না বিশ্ব-সভ্যতা তাঁর মনে একটি অখণ্ডমূর্ত্তি ধারণ করেছিল। যে বীজটি প্রাণবান তা যেমন বহুদিন ভূগর্ভে থেকে নিজের মধ্যে শক্তি আত্মসাৎ করে বেড়ে ওঠে, রামমোহনের অন্তর্জীবনও সেই রকম বহু বৎসর নির্জ্জন থেকে নানা শাস্ত্র হতে সত্য জ্ঞান এবং আনন্দ অর্জ্জন করেছিল। তিনি লোকাচারের একাধিপত্য দেখেও হতাশ হন নি, বরং অধিকতর অধ্যবসায়ের সঙ্গে সংস্কৃত, ইংরাজি, হিব্রু, গ্রীক শিখেছিলেন। এক এক দেশের ভাষার ভিতর দিয়ে তিনি সেই সেই দেশের সভ্যতাকে নিজের মধ্যে আত্মসাৎ করেছিলেন। সকল দেশের সাহিত্য, সভ্যতা তাঁর কাছে বিশ্বাত্মার বহিরাবরণরূপেই এসেছিল। যতই নানা শাস্ত্র এবং ধর্ম্মের অন্তরে প্রবেশ করতে লাগলেন, ততই একই বিশ্বাত্মায় বিশ্বাস তাঁর দৃঢ় হতে লাগল। একই অমৃত ধারাকে মানুষ নানা

দেশে, নানা কালে বিভিন্ন নাম দিয়ে পান করেচে এবং এখনও করচে। একই শুভ্র সূর্য্যকিরণ দেশে দেশে নানা রংএর মনের ভিতর দিয়ে আসাতে নানা রূপে মানুষের হৃদয়ে ধর্ম্মবিশ্বাস জাগিয়ে দিয়েচে—পাশব জীবনের অধীনতা হতে সাত্বিক জীবনের আনন্দে যাবার আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করেচে, গতি দিয়েচে, বল দিয়েচে, অনুপ্রেরণা দিয়েচে। ঊনবিংশ শতাব্দীর Comparative Theology-র আরম্ভ আমরা সেইজন্য রামমোহনেই প্রথম দেখতে পাই। তবে বৈজ্ঞানিকগণ জগতের নানা ধর্ম্মের ইতিহাস পাঠ করেন শুষ্ক জ্ঞানের জন্য, খৃষ্টান পাদরীগণ পাঠ করেন তাঁদের হাতে নতুন ছাঁচে-ঢালা খৃষ্টধর্ম্মের প্রাধান্য প্রমাণ করবার জন্য; কিন্তু রামমোহনের আস্তিক মন দেখেছিল সকল দেশের ধর্ম্মশাস্ত্র একই জগৎ পিতার মহিমা ঘোষণা করচে। এই বিশ্বাস তাঁর দৃঢ় ছিল বলেই তিনি আমাদের ব্রাহ্মণপণ্ডিতদের সঙ্গে তর্ক করতেন আমাদের শাস্ত্র হাতে নিয়ে, শ্রীরামপুরের মিশনারীদের সঙ্গে তর্ক করতেন বাইবেল হাতে নিয়ে।

(৯)

সুধী এমার্সন বলেছেন, "যুগের মূল উৎস এক আধ্যাত্মিক সত্তায়, পরিমিত কাল অনন্তের প্রচ্ছন্ন বেশ ধারণ করেই ব্যবহারক্ষেত্রে প্রকাশ পায়, ইহা অনন্তেরই মহৎ এবং ঐশ্বর্য্যশালী প্রতিনিধি; অনন্ত যে সকল উপায়ের দ্বারা তাঁর কর্ত্তৃত্ব-শক্তি জগতে প্রয়োগ করেন, নানা যুগ তার নিদর্শনমাত্র; ইহা এমন এক আধার, যাতে অতীত তার ইতিহাস রেখে যায়, এমন এক উপকরণ যার মধ্য হতে বর্ত্তমান যুগের প্রতিভাশালী মণীষীগণ

ভবিষ্যৎকে গড়ে তোলেন। অসংখ্য জাতি এবং তাদের বিভিন্ন আচার ব্যবহার, লোক-হিতকর অনুষ্ঠান এমন কি দলবদ্ধ মতামত, এই সকল নিয়েই যে বর্ত্তমান যুগ এক দিব্য ইতিহাসের পবিত্র অধ্যায়ের ন্যায়, এক অপূর্ব্ব স্থষ্টির পুর্ব্বাভাসের ন্যায়, পাঠ করতে হবে; বিশ্বাত্মা স্বয়ংই ইহার ব্যাখ্যা আমাদের চোখের সম্মুখে করচেন; এবং প্রতিদিনের বড় বড় ঘটনার মর্ম্মোদ্ঘাটন করবার জন্য আমাদের আহ্বান করচেন।" ইহা মনে রাখতে হবে যে, কেন্দ্রানুগ এবং কেন্দ্রাতিত শক্তি নিয়েই জগৎ জগৎ, জড়স্তূপ নয়। অধৈর্য্য, অহঙ্কার পারিপার্শ্বিক অবস্থা হতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করবার ধৃষ্টতা যুগের অন্তর্নিহিত বিশ্বাত্মাকে ব্যক্ত হতে বাধাই দিয়ে থাকে। রামমোহনে আমরা দেখতে পাই জগৎব্যাপী চিত্ত-চাঞ্চল্যের সহিত অবাধ সহানুভূতি এবং উদ্বেল ভাবসমুদ্রকে অন্তরের নির্জ্জনতার মধ্যে সহজেই ধারণ করে রাখবার অপরিসীম শক্তি এবং আনন্দ। এই জন্য আমরা তাঁতে বিদ্রোহীর চিত্তবিক্ষেপ দেখতে পাই নে। অন্যায়, অত্যাচার, অবিচারের বিরুদ্ধে, তা আমাদের সমাজেরই হোক, বৌদ্ধ সমাজেরই হোক, কোম্পানী বাহাদুরেরই হোক, তিনি দাঁড়াতেন, তাঁর বলিষ্ঠ—উন্নত দেহ জ্ঞানোজ্জ্বল মন এবং ভক্তিতে নত আত্মা নিয়ে।

ভারতবর্ষের সমস্যা কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের সমস্যা নয়, ইহা ধর্ম্মমণ্ডলীর সমস্যা। নানা ধর্ম্মের (সাম্প্রদায়িক) উর্দ্ধে এক ধর্ম্ম এবং নানা প্রাদেশিকতার উপরে এক রাজশক্তির আবশ্যকতা এই দুইটি বিশ্বাস এবং উদার হৃদয় নিয়ে তিনি কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেছিলেন। তাঁর জাতিবিচার ভৌগলিকসংস্থানের বাধা স্বীকার করত না। Spain-এ Constitutional government স্থাপিত হয়েচে শুনে তিনি

Town Hall-এ এক public dinner দিয়েছিলেন; আবার যে দিন সংবাদ এসেছিল যে Russia, Prussia, Austria, Sardinia এবং Naples-এর রাজন্যবৃন্দের সম্মিলিত চেষ্টায় Naples আবার Austrian সৈনিকদের বেয়নেটের তাড়নায় পরাধীন হয়েচে, তখনও তিনি এই সংবাদে এতদূর অভিভূত হয়েছিলেন যে বাকিংহাম সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করবার কথা থাকলেও, দেখা করতে যেতে পারেন নি। তিনি বলেছিলেন, "I consider the cause of the Neopalitans as my own." পৃথিবীর একপ্রান্তে কোথায় কলিকাতা আর-একপ্রান্তে কোথায় Naples !!!

মিস্ কলেট সেইজন্যই বলেছেন, "If we follow the right line of his development we shall find that he leads the way from the orientalism of the past, not to, but through Western Culture, towards a civilisation which is neither Western nor Eastern, but something vastly larger and nobler than both."..."The power that connected and restrained, as well as widened and impelled, was religion."

এই যুগধর্ম্মকে যিনি বিশ্বাস করেন, শ্রদ্ধা করেন তিনি পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করবার সংকল্প কথনই পোষণ করত পারেন না। যুগধর্ম্ম জগৎ থেকে, মানুষ থেকে একটা বিচ্ছিন্ন বস্তু নয়। এর পতাকাধারী বীরাত্মাগণ বিশ্ববিধানকে ইঙ্গিতের দ্বারা দেখিয়ে দেন; কেন না তাঁরাই বিশ্বাত্মাকে স্বীকার করে, প্রমাণ করে অগ্রসর হয়ে থাকেন। যে অভিমান জগৎ-হতে বিচ্ছিন্ন হবার কুমন্ত্রণা আমাদের দেয়, তা যুগধর্ম্মকে ব্যক্ত হতে বাধা দেয়, তা অধর্ম্ম।

(১০)

আমরা এখন আমাদের সাহিত্যে, ধর্ম্মসমাজে, রাজনীতিক্ষেত্রে যুগধর্ম্মের ভগ্নাংশকেই দেখতে পাচ্চি। তথাপি যুগধর্ম্মেরই ভগ্নাংশ, লোকাচারের বশীভূত হয়ে গতানুগতিকের নিশ্চিন্ত জীবনযাত্রা নহে। এইজন্যই এরা একটা আশা আমাদের মনে আনে। "যে সময়ে জোয়ার আসে, সমুদ্রতীরে দাঁড়ালে দেখতে পাওয়া যায় যে পূর্ব্বের তরঙ্গ অপেক্ষা একটি তরঙ্গ তীর প্লাবিত করে অধিক অগ্রসর হয়েচে, আবার পশ্চাতে ফিরে যাচ্চে; অনেকক্ষণ আর কোনও তরঙ্গই আসতে দেখা যায় না; কিন্তু কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলে দেখা যায় সমস্ত সমুদ্রই সেখানে এসে পড়ে এবং সেই স্থানও ভাসিয়ে নিয়ে যায়"।

রামমোহনের মৃত্যুর পর যে সকল মহাত্মার আবির্ভাব আমাদের দেশে হয়েচে তাঁরা যথার্থই ভক্ত ছিলেন; তাঁদের হৃদয়মন জ্ঞানদাতা ঈশ্বরের আলোকে আলোকিত, তাঁরই আদেশে পরিচালিত হয়েছিল বলে আধ্যাত্মিক সাধনায় জনসাধারণের ঊর্দ্ধে তাঁরা আরোহণ করেছিলেন; অনেক সময়ে এত দূরে তাঁরা গিয়ে পড়েছিলেন যে, অনুচরগণ আর তাঁদের নাগাল পায় নি। তাঁদের সাধনা যে সর্ব্ব-সাধারণের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ পাবে, যুগধর্ম্মের ভগ্নাংশ হলেও তাই পূর্ব্ব হতে তাঁরা ঘোষণা করেছেন।

রামমোহনের আত্মত্যাগ আমাদের দেশে বিফল হয় নি। মাতৃ-স্তন্যের সহিত মাতৃভাষার ভিতর দিয়ে "ভাব সেই একে"র জ্বলন্ত ভাবটি শিশু গ্রহণ করচে; যা বিশ্ব-সভ্যতার মেরুদণ্ড, যুবক কর্ম্মক্ষেত্রে ঐ ভাবটি সাধন করচে। এই যুগ নির্জ্জনে ভাবরসসম্ভোগের কিম্বা

উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তির গতিবেগে লক্ষ্যহীন হয়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করবার যুগ নয়। এই যুগে মানুষ কর্ম্মের দ্বারা আত্মপ্রকাশ, আত্মোপলব্ধি করবার জন্য বহু শতাব্দীর নিশ্চেষ্টতা হতে জেগেচে। কর্ম্মক্ষেত্র আমাদের সম্মুখে প্রসারিত রয়েচে কেবলমাত্র জন্মভূমি পল্লিগ্রামে নয়, বৃহৎ ভারতবর্ষে এবং তাহাপেক্ষাও বৃহত্তর য়ুরোপে, য়্যামেরিকায়। আমাদের সাহিত্যে শিল্পে, রাজনীতিতে, ধর্ম্মে, আচারে ব্যবহারে এই যুগধর্ম্মকেই প্রকাশ করতে হবে। কোন পলিটিক্যাল উদ্দেশসিদ্ধির জন্য আজ মুসলমানের, কাল য়্যামেরিকার, তার পরের দিন ইংলণ্ডের শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের সহিত বন্ধুত্ব স্থায়ীও হবে না, তাতে আমাদের সম্মানও থাকবে না। দুর্ব্বল যাকে বল বলেই ভ্রম করে, রামমোহনে আমরা ঐরূপ চতুরতা কখনো দেখতে পাই নে। সকল প্রকার ভাবরস-সম্ভোগে উন্মত্ততাকে জয় করে সহিষ্ণুতা এবং আত্মপ্রকাশে সংযম অনুশীলন করতে হবে; তাতেই ইচ্ছাশক্তি তীব্র হবে।

আমরা সকলে স্বাধীনতা পাবার জন্য অধীর হয়েচি; কিন্তু আমরা আমাদের "স্ব"-কে কি পেয়েচি যে, একমাত্র তারই অধীনতা স্বীকার করব, আর কাহারও নহে? রামমোহনের সময় ইংরাজই ভারতে শান্তি স্থাপন করেছিলেন, আর এখন ইংরাজের ক্ষাত্রশক্তি পৃথিবীর শান্তি রক্ষা করচে। যুগধর্ম্মসাধনার সময় অনুকূল ভিন্ন প্রতিকূল নয়। এই সময়ে রামমোহনকেই বিশেষ ভাবে মনে পড়ে। তাঁর অন্তর সত্য-স্বরূপের সহিত যোগযুক্ত ছিল বলে তাঁর চিন্তায় এবং কাজে বিশৃঙ্খলা ছিল না; তিনি তাঁর ইচ্ছাকে গণতন্ত্রের ইচ্ছার সহিত সেইজন্যই সামঞ্জস্য রেখে বিশ্বহিতের লক্ষ্য পরিচালনা করতে পারতেন, কাউকে খর্ব্ব করে, তার প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে নিজের মতকে প্রতিষ্ঠিত করতে

তাঁকে কখনো দেখা যায় নি ; কখনো সে চেষ্টাও করেন নি। "আত্মীয় সভা" হতে "ব্রাহ্মসমাজ" স্থাপন পর্য্যন্ত তিনি দশজনের মধ্যে থেকেই করেচেন ; অথচ নিজের প্রবৃত্তিকে কখনো উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করতে দেন নি। গণতন্ত্রের ভিতর দিয়ে ব্যক্তিত্বের বিকাশ এইরূপেই তাঁর মধ্যে হয়েছিল। কেন না তিনি ছিলেন ত্যাগী। তিনি পরা এবং অপরা বিদ্যায় জ্ঞানবান অথচ ভক্তিতে নত ; বিশ্ববিধাতার যন্ত্র ভিন্ন নিজেকে আর কিছুই জ্ঞান করতেন না ; তর্কে অজেয় অথচ কর্ম্মে দক্ষ ; তিনি ধর্ম্মসংস্কারক অথচ রাজনীতি বিশারদ ; সমাজসংস্কারক অথচ প্রাচীন সমাজের শাস্ত্রের প্রতি তাঁর গভীর আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল। তিনি উপনিষদ্ বেদান্তের অনুবাদক অথচ খৃষ্টের উপদেশাবলীর সঙ্কলন-কর্ত্তা। তাঁর জীবন হোমানলের ন্যায় ঊর্দ্ধপানে নবযুগের নবীন আকাঙ্ক্ষা-সকলকে বিকীর্ণ করেছিল, সেই জ্যোতির্ম্ময় দিব্যাগ্নিতে নবযুগকে চিনে নেবার সময় এসেচে, এর ভগ্নাংশে আর আমাদের স্থানসঙ্কুলান হচ্চে না। তাঁর চরণে প্রণাম করে, তাঁরই মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে বিশ্ব-সভ্যতার কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করবার অনুকূল মুহূর্ত্ত এসেচে। আরম্ভ যেখানে হয়েছিল, এর শেষও হবে সেইখানে—বিশ্বহিতে।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

প্রেমের সমাধি

—:*:—

মথুরার রাজপুরে বৃথা ঘুরে কবি—
প্রণয় দেবতা—তার দরশন লাগি' ;
নীতিচক্র ধ'রে হেথা যে রয়েছে জাগি'—
নয়নে ভ্রুকুটী তার, নাহি প্রেমছবি।
বৃন্দাবনী প্রেম-গাথা সে ভুলেছে সবি—
কে কবে ফিরিয়াছিল গরব তেয়াগি'
কুঞ্জপথে রাধিকার প্রেমভিক্ষা মাগি'—
হেথা আজি অস্তমিত প্রণয়ের রবি।

রাজ্যনীতি সাথে প্রেম—সে কি রহে কভু!
দেবতা গোকুলে ছিল, মথুরাতে প্রভু।

মধু রাতে হেথা নাহি আবীরের খেলা,
কুঞ্জে নাহি শোনা যায় বাঁশরী নিঃস্বন ;
যমুনার কূলে নাহি গোপিকার মেলা—
কবিহৃদে নাহি জাগে প্রণয় স্বপন।

শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ

———

মুখ চেনা

——:০:——

রাস্তায় কতরকমের মুখই চোখে পড়ে।

চোখে পড়ে অনেক মুখ; কিন্তু মনে গেঁথে থাকে দু-চারটি। সমঝদার পাঠকদের কারও মনে মনে হাসবার দরকার নেই। আমি মনের উপর কোনও সুন্দরীর মুখের ছাপের কথা বলছি নে। আমি বলছি পরুষ পুরুষজাতির মুখের কথা।

একদিন একটা খেয়াল চাপল, লোকের মুখ দেখে ঠিক করব তাদের প্রকৃতিটা কি রকম। বড় বড় কবিদের গ্রন্থ পড়ে' ঠিক করে নিলুম ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির লোকের মুখের আকৃতিটা সাধারণত কি রকম হয়ে থাকে। সরল, ক্রুর, শান্ত, দুর্দ্দান্ত, প্রভৃতি নানারূপ লোকের মুখের গড়নের ও চোখের ভাবের একটা তালিকা ঠিক করে নিয়ে একদিন রাস্তায় বেরলুম, মুখের ভিতর দিয়ে লোকের মন পড়ে' ফেল্‌বার জন্য।

বেরিয়ে ত পড়লুম। কিন্তু একি বিপদ! সকলেরই মুখের ভাব যে প্রায় একরকম! আজকাল মানুষগুলোর মন কি সব একছাঁচে ঢালা হচ্চে?—আমি ভেবেছিলুম দেখ্‌ব কারও চক্ষু রক্তবর্ণ, চুলগুলো খোঁচা খোঁচা, হাত দুটো মুষ্টিবদ্ধ; কারও বা প্রশস্ত প্রশান্ত ললাটের নীচে চোখ দুটো দিয়ে একটা জ্যোতি বেরচ্ছে; কেউ বা সন্দিগ্ধভাবে এদিক ওদিক চাইছে, ইত্যাদি। তা না হয়ে একেবারে—

যাইহোক্, যখন তা হল না তখন যেরকম মুখ চোখের সামনে পড়তে লাগ্‌ল তাই লক্ষ্য করে দেখতে লাগলুম।

(২)

একদিন একখানা ট্রামে উঠে দেখি একটি যুবকও সেই ট্রামে চলেছে। আমি অভ্যাসমত সব ক'জন আরোহীর মুখের দিকে চুপি চুপি একবার চেয়ে নিয়ে সেই যুবকটির মুখের দিকেও চেয়ে নিলুম—মুখখানিতে সৌন্দর্য্য বিশেষ কিছু পেলুম না, কিন্তু তবু কেমন যেন আকৃষ্ট হয়ে পড়লুম। আমার চোখ দুটো যেন তার মুখ থেকে আর ফিরতে চায় না। শ্যামবর্ণ মুখশ্রীর মধ্যে সৌন্দর্য্য পেলুম কেবল তার ঘন ঢেউ-খেলানো চুলগুলিতে। আমরা এতগুলো লোক ট্রামে, কিন্তু সে যেন কাউকে দেখতে পাচ্ছে না। সে ট্রামের ছাদটার দিকেও চেয়ে ছিল না, অথচ তার চোখ দুটো ছিল সেই দিকে।

আমি মনে মনে প্রশ্ন করলুম—আচ্ছা, এই যুবক এত একমনে কি ভাবছে? সে হয় ত শেয়ালদা ষ্টেশনে কোনও আত্মীয়কে গাড়ীতে তুলে দিয়ে ফিরছে। ষ্টেশনে সে হয় ত এমন একটি সুন্দর মুখ দেখেছে, যার প্রভাব কাটানো বেচারা কোমলহৃদয় তরুণের পক্ষে বড়ই কঠিন হয়ে পড়েছে! সে হয় ত মনে মনে তর্ক করছে "আনন্দ কার অধিক? সুন্দর মুখ যারা দেখে তাদের, না সুন্দর মুখের অধিকারীর কিম্বা অধিকারিনীর?" আমরা বাল্যে কতই মধুর স্বপ্ন দেখেছি। কত না রাজকন্যাকে বিবাহ করে অর্দ্ধেক রাজ্যের অধীশ্বর হয়েছি! ঠাকু'মার গল্পের কত না তরুণীর সুরভি মালা আমাদের সকলেরই গলায় ঝুলেছে? যুবকটি হয়ত তার শৈশবের কোনও স্বপ্নের

সঙ্গে আজকের দেখা মুখখানি মিলিয়ে দেখ্‌ছে।—কিছুক্ষণ পরে পাশে চেয়ে দেখি কখন্ সে নেমে গেছে। সেই সৌম্য ভাববিহ্বল মুখখানি কিন্তু আজও আমার মনে আঁকা আছে।

(৩)

আর একজনের মুখ, যা আমায় অনেকদিন ধরে ভাবিয়েছিল, আমি উপর্য্যুপরি পাঁচ বৎসর ধরে দেখেছিলুম। সে মুখ কোনও যুবকের নয়—সে এক প্রৌঢ়বয়স্ক ভদ্রলোকের। তিনি আমাদের পাড়ায় পাঁচ বৎসর বাস করেছিলেন। গৌরবর্ণ মুখশ্রীতে কপাল-থেকে মাথার উপর কিছুদূর পর্য্যন্ত কেশের নামগন্ধও ছিল না। আর ঘন গোঁফের নীচে সর্ব্বদাই একটু হাসির অবশেষ লেগে থাকৃত। প্রতিদিন সকালে ভদ্রলোকটি তাঁর দশ বৎসরের সুন্দরী কন্যার হাত ধরে বেড়াতে যেতেন। রাস্তার কোনও জিনিসই তাঁর চোখ এড়াত না। আর পাড়ার মাতব্বরদের সকলের সঙ্গেই দু'একটা কথা না কয়ে তিনি পথ চলতেন না।

প্রথম যেদিন তাঁকে দেখলুম, আমি প্রায় লাফিয়ে উঠেছিলুম এই মনে করে যে, এতদিনে আমি এমন একটি লোক দেখতে পেলুম, যিনি যেমন ভাবুক তেমন কর্ম্মঠ। সচরাচর যাঁরা ভাবসাগরে ভাসেন, তাঁরা পৃথিবীর আহারনিদ্রা, বেচাকেনা প্রভৃতি জঘন্য ব্যাপারগুলো কিছুতেই সহ্য করতে পারেন না। ইনি যে মনে মনে সমস্ত দিন বাজারের হিসাব করেন না, তা তাঁর প্রফুল্ল মুখ দেখেই বুঝতে পারলুম। অথচ তিনি যে বাজারের হিসাবকে ভয়ও করেন না, তা তাঁর প্রত্যেক অঙ্গভঙ্গীতেই প্রকাশ পেত।

আমি মনে মনে তাঁর গার্হস্থ্য জীবনটা কল্পনা করে নিলুম। নিশ্চয়ই তিনি তাঁর স্ত্রীকে এখনও শোনান্—প্রথম যেদিন তাঁর স্ত্রীর হাত তাঁর হাতের উপর রেখে পুরোহিত মন্ত্রোচ্চারণ করেছিলেন, সেদিন তাঁর মনের ভাব কি রকম হয়েছিল! আর একদিনের হাস্যকর ঘটনা আজও সেই প্রৌঢ় দম্পতিকে নিশ্চয়ই খুব হাসায়। সেদিন নিস্তব্ধ দুফুরে তাঁরা দুজনে রবীন্দ্রনাথের 'পতিতার' সেই স্থানটি পড়ছিলেন :—

"আনন্দময়ী মুরতি তোমার, কোন্ দেব তুমি আনিলে দিবা,
অমৃতসরস তোমার পরশ, তোমার নয়নে দিব্য বিভা!"

এমন সময়ে স্বামীটি শুনতে পেলেন পাশের বাড়ীর হেমবাবু লেংড়া আম যে তখন টাকায় পঁচিশটা, তা না জেনে টাকায় বিশটা কিন্‌ছেন। অমনি সেই সাধ্বী স্ত্রী আর হতভাগিনী পতিতা উভয়কেই বিস্মৃত হয়ে তিনি ছুট্‌লেন হেমবাবুর সাহায্যে!

(৪)

এতেই আমি বুঝতে পারলুম যে আমি মুখতত্ত্বে বিশেষজ্ঞ হয়ে দাঁড়াচ্ছি। একদল পণ্ডিত আছেন, যাঁরা বহুপ্রাচীন পৃথিবী থেকে লুপ্ত কোনও প্রাণীর যদি এক টুক্‌রো হাড় পান ত বলে দিতে পারেন সে প্রাণীটার গড়ন কি রকম ছিল। আমিও তেমনি মানুষের মুখের একটা দাগ দেখলেই তাঁর মনোরাজ্যের একটা মানচিত্র এঁকে দিতে পারতুম।

কিন্তু সব ওলোটপালোট্ হয়ে গেল একদিন! সেদিন পাঁচ মিনিট ধরে একটু করে বৃষ্টি হচ্ছে আর একবার করে থামছে। আমি

বেরিয়েছি নতুন মুখের সন্ধানে। হঠাৎ এক ঝাঁক বৃষ্টির জল মাথার উপর এসে পড়ল। দৌড়ে গিয়ে একটা গাড়ীবারান্দার তলায় আশ্রয় নিলুম। সেখানে আরও দুটি ভদ্রলোক দাঁড়িয়েছিলেন। দুজনেই এক আফিসের কেরানী বলে বোধ হল। একটি জীর্ণশীর্ণ, অপরটি স্থূলকায়। যিনি স্থূলকায় তাঁর দিকেই আমার নজরটা বিশেষভাবে পড়ল। এ রকম অরসিকোচিত আকৃতি সচরাচর চোখে পড়ে না। প্রথমেই তাঁর গোঁফের কথাটা বলি। গোঁফগুলি তাঁর, কামাবার বুরুষের মত, ওষ্ঠ থেকে সোজা হয়ে বেরিয়ে এসেছে। আর তাঁর চিবুকটা একটু অস্বাভাবিকরকম সামনের দিকে ঠেলা। চোখ দুটি ক্ষুদ্রাকার, আর কপালের মধ্যে গভীরভাবেই বসানো। তাঁর সেই গম্ভীর মুখে হাসি-অপদেবতা যে কোনকালে উপদ্রব করেছিল বলে আমার বিশ্বাস হল না।

হঠাৎ ক্ষীণকায় ভদ্রলোকটি তাঁর সঙ্গীকে বল্‌লেন, "হোক্, কত বৃষ্টি হতে পারে দেখি, না-হয় রাত ৯টায় বাড়ী পৌঁছব। হৃষ্টপুষ্ট ভদ্রলোকটি বল্‌লেন, "না মশায়, আমায় বাড়ী এখনি পৌঁছতে হবে; মা-মরা ছেলেমেয়ে দুটো বাড়ীতে আছে, আমি না গেলে তারা বিকেলে জলই খাবে না।"

হরি হরি! একি হল? সব যে গোলমাল হয়ে গেল! আমি এতক্ষণ ধরে তাঁর মনের যে ছবিটা আঁকলুম, সব ভেস্তে গেল? এমন গোঁফ যার তার মনে যে মমতার লেশমাত্রও থাকতে পারে না সে বিষয়ে ত আমি নিঃসংশয় হয়েইছিলুম, পরন্তু পৃথিবীর কাউকেও যে সে বিশ্বাস করতে পারে না বা ভালবাসতে পারে না। তাও আমি ধ্রুব বলে মেনে নিয়েছিলুম। কিন্তু এ যে বলে সে বাড়ী

না গেলে তার ছেলে মেয়ে দুটি খাবে না? তার চেহারাটা আমার কাছে যতই ভয়াবহ হোক্, তার সেই গোঁফের নীচে তার ছেলে মেয়ে দুটি স্নেহকোমল মূর্ত্তি দেখতে পায়। যার অনুপস্থিতিতে তারা খেতে পর্য্যন্ত চায় না তাকে তারা কতই ভালবাসে!

লোকটি বিপত্নীক। তার স্ত্রীকে সে কখনও কবিতার বন্যায় ভাসিয়ে দেয় নি, কিন্তু নিশ্চয়ই অন্তরের অন্তর দিয়ে ভালবেসেছে। মৃত্যুকালে তার স্ত্রী নির্ভয়ে তারই কোলের উপর মাথা রেখেছিলেন। সে মুখে বলে নি বটে, "প্রিয়ে! চাও, চাও, অনন্তের পারে তোমার সঙ্গে আবার দেখা হবে"—কিন্তু মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিল ছেলে মেয়ে দুটিকে মায়ের অভাব বুঝতে দেবে না।

সেই দিন থেকে মুখ দেখে মনের ভিতরটা পড়া ছেড়ে দিয়েছি।

শ্রীতারাদাস দত্ত

ত্যাগী

—:•:—

দীক্ষার সময় আচার্য্য ব'ললেন—"বৎস, নীতির উপরেই ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠান ; এইটী মনে রেখো।"

শিষ্যের মন উৎসাহে পূর্ণ হ'য়ে উঠ্‌ল।—তাকে তো নূতন ক'রে কিছু ত্যাগ করতে হবে না ; সে তো জীবনে কখন নীতির পথ হতে চ্যুত হয় নাই ; জ্ঞানত অজ্ঞানত কখন তার পদস্খলন হয় নাই ; পাপকে দূরে রেখে অতীতের দিনগুলো একরূপ আড়ষ্ট ভাবেই কাটিয়ে এসেছে সে।......

অতএব ধর্ম্ম তার করতলগত। এখন শুধু ইষ্টলাভ হ'লেই সে সফলকাম হয়।

তারই জন্য আয়োজন স্থরু হল।

* * * *

বৎসরের পর বৎসর কেটে গেল।

অস্থিচর্ম্মসার দেহ আর অন্ধতমসাবৃত মন—এই নিয়েই সাধক ইন্দ্রিয়গ্রাম রুদ্ধ ক'রে ব'সে থাকে ; কিন্তু তবুও ইন্দ্রিয়াতিরিক্ত কিছু তো তার মনের আকাশে প্রতিফলিত হ'ল না।

মন তার উদ্বিগ্ন হ'য়ে উঠে।

বিশ্বকে সে পরিত্যাগ ক'রেছে কিন্তু মনে হয় বিশ্বের দ্বারা সে তো

পরিত্যক্ত হয় নাই। পাপের বন্ধনে হ'তে মুক্ত সে—তবু আজিও এ কিসের বন্ধন তাকে ঘিরে র'য়েছে?

সাধক হতাশ হ'য়ে পড়ে।

কিন্তু সৃষ্টিকে যে বিস্মৃতির অন্ধকূপে প্রেরণ ক'রতে চায়, তাকে হতাশ হ'লে চ'লবে কেন?

সে তাই আবার আসন ক'রে বসে।......

প্রকৃতি দেবীর মমতাদৃষ্টি সেই চর্ম্মাবৃত কঙ্কালের উপর প'ড়ে বিশ্বে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস জাগিয়ে তোলে; স্রষ্টাপুরুষ উদাস্ নয়নে চেয়ে থাকেন।

* * * *

এমনি ক'রে কত বৎসর কেটে যাবার পর—

লুপ্ত স্মৃতি ও শিথিল ইন্দ্রিয়গ্রাম—এই সম্বল নিয়ে সাধক একদিন জেগে উঠ্‌ল; ব'ললে—"এই তো উপলব্ধি"।

গুহার মধ্যে উপহাস প্রতিধ্বনি হ'ল—"এই তোর উপলব্ধি!"

* * * *

সাধু বাইরে চেয়ে দেখলে—

প্রকৃতি তার শ্যামল হাতখানি তারই জন্যে প্রসারিত ক'রে রেখেছে; বিহগকণ্ঠ তার মঙ্গলাচরণ ক'রছে; ফল, ফুল আর নির্ঝরের জল তারই অভিষেক-মন্ত্র পাঠ ক'রছে।

সাধু ভাবলে—"এতো আমারই প্রাপ্য, কেননা আমি প্রকৃতিজয়ী।"

আরও একটু এগিয়ে দেখ্‌লে—

নগরোপান্তে কুটীর দ্বারে দাঁড়িয়ে আছে এক নারী।

সাধুকে ব'ললে—"তপোধন আমি যে কতযুগ ধ'রে তোমারই অপেক্ষায় র'য়েছি। তপোক্লিষ্ট দেহে সেবা গ্রহণ ক'রে আমায় পুণ্যপ্রভায় মণ্ডিত কর।"

আত্মপ্রসাদগর্ব্বিত সাধু মনে ভাবলে—"সেবা তো আমারই প্রাপ্য—নারীরূপা প্রকৃতির প্রভু তো আমিই।"

(২)

প্রসন্ন শান্তিতে কয়টা দিন কেটে গেল।

রমণীর স্নেহ যত্ন অক্ষুণ্ন ছিল। কিন্তু সাধুর মনে কোথায় এবং কখন যে বিকার আরম্ভ হ'ল—তা' সে নিজেই বুঝতে পারলে না।......

বুভুক্ষু হৃদয়ের সমস্ত বাসনা একত্রিত ক'রে সাধু একদিন জিজ্ঞাসা ক'রলে—"এতদিন কোথায় লুকিয়ে ছিলে তুমি, নারী?"

শান্ত দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে নারী উত্তর ক'রলে—"তোমারই মনের মধ্যে।"

—কে তুমি?

—তোমারি বাঞ্ছিতা আমি নৈতিকতার অধিষ্টাত্রী দেবী।

—তুমি আমারই সাধনলব্ধা?......এতদিন কেন জানতে দাও নি, নিষ্ঠুর?

—সত্যই আমি নিষ্ঠুর। বিশ্বের মাঝে তোমার ইষ্ট যেথা বিরাজ ক'রতেন, সেই জায়গাটা আড়াল ক'রে এতদিন দাঁড়িয়েছিলুম আমি।

—আর আজ?

—আজ সময় হ'য়েছে তাই ধরা দিতে এসেছি।

* * * *

রাত্রি শেষে সাধু বুকের উপর থেকে রমণীকে দূরে ফেলে দিলে।......

কি কুৎসিৎ, কি বীভৎস মূর্ত্তি তার!

এ-কেই সে এতদিন দেবতার আসনে বসিয়ে পূজা ক'রে এসেছে!......

রমণীর কুটীল হাস্য অন্ধকারের মধ্যে ফুটে উঠ্‌ল—একটা বিদ্যুত-ঝলকের মত।

সাধু সেই আলোকে দেখলে—

বিশ্বের সমস্ত দুর্ব্বলতা, সমস্ত পাপ তারই হৃদয়দ্বারে দাঁড়িয়ে রয়েছে—তারই শরণপ্রার্থী হয়ে।

তাদের ফিরিয়ে দিলে তো তার নিজের মুক্তি নাই।

সেই দিন সাধু প্রথম বিশ্বের সঙ্গে তার একাত্মতা অনুভব ক'রলে।......

রমণীর বিদ্রুপহাস্যে ক্ষুদ্র কুটীর আবার মুখরিত হয়ে উঠ্‌ল।...যন্ত্র-

চালিতের মত সাধুর হস্ত রমণীর কণ্ঠদেশ স্পর্শ করলে……পরক্ষণে রমণীর প্রাণহীন দেহ ভূমিতলে লুটিয়ে প'ড়ল।

* * * *

শিষ্য এসে আচার্য্যের পায়ে মাথা রেখে আর্ত্তকণ্ঠে ব'লে উঠল—"প্রভু, এতদিনের সাধনা আজ বিফল হ'ল ?"

আচার্য্য ব'ললেন, "বৎস, এতদিনের পর আজ তোমার সাধনা সিদ্ধির পথে এসে দাঁড়াল।"

শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ

পুরোনো কথা

আমার লিখিত গত কংগ্রেসের রিপোর্ট দৃষ্টে কেউ কেউ আমার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ এনেছেন যে, আমি স্কুল-কলেজ ও আইন-আদালত বয়কট করবার রাজনৈতিক সার্থকতা এবং আধ্যাত্মিক মাহাত্ম্য যথোচিত হৃদয়ঙ্গম করতে পারি নি।

ইংরেজী শিক্ষা ও ইংরেজী আইনই যে দেশের সকল অনর্থের মূল এ মত নূতন নয়। ইংরাজ extremist এ কথা বহুকাল থেকে বলে এসেছেন।

উক্ত মত সম্বন্ধে আমার মতও নতুন নয়। প্রমাণস্বরূপ আজ থেকে সতেরো বৎসর পূর্ব্বে বাগবাজারের মহামান্য গুলিখোর সম্প্রদায়ের তরফ থেকে বড়লাট কার্জ্জন বাহাদুরকে ইংরাজি ভাষায় যে পত্র লিখি, সেখানি আদ্যোপান্ত পুনঃ প্রকাশ করছি। বঙ্গ ভঙ্গের কারণ দর্শিয়ে বড়লাটের তরফ থেকে মান্যবর রিজলি সাহেব যে রিজলিউসন প্রকাশ করেছিলেন, সেই রিজলিউসন সমর্থন করেই উক্ত নিবেদন পত্র লেখা হয়।

শিক্ষিত ভারতবাসী ও উকিল সম্প্রদায় সম্বন্ধে মান্যবর রিজলি সাহেব যে মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন, সে সম্বন্ধে আমার কি বক্তব্য ছিল, নিম্নস্থ পত্রে পাঠক তার পরিচয় পাইবেন।

আমার বিশ্বাস স্কুল কলেজ এবং আইন-আদালত বন্ধ করে দেবার স্বপক্ষে সকল সদ্‌যুক্তিই এ পত্রে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

বীরবল

A SUPPRESSED MEMORIAL.

Reprinted from "The Englishman."

The Official Secrets Act has not yet been amended so as to make the publication of suppressed memorials criminal. We accordingly give publicity to the following copy of a petition which has, we understand, been presented to the Viceroy:—

The Humble Petition of the Honourable Society of Opium-smokers, Bagbazar.

"Sheweth"—That the proposal of partitioning Bengal and transferring its eastern districts to Assam, has met with the whole-hearted approval of your petitioners, who by common report, are the most contemplative, peace-loving, loyal and timid community of his Majesty's subjects, in as much as such territorial redistribution satisfies their sense of the natural fitness of things, a sense the possession of which is considered by them as one of their proud privileges.

"That the hue and cry raised by the non-opium-smoking section of the Bengalee community, besides being annoying, vulgar and noisy to a degree, is factitious, possibly fictitious, at any rate inconsistent with the traditional somnolent suavity and dignified apathy of the race, and as such cannot but be condemned by those, who like your petitioners seek to preserve the continuity of traditions through the medium of a vegetable product which contains the very soul of conservatism.

"That your petitioners have perused with pleasure, the letter written by the Hon'ble Mr. Risley, and in their humble

opinion, it is a masterpiece of a type of literature that is yet to come. What they specially admire in that letter, as a literary production, is its absolute freedom from the vicious rules of reason and logic, consistency and relevancy, which hamper the free flow of original ideas, and in only too many cases repress the native genius of the writer. Your Lordship is well aware that fools only make a fetish of reason, and as fools happen to be in the majority, she has become an idol of the marketplace. But as your petitioners avoid the busy haunts of men and the light of day, passing their lives in silent and secluded temples of contemplation, vulgarly known as opium dens, they have succeeded in preserving the freedom of their spirit, and can legitimately claim to be intellectually the best fitted community to appreciate the imaginative and emotional qualities of Mr. Risley's letter.

"That your petitioners fail to comprehend on what valid grounds the agitating and agitated Bengali public can take lawful exception to the proposed partition. It has been established beyond cavil, by scientific reasoning and scientific appliances, that no people or race in Asia, can claim their country to be an impartible estate. Ignorance of the above argues a deplorable lack of the perception of the eternal verities of the modern world, with which it is not possible to have any sympathy. Why?—It has only recently been decided by the Committee of Nations that even the Celestial Empire is eminently and imminently partible. In view of the above fact, it is ridiculous for the Babus of Bengal to pretend that the integrity of their country must be kept intact. An imperial statesman, like your Excellency, cannot possibly countenance such outrageous pretensions on the part of a law-abiding people.

"That your petitioners beg leave to submit that the Hon'ble Mr. Risley in his anthropological uvestigations, never hit upon a profounder truth than when he discovered that the spread of education is the cause of the increase of litigation. Your petitioners were under a fond delusion, that such concealed truths, could only stand revealed to the votaries of the 'divine drug. But now they have to admit in all humility that inspiration is even more potent than inhalation. That English education creates a penchant for British justice is a proposition which few will care to controvert. To put it in the language of Hindu philosophy one is the counterpart of the other, and without their union, which is brought about by an agency called the Press, the above evils can neither be propagated nor multiply. Your Lordship must be aware that your petitioners hate education and dread law. Education begets a dynamic state of mind, whereas the ideal of all true lovers of opium is the blissful state of static calm. And it has been the painful experience of your petitioners, that an opium-smoker enters a Court of law, only to be transferred therefrom to a cognate institution, where no opium can be procured and from which no member of their community ever returns. For the above reasons, your Excellency's Government has laid your petitioners under a deep debt of gratitude, by devising a scheme whereby the evils of education and litigation would effectively be brought under the control of personal rule.

"That your petitioners love both Assam and its people with a love that passeth all understanding. It is universally known, that when the fumes of opium mount to the brain, man's thoughts wander 'Kamrup' way, and his imagination clings fondly to that magic land of golden-hued damsels. And that

it is not for your Lordship to neglect lands of mist and mysticism, is amply evidenced by the fact of your having sent an eseteric mission to Lhassa, the advent of which, as your petitioners have been credibly informed by an authentic telepathic message, has sent such a thrill of joy through every fibre of the soul of the Dalai Lama, that he could not help instantly falling into an ecstatic trance which, it is expected, will gradually fade off into total Nirvana. So your petitioners hope and believe that your Excellency will treat with deserved contempt the soul-less criticism of those grossly materialistic men who would foolishly forego this unique opportunity of being bodily transferred to that romantic land of Assam, where it is always afternoon.

That your petitioners cannot deny that there is a time-honoured tradition in this country believed in by all sensible men, not spoiled by education, that Bengalis when they go to Kamrup are turned into sheep, but that, in the opinion of your petitioners, cannot be a sufficient reason for opposing the Government proposal, because it has not been proved that such transformation would mean a loss of zoological status to the Bengali race.

"That your Lordship well knows that the people of Assam belong to that family of human being, known to scientists as the Mongoloid. The Mongol has in him a deep-rooted craving for opium and Buddhism, the two noblest products of the soil of Behar. Now, the Mongoloids can hardly be so false to their origin as not to be too keenly sensible to the seductive charms of the precious drug, and for that reason are considered by your petitioners as brothers. One touch of narcotic makes the whole world kin—and moreover opium is thicker

than blood. It, therefore, makes their hearts palpitate with joy to find, that the time is fast approaching, when the days of separation will be over, and brother with brother will be locked in a long and languorous embrace.

"That the sudden awakening of the geographical concious-ness in the Hon'ble Mr. Risley, comes at a most opportune moment. That the ethnological significance of the Brahma-putra should have been discovered on the eve of the discovery of the secret sources of that sacred river by Colonel Young-husband, is a coincidence of such deep import, that it is bound to give food for thought to the most unthinking individual. And your petitioners submit that, now that the scientific boundary of Assam has been found, so woefully missed by all previous rulers, your Excellency should not allow it to be confused by the ignorant clamour of a prejudiced public. A people like a country should be kept within its proper bounds, for it is certain, that progress of a people beyond its natural limits is alchoholic in its tendencies, and as such is utterly repugnant to your petitioners, who detest all things stimulat-ing as pernicious antidotes

"That your petitioners have no desire to further trespass on your Lordship's time, and tire your Lordship's patience by the enumeration of all the innumerable reasons that can be urged in support of the above beneficent scheme. But in conclusion, they make bold to offer a humble suggestion for your Lordship's kind consideration. If the burden of Bengal be too heavy for a provincial Governor, how immeasurably heavier, must the burden of India be for one Governor-General ? So your petitioners beg respectfully to suggest, that in future the work of governing India should be divided among three

Viceroys. A diplomatic Governor-General for the Himalayas whose duty would be to watch and regulate the foreign relations of this country, to create complications and to procreate problems, and whose field of activity would range from Bhootan to Khotan on one side and from the Pamirs to the Amu on the other. Secondly, an artistic and literary Viceroy, for the plains, whose duty would be to preserve ancient monuments and build new ones, and administer the country by means of peripatetic orations, occidental in inward worth and oriental in outward beauty. Lastly a commercial Viceroy for the seas, whose duty would be to constantly flit to and fro between Rangoon and Bunder Abbas, looking after the ports, and controlling exports in the light of the new fiscal policy. According to the Hindu Shastras, even the Supreme Ruler of the universe found it necessary to divide his personality into three.—Shiva enthroned on the Himalayas, Vishnu in his incarnations, desporting over the length and breadth of India and Brahma, on his lotus, floating eternally on the limitless ocean.

উকিলের কথা

——:*:——

শ্রীযুক্ত "সবুজপত্র" সম্পাদক

সমীপেষু

মহাশয়,

আমি উকিল হয়েও আপনার 'সবুজপত্র'-এর গ্রাহক ও পাঠক। এতেই বুঝতে পারছেন ওকালতিতে এখনও তেমন কিছু করে' উঠতে পারি নি। মোকদ্দমার ব্রিফ আর খবরের কাগজের প্যারাগ্রাফ্ ছাড়া আর সব লেখা এখনও অপাঠ্য হয়ে ওঠে নি। আবার ও-ব্যবসাতে এমন ফেলও মারি নি যাতে বেদান্ত না পড়েও জগৎ সংসার মায়া মনে হয়, কি শ্বেত কি সবুজ, চোখে সবই ঘোরকৃষ্ণ মালুম দেয়। অর্থাৎ— আমি জুনিয়র উকিল। কাজেই ওকালতি ব্যবসাটির উপর মনে অনেক-খানি মায়া ও কতকটা মোহ রয়েছে। কিন্তু এমনি দুরদৃষ্ট যে অনেক সাধ্য সাধনার পর ব্যবসার যেই একটু সুসার হবার লক্ষণ দেখা দিয়েছে অমনি চারদিক থেকে দেশের পণ্ডিত, মূর্খ, নির্ব্বোধ, বুদ্ধিমান সবাই ও-ব্যবসাটির উপর একেবারে খাঁড়া উচিঁয়েছে। সে খাঁড়া কথার এবং লেখার হলেও তার ধার কিছু কম নয়। কার্ত্তিক মাসের 'সবুজপত্র'-এ 'বাঙালীর কথা' উপলক্ষ্য করে' 'ওকালতি বুদ্ধি'র উপর একহাত নিতে আপনিও ছাড়েন নি। চারদিক থেকে খোঁচা খেয়ে আত্ম-

রক্ষার খাতিরেই আপনাকে এই চিঠি লেখার চপলতায় প্রণোদিত হয়েছি। নইলে বিনা টাকায় মুসাবিদা করা আমাদের স্বভাব নয়।

উকিল সম্প্রদায়টির উপর দেশের রাগের কারণ এই যে, এ পর্য্যন্ত তারাই দেশের পলিটিক্যাল কাজে নেতাগিরি করে এসেছেন। কি প্রাক্‌স্বদেশী কংগ্রেসি ডেমনস্ট্রেশন, কি পোষ্টস্বদেশী স্বরাজি আজি-টেশন—সর্ব্বত্রই তারা হয়েছেন কর্ম্মকর্ত্তা। এবং আপনার মত যাঁরা মহাত্মা গান্ধির প্রচারিত নন্‌-ভায়লেণ্ট নন্‌-কো-অপারেশনের প্রসাদে বৎসরমধ্যে স্বরাজ লাভের আশ্বাসে বিশ্বাস করতে ভরসা পাচ্ছেন না তাঁরাও এই বলে খুশী হয়েছেন যে, আর কিছু না হোক, ও-আন্দোলনে দেশী বিলাতী উকিল-নেতাদের নেতাগিরির খতম হবে। মক্কেলের কাজের ফাঁকে ফাঁকে দেশের কাজের চেষ্টা বা ভাণ আর চলবে না। কথা ঠিক। যে আন্দোলনের ফলে বছর না ঘুরতে বৃটিশকর্ত্তৃত্বের বাঁধন কাটিয়ে ভারতবর্ষ স্বরাজলাভ করবে, যে বৃটিশজাত লাখ লোক দিয়ে ত্রিশকোটি ভারতবাসীকে আজ একশ' বছর ধরে শাসনে রেখেছে, গেল শ'কয়েক বছর ধরে' নিজের জাতভাই আইরীশম্যানের টুঁটি চাপছে, গেল যুদ্ধের সময় ইচ্ছামত পৃথিবীর সমস্ত জাতির ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ কি অবাধ করেছে, এমন কি মহাত্মা গান্ধিকে দিয়েও অন্য জাতির স্বাধীনতা হরণে সহায়তা করিয়ে নিয়েছে, সেই জাত সূঁচের খোঁচাটি না খেয়েও বছরের মধ্যেই পরাজয় স্বীকার করে' ভারতবর্ষটা ভারতবাসীর হাতে তুলে দিয়ে 'বিট্রনপ্রস্থ' অবলম্বন করবে, এমন আন্দোলনের নেতার কেন, চেলার কাজও ওকালতির অবসরে করা একদণ্ডের জন্যও চলবে না; এবং বিলাতি মালের দালালির অবসরেও চলবে না। এমন কি স্বদেশী তাঁতে কাপড় বোনার ফাঁকে

কি স্বদেশী দোকানে মাল বিক্রির অবসরেও অচল হবে। কেননা ওর নেতা ও চেলা হতে পারে সে-ই যে, হয় সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী, নয় যার ওর-থেকেই সংসার চলবে। কিন্তু উকিল-সম্প্রদায়ের তরফ থেকে আপনাদের একটি প্রশ্ন করছি। এমন প্রচেষ্টার কল্পনা দেশে পূর্ব্বে কবে হয়েছিল, এবং কোন্ উকিল তার নেতা হবার স্পর্দ্ধা করেছিল? আরও জিজ্ঞাসা করছি,—এতকাল যে সব প্রক্রিয়া করে' দেশ তার পলিটিক্যাল দুরবস্থা মোচন করতে চেয়েছে, উকিল তার উপযুক্ত পুরোহিত ছিল কি না? সভা ডেকে ইংরেজী বক্তৃতা করতে ও শুনতে হলে উকিলই হচ্ছে উপযুক্ত নেতা। কেননা যুদ্ধে বিক্রমের প্রয়োজন হলেও সভায় চাই বাক্‌পটুতা। এবং আমাদের অতিবড় শত্রুও কখনও বলে নি যে, আমাদের এ গুণটির কোনও অভাব আছে। ধরুন এ সব সভা-সমিতিতে উকিল নেতা না হয়ে নীরবকর্ম্মী নেতারা গিয়ে যদি নীরব হয়ে বসে থাকতেন তবে সেটা সঙ্গত না-শোভন হত। আসল কথা, যেমন অনুষ্ঠানের আয়োজন হয় কর্ম্মকর্ত্তাও তেমনি জোটে। আজ যদি দেশ সত্যিই মুখের কথা রেখে কাজের জন্য কোমর বাঁধে তবে তার গা ঝাড়ার সাড়া পেলেই উকিল-নেতারা দেশের কাঁধ থেকে আপনি নেমে পড়বেন। তাদের তাড়াবার জন্য নন্‌ভায়লেণ্ট নন-কো-অপারেশনের পাশুপাত অস্ত্র দরকার হবে না। কেননা আপনি ওকালতি-বুদ্ধির যতই নিন্দা করুন, আত্মরক্ষার বুদ্ধিতে আমরা কারুর চাইতে খাটো নই। কিন্তু আমাদের নেতাগিরির উপর আপনাদের রাগের মাত্রা দেখে সন্দেহ হয় যে, বিশেষকিছু করবার মতলব আপনাদেরও নেই। কেন না কাজ যখন আরম্ভ হয়

তখন কাজের মুখেই তার নেতা গড়ে ওঠে, এবং যে তার চলার সঙ্গে তাল রাখতে না পারে সে আপনি ছিট্‌কে পড়ে। সে জন্য বেশি সোরগোল দরকার হয় না। দেশ তার কাজের নেতা বাছাই করে' নিতে পারে না, এ ডেমক্রেটিক যুগে তাই বা কেমন করে' মুখ ফুটে স্বীকার করি। তাই এ-ও বলে রাখছি, যদি দেখা যায় যে, নন্-কো-অপারেশন ব্যাপারেও আচারের বেশি প্রয়োজন হয় না, খুব কড়া প্রচারেই কাজ চলে যায় তবে উকিল-নেতাদের সরাতে পারবেন না। কেন না, নরম গরম দু' রকম বক্তৃতাই আমাদের সমান অভ্যাস আছে। এই দেখুন না, যে কৌঁসিলি হাইকোর্টে মুখ খোলে না, মফঃস্বলে ডেপুটীর কোর্টে তিনিই নরসিংহ অবতার।

কিন্তু আমাদের আসল মুস্কিল হয়েছে এই যে, নেতাগিরি ছাড়লুম বল্লেই লোকে আমাদের ছাড়ছে না। মহাত্মা গান্ধি আবিষ্কার করেছেন যে, যে-চার পায়ের উপর ভারতবর্ষের বৃটিশ-সিংহাসন খাড়া আছে আমরা হচ্ছি তার একটা পা। সুতরাং ঐ সিংহাসন নামাতে হলে আর তিন পায়ের সঙ্গে আমাদেরও সরে দাঁড়াতে হবে। অর্থাৎ— উকিলেরা নেতাগিরি ছাড়ুক আর না-ছাড়ুক তাদের ওকালতি ছাড়তে হবে। বলা বাহুল্য, এতে আমাদের ঘোর আপত্তি। এবং সে আপত্তির কারণ সেই পুরোনো জিনিস, যার জন্য পৃথিবী জুড়ে' মারা-মারি, গালাগালি, হাঙ্গাম হরতাল চল্‌ছে, অর্থাৎ—পেটের ক্ষুধা। মহাত্মার কথায় অবশ্য অ্যানাটমির তর্ক তোলা বাচালতা, নইলে বলে' দেখা যেত, সিংহাসনের আমরা যে পা, ঐটি রেখে বাকি তিন্‌টে পা সরানো হোক। তাতে সিংহাসনের যে ভঙ্গী হবে উপবিষ্ট লোকটির পক্ষে তাই বেশি ভয়ানক। একেবারে চারটে পা সরালে সিংহাসন

নাম্‌বে বটে কিন্তু তাতে বসার কোনও অসুবিধা নাও ঘটতে পারে। চাই কি সেটা মাটীতে আরও বেশি গেড়ে বসবে। কিন্তু জানি এ সব মেডিকো-লিগাল যুক্তি একেবারে নিস্ফল। কেন না বোধ হচ্ছে নন্‌-কো-অপারেশন-বিধিতে উকিল ও ডাক্তার দুই-ই বর্জ্জনীয়।

তবে যে নন্‌-কো-অপারেশনের জালে আমাদের ওকালতির জল থেকে দেশউদ্ধারের ডাঙ্গাতে তোলার চেষ্টা হচ্ছে তার দু' একটা জায়গায় ফাঁক বড় বেশি। কেবল উকিলের চোখে নয়, একেবারে কানা না হলে সবার চোখেই তা ধরা পড়বে। নন্‌-কো-অপারেশনে স্বরাজলাভ হবে বছর মধ্যে, অথচ তার গতি ক্রমবর্দ্ধনশীল; পুরো বেগ প্রথম থেকে দেওয়া চলবে না। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ-সিংহাসনের চার পা হল উপাধিধারী খোসামুদে, স্কুল কলেজের ছোক্‌রা, আদালতের উকিল, আর *সেদিনকার নব সৃষ্টি—নখদন্তহীন কাউন্সিলের* সভ্য। ভারতীয় সৈন্য নয়, ভারতবাসী পুলিশ নয়, সরকারের দেশী চাকর চাকুরে নয়! বাধ্য হয়ে স্বীকার করতেই হবে যে, এ নন্‌-কো অপারেশনের তত্ত্ব আর সব তত্ত্বের মতই গুহায় নিহিত। সুতরাং শুন্‌তে যতই সহজ হোক, ওকে বুঝতে হলে ব্যাখ্যা দরকার। মহাত্মা গান্ধির একজন বাঙালী উকিল-শিষ্য এক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বক্তৃতায় আমাদের বলেছেন, প্রথমেই যে উকিলদের ব্যবসা ছেড়ে সন্ন্যাসী হতে বলা হয়েছে এটা তাদের পক্ষে বিশেষ সম্মানের কথা। কেননা এর অর্থ এ আন্দোলনের তারাই নেতা হবার উপযুক্ত। এর জন্য যে বিদ্যা, বুদ্ধি, দেশপ্রীতি চাই তা তাদেরই আছে। অবিশ্যি যখন ইংরেজের ইস্কুল কলেজে না পড়লে এখন আর ইংরেজের আদালতে উকিল হওয়া যায় না, এবং ও স্কুল কলেজে ঢুকলেই

ভারতবাসীর মনোভাব হয় দাসের মনোভাব, তখন বিশেষ করে উকিল-সম্প্রদায়ের এ সব গুণ কোথা থেকে আসে এ সম্বন্ধে মনে সংশয় উপস্থিত হয় বটে। কিন্তু সে কথা ভেবে দরকার নেই। নন্-কো-অপারেশন শাস্ত্রের কোনও ব্যাস কি জৈমিনী এই সব পরস্পর বিরুদ্ধ বাক্যের একদিন নিশ্চয়ই মীমাংসা করবেন। আপাতত আমি উক্ত উকিল-শিষ্যের ব্যাখ্যা মেনে নেব। উকিল হয়ে উকিলের ব্যাখ্যায় তর্ক তুলে এস্পিরিট-ডি-কোর-এর অভাব দেখাব না।

ব্যাখ্যা যখন মেনে নিচ্ছি তখন তার টীকা টিপ্পনীতে দোষ নেই। এবং ও-ব্যাখ্যার উপর আমার প্রথম টিপ্পনী হল এই যে, ও-তে 'উকিল' কথাটা বসেছে মীমাংসকদের ভাষায় 'উপলক্ষণে'। ওর প্রকৃত লক্ষ্য হ'ল সমস্ত ইংরেজী শিক্ষিতসম্প্রদায়। এই সম্প্রদায়কেই ভারতবর্ষকে মুক্তির পথে পথ দেখিয়ে নিতে হবে। উকিলের নাম লক্ষণা করার অর্থ, ও দলের মধ্যে তাদের মুখের ঠুঁলিটা একটু আলগা, গলার শিকলটা ওরি মধ্যে একটু ঢিলে। নইলে ইংরেজের আদালতে ওকালতি করার ফলে মাথার বুদ্ধি কি মনের সাহস কিছুই বেড়ে যায় না। ইংরেজী শিক্ষিতসম্প্রদায়ের লোকেরই যে কেন নেতা হতে হবে তার কারণও অতি স্পষ্ট। যে-সম্প্রদায় ইংরেজ আমলের পূর্ব্বে থেকে চিরকাল দেশের নেতৃত্ব করে আসছে, অর্থাৎ—বিদ্যা ও বুদ্ধিজীবি-সম্প্রদায় তারাই হয়েছে এ কালের ইংরেজী শিক্ষিতসম্প্রদায়। এবং ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ভবিষ্যতের যে আদর্শ আমাদের রাজনৈতিক চেষ্টার প্রবর্ত্তক সে আদর্শের অনেকখানি এসেছে আধুনিক ইউরোপ থেকে আর ইংরেজী ভাষার মারফতে; এবং মোটের উপর এর সঙ্গে পরিচয় এখনও ইংরেজি শিক্ষিতসম্প্রদায়ের মধ্যেই আবদ্ধ আছে।

আদর্শটা ইউরোপ থেকে এসেছে বলে' লজ্জার কোনও কারণ নেই। সভ্যতার কোনো সৃষ্টি প্রায়ই দুবার করে' হয় না। এক জায়গায় হলে সব সভ্য জাত তাকে আত্মসাৎ করে। 'বিশ্বমানব' জিনিসটা যে কবির কল্পনা নয়, ধান কাপড়ের দরের মতই সত্য, এ-ও তার একটা প্রমাণ। আর ও-ভাব ও-আদর্শ ইউরোপেও কিছু আদিম নয়, সেখানেও ওটা সেদিনকার সৃষ্টি। নিতে জানলে নেওয়ার মধ্যে কোনও লজ্জা নেই। এই দেখুন না, আমরা আজকাল সর্ব্বদাই বলছি ভারতবর্ষের কাছে সমস্ত পৃথিবীকে এখনও অনেক শিখতে হবে। 'পূব না হলে' পশ্চিমের চলবে না'—শ্রীযুক্ত বেনস্পুরের মুখে এ কথা শুনে ষোল হাজার লোক একসঙ্গে কংগ্রেসে হাততালি দিয়েছে। পরের কাছ থেকে নেওয়া যদি লজ্জার কথা হ'ত তাহলে পরকে কিছু দিয়ে তাদের লজ্জা দিতে মহাত্মা গান্ধির শিষ্যেরা নিশ্চয়ই লজ্জিত হতেন। আর ইংরেজী ভাষা যে এখনও ও-ভাব ও-আদর্শের বাহন হয়ে রয়েছে তার কারণ শিক্ষার অবহুল প্রচার, যার ফলে ছাপার লেখা থেকে ভাব নেবার মত পড়া যেই পড়ে, সেই প্রায় ইংরেজী পড়ে। এ দশাটা যখন ঘুচবে এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতির ভাষা ও সাহিত্য বড় হয়ে গড়ে উঠবে তখন ও-সব ভাব ও আদর্শে পৌছিতে বিদেশী ভাষার পিঠে সোয়ার হতে হবে না। এবং মাতৃভাষার মারফৎ যখন তাদের সঙ্গে পরিচয় হবে তখন তাদের বিদেশী বলেও মনে হবে না। তবে ইংরেজের ইস্কুল কলেজে ইংরেজী পড়লেই আমাদের মনোভাব দাসের মনোভাব হয় বলে যে একটা কথা রটছে ওটা 'কামুফ্লাস' ছাড়া কিছু নয়, কেননা যারা ইংরাজিতে ও-বক্তৃতা করছে আর যারা শুনে ইংরেজী কায়দায় হাততালি দিচ্ছে ও-দু'দলই ইংরেজী ইস্কুলে ইংরেজী শিখেছে বলেই

ও-কাজ করছে। নইলে সে ইস্কুলে যে পড়ে নি সে ও-কথার অর্থও বুঝতে পারবে না। আর এ-ও ত জানা কথা যে, ইংরেজ যখন এসে এ দেশের প্রভু হয়েছিল তখন দেশের কেউ ইংরেজের ইস্কুল কলেজে পড়ে নি।

ভারতবর্ষের ইংরেজী শিক্ষিতসম্প্রদায়কে নেতা হয়ে পথ দেখাতে হবে, এ ত নন্-কো-অপারেশনের ব্যাখ্যার টিপ্পনী করে পাওয়া গেল। কিন্তু সে পথ চলেছে কোথায়? এর একটা মোটামুটি পরিষ্কার উত্তর আমাদের চাই-ই চাই। নইলে আমাদের আন্দোলন হুজুগ হয়ে' উঠতে কিছুমাত্র সময় লাগবে না। এবং উত্তর দিতে গেলেই বুঝতে হবে যে, ভারতবর্ষে দুটি আন্দোলন একসঙ্গে সুরু হয়েছে। একটি আন্দোলন ভারতবর্ষের নিজস্ব, আর একটি পৃথিবী-জোড়া আন্দোলনের স্থানীয় প্রকাশ। প্রথমটি 'স্বরাজ' আন্দোলন,—বিদেশী ব্যুরক্রেসির শাসন থেকে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক মুক্তির চেষ্টা। দ্বিতীয়টি দেশের যারা অধিকাংশ সেই জনসাধারণের যুগ-যুগান্তব্যাপী দাসত্ব, রাজনৈতিক, আর্থিক, সামাজিক সমস্ত রকম দাসত্ব থেকে মুক্তির প্রয়াস। আজ ভারতবর্ষে যারা নেতৃত্ব করবে তাদের ও দুটি আন্দোলনের একসঙ্গে নেতা হতে হবে। এবং প্রথমটির খাতিরে দ্বিতীয়টি নিয়ে খেলা করলে চলবে না। ওর সঙ্গে যাদের প্রাণের যোগ নেই তাদের সকালেই সরে দাঁড়াতে হবে। এবং খুব সম্ভব বিদেশী ব্যুরক্রেসির দলে মিশে তারা একটা নতুন 'ইণ্ড-ব্রিটিশব্যুরক্রেসি'র সৃষ্টি করবে। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান আন্দোলন যে এই দো-রোখা আন্দোলন, অন্তরে তার সাড়া পেয়ে বাঙালা দেশের শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ ও শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল নাগপুর কংগ্রেসের 'স্বরাজ

চাই' এই পণটাকে 'ডেমক্রেটিক স্বরাজ চাই' এই পণে পরিবর্ত্তন করতে চেয়েছিলেন। বাকী ভারতবর্ষের কাছে তাঁরা ভোটে হেরেছেন। তা হারুন, কিন্তু বাঙলার মন যে বাকী ভারতবর্ষের পনেরো বছর আগে চলে তাও আবার প্রমাণ হয়েছে।

পৃথিবীজুড়ে আজ শূদ্র মাথা তুলছে। যারা সব দেশে জনসমষ্টির বহু, তারা চিরদিন যারা অল্প—হয় ব্রাহ্মণ, নয় ক্ষত্রিয়, নয় বৈশ্য—তাদের দাসত্ব করছে; যারা প্রাণান্ত পরিশ্রমে মানুষের সভ্যতার অন্নময় দেহ গড়ে তুলে তাতে অমৃতময় কোষের সৃষ্টি সম্ভব করেছে, কিন্তু যারা চিরকাল অন্ন ও অমৃত দুই থেকেই বঞ্চিত হয়ে আসছে,—আজ তারা পৃথিবীর অন্নে তাদের প্রাপ্য অংশ দাবী করছে। এ দাবী অগ্রাহ্য করা চলবে না, কেন না শূদ্র আজ দল বাঁধতে শিখেছে। বিধাতা করুন তারা যেন কেবল অন্নেই তুষ্ট না হয়, অমৃতেও তাদের দাবী জানায়; মানুষের সভ্যতা যে জ্ঞান ও আনন্দের সৃষ্টি করেছে তার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। সব দেশে যে স্বল্পশ্রেণী, অন্নের শ্রেষ্ঠ ভাগ ও অমৃতের সমস্তটা নিজেরা নিয়ে এসেছে, তাদের ও-দুই-ই সবার সঙ্গে সমান ভাগ করে' নিতে হবে। হৃষ্টচিত্তে এ না পারলে তাদের ও মানুষের সভ্যতার ভবিষ্যৎ অন্ধকার। পৃথিবীজোড়া এই আন্দোলনের ঢেউ ভারতবর্ষেও এসে লেগে তার শূদ্র-সমাজকে চঞ্চল করে' তুলেছে। দেশের যারা নেতা হবে তাদের কাজ এই মূক সমাজকে অন্নের দাবীতে মুখর করে তোলা, তাদের প্রাণে অমৃতের পিপাসা জাগিয়ে তোলা। তাদের জানাতে হবে স্বয়ম্ভূ তাদের দাস্যের জন্য সৃষ্টি করেন নি, তারাও "অমৃতস্য পুত্রাঃ"। এই কাজের জন্য আজ দেশকে ডাকতে হবে। কেবল পঞ্জাব ও খিলাফতের নামে নয়।

সে ডাকে উকিল-সম্প্রদায়ের ভিতরেও হয় ত সাড়া পাওয়া যাবে; তারা উকিল বলে নয়, মানুষ বলে ও শিক্ষিত মানুষ বলে।

চিঠিটা লম্বা হয়ে পড়ল। কিন্তু কি করি বলুন। একদিন সিনিয়ার হয়ে ডেলি-ফিতে কাজ করবো ভরসায় অল্প কথাকে লম্বা করবার অভ্যাস করছি। সে অভ্যাসটা অস্থানেও বের হয়ে পড়ে আর চিঠি পড়ে যদি বলেন শেষ পর্য্যন্ত কিছুই বলি নি তবে বুঝব আমার সিনিয়ারির শিক্ষানবিশি সম্পূর্ণ হয়েছে। ইতি

শ্রীজুনিয়র উকিল

গৌরীদানের ফল

সনাতন চাটুয্যে অতি তুখোড় লোক, এমন পলিসিবাজ আর দুনিয়ায় দুটো হয় না। তবে সাধারণত দেখা যায় লোকে পলিসি খাটায় ইহলৌকিক ব্যাপারে, কিন্তু সনাতন খাটাতেন পারলৌকিক ব্যাপার সম্বন্ধে। বলা বাহুল্য, বোধ হয় এই পারলৌকিক ব্যাপার সব পরার্থে উদ্দীপনাজনিত নয়, নিজস্বার্থে উৎসাহজনিত। সনাতনের জ্ঞান হওয়া থেকে বরাবর দৃষ্টি ছিল যে স্বর্গটা কিছুতেই যেন হাত-ছাড়া হ'য়ে না যায়। তাই স্বর্গে যাবার যত রকম কায়দা সংস্কৃতে লেখা আছে তা ছিল সনাতনের কণ্ঠাগ্রে ও নখাগ্রে। গয়া গঙ্গা গদাধর কারোই, রঘুনন্দন চাটুয্যের পৌত্র ও পরাশর চাটুয্যের প্রপৌত্র শ্রীযুক্ত সনাতন চাটুয্যের বিরুদ্ধে কোনই অভিযোগ বা অনুযোগ করবার কিছুই ছিল না। আর সেইজন্যে সনাতন ভাবতেন যে আর সবাইকে যদি বৈতরণী পার হ'তে হয় সাঁতরে, তবে তাঁর জন্যে তৈরী হ'য়ে থাকবে অন্তত পক্ষে একটি ময়ূরপঙ্খী, খুব কম করে' হলেও এক শ' দাঁড়ের। সনাতনের মনে যে অধিকতর দ্রুতগামী ষ্টীমলঞ্চ বা মোটর লঞ্চের কথা উঠত না, তা নয়। তবে একালের ম্লেচ্ছের আবিষ্কারগুলো সেকালের ব্রাহ্মণ ইঞ্জিনিয়ারের আবিষ্কৃত বৈতরণীর বুকে চলবে কি না সে-বিষয়ে তাঁর সন্দেহের বিরাম ছিল না।

সনাতনের বনে যাবার বয়েস ধর ধর, এমন সময় একদিন তাঁর

মনে হল যে, স্বর্গে যাবার সব রকম পুণ্যের টিকিটই তাঁর সংগ্রহ করা হ'য়ে গেছে, শুধু গৌরীদানের পুণ্যের টিকেটখানিই কেনা হয় নি। সেই বয়েসে এই কথাটা সনাতনের মনে হওয়ার একটা কারণও ছিল। সেটা হচ্ছে এই যে, সেই সময়ে তাঁর সবার ছোট মেয়েটি সাত পেরিয়ে ঠিক আটে পা দিয়েছে। সনাতনের বয়েসটাও ধাঁ ধাঁ করে' এগিয়ে যাচ্ছে। তাই সনাতন মনে মনে বললেন—না, গৌরীদানের পুণ্যটা বাকি রাখা কোন কাজের কথা নয়।

সনাতনের যে কথা সেই কাজ। বছর ফিরতে না ফিরতে বিধবা তারাসুন্দরীর একমাত্র পুত্র রমেনের সঙ্গে তাঁর ছোট মেয়ে লতিকার শুভ বিবাহটা সুসম্পন্ন করে স্বর্গে যাবার সনন্দখানি একেবারে মনের পকেটে পূরে রাখলেন।

(২)

রমেন ছিল বিধবা তারাসুন্দরীর একমাত্র ছেলে। তেইশ বছর বয়সে দু' দু' বার বি,এ, ফেল করে' বাড়ীতেই বসে' ছিল। সুতরাং এই সুযোগে মা ছেলের বিয়ে দিয়ে পুত্রবধূ ঘরে আনলেন।

বিবাহ ইত্যাদির সম্বন্ধে রমেনের যে মতামত কি ছিল তা কেউ জানত না, তবে কিছুদিন থেকে যে সে অত্যন্ত অন্যমনস্ক ভাবে গুণ্ গুণ্ করে' রবি বাবুর বাছা বাছা প্রেম সঙ্গীতগুলোর মক্স করত, সেটার সম্বন্ধে কেউ কেউ সাক্ষী দিতে পারত। তা ছাড়া বার্ণস্ ও ব্রাউনিং-এর কোন কোন লাইন যে তার হৃদয়টা দুলিয়ে যেত না সেটাও কেউ নিশ্চয় করে বলতে পারে না।

সুতরাং এ-হেন রমেনের শয্যাপ্রান্তে যেদিন তার অষ্টম বর্ষীয়া

বধূটি এসে একটি কাপড়ের পুঁটুলির মত হ'য়ে স্থান গ্রহণ করল সেদিন রমেনের হৃদয়টা তোলপাড় করে' উঠল অনেকখানি। তারপর তার হৃদয়ের রক্ত তার মাথার দিকে এবং মাথার রক্ত তার হৃদয়ের দিকে অনেকবার যাতায়াত করার পর যখন সে সাহস সঞ্চয় করে' নববধূর একটি হাত নিজের হাতে টেনে নিয়ে আবেগকম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল—"লতি, আমায় ভালবাসবে?" তখন সে আবিষ্কার করল যে লতি অবগুণ্ঠনের নীচে কাঁদছে, সে প্রশ্নে লতির কান্না দ্বিগুণ বেড়ে গেল. ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে লতি উত্তর দিলে, "মা ছাড়া আর আমি কাউকে ভালবাসব না।" রবীন্দ্রনাথ, বার্ণস, ব্রাউনিং সব জড়িয়ে মিলিয়ে মিশিয়ে রমেনের বুকের মধ্যে এমনি একটা জমাট আঁধার বেঁধে উঠল যে, তার মধ্যে রমেনের নিজের মন বুদ্ধি চিত্তও একেবারে লয় পেয়ে গেল, রইল যা তা কেবল ফিউচারিষ্টদের একখানা জোরাল ছবি।

(৩)

তার পর দিন রমেনের হঠাৎ সুবুদ্ধির উদয় হ'ল। রমেন মাকে বললে—"মা আজকাল যে রকম দিন পড়েছে তাতে আর যেটুকু জমি জমা আছে তাতে চলবে না। সুতরাং চাকরি বাকরির চেষ্টায় বেরিয়ে পড়া সমীচীন।" মায়ের অনেক অনুযোগ অভিযোগ ও অশ্রুজল হেলায় জয় করে' রমেন অতি দূরদেশ বীরভূমে তার এক দূর সম্পর্কিত চাকুরে-কাকার কাছে চলে' গেল।

কাকা মহাশয় রমেনের এই রকম হঠাৎ চাকরি করবার মত মতি দেখে যুগপৎ পুলকিত ও আনন্দিত হ'য়ে উঠলেন। কাকা

মহাশয়ের সাহেব সুবোর কাছে একটু প্রতিপত্তি যে না ছিল তা নয়। সুতরাং কিছুদিনের মধ্যেই রমেনের চল্লিশ টাকা মাইনের এক কেরানীগিরি জুটে গেল।

চাকরী পেয়ে রমেন মাকে জানাল। মা লিখলেন, "বৌকে নিয়ে যা।" রমেন উত্তরে লিখল, "মাইনে একটু বাড়ুক।" মা লিখলেন, "পূজোর বন্ধে বাড়ী আসিস্।" রমেন লিখলেন, "এত দূরদেশ থেকে বাড়ী যেতে আসতে প্রায় ত্রিশ চল্লিশ টাকা খরচ। ঐ বাজে খরচটা এখন না করে টাকাটা জমিয়ে রাখলে ভবিষ্যতে কাজ দেবে।" এতে মায়ের যে কত দিন কতখানি অশ্রু ঝরল তা রমেনের অজ্ঞাত রয়ে গেল।

দেশে অনেকগুলো কল আছে। যেমন ট্যাকশাল, বিশ্ববিদ্যালয়, ওকালতি, কেরানীগিরি। এই সব কল থেকে এক একটা টাইপ তৈরী হয়। ট্যাকশালে যেমন যে-ধাতুই গলিয়ে দেওয়া যাক্ না কেন, তার একদিকে রাজার মুখের ছাপ আর একদিকে সন তারিখ নিয়ে চেপ্টা হ'য়ে বেরিয়ে আসে, কেবল তাদের বাজারে একটু মূল্যের বেশ কম নিয়ে, তেমনি কেরানীগিরি কলে যত রকম ধাতুর মানুষই ঠেলে দেওয়া যাক্ না কেন কিছু দিন পরে' তাদের হাব ভাব ভ্রুভঙ্গী কটাক্ষ মন দেহ প্রায় এক রকমই দাঁড়িয়ে যায়; তবে বাজারদরে প্রভেদ থেকে যায়।

আটটি বছরে রমেন পাকা কেরানী হ'য়ে উঠেছে। সে যে একদিন রবিঠাকুরের প্রেমসঙ্গীত গুন্ গুন্ করে' গান করত, তা আজকাল তাকে দেখলে কেউ বিশ্বাস করবে না। বার্ণস-এর নাম শুনলে আজ তার মনে হয় ও-পদার্থটা স্কট্ল্যাণ্ডের পাহাড় কি অন্তরীপ কি অমনি একটা

কিছু হবে। আট বছরের প্রতিদিন, ঘণ্টা আষ্টেক করে' কলম পিষে তার দু চোয়াল জেগে উঠেছে চক্ষু দুটো ভিতরে নেমে গেছে, একত্রিশ বছর বয়সে এমন কি তার বাঁ কানের পাশ দিয়ে দুটো পাকা চুল পর্য্যন্ত ঝুলে পড়েছে। কিন্তু রমেন বেশ আছে, চল্লিশ থেকে তার মাইনে ষাটে উঠেছে।

এমন সময় এক দিন বিধবা তারাসুন্দরী লতিকাকে সঙ্গে নিয়ে রাইচরণ খুড়োর সাথে রমেনের কর্ম্মস্থলে এসে উপস্থিত। রমেন মনে ভাবলে মন্দ কি, এইবার খাওয়া দাওয়ার একটু সুরাহা হ'তে পারে।

রমেন প্রায়ই আপিসের খাতাপত্র নিয়ে এসে বাসায় কাজ করত। সেদিনও রাত্রে খাওয়া দাওয়া শেষ করে' এসে নিজের শোবার ঘরের টেবিলের উপরকার বাতিটা উজ্জ্বল করে' দিয়ে চেয়ারে বসে' রাশি রাশি টাকা আনা পাইয়ের হিসেব একমনে দেখে যাচ্ছিল, এমন সময় খাওয়া শেষ করে' তার ষোড়শী স্ত্রী লতিকা ঘরে প্রবেশ করল। লতিকার বয়েস যত বাড়্ছিল ততই তার স্বামীর আট বছর আগের একমাত্র প্রশ্নটি তার হৃদয়ের অন্তস্থলে একটা তীক্ষ্ণ বিষাক্ত তীর-ফলকের মত স্থূল থেকে স্থূলতর হ'য়ে উঠছিল। আজ সে এসেছিল তার সমস্ত মন প্রাণ নিয়ে একটি জীবনকে নিঃশেষে উজাড় করে' ঢেলে দেবার জন্যে। আজ লতিকার মনের সুষমা তার সমস্ত দেহে ছড়িয়ে গেছে, তার প্রাণের পুলক-স্পন্দন সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গে চারিয়ে গেছে। ষোড়শী স্ত্রী এসে রমেনের চেয়ারের একটি হাতল ধরে' রমেনের পাশে দাঁড়াল, রাজ্যের রক্তিমাভা তার কপোলে জড়িয়ে। টাকা-আনা-পাই-য়ে ব্যস্ত-রমেন একবার খালি মুখ তুলে

চাইল, তারপর তার বাঁ কানের পাশে যেখানে দুটো পাকা চুল এসে ঝুলে' পড়েছিল সেইখানে চুলের মধ্যে অন্যমনস্কভাবে তার বাঁ হাতের পাঁচ আঙুল চালাতে চালাতে বললে, "আমাকে এখন আর disturb করো না, এ-কাগজ আমাকে কালই দাখিল করতে হবে!" লতিকার কপোলের রক্তিমাভা একমুহূর্তে একেবারে পাঁশুটে হয়ে গেল, লতিকা ধীরে সরে' গেল। তার বুকের মধ্যে নেমে এল একটা জমাট বাঁধা আঁধার আর তার চোখের সামনে বিছিয়ে গেল একটা সীমাহীন শেষহীন নিষ্ঠুর মরুভূমি—যেখানে চারিদিকে কেবল বিরতি-হীন মৃগতৃষ্ণিকা।

সেই সময়টাতে প্রায় ষাট বছরের এক বৃদ্ধ ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্নে শুনছিলেন বৈতরণীর বুকে ময়ূরপঙ্খীর একশ' দাঁড়ের ঝুপ্ ঝুপ্ শব্দ।

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

প্রাপ্তি

—:০:—

ওগো তুমি এলে আজ

মহারাজ!

নয়নে শ্রবণে,

শ্রাবণের শ্রমহীন অজস্র স্রবণে

পশিলে বন্যার সম

বিহ্বল চেতনাকুল জাগরণে মম।

আবেগ-বিকম্পিত বাসরের রাতে,

তোমার নয়ন-পাতে,

অপূর্ণ বিদীর্ণ হিয়া

যেদিন ক্ষণেক তরে উঠিল গো শিহরিয়া-

সেদিন আমার

ভিখারী নয়নাসার

সম্বল ছিল গো বঁধু।

অন্তরে নিভৃততম যত রস মধু

উৎসের গতিতে

পারেনি ক্ষরিতে

তৃষ্ণার্ত্ত নয়নের তৃপ্তিহীন পথে।

সে প্রথম মিলনের শুভদিন হতে,
প্রতি দিন প্রতি রাতি,
জ্বালায়ে স্মৃতির বাতি,
ক্লান্তিহীন বেদনার পরিপূর্ণ সুখে
যাপিয়াছি প্রতিক্ষণ ভাষা-হীন মুখে।
বিরহের গুরুভারে টুটিল হৃদয়—
তবুও তোমার দেখা পাইনি নিদয়!

আজ একি! বিস্মৃতির প্রথম ইঙ্গিতে,
নিদ্রাহীন সাগরের কলকণ্ঠ গীতে
ছাপিয়া সকল বাধা, পশিলে পরাণে,
অন্তর ভরিয়া দিলে অমরার দানে!

নিখিল করিয়া তুচ্ছ চেয়েছি যখন,
পাইনি, দাওনি দরশন।
ভুলিতে বসিনু যবে—সেই শুভক্ষণে
পরশ করিয়া গেল পরশ-রতনে!

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ রায়।

বাঙালী যুবকের মনের কথা

——:*:——

গত অগাষ্ট মাসে কলিকাতায় যখন কংগ্রেসের বৈঠক বসে, তখন জনৈক ভারতপূজ্য অ-বাঙালী স্বদেশী-নেতা আমাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, "বাঙলায় ভাবের ধারা এখন কোন্ দিকে বইছে?" উত্তরে আমি ব'লি যে, "তার সন্ধান নিতে হবে বাঙলা সাহিত্যে,—বাঙালীর মুখের কংগ্রেসী-বক্তৃতা কিম্বা বাঙালীর লিখিত ইংরাজী সংবাদপত্রে নয়।" এ উত্তরে তিনি সন্তুষ্ট না হয়ে প্রশ্ন করলেন, "এক কথায় বলতে পার না?" এর উত্তরে আমি বলি, "আমার মনে হয় যে, আমাদের দুর্দ্দশার জন্য আমরা নিজেরাই যে অনেকটা দায়ী, এই সন্দেহ বাঙালার মনে উদয় হয়েছে। সুতরাং আমাদের মামুলী রাজনৈতিক বুলিগুলি বাঙালীর মনে আর তেমন করে ঘা দেয় না।"

এ উত্তর শুনে তিনি এতটা বিরক্ত হয়েছিলেন যে, আমাদের কথোপকথন আর বেশি দূর এগলো না।

বাঙলায় ভাবের ধারা কোন্ দিকে বইছে, তার পরিচয় নিতে হলে অবশ্য বাঙলার যুবক-সম্প্রদায়ের মনের দিকে নজর দিতে হবে। এ কথার মানে এ নয় যে, যুবকমাত্রেরই মনে নবভাবের সাক্ষাৎ মিলবে। তার সাক্ষাৎ মিলবে শুধু সেই সব যুবকের মনে, যারা নিজের চোখ দিয়ে দেখতে জানে, নিজের মন দিয়ে ভাবতে জানে। এ শ্রেণীর যুবকেরা যে আমাদের ইংরাজী শিক্ষিতসমাজের নানারকম সত্যমিথ্যা বুলি আজকের দিনে বিনা বিচারে গলাধঃকরণ করতে প্রস্তুত নয়, তার প্রমাণস্বরূপ আমি তিনটি যুবকের তিনখানি পত্রের কিয়দংশ প্রকাশ করছি। বলাবাহুল্য এ পত্রগুলি আমার ছাড়া অপর কারও চোখে যে কখনো পড়বে, এ কথা লেখকেরা স্বপ্নেও ভাবেন নি। সুতরাং এ সব লেখার

ভিতর কোনরূপ ভাণের লেশমাত্র নেই। এঁদের বক্তব্য কথা যেমন অকপট, তেমনি সরল।

প্রথম পত্রের লেখক গত বৎসর বি,এ, পাশ করে এখন বি,এল, পড়ছেন।

দ্বিতীয় পত্রের লেখকের নাম গোপন করবার চেষ্টা বৃথা, কেননা উক্ত পত্রের ভিতর দিয়ে তাঁর আত্মপরিচয় ফুটে বেরিয়েছে।

তৃতীয় পত্রের লেখক বাঙলার বাইরে হিন্দুস্থানীর দেশে কোনও কলেজে এখন বি,এ, পড়ছেন।

বাঙলায় যারা ভাবে, তাদের ভাবের ধারা যে গভীরতা লাভ করছে, পাঠক-মাত্রেই প্রথম ও তৃতীয় পত্রে তার স্পষ্ট পরিচয় পাবেন।

ইউরোপীয় সভ্যতার কেনা-বেচার দিক নয়, মানসিক দিকটার ঘনিষ্ঠ পরিচয় নেবার জন্য একদল বাঙালী যুবকের মন যে ব্যগ্র হয়েছে, তার পরিচয় শ্রীমান দিলীপকুমারের পত্রে পাওয়া যায়। ইউরোপীয় সভ্যতার সস্তা সমালোচনা যে খেলো মন থেকে বেরয়, অতবড় একটা জীবন্ত সভ্যতার প্রতি অবজ্ঞা যে অজ্ঞতাপ্রসূত, এ জ্ঞান দেখতে পাই আরো পাঁচ জন বাঙালী যুবকের মনে জন্মেছে। যে আত্মজিজ্ঞাসা সকল আত্মজ্ঞানের মূল, সে আত্মজিজ্ঞাসা যে বাঙলার নবীন মনেও উদয় হয়েছে, এর চাইতে আর বেশি কি আশার কথা হতে পারে?

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

(১)

৯-১১ ২০

* * * *

প্রায় প্রতি জেলার প্রতি গ্রামেই খুব জ্বর হচ্ছে ও লোক মারা যাচ্ছে। আমার ধারণা এ মৃত্যুর মূলে কেবল রোগকে স্থান দিলেই যে

চলবে তা' নয়। এই বাঙালী জাত প্রায় একশ' বছর ধরে খেতে পায় না। সত্যিই খেতে পায় না। যা পায় তা'তে পেট কারো ভরে, আর কারো সেটিও হয় না। তারপর সে খাদ্যগুলি পেটকেই ভরায়, শরীরকে তাজা করে না; কাজেই রোগের সঙ্গে যুঝে ওঠা সাধারণের দায়। খেতে যারা পায় না তাদের ঘরের অবস্থা যে কি শোচনীয়, কি দুঃসহ দুঃখের আধার, তা বলে শেষ করা যায় না। আর সেই সঙ্গে তাদের নেই রেস্ত, যে ডাক্তার ডেকে ওষুধ কিনে খায়। কাজেই সাধারণ লোক ও তথাকথিত মধ্যবিত্তের অবস্থা হতে স্পষ্টই দেখা যায় যে, এ পৃথিবীতে তাদের মানুষ হয়ে জন্মাবার সুখটা কতখানি! আমাদের এই গ্রামে বর্ষার দু'মাস ছেড়ে দিয়ে আর দশটি মাস দুধের সের হয় তিন পয়সা, আর মাছ পাওয়া যায় প্রচুর, এবং তার মূল্যও যৎসামান্য। বোধ হয় তিন আনার মাছ কিনলে দশ জনের খাওয়া মন্দ চলে না। তা'হলে দেখা যাচ্ছে গড়ে মাছ কেনার জন্য মাথাপ্রতি এক পয়সার কিঞ্চিৎ বেশি লাগে। এ খরচটাও তাঁরা পুষিয়ে উঠতে পারে না। তাদের বাঁচবার আশা কি থেকে হবে? এদের ভগবানের কাছে বোধহয় প্রার্থনা এই যে, এরা শীঘ্রই যেন পরপারে যাত্রা করতে পারে। Reform যদি করতেই হয়, তবে এইদিকে খাবার বন্দোবস্ত করে জাতকে বলবান করে তুলে, তবে তার অপর উন্নতি করতে হবে। আমার এই মত। এই জাত যদি খেতে পায়, তবে আবার বর্ত্তমান যুগের আলোতে জেগে উঠবে। আর তা যদি না পায়, তবে এরা খেতে-না-পাওয়া বাঘের মত হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে একটা বিরাট কাণ্ড বাধাবে। তাদের মুখের গ্রাস কেমন করে এবং কোথায় চলে যায়, সেইটুকু বেশ করে বুঝিয়ে দিয়ে পথ দেখাতে

হবে। এ কাজ বোধকরি এ পর্য্যন্ত কোন পলিটিসিয়ানই তেমন ক'রে করেন নি, ও শীঘ্র যে করবেন তাও মনে হয় না। অমৃতশহরে যে অমানুষিক কাণ্ড ঘটেছে, সে বিষয়ে ভারতীয় জন-সঙ্ঘের মতভেদ নেই, কিন্তু কতলোক যে প্রতিদিন এই সোনার ভারতে না খেতে পেয়ে, অকালে সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা পিছনে ফেলে, চিরদিনের মত চলে যাচ্ছে, সেইটুকু ভেবে প্রতিকারের চেষ্টাটা কেউ তেমন ভাবে করেন নি। এই খেতে না-পাওয়ার ফলে মানুষ যে অদ্ভুত মরিয়া হয়ে জাগরণের সাড়া দেয়, তা কামড়ে ধরার মত ভয়ঙ্কর; আজ সেই সাড়ার একটা ক্ষীণ স্পন্দন দেখা যাচ্ছে। সেটা অনেকটা হুজুগ হলেও কাজের। আমি বলছি এই বর্ত্তমান strike-এর ধারা দেখে। এরাই দেখাচ্ছে যে, co-operation-এর মস্ত বড় একটা শক্তি আছে, এবং এই শক্তিটাই তাদের উন্নতির পথে নিয়ে যাবে।

খাদ্যদ্রব্যের মূল্য যে বেড়ে গিয়েছে, তাতে আপাতত দুঃখ করবার যথেষ্ট কারণ আছে, কষ্টও যে সবার কম হচ্ছে তা নয়; কিন্তু এর ফল যা হচ্ছে ও হবে, সেটা ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে দেখলে মনে হয় খুবই ভাল, এবং তার ফলে যে জাগরণ হবে সেটা কল্পনায় এত আশা-প্রদ ব'লে মনে হয় যে, তাতে বর্ত্তমানের দুঃখটা ডুবে যায়। পেট যদি ভাল করেই ভরতো, তবে আজ বাঙালী বিদেশে ছুটত না,—নাক-ডাকিয়ে নিশ্চয়ই ঘুমতো!

ভারতের প্রায় সব প্রদেশই ব্যবসা করে ঘরে টাকা আনছে, শুধু বাঙলা আর মাদ্রাজ বাদে। এদেরও বর্ত্তমানের চালচলনটা আর মাষ্টারী, ওকালতী আর চাকরীতেই শেষ হচ্ছে না। Enterprising

spirit-টা খুব ধীরে ধীরে বাঙলায় ঢুকছে। এটাও কিন্তু উপরের লিখিত উপায়ে, পয়সা জোটে না দেখে, না-খেতে পেয়ে মরবার ভয়ে হচ্ছে। এ দিকের যাত্রাটা কি খুবই আশাপ্রদ নয়?

প্রায় পনেরো দিন পূর্ব্বে আমাদের বাড়ীতে এসে একটি প্রজা জানালে যে, তাদের পাশের বাড়ীতে একটি লোক বড়ই কাতর। দাদা ডাক্তারী পাশ করে বাড়ীতে এসেছেন। তাঁকে দেখতে পাঠানো হল। তিনি দেখে এসে বললেন যে, রোগটা হচ্ছে না খেতে-পাওয়া। তখন তার ব্যবস্থা করা হল, কিন্তু হতভাগা আর বাঁচল না। এই মৃত লোকটির দুটি পুত্র ও স্ত্রী আছে। এদের এখন দেখবে কে? কিবা তাদের ভূষণ, আর কিবা তাদের শ্রী! প্রবাসীর বাঁকুড়া জেলার দুর্ভিক্ষ-পীড়িত ব্যক্তিদের ফটোতোলা চেহারাকেও হার মানিয়ে নিশ্চয়ই দেবে! এদের জল খাবার ব্যবস্থাটুকুও নেই, ভাত ত দূরের কথা! আমি বলি এইরকম হিসাবের খাতা গড়ে তুলে, খতিয়ান করে দেখলে দেখা যাবে যে, ভারতবর্ষের কষ্ট দূর করবার জন্য যে সব Moderate or Extremist-রা নানা ছন্দে, নানা প্রকারে, গলা উঁচু ও নীচু করে সুর ধরেছেন, সেটা নাম জাহির করবার জন্যই, প্রকৃত দুঃখকে দূর করবার মোটেই চেষ্টা হয় নি বা হচ্ছে না। যদি কেউ এদিকে দৃষ্টি দেন, তবে তাঁকেই ভারতের প্রকৃত হিতৈষী বলে আমরা স্বীকার করতে বাধ্য।

* * * *

(২)

Randolph Hotel, Oxford.
16-11-20

*   *   *   *

আমি পরশু সন্ধ্যায় এখানকার 'মজলিসে' "সঙ্গীত রজনী" নামক আসরে নিমন্ত্রিত হয়ে, এখানকার ছাত্রবৃন্দের অতিথি হয়ে এই হোটেল-টাতে আছি। গান করতে জানলে ব্রাহ্মণভোজনের সুবিধা কেবল যে আমাদের দেশেই হয় তা নয়, এখানেও তার অভাব হয় না। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতটা একটু শিখেছিলাম বলেই যে আজ এতটা আদর পাওয়া যাচ্ছে, এ ভেবে আমার ভাগ্যকে ধন্যবাদ দেব না পরিণাম-দর্শিতারূপ পুরুষকারকে ধন্যবাদ দেব, ঠিক ঠাহর করে উঠতে পাচ্ছি না। সে যাই হোক, অক্সফোর্ড-এ এসে এখানকার ছেলেদের শাস্ত্রানুমোদিত অতিথি-সেবাতে আমি পরম পরিতুষ্ট হয়েছি, এ কথা বলতেই হবে, যদিও কোনো বিষয়েই অক্সফোর্ডের শ্রেষ্ঠতা মেনে নেওয়া আমাদের (অর্থাৎ—কেমব্রিজিয়ানদের) পক্ষে নিতান্তই un-constitutional !

এখানে গত পরশু ইংরাজ শ্রোতা ও শ্রোত্রীও অনেকে ছিলেন। তাঁদের মধ্যে দুই একজনের আমাদের সঙ্গীত ভাল লেগেছে মনে করা অসঙ্গত নয়। বিশেষত একজন ছোটখাট Composer (ছাত্র অবশ্য) যখন মহা উৎসাহের সঙ্গে আমার গান শোনার পর আমার সঙ্গে আলাপ কর্ত্তে সুরু করে দিলেন, তখন মনে হল যে, এ দেশটাকে আমাদের সঙ্গীতের একটু ভাল নমুনা যদি সত্যি সত্যিই দেওয়া যায়,

তবে হয় ত নিতান্ত অরসিকে রসের নিবেদন গোছ না হতেও পারে। সুইট্জরল্যাণ্ডে M. Romain Rolland মহাশয়ের সঙ্গে আলাপ পরিচয়ের পর যখন দেখলাম যে, তিনি একদিন নয়, রোজই আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে গান শুনতে চাইতেন, এবং যখন তিনি আমাদের সঙ্গীতের ঔৎকর্ষ্য সম্বন্ধে আমাকে লিখে পাঠিয়েছেন, তখন মনে হল যে, হয় ত উৎকৃষ্ট সঙ্গীতের মধ্যে বিশ্বজনীন কিছু থাকতেও পারে,—যদিও আমি এতদিন ধরে অন্যরকম মনে করে এসেছি। আমার মনে হত (এবং এখনও যে হয় না, তা নয়) যে কোনও শ্রেষ্ঠ আর্ট বুঝতে হলে তার চর্চ্চা (সে active-ই হোক, আর passive ই হোক) কিছুদিন ধরে করা দরকার; এবং শুধু যে দরকার তাও নয়, এ না হলে তাতে কোন প্রবুদ্ধ আনন্দ উপভোগ কর্ত্তে পারাই সম্ভবপর নয়। এখন আমার এ মতের আংশিক পরিবর্ত্তন হয়েছে। M. Romain Rolland লিখেছেন যে, যদিও সাধারণের পক্ষে এ কথা খাটে, কিন্তু যারা সত্য সত্যই সঙ্গীত-বেত্তা ও বোদ্ধা, বাস্তবিক উঁচুদরের সঙ্গীতের বিশ্বজনীনতাটা তাদের কানে অনুরণন তুলতে বাধ্য; যদিচ আমরা আমাদের সঙ্গীত থেকে যে ভাবে রসগ্রহণ কর্ত্তে সক্ষম, তাঁরা হয় ত ঠিক সে ভাবে রসবোধ কর্ত্তে পার্ব্বেন না। এ সম্বন্ধে আমি নিঃসংশয় না হতে পারলেও, এর মধ্যে যে অনেকটা সত্য আছে তা আমার অল্প অভিজ্ঞতাতেই মনে হয়। এ কথা যদি সত্য হয়, তবে আমাদের সঙ্গীত যাতে এদেশের লোকে শোনবার সুযোগ পায়, সে পক্ষে ত আমাদের দেশ থেকে চেষ্টা হওয়া উচিত। এ পক্ষে স্বরলিপিই একমাত্র সহায়, এবং আমাদের সঙ্গীতের চরম মাধুর্য্য এর মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেই য়ুরোপে প্রচার করা কর্ত্তব্য। M. Rolland

আমাকে এ কথাই বলছিলেন। আমাকে তিনি একটু ভাবিয়ে দিয়েছেন, এবং এ দেশের এই অল্পবিস্তর appreciative spirit-টাতে আমাকে একটু বিচলিত হতে হয়েছে। আপনারা এ পক্ষে কোনও চেষ্টা করেন না কেন? M. Rolland আমাকে বলছিলেন যে, ফ্রান্সে অনেক সঙ্গীতের মাসিক পত্রে আমাদের সঙ্গীতের নমুনার খুবই আদর হবে, বিশেষত যখন আমাদের সঙ্গীতটা এতই মহান্। আমি ভবিষ্যতে এ বিষয়ে কিছু contribution করবার আশা রাখি। এই জন্য আমি আজকাল য়ুরোপীয় সঙ্গীতটা মন দিয়েই শিখতে আরম্ভ করেছি। তবে এখন বুঝেছি যে, উপর উপর শেখাটা কিছু নয়, একটু তলিয়ে বোঝবার চেষ্টা করাটা বড় দরকার। সে জন্য আজকাল আমাকে একটু খাটতে হচ্ছে। Mus. Bach.-এর Part I-এ আমি আগামী জুনে পরীক্ষা দেব। এখন এখানে Theory of Music-টা ভাল করে পড়ান হয়। সেটাও ভাল করে শেখবার ইচ্ছে আছে। দেখা যাক কতদূর কি হয়। দেশে ফিরে নানাদেশে বছর দুই ধরে ঘুরে আমাদের সঙ্গীতটা আরও ভালকরে শেখবার সঙ্কল্পটা ক্রমেই দৃঢ় হতে দৃঢ়তর হচ্ছে। তবে আমাদের প্রধান দোষ হচ্ছে অধ্যবসায়ের অভাব। আমরা মনে করি talents থাকলেই বুঝি সব হয়ে গেল। এদের দেশে সঙ্গীতে (শুধু সঙ্গীতে কেন, সব বিষয়েই) যারা উচ্চাশী, তারা পরিশ্রম করে অসাধারণ। এদেশের এ spirit-টা যদি শিখে যাওয়া যায়, তা'হলে একটা মস্ত কাজ হয়। দুঃখের বিষয় আমার পরিচিতদের মধ্যে অনেকেই এখানে বহুকাল বাসের পর bow-টা ভালকরে বাঁধতে শিখে আত্ম প্রশস্তি বোধ করে থাকেন। অতুল গুপ্ত মহাশয়ও তাঁর "বৈশ্য" প্রবন্ধে লিখেছেন যে, য়ুরোপের

প্রাণের ও গভীরতার দিকটা আমাদের মধ্যে কম লোকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে ব'লে প্রমাণ হয় না যে, তার সে দিকটাই অবিদ্যমান,—না এমনি একটা কথা। কথাটা খুব ঠিক। আমার কাছে এঁদের এই উদ্যম অধ্যবসায় ও প্রাণশক্তির স্পন্দনটা খুব ভাল লাগে। বিশেষত আমাদের মত অবসন্ন জাতের কাছে এ দেশের নিকটপরিচয়ের (উপর উপর পরিচয় নয়) খুবই দাম আছে মনে করি। তবে অনেকের কাছেই এ দেশের সম্বন্ধে সস্তা প্রতিবাদ শুনে শুনে আজকাল আর প্রতিবাদ কর্ত্তে ইচ্ছে যায় না। কারণ এ দলের সমালোচকগণ কথা কিছু শেখবার জন্য বা শোনবার জন্য বলেন না, বলবার জন্যই বলেন। আমিও নিঃশ্বাস-সঞ্চয়রূপ নীতিকে বিশ্বাস করি বলে, বিরাট ennui-এর সঙ্গে অনর্গল শুনে যাই; কিন্তু তা যে কতটা কষ্টের সঙ্গে, তা বুঝতে পার্ব্বেন আমার ennui কথাটির ব্যবহার দেখে।

* * * *

(৩)

৮।১০।২০

* * * *

এখানেও মাঝে নন্-কো-অপারেশন নিয়ে খুব খানিকটা গোলমাল চল্ল। কয়েকটি ভদ্রলোক এখানে এসে মিটিং করে বক্তৃতা দিয়ে, আর কিছু না করুন শহরের এবং কলেজের অনেকের মাথা গোলমাল করে দিলেন। খুব খানিকটা "দেশভক্তি"র বিষয় বড় বড় কথা শোনা

গেল, এখন আবার সমস্ত যা ছিল তাই হল—কোনোখানে কোন সাড়াশব্দ পর্য্যন্ত নেই! আমার এই সমস্ত দেখেশুনে ধারণা হয়েছে যে, কোন গোলমালে কিছু হবে না, ভিতর থেকে জড়ত্বের দাসত্বের বন্ধন না ঘুচলে, বাহির থেকে মুক্তি আসতেই পারে না। আমরা যতদিন না কুসংস্কার-মুক্ত, কর্ম্মনিষ্ঠ ও সত্যপ্রিয় হব, ততদিন জাতীয় উন্নতি যে কি করে হবে তা আমি বুঝতে পারি নে। আমার মনে হয় মুক্তি কেবল আসতে পারে আমাদের প্রকৃত স্বরূপের উপলব্ধি থেকে, এবং সেই উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে যে আত্মত্যাগের প্রেরণা আসে, যে উচ্চ-আদর্শ লাভের আকাঙ্খা জাগরিত হয়, তার ভিতর দিয়ে। যতদিন সেই ভাব না আসবে, ততদিন সকলে নিশ্চিন্ত মনে চিরকাল শুধু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থ দ্বন্দ্ব দ্বেষ তর্কবিতর্ক দলাদলি নিয়ে দিন কাটাবে। পলিটিক্যাল তর্ক করেই বা লাভ কি?—উত্তেজক পানীয়ের মত পলিটিক্সের একটা নেশা আছে, এতে মানুষের মনে একটা সাময়িক উন্মাদনা আনে, তার perspective একেবারে উল্টে দেয়, সে ন্যায় অন্যায়, সত্য অসত্যের পার্থক্য দেখবার শক্তি হারিয়ে ফেলে;—কি জন্যে সে এত উত্তেজিত হয়ে নিজের এবং অন্যের মধ্যে অশান্তি সৃষ্টি করছে তাও ভুলে যায়, এবং দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে দেশের ও দেশ-ভক্তির নামে যত অনিষ্টসাধন করে। আমাদের দেশের লোকেরও সেই অবস্থা হয়েছে। প্রকৃত আদর্শ, প্রকৃত মুক্তিলাভের ইচ্ছা তার নেই; সে কেবল নিজের মতামতের সত্যতা প্রমাণ করবার জন্য, বুদ্ধি-বৃত্তির নানারকম চাতুর্য্যের দ্বারা ছোট ছোট জিনিসকে বড় এবং মিথ্যাকে সত্য প্রমাণ করতেই নিজের সমস্ত শক্তি খরচ করে ফেলছে, এবং পরম দেশহিতৈষী বলে তার ভক্তবৃন্দের প্রশংসা অর্জ্জন করে

নিজের এবং অন্যের জীবনকে ধন্য জ্ঞান করছে। এখনকার এই দুঃসময়ে মানুষের মধ্যেকার যা-কিছু চিরকালের, যা-কিছু অ-মলিন, সে বিষয় কোনো কথা বলতে গেলে উপহাসাস্পদ হতে হয়। তুচ্ছ জাত বা মতামতের পার্থক্যকে অব[illegible] কথা, করুণাময় স্নেহপ্রবণতার কথা বলতে গেলে, বা সরলতা দয়া ঔদার্য্য ক্ষমা ভালবাসা প্রভৃতি মানুষের সহজ স্বাভাবিক হৃদয়বৃত্তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে গেলে, লোকের চোখে হেয় হয়ে যেতে হয়। সকলে মনে করে, এর দেশের প্রতি টান মোটেই নেই, এ এখনও এই সব "সেকেলে" কথা বলতে লজ্জা বোধ করছে না, কারণ এ জানে না যে ঐ সব দয়া দাক্ষিণ্য করুণা, ত্যাগস্বীকার করা, এইসব "ভাল মানুষী"র যুগ এখন কেটে গেছে; প্রকৃত "পৌরুষ," অর্থাৎ— বীরের মত অন্যের সুখদুঃখের দিকে না তাকিয়ে, আপনার কামনার সিদ্ধি করার যে আনন্দ, মাতৃভূমির যথার্থ সন্তানের মত বিদেশী দেখলেই তাকে নিপীড়িত করে অপমানিত করে শক্তি প্রয়োগ করে যে নির্ম্মল সুখ— এ-সব এ জানে না বোঝে না। আমি আমাদের বাঙালী যুবক অনেক-কেই দেখেছি, অনেকের মধ্যেই এই ভাব ঢুকেছে। অনেকে বহুদিনের সুপ্তি থেকে হঠাৎ জেগে উঠেই স্বাধীনভাবে সংযতচিত্তে কিছু চিন্তা না করে "দেশের কাজ" করব বলে অধৈর্য্য হয়ে উঠেছে, এবং তার ফলে আর যাই হোক চেঁচামেচি গোলমালের অন্ত নেই। এর জন্যে দোষই বা দেওয়া যায় কাকে?—কারণ দেশের যাঁরা নেতা বলে প্রসিদ্ধ, তাঁরা কি নিজেদের জীবনে, কি লেখায় বক্তৃতায়, কোনদিকেই এমন একটা আদর্শ ধরে দিতে পারছেন না, যাতে দেশবাসীর মনের উপর কোনো প্রভাব হতে পারে, তাদের হৃদয়মন দেশের প্রকৃত সেবার দিকে

নিয়ন্ত্রিত হয়। যার যতটা শক্তি সে কেবল অশান্তির ধূলো ওড়াতেই খরচ করে ফেলছে, এতে সত্যদৃষ্টির সম্ভাবনা আরো সুদূর হয়ে পড়ছে ; এই কলুষিত অন্ধকার আবহাওয়ার বাহিরে যে এক রৌদ্রালোকিত নির্ম্মল শুভ্র গগন আছে, এই হিংসাদ্বেষপূর্ণ জীবনই যে মানুষের জীবন সম্বন্ধে চরম সত্য নয়, সে কথা সকলের কাছে স্বপ্নরাজ্যের অভাব্য কাহিনীর মত মিথ্যা হয়ে পড়েছে। কিন্তু একটা শান্ত সুন্দর মঙ্গলময় আদর্শ সর্ব্বদা চোখের সামনে না থাকলে, কোনো গোলমাল কোনো আন্দোলনই যে সুফল আনতে পারে, এ আমি বিশ্বাস করি নে। মাঝে ঐ গোলমালে আমিও দিক হারিয়ে ফেলেছিলাম, ধোঁয়ায় ধূলোয় অন্ধকারে আমার প্রকৃতদৃষ্টি হরণ করে নিয়েছিল, কিন্তু এখন ক্রমেই আমার বিশ্বাস বদলে যাচ্ছে। নিজের আত্মার বন্ধন ঘোচাতে চেষ্টা না করে, নিজের মনকে সত্যের আলোয় পরিপূর্ণ করতে প্রয়াস না করে, কেবল বাহির থেকে মুক্তি চাওয়া যে কতদূর নিস্ফল, আমি তা দেখতে পাচ্ছি। এখনও আমরা অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অর্থহীন প্রথার বন্ধনকে সানন্দে সগৌরবে বরণ করে ধর্ম্মের নামে যত অত্যাচার অন্যায়ের প্রশ্রয় দিচ্ছি—আমাদের মুখে মুক্তির কথা শোভা পাবে কি করে ? "নীচু জাত" হলে তার সঙ্গে আহার করা কেন, তার ছোঁয়া জল গ্রহণ করা, তার মুখ পর্য্যন্ত দর্শন করাকে আমরা ধর্ম্মের নামে মহাপাপ জ্ঞান করি—"অস্পৃশ্য জাত" হলে তার মৃতদেহ সংস্কার করাকে আমরা ধর্ম্মের নামে বারণ করতে দ্বিধা বোধ করি নে ; অসবর্ণের মধ্যে বিবাহের কথা হলে আমাদের দিগ্বিদিকজ্ঞান লুপ্ত হয়ে যায় ; বিবাহের সময় কন্যার পিতাকে পথের ভিখারী করে দিয়ে নির্লজ্জভাবে পণ গ্রহণ করতেও আমাদের কিছুমাত্র বাধে না ;

স্ত্রীশিক্ষার কথা শুনলেই ঘরে ঘরে মেয়েদের পতিভক্তি কমবে, হিন্দু-রমণীর যে গৌরব—কায়মনোবাক্যে দাসীর জীবন যাপন করা—সে-ও বা টিঁকবে না, এই ভয়েই আমরা আতঙ্কিত হয়ে পড়ি; কোন্ দিন কোন্ প্রহরে কোন্ দিকে মুখ করে কি ভাবে কি খেলে পুণ্য হয় বা পাপ হয়, এটাই আমাদের সবচেয়ে বড় চিন্তা;—আমাদের দেশের বেশিরভাগ লোকের সম্বন্ধে যদি এই সব সত্য হয়, তবে আমাদের পক্ষে জগতের স্বাধীন জাতির সঙ্গে সমানভাবে দাঁড়ানোর আকাঙ্খা দুরাকাঙ্খামাত্র। এই যুগযুগসঞ্চিত পুঞ্জিত আবর্জ্জনা দূর করতে হবে, দেহে মনে কর্ম্মে চিন্তায় স্বাধীন হতে হবে, তাহলে বাইরের দেওয়া স্বাধীনতার জন্যে আমাদের আর কাঁদতে হবে না, মুক্তি আপনিই এসে পড়বে।

এই ভিতরের দিকে দেশের লোক কৈ তাকাচ্ছে—যত কুসংস্কার, মিথ্যাচার, বিচারহীন-প্রথার দাসত্বে লোকে যেমন ছিল তেমনিই আছে, এবং সেটা অবাধে বেড়েই চলছে—অথচ এই সব কথা বললে লাভের মধ্যে লোকের অপ্রিয়ভাজন হতে হয়। দেশকে ভালবাসি বলেই যত কথা বলতে চাই, যেখানটা অশান্তির মূল নিহিত বলে মনে হয়, সেদিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে ইচ্ছে হয়; কিন্তু লোকে ভাবে সভায় সমিতিতে উচ্চৈঃস্বরে আমাদের দেশের যা-কিছু আছে তার সমর্থন করে, এই কলিকালের শোচনীয় অবস্থা সম্বন্ধে হাহুতাশ করে দীর্ঘ বক্তৃতা না দিলে কোন কাজই হল না। হয় তাই করতে হবে, নাহয় উত্তেজিতভাবে শ্বেতাঙ্গদের মার, ঘরবাড়ী লুট কর, এই বলে চেঁচাতে হবে।

— মহাত্মা গান্ধিকে আমি বিশেষ শ্রদ্ধা করি, কিন্তু তাঁর নন্-কো-

অপারেশনের সব জিনিস আমার যুক্তিযুক্ত মনে হয় না। তিনি আমাদের সকলকে ইস্কুল কলেজ ছাড়তে বলছেন এবং পরের-দেওয়া বিদেশী বিদ্যা গ্রহণ করছি বলে আমাদের লজ্জিত বোধ করতে বলছেন; কিন্তু জানি না আমি কতদূর বুঝেছি, কলেজে পড়ে হোষ্টেলে থেকে আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে, তাতে আমার সন্দেহ হয় হঠাৎ সকলে বিদ্যাশিক্ষা ত্যাগ করলে ফল একেবারেই ভাল হবে কি না। এখন অনেকের মন যা তবু একটু বাধ্য হয়ে পড়াশোনা, স্বাধীন চিন্তার দিকে যাচ্ছে, তখন সেটুকুও হবে না; কেবল সবাই যা-খুশী করে বেড়াবে, আর দেশসুদ্ধ অন্তহীন অশান্তির সৃষ্টি হবে। ভাঙ্গা সহজ, গড়ে তুলতে হলে শক্তি চাই! সেটা আমাদের কোথায়? দেশসুদ্ধ যদি national school, national college হয়, এবং তাতে প্রকৃত বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়, তাহলে সে ত আনন্দেরই কথা; কে আর তাহলে সেদিকে না গিয়ে পারবে? কিন্তু একা মহাত্মা গান্ধীই এ কথা বলছেন, দেশবাসী সকলেই এ বিষয়ে উদাসীন। আমি দেখছিলাম এতে আরো একটা কুফল হয়েছে, অনেক কষ্টে যে সব কৃষকদের, গরীব গ্রামবাসীদের, তাদের স্বাভাবিক অনিচ্ছা স্বত্বেও, নিজেদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েকে পাঠশালায় ইস্কুলে শিক্ষার জন্য পাঠাতে রাজি করা গিয়েছিল, এই আন্দোলনের ফলে তারা আর কারুকে সহজে পাঠায় না। এদিকে দু'চারটে night school পাঠশালা বন্ধ হতে চলেছে। এর ফল যে ভাল হবে, কি করে তাই বলি?

আসল কথা, এইবার আমাদের দেশের একটা দিক্‌পরিবর্ত্তনের সময় এসেছে—একটা কিছু হবেই, এরকম ভাবে বেশিদিন চলতেই পারে না। অত্যাচার অশান্তি দারিদ্র্য চারিদিকে জেগে উঠেছে—

হয় চিরকালের মত হার স্বীকার করে এই অবস্থাকে বরণ করে নিতে হবে এবং এককালে জাতিকে জাতি বিলুপ্ত হয়ে যাবার জন্যে প্রস্তুত হতে হবে, নয় স্বাধীনতার দিকে মুক্তির দিকে আত্মউপলব্ধির দিকে অগ্রসর হতে হবে।

সেদিন একটা ঘটনায় আমাদের দেশের অবস্থা সম্বন্ধে আমার স্পষ্ট ধারণা হল। শহর ছাড়িয়ে আমি অনেক দূরে বেড়াতে গিয়েছিলাম, ফিরতে দেরী হয়ে গিয়েছিল। অন্ধকার, শীতের রাত্রি। তার উপর ভয়ানক ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। নির্জ্জন রাস্তা দিয়ে একা পথ চিনে চিনে আসছি, হঠাৎ মনে হল আমার পাশেই অন্ধকারের মধ্যে কি যেন একটা ছায়ার মত জিনিস এগিয়ে চলছে। ভারি আশ্চর্য্য বোধ হল। কাছে গিয়ে দেখি সাত কি আট বছরের খুব কালো কঙ্কালসার একটি ছেলে। অত রোগা যে মানুষ হতে পারে আমি জানতাম না,—একেবারে অস্থিচর্ম্মসার, দুটো কাঠির মত পা, চোখ দুটো অর্থহীন ভাবে কোনোরকমে সামনের দিকে চেয়ে রয়েছে। এই শীতের রাত্রিতে ঠাণ্ডা বাতাসে তার সমস্ত গায়ে কোন আবরণ নেই, পা খালি। প্রথমে মনেই হচ্ছিল না এ কোন পৃথিবীর প্রাণী হতে পারে, এর সঙ্গে জীবনের কোন যোগ থাকা সম্ভব। পরে জিজ্ঞাসা করতে অতি ক্ষীণ কণ্ঠে সে জানাল যে, এই কলেরায় (এখানে এবার এক একটা গ্রামে ভয়ানক কলেরা হয়েছে) তার সকলে মারা গিয়েছে, কেউ নেই, সে সারাটা দিন বাজারে ঘুরে বেড়িয়েছে, এখন এমনি চলে যাচ্ছে। ঐ অন্ধকারে অমনিই সে চলে যাচ্ছিল, কোনো বিশেষ জায়গায় নয়, কারণ তার ত কোনো বিশেষ জায়গা ছিল না যেখানে সে যাবে।

এই রাত্রে এই অন্ধকারে গৃহহীন আশ্রয়হীন আত্মীয়স্বজনবিহীন একটি শিশু দারুণ শীতে বিবস্ত্র ভাবে সম্পূর্ণ অসহায় হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে—এ দৃশ্য কখনও ভুলব না। এরকম দুঃখ দেখলে সমস্ত জগৎ মিথ্যা হয়ে যায়। আমি ঘরে গিয়ে আরামে সময় কাটাব—এটা কেমন একেবারে অসম্ভবরকম বিসদৃশ বলে বোধ হল। এই দুঃখ দারিদ্র্য অপরিসীম অসহায়তা যে দেশে, সে দেশের কবে উদ্ধার হবে? কখনও হবে কি?—সে আশাও যে করতে পারি নে। এর পর আমরা কি করে সারহীন বক্তৃতা, মিথ্যা আন্দোলন নিয়ে সময় কাটাতে পারি? যে দেশভক্তি এই লক্ষ লক্ষ অসহায় মূক চিরদুঃখীদের দিকে একবার তাকিয়েও দেখে না—তাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য, আনন্দ বেদনা, আশা নিরাশার দিকে দৃক্‌পাত পর্য্যন্ত করা দরকার মনে করে না, তার সার্থকতা কি? বিলিতি পলিটিক্স, তার বাক্‌চাতুরী, তার বড় বড় ব্যঞ্জনাপূর্ণ diplomatic কলকৌশলাদি, ওসব বিদেশেই থাক,—এদেশে তার আমদানি করে কি হবে? আমাদের আদর্শ ভিন্ন, আমাদের জীবনযাপনপ্রণালী ভিন্ন, আমরা দাসত্বশৃঙ্খল-বদ্ধ দৈন্য-নিপীড়িত দুঃখজর্জ্জরিত জাতি—আমাদের আদর্শ হবে ত্যাগের, আত্ম-উপলব্ধির, সৌম্যের, সত্যের, সুন্দরের, মঙ্গলের; পাশ্চাত্য দেশের আত্মসুখানুধ্যায়ী স্বার্থপর হিংসাপ্রিয় সরলতা-বিবর্জ্জিত অস্বাভাবিক দেশভক্তির অনুকরণ করে আমরা কেন নিজেদের হাস্যাস্পদ করতে যাব?

সেদিনকার ঐ ছোটো ছেলেটিকে দেখে আমার মনে হল আমাদের ভারতবর্ষেরও ঐ অবস্থা—সেও অমনি গভীর অন্ধকারে অন্তহীন দুঃখের মধ্য দিয়ে অসহায়ভাবে পথ খুঁজে বেড়াচ্ছে—তার দেহ

দৈন্যদীর্ণ, তার চতুর্দ্দিকে নির্দ্দয়তা অত্যাচার, তারও সুমুখের পথ কণ্টক-বন্ধুর বিপদসঙ্কুল, কে তাকে মঙ্গলময় শান্তিপূর্ণ আশার বাণী শোনাবে, চিরসূর্য্যালোকোজ্জ্বল আনন্দনিকেতনের দিকে পথ দেখিয়ে দেবে ?

* * * *

সহজিয়া

—:০:—

এরা শুধু জীবনেরে করে উপহাস
প্রাণপণে নিশিদিন ; শতদিকে দাস
আপনায় করি, ভাবে মুক্তির গৌরব
হবে করতলগত ; সেই মহোৎসব
বিশ্ব জুড়ি' আছে ফুটি' যুগযুগান্তর
সহজ লীলায়, তারে করিয়া অন্তর,
মৃত্যুর পাষাণ স্তূপে দিল বক্ষ ভরি'—
তাই আজি দিকে দিকে ওঠে হা হা করি'
দীন হীন দীর্ণ প্রাণ ; সহজ সুন্দরে,
প্রাণপণে পড়ি' কত দুর্ব্বোধ্য মন্তরে,
দিল এরা নির্ব্বাসন ; প্রাণপীঠ হ'তে
নিভাইয়া জীবনের দীপ, কালস্রোতে
ক্ষুধাতুর তৃষাতুর দীন অসহায়,
মিথ্যা আনন্দের মোহে অই ভাসি' যায়।

(২)

রে শঙ্কিত ! জগতের ওরে পদানত !
অজ্ঞানেরে জ্ঞান বলি' করিলি আহত
জীবনের দেবতারে ; অমৃতের নামে
আনন্দেরে ঠেলি' দিলি আঁধারের পানে,

কঠোর শাসন করি ; প্রতি পুষ্পে তৃণে
যে সত্য সহজ হ'য়ে আছে নিশিদিনে
সুন্দরের মূর্ত্তি ধরি, সেই সহজিয়া
প্রতি পলে যে সঙ্গীত আনিছে বহিয়া
জলে স্থলে সমীরণে, প্রাণের দোলায়
যে রাগ-তরঙ্গ তোলে সহজ খেলায়,
করি' তারে অস্বীকার অমঙ্গল জ্ঞানে,
নিজেরে করিলি নষ্ট ; দুর্ব্বলের গানে
ভরি' দিলি চিত্ত মন প্রাণ আত্মা সব
অভিশাপ তাই তোর জীবন-উৎসব ;

(৩)

ওঠ ওঠ ওঠ আজি দেবতা সুন্দর ! •
চূর্ণ করি' মিথ্যাভরা মোহের পিঞ্জর,
রচ সৌধ হাসি গানে, আকাশের সীমা
যেথায় মিলন পাবে ; দৃপ্ত প্রাণ-বীণা
লক্ষ কোটী রচনায় গাহিয়া সঙ্গীত
রন্ধ্রে রন্ধ্রে ভরি' দিবে আত্মার ইঙ্গিত,
সহজ লীলায়। ওরে মূঢ় আত্মভোলা !
আদিম প্রভাতে কোন্ জীবনের দোলা
বক্ষে করি' নেমেছিলি দুরন্ত পুলকে,
ধরিত্রীর প্রতি রেণু প্রাণের আলোকে

করেছিলি নন্দনের পারিজাত সম ;
সে মন্ত্র হারালি কোথা ওরে ও অক্ষম ?—
ত্রাসে লাজে আজি তোর অবনত শির,
পাপ্য চির অকল্যাণ শুধু ধরিত্রীর।

(৪)

হে দেবতা! প্রাণ লয়ে কর কর খেলা,
সেথায় বসেছে ওই আনন্দের মেলা,
প্রতি পুষ্পে, প্রতি তৃণে, ধূলি-রেণুকায়
পুলক-স্পন্দন অতি সহজ ভাষায়
রচিছে সঙ্গীত—সেইখানে—সেইখানে
পাতি তব সিংহাসন, সঞ্জীবনী-গানে
এ বিশ্বে ছড়ায়ে দাও আনন্দ তোমার ;
উচ্ছ্বসিত কল্লোলিত সপ্ত পারাবার
লয়ে তার রোষ রাগ নৃত্য হাসি গান,
সত্যেরে করুক বড় : জীবনের দান
জয়পত্র শিরে বাঁধি' মৃত্যু-অভিশাপ
নিমেষে করুক নত ; অক্ষমতা পাপ
প্রাণের গৌরবে মানি' লজ্জা আর ভয়
মুক্তি দিক্ ধরিত্রীর জয় পরাজয়।

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

দুই বন্ধু

——:০:——

(Guy do Maupassant-র ফরাসী হইতে)

পারী শহর অবরুদ্ধ, দুর্ভিক্ষপীড়িত, মৃতপ্রায়; ছাতে চড়াই পাখীর দেখা আর ঘটে ওঠে না; ছাতের কোণা-কাণাচও অধিবাসীশূন্য। সকলের আহার, যা-ভাগ্যে জোটে তাই। এমনি অবস্থায় জানুয়ারী মাসের এক পরিষ্কার সকালে মঁস্যো মরিসোট কোটের পকেটে দু'হাত ভরে শূন্য উদরে বা'র-বুলভারে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। মঁস্যো মরিসোটের পৈতৃক ব্যবসায় ছিল ঘড়ি তৈয়ারী, আর নিজস্ব ব্যবসায় চটি তৈয়ারী। বেড়াতে বেড়াতে মরিসোট হঠাৎ থেমে গেলেন, কারণ তাঁর সামনে এসে পড়ল এক সহব্যবসায়ী, যার সঙ্গে তাঁর রীতিমত বন্ধুত্ব ছিল।

বন্ধুর নাম মঁস্যো সোভাজ, আলাপ হয়েছিল তাঁর সঙ্গে নদীর ধারে।

যুদ্ধ আরম্ভের আগে প্রতি রবিবারে মরিসোট সকালবেলায় হাতে এক বাঁশের ছিপ আর পিঠে এক টিনের বাক্স নিয়ে বেরিয়ে পড়তেন, আর আঁটইলের রেলের রাস্তা ধরে কোলোঁব্রুয়ে নেমে তিনি মারাণ্ট্‌ দ্বীপের নীচে উপস্থিত হতেন। তাঁর অভীষ্ট জায়গায় গিয়েই মাছধরা আরম্ভ করতেন। রাত্ত পর্য্যন্ত এই মাছধরা চলত।

প্রতি রবিবারেই তাঁর সেখানে দেখা হত এক বেঁটেখাটো মোটা-সোটা ফুর্ত্তিবাজ লোকের সঙ্গে, তার নাম মঁস্যো সোভাজ। সোভাজের ছিল এক ছোট মনোহারীর দোকান, নোতর-দাম-দ্য-লরেটেতে,—আর ছিল মাছ ধরবার প্রচণ্ড বাতিক। এই দুজনে প্রায়ই একটা সারা বেলা পাশাপাশি বসে থাকতেন—হাতে ছিপ ধরে, জলের উপর পা ঝুলিয়ে।

এমনি করে দু'জনের বন্ধুত্ব হয়েছিল।

কোন কোন দিন তাঁদের পরস্পরের সঙ্গে একটিও কথা হত না, আবার কখনো কখনো দিব্য কথাবার্ত্তা চল্‌ত। কিন্তু কথা না বলেও তাঁরা পরস্পরকে চমৎকার বুঝতে পারতেন, কারণ তাঁদের দুজনেরই রুচি ও মনোভাব প্রায় একই ধরণের ছিল।

বসন্তের প্রভাতে নবযৌবনপ্রাপ্তের ন্যায় দীপ্ত সূর্য্য যখন শান্ত নদীর জলে তারি বুকের উপর দিয়ে ভেসে-বেড়ানো বাষ্পরাশির প্রতিবিম্ব ফুটিয়ে তুল্‌ত, ও মাছধরায় উন্মত্ত দুজনের পিঠের উপর নবঋতুর আনন্দসূচক কিরণজাল ছড়িয়ে দিত, তখন মরিসোট হয়ত পাশের লোকটিকে বলে উঠতেন, "কেমন চমৎকার, নয় কি ?"

সোভাজ উত্তর করতেন "এমনটি আর হয় না।"

ব্যস্‌! এই তাদের পরস্পরকে বোঝবার ও শ্রদ্ধা করবার পক্ষে যথেষ্ট।

শরৎকালে দিনের শেষে রক্তবর্ণ আকাশে যখন অস্তগামী সূর্য্য নদীর জলে লাল মেঘমালার ছায়া ফেলে সমগ্র নদীবক্ষ লাল করে, দূর দিগন্তে আগুন ধরিয়ে ও দু'বন্ধুকে আগুনেরই মত জল্‌জ্বলে করে তুল্‌ত, এবং যখন গাছের পাণ্ডাস পাতাগুলি যেন আসন্ন শীতের ভয়ে

থর থর করে কেঁপে সেই আলোতে উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ত, তখন সোভাজ একটুখানি হেসে মরিসোটের দিকে চেয়ে বল্‌তেন, "কি দৃশ্য"! মরিসোট বিস্ময়ভরা স্বরে অথচ চোখ দুটি ভাসমান ফাৎনার উপর থেকে না উঠিয়ে উত্তর দিতেন, "বুল্‌ভারের চেয়ে ভাল, নয় কি?"

তাঁরা পরস্পরকে চিনতে পেরে সাগ্রহে করমর্দ্দন করলেন, কারণ মন তাঁদের দুজনেরই বিকল হল এই ভেবে যে, কি অবস্থায় আবার তাঁদের দেখা হল! সোভাজ একটু নিঃশ্বাস ফেলে বিড় বিড় করে বল্‌লেন, "কি সব ব্যাপার দেখুন।" মরিসোট আরও নিরুৎসাহ। তিনি কাৎরিয়ে বললেন, "কি সময় পড়েছে! আজ বছরের প্রথম পরিষ্কার দিন।"

বাস্তবিকই সুনীল আকাশে আলো যেন উছ্‌লে পড়ছিল।

দুজনে চিন্তাক্লিষ্ট ও দুঃখভারাক্রান্ত মনে পাশাপাশি চল্‌লেন। মরিসোট বলে উঠ্‌লেন, "হ্যাঁ সেই মাছধরা! ভাল কথা মনে পড়েছে।"

সোভাজ জিজ্ঞাসা করলেন, "আবার কবে যাওয়া যাবে?"

তারপর দুজনে ছোট এক কাফেতে ঢুকে গিয়ে একটু করে তিতো-মেশানো মদ খেলেন। বেরিয়ে এসে ফুটপাথের উপর পায়চারি করতে লাগলেন। হঠাৎ মরিসোট থেমে বল্‌লেন, "আর এক গেলাস?" সোভাজ রাজি হয়ে বল্‌লেন, "আপনার যেমন ইচ্ছে।" দুজনে আরেক মদের দোকানে ঢুক্‌লেন।

বেরিয়ে আসতে তাঁদের হয়ে গেল অনেক দেরী, কারণ খালিপেটে মদ খেলে যেমন তাল হারিয়ে যেতে হয়, তাই তাঁদের হয়েছিল। বাইরের দৃশ্য চমৎকার। মৃদু হাওয়া এসে যেন তাঁদের বাতাস দিয়ে যাচ্ছিল।

ঈষৎ গরম হাওয়া লেগে সোভাজের নেশা যেন জমে উঠ্‌ল। তিনি থেমে বললেন, "যদি যাওয়া যায় সেখানে?"

—"কোথায়?"

—"এই মাছ ধরতে।"

—"কোথায়?"

—"আমাদের সেই দ্বীপের কাছে। ফরাসী অগ্রবর্ত্তী সৈন্যের দল কোলোম্বের কাছেই থাকবে। কর্ণেল ডুমুল্যাঁর সঙ্গে আমার আলাপ আছে। তিনি আমাদের যাবার সঙ্কেতবাক্য বলে' দেবেন।"

মরিসোট কেঁপে চম্‌কে উঠে বল্‌লেন, "বেশ; এই ঠিক। চলুন আমি যাচ্ছি।"

তারপর যন্ত্রপাতি আনবার জন্য দুজনে দুদিকে গেলেন।

এক ঘণ্টা পরে তাঁরা বড় রাস্তা ধরে পাশাপাশি চল্‌লেন। যেতে যেতে যে বাড়ীতে কর্ণেল থাকেন সেখানে গিয়ে পৌঁছলেন। কর্ণেল তাঁদের প্রার্থনা শুনে হেসে অনুমতি দিলেন। তাঁরা সঙ্কেত জেনে নিয়ে ফের রাস্তা ধরে রওনা হলেন।

খানিক পরে তাঁরা অগ্রবর্ত্তী সৈন্যদলকে ছাড়িয়ে পরিত্যক্ত কোলোম্বের ভিতর দিয়ে গিয়ে উপস্থিত হলেন কতকগুলি ছোট আঙুর ক্ষেতের মধ্যে; সেই ক্ষেতগুলি সেইন নদীর পাড় পর্য্যন্ত নেমে গেছে। বেলা তখন প্রায় এগারোটা।

সামনে তার—গ্রাম মরার মত পড়ে। অর্জাটইলর্‌জেমেণ্ট ও সানোয়ার উচ্চ স্থানগুলি সকলের মাথার উপর জেগে আছে। নানটের্‌র পর্য্যন্ত যে মস্ত মাঠ গিয়েছে সেটি একেবারে খালি, তার চেরী গাছগুলি ফলপাতাহীন, তার গা ক্ষতবিক্ষত।

সোভাজ একটা উঁচু জায়গায় উঠে আস্তে আস্তে বল্‌লেন, "ওই-খানে প্রুশিয়ানরা রয়েছে।" জনশূন্য প্রান্তরের মধ্যে ভয়ানক উদ্বেগে দুই বন্ধু যেন আড়ষ্ট হয়ে গেলেন।

—"প্রুশিয়ানরা।" তাঁরা কখনও তাদের চোখে দেখেন নি; কিন্তু কয়েকমাস ধরে তারা যে আছে এটা ভাল করেই অনুভব করছিলেন। পারীর চারদিক ঘিরে, ফ্রান্সের সর্ব্বনাশ করবার জন্য লুট করে, খুন করে, আগুন ধরিয়ে, অদৃশ্য অথচ সর্ব্বশক্তিমানভাবে তারা ছিল। তাঁদের মনে এই অজ্ঞাত ও বিজয়ী লোকগুলার উপর ঘৃণার সঙ্গে একরকম কুসংস্কারজনিত ভয় মেশান ছিল। মরিসোট আম্‌তা আম্‌তা করে বল্‌লেন, "ওদের অবস্থা দেখবার জন্য একবার এগনো যাক।"

রঙ্গপ্রিয়তা পারী-নাগরিকের স্বভাবজ, কোন অবস্থাতেই তা দমে না। সোভাজ উত্তর করলেন, "ভাল, কিছু মাছ ভাজি তাদের দেওয়া যাবে।"

কিন্তু মাঠের মধ্যে এগিয়ে যেতে তাঁরা ইতস্তত করতে লাগলেন, কারণ চারদিকের নিস্তব্ধতা এমন যে তাইতেই ভয় হয়।

শেষকালে সোভাজ বল্‌লেন, "যাক, এগিয়ে চলুন, কিন্তু খুব সাবধানে।" তারপর দুজনে এক আঙুর-ক্ষেতের মধ্যে নামলেন, হাঁটু গেড়ে, হামাগুড়ি দিয়ে, কতকগুলা ঝোপের আড়াল রেখে, চোখ চারদিকে রেখে, কান খাড়া করে।

নদীর ধারে পৌঁছতে কেবল খানিকটা খালি জায়গা বাকি। তাঁরা দৌড়তে আরম্ভ করলেন। সেখানে পৌঁছে কতকগুলা শুক্‌নো নল-খাগড়ার ঝোপের মধ্যে গিয়ে বসে পড়লেন।

মরিসোট মাটিতে কান পেতে শুনতে চেষ্টা করলেন কেউ আশে-

পাশে আছে কি না। কোন শব্দই তাঁর কানে এল না। সেখানে তাঁরা একা, আর জনপ্রাণী নেই। তখন বেশ ঠাণ্ডা হয়ে দুজনে মাছ ধরতে আরম্ভ করলেন।

সুমুখে পরিত্যক্ত মারাণ্ট দ্বীপ, নদীর অপর পার থেকে তাঁদের যেন ঢেকে রাখছিল। ছোট রেস্তোরাঁ-ঘরটি বন্ধ দেখে মনে হয়, কত বছর ধরে যেন ওটা ঐরকম পড়ে আছে।

প্রথম মাছ ধরলেন সোভাজ; দ্বিতীয়টি ধরলেন মরিসোট। তার-পর প্রত্যেক বারই ছিপ উঠাবার সঙ্গে সঙ্গে বঁড়শি বিঁধে শাদা চক্চকে ছোট ছোট মাছ উঠ্‌তে লাগ্‌ল। বাস্তবিক অদ্ভুত মাছধরা। তাঁরা বেশ ধীরে-সুস্থে মাছগুলি একটা শক্ত-করে-আঁটা থলের মধ্যে পুরতে লাগলেন। থলেটা তাঁদের পায়ের কাছে জলের মধ্যে ভিজ্‌ছিল। তাঁদের মন একটা মৃদুমধুর আনন্দে ভরে গেল—অনেক দিনের অভ্যস্ত একটা আমোদ থেকে জবরদস্তি বঞ্চিত থাকবার পর হঠাৎ যখন ফিরে সেই আমোদের স্বাদ পাওয়া যায়, তখন যেরকম হয় সেইরকম তাঁদের হল।

তাঁদের পিঠের উপর তখন সূর্য্যের কিরণ এসে পড়েছে, তাঁদের কানে আর কোন শব্দই যাচ্ছে না, তাঁদের মনেও আর কোন চিন্তার উদয় হচ্ছে না; এমনি করে সমস্ত সংসারের অস্তিত্ব তাঁরা ভুলে গিয়েছিলেন,—কারণ তাঁরা মাছ ধরছিলেন।

হঠাৎ একটা ভারী আওয়াজ, মনে হল যেন সেটি মাটী ফুঁড়ে বেরল ও চারদিকের মাটী কাঁপিয়ে দিল। ফের কামানের শব্দ আরম্ভ হল।

মরিসোট ঘাড় ফেরালেন। নদীর পাড়ের উপর বাঁয়ে ভালেরিন পর্ব্বতের প্রকাণ্ড কালো ছায়া। তার কপালের উপর যেন একখানা

শাদা পাহাড়, ধোঁয়ার একখানা মেঘ যেন পর্ব্বত তার মুখ থেকে ছেড়ে দিয়েছে।

তৎক্ষণাৎ ধোঁয়ার আর একটা মেঘ দুর্গের উপর থেকে যেন ছুটে বেরল। কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই নতুন করে গর্জ্জন আরম্ভ হল।

তারপর আবার গর্জ্জন। প্রতি মুহূর্ত্তেই পর্ব্বত তার বিষাক্ত নিঃশ্বাস ফেলতে আরম্ভ করল। সেই দুধের মত শাদা ধোঁয়ার রাশ আস্তে আস্তে উপরদিকে উঠতে আরম্ভ করল, তার মাথার উপর একখানা মেঘের মত হয়ে রইল।

সোভাজ ঘাড় নেড়ে বললেন, "এই ফের আরম্ভ হল।"

মরিসোট একমনে তাঁর ফাৎনার দিকে চেয়ে ছিলেন, কারণ তাতে অনবরত টান পড়ছিল। তাঁর স্বভাব ছিল শান্তিপ্রিয়। এইরকম লোকের যেমন হয়ে থাকে তেমনি হঠাৎ তাঁর রাগ হয়ে গেল, ঐসব উন্মাদ লোকগুলার উপর, যারা এমনতর করে মারামারি কাটাকাটি করে। তিনি খুঁৎ খুঁৎ করে বল্‌লেন, "এমন করে নিজের মাথায় লাঠি মারার চেয়ে নির্ব্বুদ্ধির কাজ আর কি হতে পারে?"

সোভাজ বল্‌লেন "পশুর চেয়েও এ অধম।" মরিসোট একটা মাছ টেনে তুলে বল্‌লেন "আর যে পর্য্যন্ত রাজা ও রাজত্ব থাকবে, ততদিন এইরকমই চলবে।"

সোভাজ তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন, "রিপাব্‌লিক হলেও কি যুদ্ধ করত না?"

মরিসোট বল্‌লেন, "রাজা থাকতে যুদ্ধ হত রাজ্যের বাইরে, আর রিপাব্‌লিকের আমলে যুদ্ধ হয় দেশের ভিতরে।"

তারপর তাঁরা বেশ নিশ্চিন্তমনে আলোচনা করতে আরম্ভ

করলেন রাজনীতির সব বড় বড় কথা, স্থূলদর্শী ঠাণ্ডামেজাজী লোকেরা যেমন বিজ্ঞভাবে করে থাকে। কেবল একটা বিষয়ে তাঁদের মতের মিল হল—সেটি এই যে, স্বাধীনতা ভোগ করা তাঁদের কপালে নেই।

ভালেরিণ পাহাড় অবিরাম গর্জ্জন করতে লাগল;—গোলার আঘাতে ফরাসী বাড়ী-ঘর ভেঙে দিয়ে, ফরাসী মানুষ পিষে দিয়ে, গাছ পাথর গুঁড়ো করে দিয়ে ভালেরিন গর্জ্জন করতে লাগ্‌ল। কত স্বপ্ন, কত আনন্দের আকাঙ্ক্ষা, কত সুখের আশা শেষ করে দিয়ে, কত স্ত্রীর বুকে, মেয়ের বুকে, মায়ের বুকে অসীম শোকের উৎস খুলে দিয়ে ভালেরিণ পাহাড় গর্জ্জন করতে লাগ্‌ল। সোভাজ বল্‌লেন, "একেই বলে জীবন।"

মরিসোট বললেন, "তার চেয়ে বরং বলুন যে একেই বলে মৃত্যু।"

তাঁদের পিছনে কে যেন এসেছে টের পেয়ে তাঁরা ভয়ে কেঁপে উঠলেন। চোখ ফিরিয়ে তাঁরা দেখতে পেলেন ঘাড়ের পিছনে সোজা দাঁড়িয়ে প্রকাণ্ড লম্বা সশস্ত্র দাড়িওয়ালা চারজন লোক, বড় ঘরের চাকরদের মত পোষাক আর মাথায় চেপ্‌টা টুপি পরে' তাঁদের দিকে অস্ত্র উঁচিয়ে রয়েছে।

দু'খানি ছিপ তাঁদের হাত থেকে খসে পড়ে আস্তে আস্তে গড়িয়ে নদীতে নামতে লাগল।

তারপর তাঁদের পাকড়াও করে, বেঁধে এক নৌকার উপর ফেলে সামনের দ্বীপে নিয়ে যাওয়া হল। যেটিকে তাঁরা মনে করছিলেন খালি ও পরিত্যক্ত, সেই ঘরের পিছনে তাঁরা দেখলেন রয়েছে কুড়িজন জার্ম্মাণ সৈন্য।

লোমশ দৈত্যের মত চেহারার একজন লোক এক চেয়ারের দুইধারে ঠ্যাং তুলে দিয়ে বসে প্রকাণ্ড এক পোর্‌স্‌লেনের পাইপে তামাক টানছিল। সে খুব ভাল ফরাসীতে বল্‌লে, "নমস্কার মশাই, আপনাদের বেশ ভাল মাছধরা হয়েছে ত ?"

একজন সৈন্য অফিসারের পায়ের কাছে এক থলেভরা মাছ ফেলে দিল, সেটা তাঁদের দুজনকে গ্রেপ্তার করবার সময় তার বয়ে আনতে হয়েছিল। প্রুশীয় অফিসার একটু হাস্‌ল—"হি হি, তাইত দেখ্‌ছি মন্দ শীকার হয় নি। যাক্‌গে ও-কথা। এখন আমি যা বলি সেইটে মন দিয়ে শুনুন। কিছু ব্যস্ত হবার প্রয়োজন নেই। আমার চোখে আপনারা দু'জন গুপ্তচর, আমার উপর নজর রাখবার জন্য আপনা-দিগকে পাঠানো হয়েছে। কাজেই আমার কর্ত্তব্য আপনাদিগকে ধরা, ও গুলি করে মারা। আপনারা ভাল করে কাজ হাসিল করবার জন্য মাছ ধরবার ভাণ করছিলেন। আমার হাতে আপনারা পড়েছেন, সেটা আপনাদের অদৃষ্ট মন্দ বলে। এই হচ্ছে যুদ্ধের নিয়ম। কিন্তু আপনারা যখন অগ্রবর্ত্তী সৈন্যদল ছাড়িয়ে এসেছেন, তখন নিশ্চয়ই আপনাদের ফিরে যাবার সঙ্কেত জানা আছে। আমাকে সেইটে বলে' ফেলুন, আমি আপনাদের ছেড়ে দিচ্ছি।"

দুই বন্ধুর মুখ শাদা হয়ে গেল। তাঁরা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাঁদের হাত কাঁপুনির চোটে ঠক্ ঠক্ করে নড়ছিল। দুজনেই চুপ করে রইলেন।

অফিসার ফের বল্‌লে, "কেউ কথাটা জানবে না, আপনারা নির্ব্বিঘ্নে ভিতরে চলে যাবেন, আপনাদের সঙ্গে সঙ্গেই সব গোলযোগ চুকে

যাবে। অমত করলে মৃত্যু, আর তারপর যা হয়ে থাকে। চট্ করে ঠিক করে ফেলুন কি করবেন।"

দু'জনেই চুপ করে রইলেন, তাঁদের মুখ সমান বন্ধ রইল।

প্রুশীয় অফিসার একটুও চট্‌ল না। নদীর দিকে হাত বাড়িয়ে সে বল্লে, "বুঝছেন না যে আর পাঁচমিনিটের মধ্যে ওই নদীগর্ভে আপনাদের ঠাঁই হবে? পাঁচ মিনিট!—আপনাদের আত্মীয়-স্বজন বোধহয় কেউ নেই?"

ভালেরিণ পাহাড় অবিরাম গর্জ্জন করতে লাগ্‌ল।

দুই বন্ধু সোজা দাঁড়িয়ে চুপ করে রইলেন। জার্ম্মাণ অফিসার নিজের ভাষায় কি হুকুম দিল। তারপর বন্দীদের কাছ থেকে নিজের চেয়ার সরিয়ে নিল। তারপর বারোজন লোক বিশ হাত দূরে বন্দুক খাড়া করে দাঁড়িয়ে গেল।

অফিসার বল্‌লে, "আমি আপনাদের এক মিনিট সময় দিচ্ছি, আর দু'সেকেণ্ডও বেশি নয়।"

তারপর হঠাৎ সে উঠে ফরাসী দুজনের কাছে এগিয়ে গেল। মরিসোটের হাত ধরে তাঁকে টেনে দূরে নিয়ে গিয়ে নীচুগলায় বল্‌লে, "চট্ করে বলে ফেলুন আপনার সঙ্কেত কথাটি কি? আপনার সঙ্গী জানতে পারবেন না। আমি যেন দয়া করছি এই ভাব দেখাব।"

মরিসোট কোনই উত্তর করলেন না।

অফিসার তারপর সোভাজকে টেনে নিয়ে গিয়ে ঐ কথাই বল্‌লে।

সোভাজও কোন উত্তর দিলেন না।

দু'জনকে আবার পাশাপাশি দাঁড় করান হল। অফিসার হুকুম দিল, সৈন্যেরা বন্দুক তুল্‌লে।

তখন মরিসোটের হঠাৎ চোখে পড়ল কিছু দূরে ঘাসের মধ্যে মাছের থলের উপর। একটুখানি সূর্য্যের কিরণ সেই মাছগুলির উপর পড়ে চক্‌চক করছিল। মাছগুলা তখনও নড়ছিল। মরিসোটের মূর্চ্ছার মত হল। অনেক চেষ্টা করেও তিনি থামাতে পারলেন না। চোখ জলে ভরে এল।

তিনি তোৎলার মত বল্‌লেন, "বিদায় মঁস্যো সোভাজ!"

সোভাজ উত্তর করলেন, "বিদায় মঁস্যো মরিসোট।"

তাঁরা দু'জনে হস্তমর্দ্দন করলেন। তখন তাঁদের পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত ভয়ানক কাঁপ্‌ছিল।

অফিসার বল্‌লে, "গুলি চালাও।"

বারোটা বন্দুকে একসঙ্গে দম্ করে আওয়াজ হল।

সোভাজ ধপ্ করে নাক-থুব্‌ড়ে পড়লেন। মরিসোট ছিলেন লম্বা। তিনি হেলে ঘুরে মুখ আকাশের দিকে করে তাঁর সঙ্গীর উপর ঢলে পড়লেন। বুকের উপরকার সার্ট ফেটে ঠেলে উঠতে লাগ্‌ল তাঁর রক্ত।

জার্ম্মাণ সৈনিক এবার নূতন আদেশ দিল।

কয়েকজন লোক সেখান থেকে চলে গেল। ফিরে এল তারা খানিক দড়ি আর একরাশ পাথর নিয়ে। সেগুলা ঐ মৃত দু'ব্যক্তির পায়ের সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হল। তারপর তাঁদের টেনে নিয়ে যাওয়া হল নদীর ধারে।

ভালেরিণ পাহাড় তখনও অবিরাম গর্জ্জন করছিল। মাথার উপর তার ধোঁয়ার আর এক বিরাট পাহাড়।

দু'জন সৈন্য মরিসোটকে পা ও মাথা ধরে তুলল, আর দুজন

সোভাজকেও অমনি করে ওঠাল। দুটা মৃতদেহকে এক ঝাঁকুনিতে উপরে উঠিয়ে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হল। সে দুটি একবার পাক খেয়ে সিধা হয়ে জলে পড়ল, কারণ সবার আগে পায়ের উপর পাথরের ভারে টান পড়েছিল।

জল ছিটিয়ে ভূরভুরি কেটে কেঁপে উঠ্‌ল। তারপর সব ঠাণ্ডা। ছোট ছোট ঢেউগুলি সরতে সরতে কিনারা পর্য্যন্ত এসে থেমে গেল। জলের উপর ভেসে রইল কেবল এক ফোঁটা রক্ত।

অফিসারের মেজাজ একটুও গরম হয় নি। সে স্বগত বল্‌লে—"এইবার মাছগুলার পালা।"

তারপর সে ঘরের দিকে ফির্‌ল।

হঠাৎ তার চোখে পড়ল ঘাসের মধ্যে পড়ে সেই মাছের থলের উপর। সে সেটা হাতে করে তুল্‌লে, নেড়ে চেড়ে দেখ্‌লে, তারপর খানিক হেসে ডাক দিলে—

—"উইলিয়াম!"

একজন শাদা পোষাক-পরা সৈন্য তার কাছে দৌড়ে গেল। তখন সেই প্রুশিয়ান গুলি-করে-মারা ফরাসী দু'জনার ধরা মাছ তার কাছে ফেলে দিয়ে হুকুম করলে—

—"ওই ক্ষুদে মাছগুলা তাজা থাকতে থাকতে আমার জন্য ভেজে দাও। খেতে ভারি চমৎকার হবে!"

তারপর সে ফের পাইপ টানতে লাগ্‌ল।

শ্রীননীমাধব চৌধুরী

"ডেস্ট্রাক্‌টিব্"-এর ওজর

—:•:—

এই একটা কথা নিত্য শুন্‌তে পাওয়া যায়, যে "সবাই কেবল সমালোচনাই করছেন, ভাঙছেনই। কই কে কি গড়ে তুলছেন, Constructive কেউ কিছু লিখছেন না ত।" নব্য দলের বিরুদ্ধে এটা যে একটা নতুন কিংবা একমাত্র অভিযোগ তা নয়। কিন্তু এ সমস্ত বাণবৃষ্টিতে রুষ্ট হবার চাইতে হৃষ্ট হবার কারণই বেশি। নিত্য-নিরত পরের কণ্ঠের জয়রব শোনবার জন্যে যে উৎকণ্ঠা, সেটা সুস্থ প্রকৃতির লক্ষণ নয়। আর, কবি যাই বলুন, নবীন প্রাণকে কেউ কোনোকালে শঙ্খধ্বনি করে বরণ করে নি। কেবল উদ্‌ভিদই যে মাটী ফুঁড়ে বেরয় তা নয়, জীবনের জন্মই হয় ভেদ করে' ব্যথা দিয়ে। বাণ যে এসে পড়চে, তাই হচ্ছে প্রমাণ যে অঙ্কুর বেরিয়েচে—কেননা শূন্যের গায়ে লক্ষ্য-বেধ করা চলে না।

নবীন, জন্ম নিয়েই কোথায় সে জন্মেছে চোখ মেলে তাকিয়ে দেখচে। কেননা, সে বলচে, এই যে দু'টি নয়ন এ বন্ধ রাখবার জন্যে তৈরি হয় নি, একে রাখতে হবে সম্যক্‌ বিস্ফারিত করে'। দূর থেকে দেখলে একটা জিনিসকে সুন্দর দেখায়; নৈকট্যই সৌন্দর্য্যের বিনাশক—সেই জন্যেই ত আমাদের দেশকে সুন্দর দেখ্‌তেই হবে বলে' যাঁরা ভীষ্ম-প্রতিজ্ঞা করে' বসেছেন—তাঁরা করেন কি, না, আমাদের দেশটিকে একেবারে মূলসুদ্ধ উপ্‌ড়ে তুলে ভীষ্মেরও পিতামহ যে

মান্ধাতা, তাঁরই আমলের কোনো কৈলাস বা সুমেরুর এক শৃঙ্গের উপরে চড়িয়ে রেখে দেন—যাতে নীচে থেকে দাঁড়িয়ে বল্‌তে পারেন মনের সাধে, “বাঃ”। এর মধ্যে যে কোনোই সত্য নেই তা নয়, সমগ্রই হচ্চে সুন্দর, আর সমগ্রকে একেবারে চোখের সাম্‌নে দেখ্‌তে পাওয়া যায়ই না। কিন্তু সমগ্রকে দেখাই যে সম্যগ্‌দৃষ্টি, তা সব সময়ে সত্য নয়। সমগ্রের মধ্যে ত কোনো খুঁত নেই, অথচ প্রথম সম্যগ্‌দ্রষ্টা যে শাক্যসিংহ, জীবনের খুঁতগুলি তাঁরই চোখে যেমন পড়েছিল এমন ত আর কারু নয়। সমগ্রের অবলোকন, সমালোচন নয়, তা কাব্য; আর সমালোচক কবি নন্,—বৈজ্ঞানিক; খণ্ড খণ্ড করাই তাঁর কাজ—আর তা করতে গেলে সমগ্র যদি প্রাণ হারান, তবেই দেশসুদ্ধ লোকের প্রাণ আঁৎকে উঠে, বলে “Destructive”!

২

সত্যকে জান্‌বার পথে যে কতকগুলি বাধার নাম হার্বার্ট স্পেন্‌সার উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে একটা নাকি ভাবোচ্ছ্বাস। ভক্তি-অশ্রুর কুয়াসার মধ্য দিয়ে যে জিনিসটাকে দেখ্‌চি, তা রং-বেরং হ’তে পারে; এমন কি অতীতের জন্য শোকাবেগ প্রবল হয়ে উঠ্‌লে তা “রোদনের রঙে রাঙা”ও দেখাতে পারে; কিন্তু বস্তুকে যে ঝাপ্‌সা করে’ দেখব সে সম্বন্ধে ত কোনো সন্দেহ থাক্‌তে পারে না। অথচ এ যুগে সাহিত্যে ঝাপ্‌সার জায়গা থাক্‌লেও বস্তুজগতে ও-পদার্থের ঠাঁই নেই। সমস্ত জাতিদের মধ্যে ভারতবর্ষের স্থান, সে ত অতি দেদীপ্যমান—কোথাও ত এতটুকু ভুল করবার জো নেই। ফিজি, দক্ষিণ-অফ্রিকা, আমেরিকা—এ সমস্ত জায়গায় ভারতবর্ষের কি

অবস্থা তা কেবল তাঁদেরই অজানা যাঁরা জেগে ঘুমোন্। এই দিবা-লোকের মধ্যে আমাদের নাড়া দিয়ে সজাগ করছেন যাঁরা তাঁরাই আমাদের বেশি আত্মীয়, যাঁরা ঘুম-পাড়ানো মাসিপিসির গানে আমাদের ঘুম পাড়াবেন তাঁদের চাইতে। নির্ম্মম হস্তে যাঁরা আমাদের প্রিয় ধারণাগুলিকে ধূলিসাৎ করবেন, তাঁদের আমাদের ভাল না লাগ্‌তেও পারে, কিন্তু যতই আমরা চট্‌ছি ততই প্রমাণিত কর্‌চি যে, আমাদের মধ্যে তাঁদের ঔষধের ক্রিয়া সুরু হয়েচে।

(৩)

অথচ, আর একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার এই যে, যাঁরা Destructive-দের সমালোচক, তাঁরা নিজেরাও, কি জীবনে কি সাহিত্যে, Construction-এর কোনোই পরিচয় দেন নি। তাঁরা গীতার শ্লোক আউড়ে আদালতে চলে যান মোকদ্দমা করতে, আর তাঁদের যত-কিছু জাতীয়তা সে কেবল মাসিক পত্রের ছত্রে ছত্রে। সমস্ত বৃন্দাবনী-উচ্ছ্বাসের মধ্যে "জন্মান্তর"-এর মত একটি কবিতা খুঁজে পাওয়া শক্ত। যে কলম থেকে "হিং টিং ছট্" বেরল, সেই কলম থেকেই বেরল এমন শত-শত গান আর কবিতা, যার মধ্যে অতীত ভারতবর্ষের প্রতি এমন এক গভীর শ্রদ্ধার সুর বাজছে, যার দোসর নেই। "এমন ধর্ম্ম নাই আর দাদা" আর "এমন দেশটি কোথাও খুঁজে" একই ব্যক্তির লেখা।

আসল কথা, যে-মনের ভিতরে একটা বড় আদর্শ ফুটে উঠেছে, সে-ই বাস্তবের হীনতা দেখতে পায়,—ইতরের সে সাধ্য নেই। যে গড়্‌তে পারে, কেবল তারই ভাঙ্‌বার ক্ষমতা আছে—অন্যের অক্ষম

কুতূহল মারতে কোনো আপত্তি নেই ; কিন্তু সে কেবল ঠক্‌ঠকানিতেই পর্য্যবসিত। রুশো এবং ভলটেয়ার—যাঁদের চিদাকাশে ভবিষ্যৎ সভ্যতার চেহারা ফুটে উঠেছিল, তাঁরাই বর্ত্তমান-ফ্রান্সকে বলের সঙ্গে ঘা দিতে পেরেছেন। ভারতবর্ষের শুভ্র নিরুপম নিষ্কলঙ্ক গরীয়সী মূর্ত্তিকে কেবল ধ্যানে দেখা নয়, জীবনের মধ্যে সত্য করে উপলব্ধি করা যাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়েচে, তাঁরা বাস্তব ভারতবর্ষের পঙ্গুতা ও ত্রুটি দেখে বেদনায় কেঁদে ও হেসে ওঠেন। সেই মূর্ত্তি দ্বিজেন্দ্রলাল দেখে ছিলেন বলে তীব্র হাসি হাসতে পেরেছিলেন। সমস্ত প্রাণ দিয়ে ভারত-বর্ষকে যাঁরা প্রণিপাত করেছেন, তাঁরা ভারতবর্ষের প্রতি শ্রদ্ধাবান্। খোসামুদি আর শ্রদ্ধা অবশ্য এক নয়। আদর্শকে নমস্কার করা হচ্ছে নিজেকে সবচাইতে উচ্চ করা—যত-টুকু উচ্চতার সম্ভাবনা প্রকৃতির মধ্যে রয়েচে। এবং আদর্শের আলোকেই জ্বল-জ্বল করে ওঠে যত-কিছু দৈন্য এবং যত-কিছু কালী। যাঁরা সেই দৈন্যকে দেখতে পান নি, আদর্শ তাঁদের কাছে স্ফুট নয়। শুয়ে অবশ্য দাঁড়ানর কল্পনা করা কঠিন নয়, কিন্তু দাঁড়াতে গেলে দেখতে পাওয়া যেত "জড়ায়ে আছে বাধা" এবং সেই বাধা বাইরের নয়, আপনারই মধ্যে।

(৪)

আসল কথা, আমাদের প্রকৃতির মধ্যেই রয়েচে একটা স্থাবরতা, স্থবিরতা যার ছোট বোন। নবীন প্রাণের সঙ্গেও তার যে কোনো সম্পর্ক নেই তা নয়, এবং সম্পর্কটা নেহাৎ পাতানোও নয়, একেবারে "যেষাঞ্চ বিরোধঃ শাশ্বতিকঃ"। তবে অহি-নকুলের মত সম্পর্কটা সর্ব্বদা প্রকাশ্য নয় ; এবং যতই অপ্রকাশ ততই বেশি ভয়াবহ।

পাকা-বুদ্ধির সঙ্গে নবীন প্রাণের তফাৎই এই যে, এর একটি দিবারাত্র হিসাব করে চলেন তাই ভুল করেন না, আর একটি দিবারাত্র হিসাব করে না তাই ভুল করে। মিথ্যার সঙ্গে ভুলের তফাৎ এই যে, ভুল হচ্চে সত্যের পথে যেতে পদস্খলন, আর মিথ্যা হচ্চে সত্যের দিকে পিছু ফিরিয়ে একেবারে সীধা উল্‌টো দিকে যাত্রা। ভুল যে করচে, তবু সে এগিয়েই যাচ্চে তার গন্তব্যের পথে। মিথ্যা দিয়ে যে নিজেকে আবৃত করচে, সে নিজেকে বিনাশ করচে— নিজেকে বাঁচাবার সুবুদ্ধি খাটাতে গিয়ে।

যে-কোনো নর-সমাজের মধ্যে যা-কিছু আছে সবই ভাল, কিছুই ছাড়াবার নেই, একথা বললে এই মিথ্যা কথাটি বলা হয় যে, "মানুষ পূর্ণ"। মানুষের যা অপূর্ণতা, তা হচ্চে ভ্রান্তি, এ সব কথা অদ্বৈত-বাদীর মুখে যতই সাজুক আমরা যারা কোনো বাদী নই, আমরা ও-সমস্ত হাওয়ার দুর্গে বাসা বাঁধতে মোটেই রাজি নই। চোখের সামনে যা দেখচি তাকে ভেল্‌কি বলে উড়িয়ে দিতে মস্তিষ্কের যে অবস্থাটায় পৌঁচা দরকার, দর্শনের ব্যোম-যানে চড়ি নি বলেই হোক্, কি যে কারণেই হোক্, আমরা আজও সেখানে পৌঁচতে পারি নি।

বস্তু যখন চিৎ-এর উপরে ওঠে, বাইর তখন ভিতরকে ছাপায়। মোটা মানুষ যখন বেদম খেয়ে আসন থেকে আর উঠতে পারে না, জোর হাওয়ায় ছাতাটাকে হাত থেকে ছিনিয়ে উড়িয়ে নিয়ে গেলে মানুষ যখন তার পেছনে দৌড়ায়, জড়ের কাছে তখন হয় মনের পরাজয়। Form যখনই Spirit-কে ছাড়িয়ে গেছে তখনই যুগেযুগে মানুষের শিল্পে সাহিত্যে সে হাস্যরস জুগিয়েছে। ডেক্টোকৃটিবিষ্ট্ কি হাস্যরসিক? তার হাসি অন্তত "Crackling of thorns" নয়।

তার হাসি বলবান্ প্রাণের সবল বক্ষ বিস্ফারী বিপুল "হা হা"—যেমন হাসি ওল্‌ড্ টেষ্টামেণ্টের প্রবক্তার।

রবীন্দ্রনাথের "তোতা-কাহিনী"র হাস্য কি বাঙলা সাপ্তাহিকের বা দৈনিকের শ্লেষের বক্রহাস্য? সকল জাতীয় প্লেথোরিক্ অতিকায়তার অন্তঃসারহীন বৃদ্ধিকে যিনি কেবল সাহিত্যে নয়—জীবনের মধ্যে আক্রমণ করেছেন—সমস্ত উপকরণ জঞ্জাল-মুক্ত সরল একটি তপোবন-বিশ্ববিদ্যালয়ের কাঠামোকে যিনি সত্যসত্যই—কবির মানস-লোকে নয়, একেবারে বাস্তবিকতার মধ্যে "Construct" করলেন, পাশকরা ইন্‌স্পেক্টর ও ভাতে-মরা গুরুকুলের কেতাবখানাকে বিদ্রূপের ব্যঙ্গোক্তি না করলে যে তাঁর সময় কাটত না, তা নয়। শিক্ষা বাড়চে, না, জীবনের বিপুল অপচয় হচ্চে, তারি বেদনা কাঁপিয়েচে সেই চিত্তকে যে চিত্ত সমস্ত দেশের মর্ম্মলোকের গুহাকন্দরের অধিবাসী—সেই ব্যথা গহ্বর থেকে বেরিয়ে আসচে অট্টহাস্য হয়ে।

(৫)

প্রকৃতি তরুণ তরুকে কাঁটা দিয়েছেন—উদ্‌ভিদ্‌ভোজী জন্তুদের কবল থেকে তাকে বাঁচাবার জন্যে। নবীন প্রাণকে তেমনি দিয়েছেন চোখা এপিগ্রাম্। সাধুভাষার সোথ যদি বিঁধে যায় ফুঁড়ে যায়, ত বদ্‌রস বেরিয়ে গিয়ে স্থূলত্বার শীর্ণতা আসবে। শীর্ণতাই সৌন্দর্য্য, কেননা আত্মা সেখানে বাহুল্যে ভারাক্রান্ত না হয়ে কোমল করপদ-পল্লবে ক্ষীণ ওষ্ঠপুটে ছন্দ-প্রাপ্ত।

শ্রীমণিগুপ্ত

ভুল

সে থাকত নিজের খেয়ালে। মাঠে ঘাটে সে ঘুরে বেড়াত—ঝোপে ঝাড়ে সে পড়ে থাকত। বৃষ্টিতে ভিজতে ছিল তার আনন্দ—রোদে পুড়তেও তার আপত্তি দেখা যেত না। কত রাত সে পথে পথে ফিরেছে, কত দিন সে বনে বনে ঘুরেচে। এজন্য সে কত বকুনি খেয়েচে কত অনুতাপও করেচে কিন্তু এ না করেও সে থাকতে পারে নি।

সমবয়সীদের হাসি খেলার মধ্যেও সে থাকত। তাকে না হলেও তাদের খেলা জমত না, হাসি মজত না। এদের সঙ্গে তার ঝগড়াও হত কিন্তু হাতাহাতি হবার আগেই সে হেসে ফেলত। সকলে বলত তার একটু ছিট আছে। শুনে সে এমন কৌতুক অনুভব করত যেন তেমন মজার কথা সে কখনো শোনে নি।

ছোটদের সঙ্গেও তার বেশ বনত। তাকে পেয়ে তারাও খুশী হত এবং তাদের নিয়েও সে থাকত ভাল।

পাড়ার লোকের কাজ সে করে দিত কিন্তু বাড়ীর কোন কাজে মা তাকে খুঁজে পেতেন না। সেই দুঃখে তিনি কাঁদতেন, মাথা খুঁড়তেন—সেও ভাত না খেয়ে বাড়ী না এসে তার শোধ তুলত। রাত্রে তার কথা শুনে মা কতবার ভেবেছেন এমন ছেলে আর হবে না—দিনেও তিনি তাই বুঝেছেন কিন্তু সে চোখের জলে।

দেখেশুনে বড়রা তাকে জমায় বাদ দিয়ে রেখে ছিলেন—সে তাতে বরং সুখীই হয়েছিল। এক দিন বিকেলবেলা একটা বকুল তলায় সে বসে ছিল। তখন বোশেখ মাসের শেষ—ফোটা ফুলগুলি নীরবে ঝড়ে পড়ছিল গাছথেকে, দেখে মনে হল যেন তার মাথায় পুষ্পবৃষ্টি হচ্চে।

কি মনে হল, আমি তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম কি ভাবচে সে সেখানে বসে। উত্তরে সে যা বললে আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না; কিন্তু আমার আগ্রহ দেখে সে স্বীকার করলে কথাটা আমায় সমজে দেবে এক দিন।

কথাটা আমি ভুলে গিয়েছিলাম কিন্তু হঠাৎ তাকে দেখে যখন কথাটা মনে পড়ল তখন উল্টো চাপ দিয়ে আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম আমার কথা সে ভুলে গিয়েচে কি না।

উত্তরে সে শুধু একবার আমার দিকে চাইল, কোন কথা বলল না; কিন্তু বোধ হল আমার কথায় সে মনে লজ্জা পেয়েচে।

তারপর এক দিন শুনলাম সে হঠাৎ মারা গিয়ে গিয়েচে। শুনে মনটা খারাপ হয়ে গেল। পাগল বটে কিন্তু লোকটা ছিল মন্দ নয়।

শেষে এক দিন তার ভাই আমার হাতে একখান চিঠি দিয়ে গেল। পড়ে দেখলাম তার চিঠি। সে লিখেচে—

"কথা দিয়ে তোমার সঙ্গে তা রাখি নি বলে তুমি রাগ করেছিলে। আমার কথার যে অত দাম আছে তা আমি ভাবি নি, তবু তুমি যখন তা ভেবেচ তখন সে কথার মর্য্যাদা আমায় রাখতেই হবে। কিন্তু মুখে বলবার সময় হবে না বোধ হয়; তাই এই লিখে জানাচ্চি কি ভাবছিলাম সে দিন।

কারণ আমি আর বাঁচব না। কিছু দিন থেকেই কথাটা বুঝেচি কিন্তু আগের রাত্রে একটা স্বপ্ন দেখে পর্য্যন্ত তার ব্যথাটাও যেন অনুভব করচি।

স্বপ্নে দেখলাম যেন, সমস্ত রাত ধরে ফুল ফুটচে, বনের বুকের মধ্যে পাতার আড়ালে। কেউ তা টের পাচ্চে না, কারণ যদিও তার গন্ধ আছে তা ছড়াবার বাতাস নেই এবং তার রূপ আছে বটে কিন্তু তা দেখাবার আলো নেই।

ভোর হতে না হতে কিন্তু বাতাস তার ঠিকানা বলে দিল, আলো তারে পাকড়াও করে ফেলল। ধরা পড়লে দেখা গেল, তখনো তার পাঁপড়িতে পাঁপড়িতে রাতের শিশির টল টল করচে আর ভোরের আলো তার মধ্যে ঠিকরে পড়চে।

দেখতে দেখতে রোদে তার দলগুলি শুকিয়ে আসতে লাগল। বোঝা গেল ঝরে পড়ারও বেশি দেরী নেই আর।

শেষে সে ঝরেও পড়ল।

আকাশ ব্যাপে রইল তার প্রীতি, বাতাসে লেগে থাকল তার গীতি আর মানুষের মনে চেপে বসল তার স্মৃতি। সে স্মৃতি আবার তার নিজের নয়, যতটা অশ্রুবিন্দুর মত সেই এক বিন্দু শিশিরের আর তার মধ্যে প্রভাত অরুণের যে আলো চিকচিক করছিল, হাসির মত সেই আলোর।

ব্যথাভরা প্রাণ নিয়ে মানুষ ভাবল ফুলের আদর সেই জানে তার কদরও তাই তার কাছে।

লজ্জায় গোধূলি আকাশ লাল হয়ে গেল—মলয় বাতাস ক্ষণে ক্ষণে মরমে শিউরে উঠতে লাগল।

স্বপ্ন ভেঙে গেল।

কাল শুয়ে শুয়ে মনে হচ্ছিল মরণটা যেন শিয়রে দাঁড়িয়ে রয়েচে আর মরণাহত মনে কেমন করে হল জানি নে, কিন্তু মনে হতে লাগল যে মরে গেলে আমার কথা তুমিও ভুলতে পারবে না এবং তোমার সঙ্গে যে কথা রেখেচি সেই কথাই সকলের বেশিকরে মনে পড়বে তোমার। কিন্তু তুমি বুঝবে না যে এ কথা আমি রাখি নি, তুমি রাখিয়েচ। তাতে দুঃখ নেই; কিন্তু তবু দুঃখ হয় যে, এই পরিচয়ই আমার স্বরূপ বলে তুমি বার বার ভুল করবে।

শ্রীপ্রবোধ ঘোষ

উড়ো-চিঠি

—:০:—

জানুয়ারী ১, ১৯২১

জীবনকুমার

পুরোনো "প্রবাসী"র পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে একটা প্রবন্ধে তুমি এই কথাগুলো পেয়েছ—

"আজ আমরা দেশকে তুল্‌তে যাচ্ছি, নেশান গঠন কর্‌তে যাচ্ছি, যশহীন গৌরবহীন ঐশ্বর্য্যহীন এই হতভাগ্য দেশকে ঐশ্বর্য্যে সম্পদে গৌরবে আমরা প্রতিষ্ঠিত করতে যাচ্ছি; কিন্তু সে প্রয়াসকে সফল করে' তুল্‌তে চাইলে আগে সে প্রয়াসকে সত্য করে' তুল্‌তে হবে। আর সে প্রয়াসকে সত্য করে' তুল্‌তে চাইলে দেশবাসীর সম্মুখ থেকে বৈরাগ্যের আদর্শকে অপসারিত করে' তার অন্তরে এই শস্যশ্যামলা ধরিত্রীর-প্রেমকে জাগ্রত করে' তুল্‌তে হবে।"

এবং তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করেছ, ঐ কথাগুলোয় আমি কি বুঝি? অর্থাৎ—তোমার ঐ প্রশ্নযুক্ত বাক্যের পরিষ্কার ভাব হচ্ছে, "ওর একটা বিশদ ও সরল ব্যাখ্যা করহ।"

তুমি যে প্রবন্ধটি থেকে ঐ লাইন ক'টি উদ্ধৃত করেছ সে প্রবন্ধটি যে-সময়টাতে "প্রবাসী"তে বেরয় সে-সময়টা আমার বেশ মনে আছে। কেননা ঐ প্রবন্ধটি বেরবার পরই বাঙলা-সাহিত্যের কোন কোন সমালোচক হঠাৎ কি-রকম যেন-এক-রকম ক্ষিপ্তাবস্থা প্রাপ্ত হয়েছিলেন। সেই ক্ষিপ্ত অবস্থার প্রধান লক্ষণ ছিল তাঁদের নিজ নিজ

হাতের কলমকে সত্যিকার সঙ্গীন বলে' ভুল করা। যে-অবস্থায় তাঁদের হাতের সেই সঙ্গীনটাকে, দু'চোখ বুঁজে এম্‌নি করে' তাঁরা চালিয়েছিলেন যেন তাঁরা ওয়াটার্লু যুদ্ধে Duke of Wellington-এর Tommies. সেই কস্‌রতে তাঁদের হাতের কলমরূপী সঙ্গীনের ডগা থেকে অজস্র মসি-কণা যে তাঁদের দু'গালে এসে উড়ে পড়েছিল তা তাঁদের চোখেই পড়ে নি। কেননা সেই ক্ষিপ্ত অবস্থায় তাঁদের মনের দর্পণে নিজের নিজের মুখ দেখবার কথা একবারও মনে ওঠে নি।

সে যাই হোক্, এতে করে' একটি জিনিস প্রমাণিত হয়েছে। সেটা হচ্ছে এই যে, কোন কোন বাঙালীর মনে এমন একটা জিনিসের এম্‌নি ভাবে আবির্ভাব হয়েছে যে, সেটাকে একটা রিপু বলা চলে। সে-জিনিসটির নাম হচ্ছে বৈরাগ্য। এবং তার বিরুদ্ধে কেউ কোন কথা বল্‌লে দ্বিতীয় রিপুটি সহজেই আবির্ভূত হন।

কিন্তু যাক সে কথা, তুমি যখন জিজ্ঞেস করেছ তখন ঐ লাইন ক'টির একটা ব্যাখ্যা তোমায় দিচ্ছি—আমি যেমন বুঝি। সে ব্যাখ্যাটা সরল হবে কি না তা বল্‌তে পারি নে, তবে সেটা বিশদ করবার দিকে একটা বিশেষ চেষ্টা আমার থাক্‌বে।

(২)

দেখ, স্বামী বিবেকানন্দের একটি কথা আমার মনে বড় লেগে আছে। সে-কথাটা হচ্ছে "চালাকির দ্বারা কোন মহৎ কাজ সাধিত হয় না।" এই কথাটা আমি খুব মানি, তবে ওর দু'টি পদ ছাড়া—ঐ যে ঐ "মহৎ কাজ"। ঐখানেই স্বামী বিবেকানন্দ exclusive হয়েছেন।

আসলে মহৎ-ই হোক ও অসৎ-ই হোক, কোন কাজটাই চালাকির দ্বারা সম্পন্ন করা যায় না। কেননা মহৎ কাজ ও অসৎ কাজ এ-দু'টোতে প্রকৃতিগত কোন তফাৎ নেই, অর্থাৎ—দু'টোই একই শ্রেনীর, অর্থাৎ—মহৎ কাজও যেমন অসাধারণ, অসৎ কাজও তেমনি সাধারণ নয়। ওর দু'টোর গায়েই সংসারের সেই সহজ জিনিসটির ছাপ নেই, যে জিনিসটির নাম হচ্ছে mediocrity, আসলে ও-দুটো হচ্ছে যমজ ভাই। এবং ও-দুটোর যে দু'রকম নাম দিয়ে রেখেছি তা কেবল ওদের চিনে নেবার সুবিধার জন্যে। কারণ আমাদের মতলব এই যে আমরা ওর একটার স্তবস্তুতি করব আর একটাকে গালাগালি দেব।

মহৎ অসৎ বা সৎ অসৎ-এর গা থেকে সুনীতি দুর্নীতি, সুন্দর অসুন্দর ইত্যাদি যত রকমের সভ্য-পোষাক আছে সব খুলে নিয়ে যদি সাদা চোখে স্পষ্ট দেখ্তে চেষ্টা কর তবে দেখবে যে, ওর পিছনে রয়েছে মানুষের আদিম মন, অর্থাৎ—primitive mind. অর্থাৎ—তার লাভ লোকসানের হিসেব, একেবারে সোজা আর ছাঁকা। বাড়ীতে ডাকাত পড়ে' যদি ডাকাতি করে' যায় তখন সেটা যে অত্যন্ত অসৎ কাজ, সেটা যে-কোন দেশের পিনাল কোড্ খুললেই দেখ্তে পাবে। কিন্তু "একদা যখন বিজয় সেনানী হেলায় লঙ্কা করিল জয়," তখন সেটা যে খুবই মহৎ কাজ হয়েছিল এটা যে-কোন স্বদেশ ও স্বজাতি ভক্ত বাঙালীর কাছ থেকে শুন্তে পাবে। তবে লঙ্কা-বাসীদের কাছে সেটা নিশ্চয়ই তেমন মহৎ বলে' প্রতীয়মান হয় নি। যদি বা হ'য়ে থাকে তবে নিশ্চয়ই তাতে তাদের একটা বড় রকমের লাভ হয়েছিল জান্বে। জার্ম্মান ইম্পিরিয়েলিজম্ যে কতদূর অসৎ [illegible] আমরা সবাই জানি; কিন্তু ব্রিটীশ সাম্রাজ্যের মহত্ত্ব

কতদূর তা ত আমাদের সবার কাছেই স্পষ্ট। তবেই দেখ্‌তে পাচ্ছ যে, মহৎ বা অসৎ, এ দুয়ের পিছনে রয়েছে একটা ব্যক্তিগত বা জাতিগত লাভালাভের হিসেব। এবং ঐ কারণেই একই প্রকৃতির কাজ সামাজিক হলে অসৎ হ'য়ে পড়ে, কিন্তু আন্তর্জাতিক হ'লেই মহৎ হ'য়ে ওঠে। কেননা আমাদের মন স্ব স্ব জাতির বাইরে গিয়ে দু' তিনটি জাতিকে সমষ্টি হিসেবে দেখ্‌তে পারে না। পাড়া-প্রতিবেশীর মধ্যে ঝগড়া নিতান্তই ঝগড়া; কিন্তু রাজায় রাজায় যুদ্ধ হচ্ছে শৌর্য্য। সুতরাং বুঝ্‌তে পাচ্ছ যে, "মহৎ" ও "অসৎ-এ" যে তফাৎ সেটা বস্তুগত বা বিষয়গত নয়, সেটা হচ্ছে ব্যক্তিগত। অর্থাৎ—সেটা objective ততটা নয় যতটা subjective. আমার কথাগুলো তোমার কাছে স্পষ্ট হ'ল কি না তা জানি নে। কিন্তু না হোক্ ও-দুটোকে আর একটা দিক থেকে দেখবার চেষ্টা করা যাক্।

তুমি জান, গেলযুদ্ধে জার্ম্মানদের সঙ্গীনের খোঁচা ইয়োরোপ আমেরিকার অনেক অনেক ফিলজফারদের মাথার খুলিটা একটু একটু ফাঁক করে দিয়েছে, সেই অবস্থায় তাঁদের বুদ্ধির গোড়ায় হাওয়া লাগ্‌তেই তাঁরা জার্ম্মানদের সম্বন্ধে ভাবতে লেগে গেছেন। Harvard University-র প্রফেসর একটি Spanish ফিলজফারের একখানা বইয়ের দু'এক অধ্যায় সেদিন দেখেছিলুম। তাতে তিনি শোপেনাহার ও নিট্‌শে, এ দু'জনের তুলনা করেছেন! তাতে তিনি বলেছেন, শোপেনহার ছিলেন Pessimist, আর নিট্‌শ্‌-এ ছিলেন Optimist; তাতেই বোঝা যায় যে ও দুটি মানুষের ধাতু ছিল একই। Pessimism যেটা founded on reflection, সেইটেই Optimism, founded on courage হ'য়ে

দাঁড়ায়। অর্থাৎ—একজনকে উল্টিয়ে দেখ্‌লেই আর একজনকে পাওয়া যায়। কেন না, the belief in a romantic chaos lends itself to pessimism, but it also lends itself to absolute self-assertion. এটাও ঐ Spanish ফিলজফারের কথা। মানুষ মর্‌তে মর্‌তেই মরিয়া হ'য়ে ওঠে, এ-ত জানা কথা। চরমদুঃখই যে 'চরম' আনন্দ এ কথা যে-কোন দার্শনিক প্রেমিকের কাছ থেকে জান্‌তে পার্‌বে। Extremes meet, এটা যে কেবল একটা দার্শনিক মজার কথা তা নয়, এটা একটা বৈজ্ঞানিক সত্যিকথাও।

উপরে আমার ঐ লম্বা বক্তৃতা দেওয়ার উদ্দেশ্য তোমাকে বলা যে, "মহৎ" ও "অসৎ"-এর ভিতরে আছে একটা অতি সূক্ষ্ম পরদামাত্র, আর সে পরদাও আমাদেরই মনের তৈরী, আমাদের লাভ লোকসানের দিকে দৃষ্টি রেখেই। "মহৎ" ও "অসৎ"-এ অম্‌নি একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে বলেই অপকৃষ্টও উৎকৃষ্ট হ'তে পারে এক পলকে, কিন্তু ভাল থেকে উত্তম হওয়ার সাধনা অনেক কঠিন। লক্ষ্মীছাড়ার মধ্যে hero-র বীজ যেমন তাজা অবস্থায় আছে, ভাল মানুষের মধ্যে তেমন নেই। তাই আমার স্বামীজীর ঐ exclusiveness-এ আপত্তি। তাই বল্‌ছি যে মহৎ-ই হোক্ বা অসৎ-ই হোক, এ দুয়ের কোন কাজই চালাকির দ্বারা সম্পন্ন করা যায় না।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই, চালাকি কথার অর্থটা কি?—চালাকির অর্থ আমি যা করেছি তা তোমায় বল্‌ছি—অবশ্য আমি ওর অর্থটা করেছি ইংরেজীতে। ও-বস্তুর মূলে আছে মানুষের superficial impulse—ওর বাঙলা কর্‌লে এই দাঁড়ায়, ও হচ্ছে মানুষের প্রবুদ্ধ চৈতন্যের একটা হাল্‌কা রকমের খেয়াল।

মানব সমাজ-সমষ্টির সত্যতাটা যে কি তা এখনও আমাদের চোখের সাম্‌নে স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে নি। সমাজ দেশ জাতি ধর্ম্মের মধ্যে যে এত হিংসা দ্বেষ মারামারি কাটাকাটি চলেছে সে সমস্তের তলে চাপা পড়ে' রয়েছে যে একটা প্রেমের বা প্রীতির সম্বন্ধ যেটা মানবসমাজের আসল সত্য, এ কথাটা মনে কর্‌তে আমরা সবাই ভালবাসি। এই সম্বন্ধটাকেই সত্যকরে' তুল্‌বার একটা চেষ্টাও যে শক্তিশালী জাতিদের মধ্য থেকেও কারো কারো দ্বারা আরম্ভ হয়েছে তাও আমরা দেখ্‌ছি ও শুন্‌ছি। কিন্তু বর্ত্তমানে যে জিনিসটা বিশ্বমানবের মধ্যে আমাদের প্রত্যক্ষ হ'য়ে আছে সে জিনিসটির নাম হচ্ছে—নামটি অতি পুরাতন ও ইংরেজীতে struggle for existence—যেটার বাঙলা আমরা করেছি জীবন-সংগ্রাম।

এই যে জীবন-সংগ্রাম, এই যে struggle for existence, এ জিনিসটি বর্ত্তমানে এমনি সত্য হ'য়ে উঠেছে যে যেখানে দেখ্‌বে কোন struggle নেই সেখানেই জান্‌বে কোন existence-ও নেই—অবশ্য existence কথাটা এখানে আমি তার বিশিষ্টার্থে ব্যবহার কর্‌ছি, অর্থাৎ—কেবল বেঁচে থাকা নয়, আপনাকে নিত্য নব নব রূপে সৃষ্টি করে' চলার অর্থে।

উপরে যা বললুম তার প্রকৃষ্ট উৎকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছি আমরা।

আমাদের মধ্যে যে struggle নেই, অন্তত বহুদিন পর্য্যন্ত ছিল না, তা আর সব জাতির মুখেই শুন্‌তে পাবে। তাদের মতে আমরা হচ্ছি শান্তিপ্রিয় জাত। আমরা যে এত শান্তিপ্রিয় হ'য়ে উঠেছিলুম তার কারণ, আমাদের মধ্যে এমন কোন একটা বিশিষ্ট সত্য স্পষ্ট হ'য়ে

ছিল না, যাকে রূপ দেওয়ার একটা অদম্য প্রেরণা আমরা অনুভব করতুম, অর্থাৎ—বিশিষ্টার্থে আমাদের কোন existence, পেলে না পেলেও, অন্তত সুপ্ত হ'য়ে ছিল—এক কথায়, আমাদের অন্তরাত্মা মৃত হয়ে উঠেছিল। তবু যে আমরা দেহ নিয়ে বেঁচে ছিলুম সেটা নিতান্তই প্রাকৃতিক নিয়মের জোরে এবং পরের কৃপায়। কেননা আমরা নিজের কাছে নিজে যত শূন্য হ'য়ে পড়েছি পরের কাছে আমাদের মূল্য তত বেড়ে গিয়েছে। একের পর প্রত্যেক শূন্যের মূল্য যে দশগুণ এ ত স্কুলের ছেলেরাও জানে। নিজের কাজে আমরা যখন অকর্ম্মা হ'য়ে উঠেছি পরের হাতে তখনই আমরা সকর্ম্মক হ'য়ে উঠেছি। এটা খুবই স্বাভাবিক। বেকার লোককেই বেগার খাটান সুবিধা, এটা বোকাও বোঝে।

কিন্তু আমরা যে শান্তিপ্রিয়, সেটা আজ কাল আর তেমন জোর করে' বলা চলে না। কেন না আমাদের মধ্যেও struggle দেখা দিয়েছে। তার মানে, আমরা আমাদের existence-কে সত্য করে' positive করে' লাভ করেছি—আমাদের একটা বিশিষ্ট সত্তা পৃথক সত্ত্বা অস্পষ্ট হ'লেও দেখা দিয়েছে—এবং সে সত্ত্বাকে ফুটিয়ে তোলবার সেটাকে বাইরের জগতে সাহিত্যে কাব্যে কথায় রাজনীতিতে সমাজ-নীতিতে মূর্ত্ত করে' তোলবার একটা অস্পষ্ট আকাঙ্খা আমরা আজ অনুভব করছি। তাই আজ আমরা পলিটিক্সে নেমেছি। যে বাধা আমাদের বাহিরটা জুড়ে বসে' আছে সেই বাধাকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করছি। আমরা আজ বলছি, "হে ইংরেজ, যতদিন আমরা শূন্য পাত্র ছিলুম ততদিন সেখানে তুমি তোমার জ্ঞান-বিজ্ঞান, কাব্য-কলা, তোমার ব্যবসা-বাণিজ্য, তোমার কোট-প্যাণ্ট, চা-চুরুট, টেবিল-

চেয়ার দিয়ে সাজিয়েছ তাতে আমাদের কিছু আসে যায় নি; কিন্তু আজ আর আমরা শূন্য নই, আমাদের অন্তরাত্মা আজ সাড়া দিয়েছে তার পিছনের হাজার পাঁচেক বৎসরের সাধনা অভিজ্ঞতা জ্ঞান নিয়ে। আজ আমাদের মনে একটা প্ল্যান জেগে উঠেছে। সেই প্ল্যান আঁক্‌তে আমাদের জায়গা চাই, তাতে রং ফলাতে আমাদের আলো চাই বাতাস চাই। আজ তোমার রাজনীতি, তোমার জ্ঞান-বিজ্ঞান কাব্য-কলা, তোমার হ্যাট্‌-কোট টেবিল-চেয়ার যে আমাদের সব জায়গাখানি জুড়ে বসে' আছে তাতে আমাদের আজ ভীষণ আসে যাচ্ছে। সুতরাং সে সব সরিয়ে নিয়ে যাও। আমাদের নিজেদের মনের প্ল্যানকে মূর্ত্ত করব সফল করব। কেননা দুটো জিনিস যে একই জায়গা অধিকার করে থাক্‌তে পারে না তা বহু বহু আগে ইউক্লিড বলে' গেছেন এবং সেটা এ পর্য্যন্ত অপ্রমাণিত হয় নি।" এই হচ্ছে আমাদের পলিটিক্সের ভিতরের কথাটা। পলিটিক্যাল ভাষায় একেই বলি আমরা স্বাধীনতার আকাঙ্খা।

Fact-হিসেবে দেখ্‌ছি যে পাশ্চাত্য সভ্যতার ধাক্কায় আমাদের এই স্বাধীনতার আকাঙ্খা জেগেছে—পাশ্চাত্য সভ্যতার অহঙ্কারের স্পর্শে আমাদের জাতীয় অহঙ্কার প্রাণ পেয়েছে। অবশ্য আমি এ কথা বল্‌ছি না যে, পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে না এলে আমাদের স্বাধীনতার আকাঙ্খা আজ জাগ্‌ত না। ও-কথা মনে করায় আমাদের অনেকেরই প্যাট্রিয়টিক্‌ অহঙ্কারে আঘাত লাগে। তবে এটুকু বোধ হয় আমরা নির্ব্বিবাদে মেনে নিতে পারি যে, এযুগে আমাদের স্বাধীনতার আকাঙ্খা জাগাবার পাশ্চাত্য সভ্যতাই হচ্ছে নিমিত্ত। ইংরেজী কাব্য ইতিহাস ও ইংরেজের বুটের গুঁতো—এ দুই-ই

আমাদের মন ও দেহকে ক্রমাগত উদ্বুদ্ধ ও উত্তেজিত করছে আত্মবশ হবার জন্যে।

কিন্তু যে বস্তুটির আমরা একচেটে ব্যবসা করি, অর্থাৎ—আধ্যাত্মিকতা, যার মানে আমাদের সবারই মতে আমাদের আত্মার নির্গুণ অবস্থা, হয় ত সেই আধ্যাত্মিকতার গুণে ইংরেজি কাব্য ইতিহাস আমাদের আত্মাকে যতটা উদ্বুদ্ধ না করেছে ইংরেজের বুটের গুঁতো আমাদের দেহকে তার চাইতে ঢের বেশি উত্তেজিত করেছে। বিলিতি কাব্য ইতিহাস আমাদের মনে দাগ কেটেছে, বিলিতি বুট আমাদের গায়ে তার চাইতে অনেক স্পষ্ট ও অনেক গভীর দাগ কেটেছে।

এর প্রমাণ পাচ্ছি আজ আমরা আমাদের পালিটিক্সে, যা আজ আমরা মনে প্রাণে করছি। আমাদের পলিটিক্স আমি দেখ্ছি একটা চালাকির খেলা, অর্থাৎ—জাতীয় বুদ্ধির একটা superficial impulse. এ কথায় আমি কি বল্‌তে চাই তা তোমায় বল্‌ছি।

যে সব দেশে রাজা বা গভর্ণমেণ্ট বিদেশী নয় সে সব দেশে রাজনীতি ও সমাজনীতি আলাদা নয়। সে সব দেশে একটা আর একটারই ফল। ব্যষ্টি ও ব্যষ্টির মধ্যে যে সম্বন্ধ সেই সম্বন্ধকে জড়িয়ে গড়ে' ওঠে সমাজনীতি, আর সমষ্টি ও সমষ্টি, জাতি ও জাতি, এক দেশ ও আর এক দেশের মধ্যে যে সম্বন্ধ সেই সম্বন্ধকে নিয়ে গড়ে' উঠেছে রাজনীতি বা পলিটিক্স। কিম্বা এক জাতির মধ্যেই ব্যষ্টির প্রতিদিনকার জীবন-যাত্রার হিসেব হচ্ছে সমাজনীতিতে, আর সমষ্টির সাম্বৎসরিক জীবনযাত্রার হিসেব হচ্ছে রাজনীতিতে। অথবা প্রতিটি ব্যক্তি প্রত্যেকদিন যা করেন তাই হচ্ছে সমাজনীতি আর রাজা বা গভর্ণমেণ্ট বৎসর ধরে' যা করেন তাই হচ্ছে রাজনীতি বা পলিটিক্স। যে দিক

থেকেই দেখ না কেন, দেখ্‌বে একটা আর একটা থেকে বিচ্ছিন্ন ত নয়ই, বরং একটা আর একটার বৃহত্তর রূপ—রাজনীতিটা সমাজ-নীতিরই বৃহত্তর রূপ। এবং ঐটেই স্বাভাবিক অবস্থা।

কিন্তু এই স্বাভাবিক অবস্থা সেইদিন থেকে আমাদের দেশে অস্বাভাবিক হ'য়ে উঠ্‌ল যে দিন থেকে আমাদের রাজা এসে হ'ল বিদেশী। সেইদিন থেকে আমাদের সমাজনীতি দেশের রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়্‌ল। তখন থেকে ভিন্ন দেশ ভিন্ন সমাজ ভিন্ন জাতির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে আমাদের কোন সম্বন্ধই রইল না। ফলে ধীরে ধীরে আমরা আদার ব্যাপারী হ'য়ে উঠ্‌লুম তখন আর জাহাজের খবর রাখ্‌বার আমাদের কোন প্রয়োজনই রইল না। তার ফলে ধীরে ধীরে রত্নগর্ভা সপ্তসিন্ধু আমাদের কাছে জাতমারা কালাপানি হ'য়ে উঠ্‌ল। বাহির আমাদের কাছে যত সংকীর্ণ হ'য়ে আস্‌তে লাগ্‌ল আমরা ততই আধ্যাত্মিক হ'য়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লুম। প্রাণ যখন আপনাকে চারিদিকে ছড়াবার জায়গা পেলে না, আত্মা তখন আমাদের বেড়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল ঊর্দ্ধে আকাশ ফেড়ে আর অধে মাটী ফুঁড়ে।

কিন্তু আমাদের হাত পা চোখ কানের যেমন একটা অনুপাত আছে এবং সে অনুপাতকে লঙ্ঘন ক'রে কিছু একটা যদি অতিলম্বা বা অতি-বৃহৎ হ'য়ে ওঠে তবে সেটা যেমন বিশ্রী ও অসুন্দর হ'য়ে পড়ে এবং চতুর্ভুজ বা লম্বকর্ণ হ'য়ে উঠ্‌বার সম্ভাবনা দাঁড়ায়, তেম্‌নি দেহ ও আত্মার মধ্যে একটা অনুপাত আছে এবং সে অনুপাতের সামঞ্জস্যকে এড়িয়ে যদি ওর একটা একান্ত হয়ে দাঁড়ায় তবে তাও বিলক্ষণ বিশ্রী ও অসুন্দর হ'য়ে ওঠে। তাই আত্মার ঐ রকম অস্বাভাবিক বৃদ্ধিতে আমরাও অসুন্দর হ'য়ে উঠেছি আমাদের মনে প্রাণে জীবনে। যদি

বল; আমরা যে অসুন্দর তার প্রমাণ কোথায় পেলে ?—তার উত্তর চোখ খুলে একবার আমাদের সমাজের দিকে তাকিয়ে দেখ, সেখানে যদি কিছু থাকে সে হচ্ছে সৌন্দর্য্যহীনতা।

সে যাই হোক্, মুসলমান গেল ইংরেজ এল ; কিন্তু আমাদের রাজনীতি ও সমাজনীতির ছিন্নসূত্র আর জোড়া লাগল না। বরং আরও বিপরীত হয়ে উঠল। কেননা, মুসলমানদের সঙ্গে আমাদের প্রধান পার্থক্য ছিল ধর্ম্মের, ইংরেজদের সঙ্গে আমাদের তফাৎ হ'ল ধর্ম্মের ত বটেই, তার সঙ্গে সঙ্গে আবার বর্ণেরও। ওর ফলে আমাদের চতুর্বর্ণ লোপ পেয়ে আমরা ধীরে ধীরে এসে দাঁড়ালুম দু'বর্ণে— শ্বেত আর কৃষ্ণে। আলো অন্ধকারের যোগ কবে সম্ভব হয় ? সুতরাং এই আলো আর অন্ধকারের যোগ কোনকালে সম্ভব হ'ল না। ফলে ইংরেজের রাজনীতির হাওয়া আমাদের সমাজনীতির গায়ে লাগল না, আর আমাদের সমাজনীতির পবিত্র ধর্ম্মভাব ইংরেজের রাজনীতিকে কোট্-প্যাণ্ট্ ছাড়িয়ে ধুতি-চাদর ধরাতে পারল না। ফলে, আমাদের আধ্যাত্মিক অবস্থা আশ্চর্য্য রকম গৌরবের হ'য়ে উঠল। আমাদের আত্মা' একটা বিরাট পুরুষ হ'য়ে সমস্ত জল স্থল আকাশ অধিকার করে' চিদ্‌ঘন নির্গুণ ব্রহ্মবৎ বিরাজ করতে লাগলেন ; কিন্তু আমাদের দেহের কোন খোঁজ খবরই রইল না যে, তা থাকল কি গেল।

এতে ফল হ'ল এই যে, ইংরেজ দেখলে মহা বিপদ। সে ভারতের রাজা হ'য়ে বসেছে। রাজা হলে রাজ্যে প্রজা চাই। আমাদের যে-রকম ভাবে যে-দিকে গতি তাতে আমরা যে সবাই নিছক আত্মা হ'য়ে উবে যাব না তার নিশ্চয়তা কি ? তখন সে রাজ্য করবে কাকে নিয়ে ? মাটীর মূল্য না তখনই যখন তার উপরে মাটীর মানুষও

থাকে। তাই ইংরেজ তখন স্থির করলে যে, সে আমাদের শিক্ষা দেবে তার ভাবে ও তার ভাষায়। কেননা, তার সাহিত্য হচ্ছে মাটীর ও মানুষের এবং মাটীর মানুষের গল্প দিয়ে ভরা। তার গানের ও গল্পের প্রধান সুর হচ্ছে মাটীর মানুষের আশা-আকাঙ্খা ভাব-ভাষা ঐশ্বর্য্য-সম্পদ যশ-গৌরবের অনুপ্রেরণা দিয়ে মণ্ডিত ও অনুরণনা দিয়ে ঝঙ্কৃত, তার মনের কথা প্রাণের ব্যথা সব ইহজগতের আনন্দের স্পর্শে হিল্লোলিত উল্লসিত। তার ভরসা, যদি সে-কথার সে-ব্যথার চমৎকারিত্বে মোহিত হয়ে আমাদের আধ্যাত্মিক নির্লিপ্ততা কতকটা কেটে যায় এবং আমরা এই মাটীর 'পরে নেমে আসি আমাদের দেহ মন প্রাণ নিয়ে, তবে তার রাজ্যও থাকে রাজত্বও চলে।

ইংরেজী শিক্ষার সঙ্গে আমাদের মনের স্পর্শ ঘটলে আমাদের আধ্যাত্মিক অবস্থার শুচিতা ও শুদ্ধতা আমরা হারিয়ে যাব এই মনে করে' আমাদের মধ্যে অনেকে সে শিক্ষার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠলেন; কিন্তু দু'এক জনা এমন ছিলেন যাঁরা আত্মাকে মন প্রাণ দেহের নিতান্ত অনাত্মীয় বলে মনে করতেন না, তাঁরা বললেন, কুচ্ পরোয়া নেহি, আমরা ইংরাজি শিখব, ইংরাজের সাহিত্য পড়ব, তার ভাব ভাষার আলোচনা করব। ফলে একদিকে গালাগালি আর একদিকে হাততালির মধ্যে ইংরেজী শিক্ষা আরম্ভ হ'য়ে গেল।

আমি আগেই বলেছি, ইংরেজী সাহিত্য হচ্ছে মাটী ও মানুষ এবং মাটীর মানুষের কথা। তার আশা আকাঙ্খার ছবি সেখানে আঁকা— আর সে এমনি মনোহর করে এম্‌নি চমৎকার করে, এম্‌নি একটা বৃহতের সুর তাতে মাখান যে, তা মানুষের প্রাণে সোজা ও সহজ হ'য়ে পৌঁছে যায়। আমাদের আত্মিক অবস্থার যত উঁচু evolution-ই

হোক্ না কেন আমরা মানুষ ত বটে। তাই ইংরেজের কাব্য ইতিহাস আমাদের প্রাণে এম্‌নি একটা তরঙ্গ তুল্‌ল, এম্‌নি একটা নিবিড় ব্যথা জাগাল, এম্‌নি একটা বহুদিনের ভুলে যাওয়া-খেলা-ধূলোর স্মৃতি জাগ্রত করে' তুল্‌ল যে, আমাদের চোখের কোণে অশ্রু ফুঠে উঠল —মর্ম্মতল বাদলের ব্যথা-জড়িত সুখস্বপ্নে কি রকম ভরে' উঠল। আমরা সেদিন মনে মনে ভাবলুম, আত্মা জিনিসটা খুবই ভাল সন্দেহ নেই; কিন্তু মানুষও ত কম নয়, তার মনের প্রাণের সুখ দুঃখ, আকাঙ্খা আকিঞ্চন, হাসি অশ্রুর ভিতর দিয়ে যে এক দেবতা এসেছেন তিনি ত দীন নন্ হীন নন্,—তিনি মুক্ত তাই বন্ধনে তাঁর ভয় নেই, তিনি ঐশ্বর্য্যবান, তাই অশ্রু তাঁর মুক্তো হ'য়ে ফুটে ওঠে, তিনি আনন্দময় তাই রিক্ততা তাঁর দৈন্যের মাপ-কাঠিতে মাপা চলে না। ওর ফল হ'ল এই যে, আমরা আকাশ থেকে মাটীতে নেমে পড়লুম।

মাটীতে নেমে আমাদের হ'ল মুস্কিল। এতদিন আমরা আত্মাকে দিব্যি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ছড়িয়ে নির্ব্বিবাদে বসে' ছিলুম, পৃথিবীতে নেমে দেখলুম যে সেখানে আমাদের পা রাখবার মত একটু জায়গা মিলতে পারে কিন্তু মাথা গুঁজবার মত কোন স্থান নেই। পৃথিবীকে আমরা এতদিন ছেড়ে ছিলুম, সেই অবসরে আর সবাই তাকে বেশ অধিকার করে' বসে' আছে। ইংরেজের পুঁথিতে পড়ে ছিলুম স্বাধীনতার কথা নিজ নিজ স্বত্বের কথা অধিকারের কথা। আমরা ইংরেজকে বললুম, আমরাও ত মাটীর মানুষ, সুতরাং মাটীর কিছু অংশ আমাদের ন্যায্য প্রাপ্য। ইংরেজ হেসে বল্‌লে, "তোমরা মানুষ কে বল্‌লে, তোমরা ত সব আত্মার দল।" সেদিন থেকে ইংরেজের কাছে আমরা

যে মানুষ তা প্রমাণ করতে বসে' গেলুম। হ্যাট্ কোট্ প্যাণ্ট্ পরে' তার কাছে গিয়ে টুপিটি হেলিয়ে পা দুটো ফাঁক করে' বললুম, এই দেখ আমরাও মানুষ। ইংরেজ কি ভাবলে জানি নে কিন্তু জায়গা ছাড়লে না। সেদিন থেকে আমরা পলিটিক্স করতে লেগে গেলুম। আমরা বললুম, "হে ইংরাজ, তুমি আছ, কিন্তু আমিও আছি এটা তোমায় মান্‌তে হবে।" বহুদিন কেটে গেল, ক্রমে ক্রমে আমরাও বল্‌তে শিখলুম, "হে ইংরাজ তুমি আছ কি নেই তা আমরা জানি নে, কিন্তু আমার মাটী আমার দেশে আমিই আছি, সবার প্রথমে।" স্বাধীনতার কথা আমাদের ঠোঁটে স্পষ্ট হ'য়ে উঠল, আমরা বললুম, "স্বরাজ স্বরাজ।"

কিন্তু এই যে পলিটিক্স, এই যে স্বাধীনতার কথা, ও কেবল আমাদের ঠোঁটের আগে superficial-একটা চালাকি। এ স্বাধীনতা আমাদের অন্তরে অন্তরে জ্বলন্ত হ'য়ে উঠে নি, আমরা ইংরেজের শেখান বিদ্যার বুলি ঘাটে মাঠে বাটে ছড়াচ্ছি—কোথাও বা হুঙ্কার দিয়ে কোথাও বা গম্ভীর ভাবে। আমরা পুরো মানুষ এখনও হ'য়ে উঠি নি। কিসে বুঝি—তা বল্‌ছি।

আমি আগেই বলেছি, বিদেশী ও বিধর্ম্মী রাজার অধীনে আমাদের রাজনীতি ও সমাজনীতি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। মানুষের ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রাজনীতির সঙ্গে ততটা নেই যতটা আছে তার সমাজ-নীতির সঙ্গে। ইংরেজের রাজ্য-শাসনের সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিগত প্রত্যক্ষ স্পর্শ প্রত্যক্ষ contact যা আছে, তার একশ' গুণ আছে আমাদের সামাজিক শাসনের সঙ্গে। কিন্তু ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ইংরেজের রাজনীতিতে যতটা আছে আমাদের সমাজনীতিতে তার

চার ভাগের এক ভাগও নেই। অথচ আমাদের সমাজ সম্বন্ধে যেমন ভাব দশ দিন আগে ছিল এখনও তেমনি আছে। কিন্তু আমাদের চারিদিকে সমাজের সহস্র বন্ধন। মানুষ যাতে আপনাকে উদার করে' পায় মুক্ত করে' পায় তারই বিরুদ্ধে সমাজের যুদ্ধ-ঘোষণা। আমরা যদি সত্য সত্য মানুষ হ'য়ে উঠ্‌তুম, দাসত্বের শৃঙ্খল যদি সত্য সত্য আমাদের গুরুভার হ'য়ে উঠত, স্বাধীনতার সত্য আকাঙ্খা যদি সত্য সত্য আমাদের আত্মায় জ্বলন্ত জীবন্ত জাজ্জ্বল্যমান হয়ে উঠত তবে দেখতে, আমরা আজ আমাদের সমাজের বিরুদ্ধে ঘোর বিদ্রোহী হ'য়ে উঠতুম—কেননা সমাজের বন্ধনই আমাদের প্রত্যক্ষভাবে ব্যক্তিগত জীবনকে স্পর্শ করে' আছে। কারণ, মানুষের প্রথম জ্ঞান ব্যষ্টিত্বের, তারপর সমষ্টিত্বের বা জাতীয়ত্বের। তাই বল্‌ছি, আমাদের স্বাধীনতার জন্য হা হুতাশ আমাদের ঠোঁটের কথা, প্রাণের কথা নয় আত্মার কথা নয়, অর্থাৎ—superficial. তাই আমাদের রাজনৈতিক নেতা বা বক্তাদের মুখে রাজনীতির খৈ ফুট্‌তে থাকে কিন্তু সমাজের দিকে কেউ অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করলেই অম্‌নি তাঁদের ঠোঁট শুকিয়ে ওঠে ও গলা কাঠ হয়ে যায়।

ওর কারণ কি জান?—কারণ ইংরেজের ইতিহাস। ইরেজের ইতিহাসে আমরা পড়েছি রাজায় প্রজায় যুদ্ধ। ইরেজের সামাজিক জীবনে কোন দিনই সনাতনত্বের দানা বেঁধে উঠবার অবসর পায় নি। কাজেই সেখানে ইংরেজরূপী মানুষের কোন সংগ্রাম করবার দরকার হয় নি। ইংরেজের যুদ্ধ ছিল রাজার সঙ্গে। ইংরেজের পুঁথি পড়ে সেই একই জিনিস আমরা শিখেছি। ইংল্যাণ্ডের ইতিহাস যদি রাজায় প্রজায় যুদ্ধ না হ'য়ে ইংরেজদের সামাজিক জীবনের একটা ওলোট-

পালোট হ'ত তবে দেখ্‌তে আজ আমরা রাজনৈতিক প্ল্যাটফরম্‌ পুলপিট্‌ থেকে বাক্যবান বর্ষণ না করে' আমাদের সামাজিক আসরে নেমে অস্ত্র ধারণ করতুম। মানুষের মনের সাকার রূপ যে সমাজ এবং সমাজের বৃহত্তর রূপ যে রাষ্ট্র সেটা আমরা ভুলেছি। ইংরেজের রাজ্যশাসন প্রণালী ও ইংরেজী পলিটিক্সের পিছনে আছে ইংরেজের মন ও সমাজ। ঐখানে গিয়ে আমরা তাদের ভাষায় তাদের মনোভাব প্রকাশ করছি। ইংরেজ যে আমাদের সে সব কথা দু'কান পেতে শুনছে তার কারণ, সে বুঝছে যে সে সব তার নিজের ইতিহাসের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। ওর ফলে আমরা ইংরেজী হ্যাট্‌ কোট্‌ পরা কোন স্বরাজ-লাভ করি আর যাই করি, দেখ্‌বে এমন একদিন আস্‌বে যখন ঐ স্বরাজ ভেঙে ফেলে আবার আমাদের নতুন করে' গড়্‌তে হবেই। কেন না বিলিতি-স্বরাজের পিছনে আমাদের সামাজিক-মন নেই এবং তার পিছনে আমাদের ব্যষ্টির ধর্ম্ম নেই। সে-স্বরাজের পিছনে যা থাক্‌বে সেটা হচ্ছে বিলিতি মন ও দেশী বুদ্ধি। এ ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়ে নিও।

(৩)

তোমায় কি বল্‌তে গিয়ে কোথায় ভেসে গেলুম। এইবার ফির্‌ব। কেননা অনেক বকেছি। বলছিলুম স্বামী বিবেকানন্দের সেই কথাটা— চালাকীর দ্বারা কোন মহৎ কাজ সাধিত হয় না।" আর এই চালাকির অর্থ হচ্ছে superficial impulse—মানুষের বাইরেকার একটা আলগা প্রেরণা।

আমরা আমাদের দেশকে ঐশ্বর্য্যে সম্পদে গৌরবে প্রতিষ্ঠিত

করতে চাই এর মানে অবশ্য এ নয় যে, দেশের মাটী ঐশ্বর্য্যে সম্পদে গৌরবশালী হ'য়ে উঠবে;—তার মানে দেশের মানুষই সত্যি সত্যি উক্তরূপ বিশেষণে বিভূষিত হ'য়ে উঠবে। দেশকে মাতৃমুর্ত্তিতে গড়ে' সামাজিক জীবের মনে প্রাণে emotion জাগান সুবিধা হ'তে পারে এবং জীবন্মৃত জাতির পক্ষে যে সেটার একটা মস্ত দরকার তাও স্পষ্ট; কিন্তু দেশ মানে যে মানুষ এ কথা political economy-র সময় মনে না রাখলে লাভের সম্ভাবনা দু'গণ্ডা রম্ভা। সুতরাং দাঁড়াল এই, দেশ ঐশ্বর্য্য সম্পদে পূর্ণ হ'য়ে উঠবে, মানে দেশের লোকেরা ধন দৌলত অর্জ্জন ও উপার্জ্জন করবে, তার অর্থ সেটা তারা বর্জ্জন করবে না।

কিন্তু বৈরাগ্যের প্রধান ও প্রথম সূত্রই হচ্ছে ঐ সব অনিত্য বস্তুকে বর্জ্জন করে' চলা। সুতরাং দেখতে পাচ্ছ দেশের ধন দৌলতের সঙ্গে মানুষের বৈরাগ্য-ভাবের কোনই সম্বন্ধ নেই—ওর একটা আর একটার ঘোর বিরোধী।

এখন মানুষ যদি ধন দৌলত যশ গৌরব অর্জ্জন করতে চায় তবে তার জন্যে তার চাই সত্য-আকাঙ্খা। এটার বোধ হয় বিশেষ ব্যাখ্যা তোমার কাছে দিতে হবে না। মানুষের আকাঙ্খার সঙ্গে যে তার কর্ম্ম-প্রেরণার বিশেষ যোগ আছে সেটা ত সবার কাছেই স্পষ্ট। যে বস্তু বা বিষয়ের জন্য মানুষের সত্য-আকাঙ্খা নেই সে বস্তু বা বিষয়ের জন্য মানুষের কর্ম্ম-প্রেরণা সত্যভাবে নিয়োজিত হ'তে পারে না। সত্য-আকাঙ্খা বলতে আমি বুঝি, মানুষের আত্মাই বল বা তার deeper self-ই বল বা তার higher consciousness-ই বল তারই সত্য—এবং মানুষের জীবনে সেই সত্যই বিকশিত হ'তে

হ'তে চলেছে—মানুষের চিন্তা কর্ম্ম ধর্ম্ম সেই সত্যেরই বর্ণে ও গন্ধে ফুটে উঠ্‌ছে—সেই সত্যেরই সুরে ও তালে বেজে উঠ্‌ছে—মানুষের জীবন সেই সত্যেরই একটা সাকার রূপ।

উপরের ঐ কথা যদি মান, তবে এ-কথা স্বীকার করতেই হবে যে, আমাদের দেশের লোকের আত্মায়, তার deeper self-এ যদি বৈরাগ্যই, অর্থাৎ—বিষয়-বিতৃষ্ণাই সত্য হ'য়ে থাকে তবে তার কর্ম্ম-প্রেরণা ঐশ্বর্য্য-সম্পদ-গৌরবের সংস্পর্শে আনন্দ লাভ করবে না—সে প্রচেষ্টা তখন তার হবে একটা superficial impulse—তাতে থাক্‌বে তার বেদনা, কেননা সেটা তখন তার স্বধর্ম্ম নয়—পরধর্ম্ম। এবং আমাদের পরধর্ম্ম অন্যের স্বধর্ম্মের কাছে পদে পদে পরাজিত ও লাঞ্ছিত হ'তে বাধ্য। ভারতবাসীর অসত্য আকাঙ্খা ইংলণ্ডবাসীর সত্য আকাঙ্খার সাম্‌নে যুগে যুগে মাথা নীচু করে' থাক্‌বে।

সুতরাং দেশবাসীদের সম্মুখ থেকে বৈরাগ্যের আদর্শকে অপসারিত কর্‌তে হবে এবং তাদের অন্তরাত্মায় বস্তুর বিষয়ের ভোগের আনন্দকে সত্য করে তুল্‌তে হবে তবেই তাদের কর্ম্ম-প্রেরণার সত্য প্রচেষ্টা নিয়োজিত হবে, সেদিকে আনন্দের ভিতর দিয়ে—কেননা অন্তরাত্মার যে সত্য সেই সত্য আচরণেই মানুষের আনন্দ। আর তবেই তা সফল ও সার্থক হ'য়ে উঠবে। কেননা এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যে সৃষ্টি সফল হ'য়ে আছে, তার কারণ, তা আনন্দে উৎসৃষ্ট হ'য়ে আনন্দ থেকেই আনন্দেই যাচ্ছে—সব কিছুরই আনন্দেই জন্ম, আনন্দেই স্থিতি ও আনন্দেই গতি। ঐ শেষের কথাটা উপনিষদের।

আমি উপরে যে লম্বা বক্তৃতা ঝাড়লুম তা যদি না বোঝ তবে দোষ, হয় আমার কলমের, নয় তোমার মগজের।

বিলিতি মতে New Year's Greetings জানাচ্ছি, স্বদেশী ভাবে গ্রহণ কোরো। আশা করি এই ট্রাম ট্যাক্সি strike-এর মরসুমে তুমি খোস্ মেজাজে ও বহাল্ তবিয়তে বিরাজ করছ। ইতি—

তোমার

মৃত্যুঞ্জয়

"দাস-মনোভাব"

——:০:——

'দাস-মনোভাব' বস্তুটি যদিও বর্ত্তমানে ভারতবর্ষের নিজস্ব ও ভারতবাসীর খাসদখলে, তবু এটা যে পেয়েছি আমরা ইংরাজ-রাজের কাছ থেকে—তা অস্বীকার করলে একটা দিনের আলোর মত উজ্জ্বল ও স্পষ্ট সত্যেরও অপলাপ করা হবে।

আমরা যে পরাধীন, অর্থাৎ কিনা দাস-জাতি, সে ইংরাজেরই প্রসাদাৎ।

তারপর প্রশ্ন উঠ্‌তে পারে যে, এই নন্‌-কো-অপারেশনের নব-যুগে যখন কংগ্রেস্‌-মঞ্চ থেকে ঘোষণা করা হল যে, এক বছরের মধ্যে স্বরাজ লাভ করে' স্বাধীন হতে হবে, তখন আমি কেন দাস-মনোভাবের প্রভাবের পরিচয় দিতে যাচ্ছি।—তার উত্তরে আমার বল্‌বার আছে এই যে, দাসত্বের শিক্‌লি কেটে' ফেলে' দিয়ে স্বাধীন হয়ে গেলে ত দাস-মনোভাব সম্বন্ধে বল্‌বার আমি অধিকারী থাক্‌ব না। তখন স্বাধীন ভারতে স্বাধীন ভারতবাসী আমি, এই অনধিকার-চর্চ্চা কেনই বা করতে যাব? তাই আগে-ভাগেই এ বিষয়ের আলোচনা শেষ করে' নেওয়া ভাল মনে করি। এ আলোচনায় যে কারুর চোখ ফুট্‌বে এমন আশা করি নে, তা বলে' বুক ও যে ফাট্‌বে এমন আশঙ্কাও নেই।

মানুষের প্রকৃতি-ভেদে যেমন মনোভাবের আকার ও প্রকার

ভিন্ন ভিন্ন রকমের হয়, জাতিরও ঠিক তেমনি হয়ে থাকে। দুষ্ট লোকের মনটিকে যেমন দুস্টামি-নষ্টামি অহরহ তোলপাড় করে' তোলে, তেমনি আবার ভাল লোকের মনকে নানান রকমের সদ্ভাব এসে উচ্ছ্বসিত করে দেয়। স্বাধীন জাতি আর পরাধীন জাতির প্রকৃতিতে প্রভেদ আকাশ-পাতাল। একটি বেড়ে' ওঠে যে আব্-হাওয়ার মধ্যে তা মুক্ত, সুন্দর ও অনাবিল; আর একটি বেড়ে' ওঠে যার ভিতর দিয়ে সে হচ্ছে বদ্ধ, কুৎসিৎ ও আবিল। সুতরাং স্বাধীন আর পরাধীন—এ দু'য়ের মনোভাবের বিকাশ ও প্রকাশ, দ্যোতনা ও ব্যঞ্জনা একেবারে ভিন্ন রকমের। একের সাথে অপরের মিলও নেই কিছু, সাদৃশ্য বা সামঞ্জস্যও নেই কিছু।

দাস-মনোভাব দাসত্বের ফুল না হলেও যে মূল, এতে আর ভুল নেই। কেননা দাস-মনোভাবকে আশ্রয় করেই দাসত্ব স্বাধীনতার আগাছা ঝেড়ে-ঝুড়ে বেড়ে' ওঠে। দাস-মনোভাবরূপ মূল যেদিন ছিঁড়ে যায়, অর্থাৎ কিনা, দাস-জাতির ঘুম ভাঙ্গে, সেদিন এই দাসত্ব-বিটপী—সে যত প্রকাণ্ডই হোক্ না কেন—বড় বড় শাখা-প্রশাখা সমেত একেবারে ভূমিসাৎ হয়ে যায়। এ জন্যেই দাসত্বের ব্রহ্মারা দাস-মনোভাবের সৃষ্টিতেই তুষ্টি লাভ করতে পারেন না—তাঁরা চান বিষ্ণুর মত এর স্থিতি। কিন্তু মজা হচ্ছে সেই খানেই, যেখানটায় এঁরা প্রলয়কর্ত্তা শিবকে একেবারে বাদ-সাদ দিয়ে সৃষ্টিতত্ত্বের লীলা-খেলা শেষ করতে চান।

দাস-মনোভাবের স্থায়ীত্বের উপর দাসত্বের জীবন নির্ভর করে বলেই ব্রহ্মারা এইটিকে পুষ্টিকর ও তুষ্টিকর আহার্য্য দিয়ে সজীব ও সতেজ করে' রাখতে ব্যস্ত। এর দরুণই ভারতবর্ষের হর্ত্তাকর্ত্তা

বিধাতারা আমাদের শিক্ষার উপরে এত কড়া নজর রাখেন। শিক্ষা-নীতি কেমন ছাঁচে ঢাললে, কোন্ কোন্ পুঁথি পাঠ্যপুস্তক করলে, কি ধরণের শিক্ষক নিয়োগ করলে ছেলেদের মনোভাবগুলিকে ঠিক দাস-জাতির উপযোগী করে' গড়ে' তোলা যায়, তা নিয়ে আমাদের রাজগুরুরা যতটা মাথা ঘামান আর কিছুতে তেমনটি ঘামান কি না জানি নে। ইস্কুলের চতুঃসীমানার মধ্যে স্বদেশ-ভক্তদের আলেখ্য-দর্শন কারুর ভাগ্যে ঘটে' ওঠে না। স্বাধীন দেশে রাজ-ভক্তি বল্‌তে বুঝায় স্বদেশ-ভক্তি; আর এ দেশে স্বদেশ-ভক্তি বললে সচারাচার বিদেশীরা বুঝেন বিদেশী-বিদ্বেষ। ভক্তি কখনো বিদ্বেষের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না—এ সত্যটুকু উপলব্ধি করতে পারলে সব সংশয়ের মেঘ দূর হয়ে শাসকদের মনটা খোলসা হয়ে যেত।

ইস্কুলের এমন রুদ্র শাসন ও দাসত্বের আওতার মধ্যে লালিত-পালিত হয়েও এক-একটি ছেলে দাস-মনোভাবের প্রবল প্রভাব থেকে আত্মরক্ষা করে' বিশ্ব-বিজয়ী বীরপুরুষের মত মাথা উঁচু করে' দাঁড়ায়; অর্থাৎ—স্কুলবুকের ভাষায় বলতে গেলে সুশীল ও সুবোধ না হয়ে বেণীর মত দুরন্ত হয়ে ওঠে, এত বাধা বিঘ্নের মধ্যে এমন্‌টি যে হয়ে ওঠে সে 'কোটিকে গোটিক', আর অমন হয়ে ওঠা, সে হচ্ছে প্রাক্তনের পুণ্যফল।

কিন্তু এই যে 'কোটিকে গোটিক'—সে যখন ইস্কুলের সীমানা ছেড়ে বাইরের মুক্ত মাঠে পা বাড়াল অমনি গোয়েন্দা-ইস্কুলমাষ্টাররা এসে তাকে তেড়ে ধরলেন, কায়ার সঙ্গে ছায়ার মতন তার সঙ্গী হয়ে বসলেন। সেই থেকে যে বসতে খেতে, বলতে ফিরতে এঁরা

তার পিছনে লাগলেন—তার গৌণ উদ্দেশ্য যাই হোক, মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে এমনি ভাবে জ্বালাতন করে' তার উপচীয়মান স্বাধীন মনোভাবকে অন্ধ ও বন্ধ করে' দাস-মনোভাবের দিকে তার মতি ও গতি ফিরিয়ে দেওয়া। ব্যুরোক্রেশীর বিচিত্র মনোভাবের খোঁজ খবর যাঁরা রাখেন তাঁরাই জানেন যে, দাস-জাতির দাস-মনোভাবকে জাগিয়ে রাখা তাদের নীতি, আর এইটিকে চাগিয়ে রাখা তাদের রীতি। এ নীতির অনুসরণ ও এ রীতির অনুবর্ত্তন না করলে তাদের শাসন একেবারেই বিফল ও শাসন-যন্ত্র একদিনেই বিকল হয়ে যেতে পারে, এ আশঙ্কা নিশিদিন তাদের মনের মধ্যে ডঙ্কা বাজিয়ে ঘুরছে। এ আশঙ্কা যে অমূলক, তা বলতে পারি নে। যাঁরা দাসত্বের কারবার করেন তাঁদের মনোবিজ্ঞানে বিশারদ হওয়া প্রয়োজন। ইংরাজরা ভারতীয় দাস-জাতির মনোবিজ্ঞান নিয়ে যে প্রচুর গবেষণা করেছেন, তা তাদের শাসন-নীতি থেকেই পরিচয় পাওরা যায়।

জাতীয় বেশ-ভূষা ছেড়ে যে সব দাঁড়-কাক বিজাতীয় পোষাকে ভূষিত হয়ে ময়ূর সাজেন তাঁরা আমাদের মনিব-সমাজে মেলামেশার কতকটা অধিকারী হন। গৌরাঙ্গেরা এই শিখি-পুচ্ছধারী কৃষ্ণাঙ্গদের যে খুব সুনজরে দেখেন তা অবশ্য নয়। তার প্রমাণ, রেলে ষ্টীমারে হরদম গোরা আর কালার সংঘর্ষ থেকেই মিল্‌বে। সাদার পোষাক-পরা এই কৃষ্ণদাসটিকে নিয়ে কত রং-ঢং তারা করে থাকে। কিন্তু ঐ উপহাস-পরিহাসের মধ্য দিয়ে, ঐ মেলামেশার ভিতর দিয়ে তার স্বদেশীর প্রতি এদের বিদেশী ভাব প্রতিমুহূর্ত্তে মারাত্মক ও বিষাক্ত বাণ হানছে। বিদেশীর সে বাণ স্বদেশীর চর্ম্ম ভেদ করে মর্ম্ম পর্য্যন্ত গিয়ে বিঁধলেও কালার তাতে বেদনা-বোধ হয় না। কারণ, 'দাস-মনোভাব'

গ্রস্থ যে, তার স্বজাতির প্রতি বেদনা-বোধ একেবারে লুপ্ত না হলেও সুপ্ত হয়ে থাকে।

দাস-মনোভাব যাকে পূরোপূরি পেয়ে বসেছে, সে স্বদেশী ঠাকুর ফেলে' বিদেশী কুকুরকে পূজা করে' তুষ্টি ও তৃপ্তি লাভ করে। এতে তার নিজের মোক্ষ-লাভের পথ পরিষ্কার হোক্ আর নাই হোক্, তার স্বদেশ ও স্বজাতির সজ্ঞানে স্বর্গ-লাভের পথ যে নিষ্কণ্টক হয় তাতে আর কোনো সন্দেহ নেই। দাস-মনোভাবের প্রভাবে মানুষের ভিতর-বাহির দুই দিক্‌কার চেহারাই হুবহু বদ্‌লে যায়। গোলাম যে সেলাম ঠোকার জন্যেই জন্মেছে, তা তার চেহারা দেখেই মালুম হয়। মনিবের দর্শনে গোলামের হাত সেলামের জন্যে উরুদেশ থেকে ললাটদেশ পর্য্যন্ত স্বতই উত্থিত হয়ে থাকে, মাথা ফলবান বৃক্ষেরই মত আপনা-আপনি নুইয়ে পড়ে, মেরুদণ্ড বেতসী-লতার মতন বক্র হয়ে যায়, আর চোখে ভেসে ওঠে ফ্যাল্ ফ্যাল্ দৃষ্টি, মুখে আসে স্তোক-বচন ও বুকে অনুভূত হয় হৃৎপিণ্ডের ঘন স্পন্দন। এমত অবস্থায় গোলামকে দেখে' ঠিক করা মুস্কিল—সে পুরুষ, কি কাপুরুষ কি না-পুরুষ। গোলামের এই যে নেতিয়ে পড়া এলিয়ে পড়া ভাব, এ আয়ত্ত করতে তেমন কোনো সাধনা বা চেষ্টা-চরিত্রের দরকার হয় না। দাস-মনোভাব দাস-জাতির অস্থি-মজ্জায় ওতপ্রোতভাবে প্রবিষ্ট হলে আপনাহতেই গোলামী-ভাব ফুটে' ওঠে, গোলামী-স্বভাব গড়ে' ওঠে। জিনিস গড়তে যত সময় ও পরিশ্রম দরকার, ভাঙ্‌তে ততটার আবশ্যক হয় না। কিন্তু দাস-মনোভাব কিংবা গোলামী-স্বভাবের বেলায় ও-কথা খাটে না। দাস-মনোভাবকে ভিত্তি করে' ফুটে' ওঠা গোলামী-ভাবকে নষ্ট করতে হলে ও গড়ে'-ওঠা-

গোলামী-স্বভাবকে ধূলিসাৎ করতে হলে দাস-মনোভাবরূপ দৃঢ় ভিত্তিকে ভেঙ্গে' চূরমার করে' দিতে হবে। তবে, এ ভিত্তি গড়া যত সহজ ভাঙ্গা তত সহজ নয়। তাই সাধনার প্রয়োজন। আর এই সাধনায় সিদ্ধির উপরই জাতির স্বাধীনতা-ঋদ্ধি নির্ভর করে।

বনের বাঘের চেয়ে মনের পাপ যে বেশি হিংস্র তা কে না জানে। দেহের দাসত্ব অপেক্ষা মনের দাসত্ব যে কত ভীষণ ও সাংঘাতিক তা অস্বীকার করবার যো নেই। দেহ পরাধীন হলেই মনটিও যে ও-রকমটি হবে তা ঠিক বলা যায় না। কিন্তু মন পরাধীন হলে দেহের স্বাধীনতা যে সঙ্গে সঙ্গেই উপে যায় তা অতি সত্য কথা। এই জন্যেই পৃথিবীর ঋষি-মনীষীরা আলোচনা করেন এই একটা তন্ত্র নিয়েই, যেটা রাজতন্ত্রও নয়, গণতন্ত্রও নয়—সেটা হচ্ছে মনতন্ত্র। মনতন্ত্রের শাশ্বতী নীতি—মনের বন্ধন-মোচন, আত্মার মুক্তি।

দাস-মনোভাবের প্রভাব যে কত ভীষণ কত মারাত্মক, তার একটা প্রমাণ দিচ্ছি। যা বলতে যাচ্ছি তা মন-গড়া গল্প নয়—নিজের চোখে-দেখা প্রত্যক্ষ ঘটনা। সে বছর তিনেক আগেকার কথা—আমি তখন বাঙলার উত্তর প্রান্তে ভুটান-পাহাড়ের ধারে একটি স্থানে রাজ-অতিথিরূপে পরমসুখে জামাই-আদরে বাস করছিলুম। সেখানকার এক হিন্দুস্থানী মিঠাইওয়ালার দোকানে আমি প্রায় প্রতিদিনই সকাল-বিকাল যেতাম। মিঠাইওয়ালার অনেক দিনের একটি পোষা টিয়া পাখী ছিল। একদিন বিকালে গিয়ে দেখি, মিঠাইওয়ালার বদন বিরস নয়ন ছল-ছল আর মুখ দিয়ে বেরুচ্ছে অশ্রাব্য বচন। তার আশে-পাশে কয়েকটি চা-বাগানের কুলী বসে' আছে। সবার হাব-ভাব, আকার-প্রকার দেখে' মনে হল্‌ যেন, মিঠাইওয়ালা মিছির-ঠাকুরের

উপর কোনো আকস্মিক বিপদপাত হয়েছে। আমি জিজ্ঞাসা করলুম—"ক্যায়া হুয়া মিছির-ঠাকুর?" বড় আপ্‌শোষ করে' সে তখন সুমুখের সড়কের ধারে একটা বড় গাছের ডালের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে' বল্লে—"বাবু-সাহেব, বঢ়ী আপ্‌শোষকি বাত্‌, হামারা পাখীঠো ছুট্‌ গিয়া" এই বলেই সেই টিয়া পাখীকে উদ্দেশ করে' গালাগালি করতে সুরু করলে—"শ্যালা নিমকহারাম, এতনা রোজ কেত্‌না খিলায়া তব্‌ভী চল্‌ গিয়া।" মিঠাইওয়ালা মিছির-ঠাকুরের সাথে আমার বেশ ভাব থাক্‌লেও, আর তার দোকানের একজন বাঁধা খদ্দের হলেও, তার এই মনোবেদনায় আমার প্রাণে কোনো সমবেদনার উদ্রেক হয় নি। পায়ে শিক্‌লি-পরা খাঁচার পাখী বন্ধন-মুক্ত হয়ে স্বাধীন বনের পাখীর মত গাছে বসে' নীল আকাশের তলে মুক্ত হাওয়ার মাঝে ডাকছে শুনে আমার সারা হৃদয়খানি অনাবিল আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। তারপর সেদিনকার মত আমি আমার কুটীরে ফিরে গেলাম। বন্দী আমি—রাতে শুয়ে শুয়েও এই পাখীটির কথাই ভাবলুম, পাখীর কি হল—সে কি খাঁচায় ফিরে এল, না আপন-মনে বিজন বনে উড়ে' চলে গেল, শুধু তা জানবার জন্যে। আবার সকাল-বেলা দোকানে গিয়ে হাজির হয়ে মিছির-ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলুম্‌—"পাখীঠো মিলা মিছির?" হাসি-মুখে মিছির-ঠাকুর জবাব দিলে—"কাহে নেহি মিলেগা বাবু-সাহেব! পাখীঠো সাম্‌কা বক্‌ত আপ্‌হি আপ্‌ আকে পিঁজরামে ঘুসা।"

দাসত্বের কেমন মোহ! পিঁজরার কি সম্মোহিনী শক্তি! শিক্‌লির কত আকর্ষণ! খাঁচার পাখী স্বাধীনতা পেলেও আবার সাধ করে' স্বেচ্ছায় নিজে এসে খাঁচায় ঢুক্‌লে—এ যে দাস-মনোভাবের

প্রভাব বই আর কিছুই নয়। পাখীর বেলা যা, মানুষের বেলায়ও ঠিক তাই। আমেরিকায় নিগ্রোদের যখন দাসত্ব-মোচনের প্রস্তাব হল, তখন নাকি দাসদের মধ্যে একটা ভয়ঙ্কর অস্বস্তি ও চাঞ্চল্যের ভাব জেগে উঠেছিল, তাদের অনেকেই নাকি তখন মনিবদের কাছে কান্না-কাটি করে' বলেছিল যে, মনিব ছাড়া হলে তাদের কি উপায় হবে।

দাস-জাতির মনস্তত্ত্বের আলোচনা কর্‌লে এই নিখুঁত ও নিছক তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায় যে, Physical slavery বা দৈহিক দাসত্বের চাইতে mental slavery বা মানসিক দাসত্ব বড় সাংঘাতিক, ভীষণ মারাত্মক। সুতরাং মনের বন্ধন মোচন করে' তাকে মুক্তি দিতে হলে দাস-মনোভাবকে উন্মূলিত করে' ফেলতে হবে। মনই যদি স্বাধীন হল, তবে দেহকে আর কয়দিন বন্দী করে' রাখা চলে?

শ্রীনগেন্দ্রকুমার গুহ রায়

মন্তব্য—

দাস-মনোভাব ওরফে Slave mentality কথাটি কিছুদিন হল এদেশে মুখে মুখে ফিরছে। সকলে যখন একটা কথা বলে তখন সকলের মনে তার অর্থ স্পষ্ট কি না, এ সন্দেহ সহজেই হয়। তবে যে বিষয়ে সন্দেহ সেই সে হচ্ছে এই যে, সকলে সেটা এক অর্থে বোঝে না।

বাঙলার যুবক-সম্প্রদায়ের মধ্যে একদল দাস-মনোভাব বলতে কি বোঝেন তার পরিচয় উপরোক্ত প্রবন্ধে পাওয়া যায়। এই সংখ্যায় প্রকাশিত "উড়ো-চিঠি"তেও এই একই বিষয়েরই আলোচনা আছে। একটির পর আর একটি পড়লেই, পাঠকমাত্রেরই কাছে একের মনোভাবের সঙ্গে অপরের মনোভাবের

স্বাতন্ত্র্যটুকু সহজেই ধরা পড়বে। এই লেখা দুটিই প্রমাণ যে, বাঙলার যুবক-সম্প্রদায় কথা একমাত্র আউড়েই মনস্তুষ্টি লাভ করেন না, তাঁদের মধ্যে অনেকে সে কথার মানে নিজের মনে পরিষ্কার করতে চেষ্টা করেন। কথার পিছনে মানে খোঁজার প্রকৃতি যে জাতের অন্তরে আছে তাদের মুখে কোন কথাই ছেরেফ বুলি হয়ে উঠতে পারে না। বাঙালির বিশেষত্বই এইখানে।'

—সম্পাদক

প্রকৃতির অভিসার

—✱—

স্নেহব্যগ্র দুটি বাহু প্রসারি অমন,
কেগো তুমি শ্যামাঙ্গিনী দাঁড়াইয়া বালা !
ত্রস্ত আলিঙ্গনে মোরে করিয়া বন্ধন
কি কথা কহিবে কানে আজি সন্ধ্যাবেলা ?
স্বপনসুষমা ঘেরা উপবনে হেথা
কেগো তুমি পাগলিনী বাঁধিয়াছ বাসা,
চিত্তে যদি জাগে তব প্রকাশের ব্যথা—
কেন মূক কণ্ঠে তব নাহি কোন ভাষা ?
এত শোভা চারি ভায়, বনানীর গায়
আলোছায়া করে খেলা গোধূলি-বেলায় ;
আজি এ স্বপনপুরে ঘনবনচ্ছায়
খুলিব কি হৃদিদ্বার তোমায় আমায় ?
নিরজন বনপথে বসি তৃণাসনে,
গাহিব কি আজি গান আপনার মনে ?

শ্রীভূপেন্দ্রলাল সেন চৌধুরী

প্রকৃতির প্রতি

—:*:—

আসিয়াছি আজি পুনঃ দুয়ারে তোমার,
অয়ি শুভে, অয়ি মম শ্যামা বনরাণী!
শ্যামল আঁচলখানি বিছায়ে আবার,
তব শান্ত বক্ষোপরে লহ মোরে টানি।
যা-কিছু সম্বল মম বাণী-সাধনায়
নিঃশেষে বিকায়ে দিব চরণে তোমার—
দেখাও সে লীলা তব দীন অভাগায়,
সেই তব শ্যাম হাসি অনন্ত শোভার!
চারিপাশে আনাগোনা কর্ম্মকোলাহল,
তার মাঝে স্থান মোর নাহিক কখন—
সায়াহ্নের ম্লান ছায়ে মৌন ধরাতল,
তারি মাঝে সঙ্গোপনে রহিব দু'জন।
মূক বিস্ময়ের রেখা নয়নের কোণে,
জানাইবে কত প্রীতি জাগে মোর মনে।

শ্রীভূপেন্দ্রলাল সেন চৌধুরী

———

বন্ধু

——:❀:——

(ক)

দেওঘর

২০শে মাঘ, ১৩২১

সতীশ

একটা বিপদে পড়ে তোমায় লিখছি এই চিঠি। হঠাৎ এখানে আমার কিছু টাকার দরকার হয়ে পড়েছে।

যেরকম অনুমান করে এসেছিলাম, এখানে খরচ তার চেয়ে অনেক বেশি হচ্চে দেখছি; আরও বোধ হচ্চে, যতদিন থাকব ভেবে-ছিলাম তার চেয়েও বেশিদিন থাকতে হবে। এই সব জন্যই, যে টাকা আছে মনে হচ্চে যে তাতে কুলোবে না।

অথচ উপস্থিত এখান থেকে আমার নড়বার জো নেই। এ বিদেশে এদের কার কাছে রেখে যাই! আর এখানে টাকা পাওয়া একরকম অসম্ভব। কারণ যদিও ২।৫ জনের সঙ্গে আলাপ হয়েছে এখানকার, কিন্তু তাঁরা সকলেই আমার মত হাওয়া খেতে এসেছেন। তাই তোমাকে লিখছি। যদি সম্ভব হয় টাকাটা একটু শীঘ্র পাঠিয়ে দিয়ো, কারণ দিন দিন যেমন টাকা ফুরিয়ে আসচে, সঙ্গে সঙ্গে তেমনি দুর্ভাবনাও বাড়চে।

যদি চাও তবে আষাঢ় মাসে দেশে ফিরেই তোমায় টাকা দিতে পারব; কিন্তু যদি আশ্বিন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে পার, তবে দেবার সময় আমার একটু সুবিধা হয়।

তুমি বোধ হচ্চে এ সব দেশে কখনো আস নি। চমৎকার দেশ—এখানকার হাওয়ায় যেন আনন্দ ভেসে বেড়াচ্চে। যদি পার একবার এস এদিকে, এবং আমার থাকবার মধ্যে এলেই আমি সুখী হব জানবে। ইতি—

প্রমথ

পুঃ—সঙ্গে একখান হ্যাণ্ডনোট দিলাম। তুমি হয় ত তার দরকার মনে নাও করতে পার, কিন্তু আমার মনে হয় যার যা দস্তুর তা মেনে চলা দরকার। বড়জোর তুমি এটাকে অধিকন্তু বলতে পার, কিন্তু সেটা দোষের নয়, এবং আশা করি সে জন্য রাগ করবে না।

প্রঃ

(খ)

রাজগ্রাম

১৭।১১।২১

ভাই প্রমথ

ভাই তোমার চিঠির উত্তর দিতে অত্যন্ত দেরী হয়ে গিয়েচে বলে নিজেকে নিতান্ত অপরাধী মনে করচি। আশা করি তুমি আমাকে ক্ষমা করবে, যদিও ক্ষমা চাইবার মুখ আমার নেই!

এমন ঝঞ্ঝাটে পড়ে গিইচি কিছুদিন থেকে, যে তোমার চিঠির কথা প্রায় ভুলেই গিইছিলাম। কথাটা মনে হবহব সময়ে তোমার দ্বিতীয়

চিঠি পেলাম। তুমি ব্যস্ত হয়ে উঠেচ দেখে আর দেরী করতে পারলাম না।

যদিও শুনে তোমার কোনই লাভ নেই, তবু আমার নিজের সাফাইয়ের জন্য আমার কথাটাও তোমায় জানিয়ে রাখি। ভাইয়ের সঙ্গে গোড়া থেকেই আমার বনচে না—উপস্থিত শুনচি সে আদালত করবে, আমাকেও সে উকিলের চিঠি দিয়েছে। তার ন্যায্য গণ্ডা তারে বুঝিয়ে দিতে আমার কোনই আপত্তি নেই, আর সে আপত্তি করলেই বা তা টিঁকবে কেন? কিন্তু কুলোকের কুচক্রে পড়ে ভাই আমার কাছে যা চাচ্চে, তা তার ন্যায্য পাওনার অনেক বেশি। অবিশ্যি ভাইকে দিতে আমার অসাধ নেই, কিন্তু ছেলেমেয়েদেরও ত তাই বলে পথে বসাতে পারিনে।

তার উপর হেমটার অসুখ লেগেই আছে। ডাক্তার-খরচ করতে করতে জেরবার হয়ে পড়লাম ভাই। অথচ একবার যে দেশ ছেড়ে কোথাও বেরব, তার পর্য্যন্ত জো নেই। তাহলে আমাকে মূলেই হাবাৎ হতে হবে হয়ত—এমনি গুণের ভাই আমার।

মেয়েটারও বিয়ে দেবার সময় হয়ে আসচে। তোমার সন্ধানে যদি ভাল ছেলে থাকে ত দেখো। আমার মেয়ের বয়স যদিও বেশি নয়, কিন্তু এ পাড়াগাঁ—সহরের নিয়ম এখানে খাটে না।

সবার সেরা বিপদ হয়েচে এই যে, আদায়পত্র সব বন্ধ। আমাদের ঘরোয়া বিপদের খবর চারদিকে জানাজানি হয়ে পড়েচে—দেনদারেরা সব ওৎ পেতে বসে আছে—একটা কিছু হেস্তনেস্ত না হলে তারা পয়সাকড়ি দেবে না দেখচি।

এই সব কারণে উপস্থিত টাকা দিয়ে তোমার কোনরকম উপকার করতে পেরে উঠব বলে বোধ হচ্চে না। আশা করি সে জন্য তুমি আমায় ক্ষমা করবে।

কিন্তু হ্যাণ্ডনোট পাঠানো তোমার উচিত হয় নি কোনমতেই। বন্ধুর কাছে টাকা চাইতেও যদি ও-সবের দরকার হয়, তবে অন্যের সঙ্গে আমাদের প্রভেদ কি? এ বিষয়ে তোমাকে আর বেশি কিছু বলব না—কারণ নিশ্চয় তুমি তোমার অন্যায় বুঝতে পেরেচ, এবং সেজন্য মনে মনে অনুতাপও হচ্চে তোমার হয় ত।

আশা করি তুমি অন্য কোন জায়গা থেকে টাকা পাবে তোমার দরকার অবিশ্যি মিটে যাবে একরকম করে, কেবল মাঝে থেকে আমাকে শুধু লজ্জায় ফেল্‌লে অসময়ে টাকা চেয়ে। ইতি—

শ্রীসতীশচন্দ্র রায়

(গ)

২৫।৩।১০

সতীশ

দেখচি টাকা দিতে পারলে না বলে তুমি অত্যন্ত কুণ্ঠিত হয়ে পড়েচ এবং বার বার সেজন্য ক্ষমা চেয়েচ, কিন্তু আমার ত মনে হয় আমার কাছে এমন কোন অপরাধ তুমি কর নি যার জন্য ক্ষমা চাইবার দরকার আছে। তোমার বিপদের মধ্যে যে আমার কথা তুমি ভুলে গিইছিলে সেজন্য নিশ্চয়ই তোমার কোন দোষ হয় নি, বরং তারে অন্যায় বলে মনে করলে আমারই অপরাধ হবে এবং তার ক্ষমাও মিলবে না আমার ভাগ্যে।

যদি কোন অপরাধ তোমার হয়ে থাকে তবে তোমার নিজের কাছেই হয়েচে এবং সেজন্য আমার ক্ষমা চাওয়ার কোনই দরকার নেই তোমার। কিন্তু আমার এও মনে হয় যে, নিজের কাছেও তুমি এ-সম্পর্কে কোন অন্যায় কর নি, যদিও আমার চেয়ে সে কথা নিজেই তুমি ভাল বুঝতে পারবে।

বিপদ হয়, আবার কেটেও যায়—কোনটা হয় ত একটু জানিয়ে যায়। তার বেশি কিছু সে করতে পারে না, তবে এটুকু যে করে সে স্বভাবে।'

এযাবৎ নিজের উপর দিয়ে এত বিপদ আপদ গিয়েচে যে, ওতে আর অধীর হবার কারণ দেখি নে। তবে ঘাড়ে চেপে পড়লে যে বিপদে আমরা অধীর হয়ে পড়ি, তার কারণ বিপদের ভার তত নয় যত তার ভয়। আমার ত মনে হয়, যে ভার সইতে পারে সে ভার বইতেও পারে—অন্তত ভার যে সে ঝেড়ে ফেলতে পারে তা নিশ্চিত। তবে ভয়ের কথা আলাদা—সেটা মনের। মনে করলে আমরা সেটাকে বিভীষিকা করে তুলতে পারি, আবার তারে আদপেই আমল না-দেওয়াও আমাদের পক্ষে অসম্ভব নয়।

আশা করি ভগবানের আশীর্ব্বাদে শীঘ্রই সবদিকে মঙ্গল হবে।

তোমার

প্রমথ

পুঃ—ভাল কথা—এখানে এক বন্ধুর কাছে টাকা পাব আশা পেয়েচি যা ভাবতে ভরসা করি নি দেখচি তাই ঘটনায় ঘটে গেল। এমনিই হয়। বিপদ এমনি ভাবেই আসে, এমনি ভাবেই যায়।

(ঘ)

বেলপুর
২৫শে আশ্বিন' ২২

সতীশ

ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারচি নে। হঠাৎ গিরীশচন্দ্র রায়, যিনি তোমার ভাই বলে নিজের পরিচয় দিচ্চেন, তিনি আমার কাছে হ্যাণ্ডনোট বাবদ সুদে আসলে প্রায় সাড়ে পাঁচ'শ টাকার একসঙ্গে দাবী ও তাগাদা করে চিঠি দিয়েচেন।

তোমার ভাইয়ের সঙ্গে আমার লেন্‌দেন দূরের কথা—জানশোনা পর্য্যন্ত নেই। হঠাৎ তাঁর কাছ থেকে এরকম চিঠি পেয়ে তাই বড় আশ্চর্য্য হয়ে গিইচি।

কিন্তু ব্যাপারটা খোলসা করবার জন্য তিনি লিখেচেন যে, তোমাদের কারবার পৃথক হবার সময় যে সব খৎপত্র তাঁর ভাগে পড়ে, তারই মধ্যে আমার এই হ্যাণ্ডনোটখানি তিনি পেয়েচেন। সঙ্গে তিনি আবার সে চিঠিখানাও পেয়েচেন, যাতে আমি তোমায় টাকার জন্য লিখেছিলাম, এবং তাতে লেখা মতই এই সময়ে তিনি আমার কাছে টাকার তাগিদ করেচেন।

নিশ্চয় একটা ভুল হয়েচে এর মধ্যে। যদিও তুমি দেওঘর থাকতে আমি টাকার জন্য তোমায় লিখেছিলাম এবং একখানা হ্যাণ্ডনোটও সঙ্গে পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু তোমার কাছে আমি টাকা পাই নি; হ্যাণ্ডনোটখানাও আমি ফেরত চাই নি, কারণ ভেবেছিলাম যে তুমি নিশ্চয় সেখানা ছিঁড়ে ফেলেচ।

তোমার তখনকার সেই চিঠিখানা আমি রেখে দিইছিলাম।

তোমার ভাইয়ের চিঠি পেয়ে তারে খুঁজে বার করেচি। এই সঙ্গে তার নকল পাঠালাম। যদি নিজের ঝঞ্ঝাটে কথাটা তোমার মনে না থাকে, তবে চিঠিখানা পড়ে' নিশ্চয় সব মনে পড়বে। আর সে কথা মনে থাকাও বিচিত্র নয়, কারণ ঘটনা ত বেশিদিনের নয়। তোমার ভাইকে আমি বিশেষ কিছু লিখলাম না। তুমি তাঁরে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেবে—যেন তিনি অকারণে একজন নিরপরাধীকে উদ্ব্যস্ত না করেন। আমি শুধু লিখ্‌লাম যে তোমায় এ বিষয় লিখলাম, এবং তুমিই সব কথা তাঁরে বুঝিয়ে দেবে।

তোমার

প্রমথ

(৬)

রাজসাহী

৩০শে আশ্বিন' ২২

ভাই প্রমথ

কি বলে যে তোমার ক্ষমা চাইব বুঝতে পারচি নে, কারণ দেখচি একটা ভয়ানক ভুল হয়ে গিয়েচে এর ভেতরে। কিন্তু ভাগ্যে তোমার হিসেবে হয়েচে আর কথাটা মনে আছে আমাদের, নইলে হয় ত অকারণে একটা গণ্ডগোলের সূচনা হয়ে দাঁড়াত, কারণ টাকাকড়ির কথায় যে কিসে কি হয় বলা যায় না।

তবে ভুলটা যে হতে পেরেচে, সে আমারই দোষ। আমি নিজ-হাতে তোমার হ্যাণ্ডনোটখানা ছিঁড়ে ফেলি নি, গোমস্তাকে বলে-ছিলাম। তারও ভুল হত না, যদি না ঐ তারিখের আর একখানা ঐ টাকার হ্যাণ্ডনোট থাকত

খাতায় দেখছি ঐ তারিখে ৫০০৲ টাকা খরচ লেখা আছে হ্যাণ্ডনোট বাবদ। তবেই বুঝতে পারচ টাকাটা দেওয়া হয়েচে ঠিক, কিন্তু ভুল হয়েচে খৎখানা ছিঁড়বার বেলায়। নিজে হাতে ছিঁড়লে আর এ ভুলটা হত না, আমার এ দণ্ডটা লাগত না।

আরও ভুল হল আমার এই যে ভাগাভাগির সময় আমি কোন কথা কই নি। কারণ দেখলেই আমি সব বুঝতে পারতাম, আর টাটকা টাটকা তখন মনেও পড়ত হয় ত টাকাটা কাকে দেওয়া হয়েচে।

তোমার লেখা খৎখানা আমার ভাগে পড়লেও কোন গোল হত না। কিন্তু ভাই আমার নাকি বড় গুণের ভাই—খৎগুলোর মধ্যে যেগুলোর মার নেই সেই গুলোই তিনি নিলেন বেছে। আর আমার ভাগে পড়ল যত সব আদায় না হওয়ার মত ছিল।

যাক্ সে সব কথা বলে আর লাভ নেই। বুঝতে পারচ আক্কেল-সেলামী আমার কম দিতে হচ্চে না। এই দুঃসময়ে এতগুলো টাকা অকারণে দেওয়া কি সহজ কথা—হাত খালি হয়ে যায় একেবারে। কিন্তু দেখচি আমার গোলমালেরই বরাৎ—ভাগের সময় বেশি গেল—ভাই বলে কিছু বলতে পারলাম না; আর এখনও যাচ্চে দফায় দফায় ছুতোয় নাতায়—এই দেখ না তোমার এই ব্যাপারটাই তার প্রমাণ।

কিন্তু সে যাই হোক, তোমার কোন ভাবনা নেই আর। গিরীশকে আমি টাকা দিয়ে দেব, কারণ সে আমার এমন ভাই নয় যে বুঝিয়ে বললে কথাটা বুঝবে। তোমার

সতীশ

শ্রীপ্রবোধ ঘোষ

বাঙালী যুবক ও নন্‌-কো-অপারেশন

—:০:—

শ্রীযুক্ত "সবুজপত্র" সম্পাদক

সমীপেষু

মহাশয়,

এই পাতা কয়টিতে আমাদের কয়েকটি বন্ধুর মনোভাব ব্যক্ত করলুম নন্‌-কো-অপারেশন সম্পর্কে। 'সবুজে' স্থান লাভের যোগ্য বিবেচিত হলে কৃতার্থ হব। ইতি

ঢাকা—১০,২,২১

নিবেদক

শ্রীঅমৃতকণ্ঠ চট্টোপাধ্যায়

তরুণ বাঙলার মনোবিকাশের ছন্দটার যদি কোথাও খোঁজ পাওয়া যায়, তবে সে 'সবুজের' পাতায়। অবশ্যি এ তরুণ শুধু তরুণ নয়, ভাবুকও। তরুণ বলে দাবী আমি করতে পারি, কিন্তু ভাবুক বলে দাবী করবার মত গাম্ভীর্য্য আমার যে নেই সে বিষয়ে শত্রু-মিত্র একমত। তাই পৌষের "সবুজপত্র"-এর বাঙালী যুবকদের

সাথে আমার মনের মিল দেখে ও মতের মিল খুঁজে না পেয়ে, আশ্চর্য্য হবেন না আশা করি।

নন-কো-অপারেশন প্রস্তাবটি কংগ্রেসে গৃহীত হবার আগে থেকে আজ পর্য্যন্ত একটা তুফান চলেছে,—কাজের চেয়ে কথার বেশি। তা'তে তলিয়ে গেছেন যেমন অনেক 'Rationalist'—পণ্ডিত মালবীয় ও জষ্টিস্ চৌধুরীর মত, হঠাৎ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছেনও তেমনি অনেক 'Nationalist'; তাঁদের উদ্ভিদ বলা যেতে পারে, কারণ ভুঁইফোঁড় বললে হয় ত কলেজ স্কোয়ারে 'সবুজের' জন্যে একটা অগ্নিকুণ্ড তৈরী হ'বে। মীমাংসাতে পৌঁছানো ত গেলই না বরং আজ মনে হচ্ছে যে সমস্যাটা আরো বেড়ে গিয়েছে, তার প্রমাণ বাঙলার ছাত্র-সমাজের ভূ-কম্পনটা। এইটেই বোধহয় যথেষ্ট প্রমাণ যে, বাঙালী ছেলেদের ভাবের ধারা ও পৌষের-বাঙালী যুবকদের ভাবের ধারায় মিল নেই মোটেই। আসলে কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই বেশ বুঝতে পারা যায় যে, দু'টির মাঝে তফাৎও খুব কম।

আজ যাঁরা নন-কো-অপারেশন-এ বিশ্বাস করছেন না, তাঁদের অনেকেই পনের বছর আগেকার বাঙলার অভিজ্ঞতাটাকে স্মরণ করে "ঘরে-বাইরে"র ভাষা আওড়িয়ে বলতে চান, "উত্তেজনার কড়া মদ খেয়ে দেশের কাজে লাগব না, সমস্ত দেশের ভৈরবী চক্রে মদের পাত্র নিয়েও আমরা বসে যাব না।" কথাটা যতই সত্য হোক্, এ কথাটাও তাঁদের ভাবা উচিত, উত্তেজনা থেকে সরতে সরতে তাঁরা কর্ম্মহীনতার মধ্যে এসে পড়েছেন কিনা। হৈ চৈ-এর ভিতরে ঝাঁপিয়ে পড়তে কাউকে বল্‌ছি নে, কিন্তু যেখানে টুঁ শব্দটিও

শোনা যায় না তেমনি স্থানে নিশ্চল ধ্যানে বসে থাকাটা যে আমাদের বদ্ধমূল জড়তার প্রকারভেদমাত্র, এ সন্দেহ হওয়াটাও খুব অস্বাভাবিক নয়। সন্দীপ হ'তে এবার কাউকেও ডাকা হয় নি, বরং নিখিলেশের আদর্শকেই এবার বরণ করা হ'য়েছে; তাই "ঘরে-বাইরে"র বুলি কপচানো খুব সুবিধেজনক নয়, বরং বিপজ্জনক ঢের বেশি। একশ' বছর ধরে এই বাঙালি জাতটা খেতে পায় না যিনি বলছেন, গ্রামের সঙ্গে তাঁ'র সত্যিকার সম্বন্ধ আছে বলে মনে হচ্ছে, তিনি বোধ হয় অস্বীকার করবেন না যে, এই জাতটা আরো একশ' বছর দিব্য আরামে এমনি না-খেয়েই চলে যাবে, খেতে পায় না এ জ্ঞানটাও এদের জন্মাবে না, যদি না এসে কেউ এদের বুঝিয়ে দেয় যে, এভাবে টিঁকে থাকাটাই মনুষ্যোচিত নয়। তাই ত "নন্-কো-অপারেশন"-এর দরকার। এতদিন গ্রাম ছেড়ে আমরা চলছিলুম City rabble নিয়ে খেলা করে, এবারকার "নন-কো-অপারেশন" বলছে "Back to village." তাই বুকের উপর দিয়ে স্পেশাল কংগ্রেসটা চলে গেলেও বাঙলার ছেলে সাড়া দেয় নি, দিলে নাগপুর কংগ্রেসের পর। অতীতে হয় ত "প্রকৃত দুঃখকে দূর করবার মোটেই চেষ্টা হয় নি"; কিন্তু একথা আজ আর খাটে না। আসলে Moderate বা Extremist-দের গাল দেওয়াও তেমনি একটা ফ্যাসান হয়ে দাঁড়াচ্ছে, উক্ত দল দু'টির "নানাছন্দে, নানা প্রকারে, গলা উঁচু নীচু করে সুর ধরা যেমনি একটা ফ্যাসান। লজিকের প্রতি যাঁর শ্রদ্ধা আছে তিনি স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হবেন না যে, অজন্মা দুর্ভিক্ষ ও অন্নাভাব আদি হাজার রকমের দুঃখের বোঝাকে উপরের ভগবান ও নিজের কপালের দোষ বলে মেনে নিয়ে যে লক্ষ লক্ষ লোক

দিন গুজরাচ্ছে, তাদের কল্যাণের কোনো ব্যবস্থা করতে হলেই গ্রামে ফিরতে হবে। এবং এই গ্রামে ফেরাটাই নন-কো-অপারেশন-এর একটি অঙ্গ।

(২)

বাঙলা যে অন্যান্য প্রদেশগুলো থেকে পনের বছর এগিয়ে চলছে তার কারণ বাঙালার 'কালচার'। এই 'কালচার'টি তার বিদেশী শিক্ষার মারফত পাওয়া বলে দুঃখ নেই মোটেই, বরং গর্ব্ব আছে। অন্য প্রদেশ যাই বলুক না কেন, আমরা জানি, বিদেশী সভ্যতার অমৃত উপচে গিয়ে গরলই কেবল আমাদের ভাগ্যে ওঠে নি ;—সতীদাহের মত সংস্কারগুলোও যার প্রসাদে ঝরে পড়েছে। কিন্তু আমাদের এই 'কালচার'-এর সাথে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের যোগাযোগ যে কতটা "সবুজ-পত্র"-এর পাতাতেই অনেকবার তার পরিচয় পেয়েছি। M. Sylvian Levy জগতের দোরে আমাদের একটু ভাল সম্বর্দ্ধনার দাবী করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের নাম পেয়েছেন, কিন্তু বাঙলার বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কাছে বাঙলার কবি কেমনতর পূজা পেয়েছেন তা' কারো অজানা নেই ; বিশ্ববিদ্যালয়েরও তা'র জন্যে এক কণা আপ্‌শোষ নেই। তাই, কাল্‌চারের দোহাই দিয়ে যাঁরা লেখা-পড়া ছাড়তে নারাজ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁদের ক্ষেত্রে যে নয় বেশ বলা যেতে পারে, এবং তাদের জন্যে শান্তিনিকেতনের "বিশ্বভারতীর" দিকে আঙুল দেখিয়ে দিলেও খুব বেশি বেয়াদবী হবে না।

তলিয়ে দেখলে দেখতে পাই, আমাদের কাল্‌চারই আমাদের ভারতীয় ইংরেজের সাথে সমস্ত সম্পর্ক ছিঁড়ে ফেলতে বলছে। রবীন্দ্রনাথের সমস্ত সঙ্গীতের ভিতর দিয়ে একটা মৈত্রীর রাগিণী বেজে উঠ্‌ছে; কিন্তু সে মৈত্রীর ভিত্তিই হল সাম্য। তাই, "আবেদন আর নিবেদন"-এর পালা সাঙ্গ করে আজ যদি বাঙালী হঠাৎ পিছন ফিরে দাঁড়ায়, তা' হলে বলতে হবে যে বাঙালায় কবির গানগুলো 'কানের ভিতরে' যায় নি শুধু, একেবারে গিয়ে 'মরমে পশেছে।' তাই, 'নন-কো-অপারেশন'-এ আমরা 'বয়ে' যাচ্ছি একথা যাঁরা বলতে চান, তাঁরা ভুলে যান যে, ঘর ছেড়ে ঘরের দিকে ফেরবার নাম বয়ে যাওয়া নয়।

অবশ্যি একথা ঠিক যে, উগ্র স্বাদেশিকতায় কেউ-কেউ মেতে উঠবেন বিদেশকে সকল রকমে বয়কট করবার জন্যে। আসলে তাঁরা fanatics. তাঁদের বেশির ভাগই হবে গেঁয়ে বামুন, ইংরেজী হরপের সাথে যাঁদের পরিচয় হয় নি; অর্থাৎ—যাঁরা 'এরোপ্লেন' যে পুষ্পকরথের নূতন সংস্করণ এ তত্ত্বটি আবিষ্কার করেছেন, তাঁরা এখনো গ্রামে বেশ সচ্ছন্দে আছেন, তাঁদের হাত থেকে মুক্তি দেবার জন্যেও গ্রামে আমাদের যুবকদের দরকার। বাঙালী যুবকের দল বেশ জানে, লাঙ্কেশায়েরের কলের চিমনিগুলোর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদা আমাদের কৃতিত্বের চিহ্ন হতে পারে, কিন্তু অক্সফোর্ড ও ক্যাম্ব্রিজের দিকে পিছন ফেরা আমাদের সৌভাগ্যের কথা নয়। ইংরেজের অন্তরে যে Mammon আছে তাকে আমরা পায়ে ঠেলতে পারি, কিন্তু তাঁর বুক জুড়ে আছে যে Ulysses, তাঁর কাছে আমাদের মতি করতেই হবে।

(৩)

যাঁরা আমাদের সামাজিক ত্রুটিগুলোর দিকে দেখিয়ে আজ বলতে চান, "নিজের ঘর ঝাঁট দাও," তাঁরা বলছেন সত্যিকথা, কিন্তু দেখছেন না যে বাইরে থেকে ঘর ঝাঁট দেওয়া চলে না। ঘরে আমাদের জঞ্জাল জমা হয়েছে অনেক; কিন্তু তাদের তাড়াতে হলে গ্রামে ফেরা ছাড়া আর কোনো পথ নেই। এতদিন পর্য্যন্ত আমাদের সমাজ-সংস্কারের আর রাজনৈতিক অধিকারলাভের চেষ্টা-দু'টির মাঝে যে সম্পর্কটি ছিল তা ঠিক অহি-নকুলের সমান না হোক, কাছাকাছি গিয়েছিল। "নন্-কো-অপারেশন"-এর এবারকার প্রোগ্রামটি নদীর দু'টি পাড় জুড়ে দিয়েছে একটি সেতুতে। অতীতের আর আর রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে "নন্-কো-অপারেশন"-এর শ্রেষ্ঠতাই এখানে। "স্বরাজ" লাভের আশায় একদিকে যেমন আমরা জীবনপণ করে লাগব, আর দিকে তেমনি হাতুড়ি নিয়ে দাঁড়াব কুসংস্কারের বেড়ী ভাঙতে। একদিকে যেমন ভাষাহীন লক্ষ মানুষকে জানিয়ে দিতে হবে বিদেশী শাসনের লাঞ্ছনা আর গঞ্জনা, আর দিকে তেমনি উদ্বুদ্ধ করে তুলতে হবে আমাদের লক্ষ লক্ষ 'অস্পৃশ্যদের' আর তাদেরি সামিল সমগ্র ভারতের নারীদের, সাম্য ও স্বাধীনতার বাণীতে 'মানুষের অধিকার' দাবী করবার জন্য। এ বিষয়ে দু'মত নেই।

'Anonymous Russia-র দিকে ফেরাই একমাত্র পন্থা বলে Turgeniv তাঁর "Virgin Soil"-এ নির্দ্দেশ করেছেন। 'সাত সমুদ্র তেরো নদীর' তফাৎ থাকলেও সেদিনকার রাশিয়ার সাথে

আজকার ভারতবর্ষের তফাৎ বড় বেশি নয়;—কথাটা আমাদের সম্বন্ধেও বেশ খাটে। "নন্ কো-অপারেশন" সেই 'Anonymous India'-র দিকে ফেরার ডাক।

ছাত্র 'নন্-কো-অপারেটার'

মন্তব্য—

এ চিঠিখানি আমি অত্যন্ত আহ্লাদের সঙ্গে প্রকাশ করছি, কেননা যে সকল যুবক নন্-কো-অপারেশন-ব্রত গ্রহণ করেছেন তাঁরা ও-ব্যাপারটি কি ভাবে বুঝেছেন তার পরিচয় এ পত্রে পাওয়া যায়।

লেখক ঠিকই বলেছেন। পৌষের সবুজপত্রে যেক'টি বাঙালী যুবকের পত্র প্রকাশিত হয়েছে তাঁদের সঙ্গে লেখক এবং তাঁর বন্ধুবর্গের সঙ্গে ষোলআনা মনের মিল আছে—পরস্পরের ভিতর যা-কিছু প্রভেদ আছে—সে মতের।

বলা বাহুল্য যে, মতের চাইতে মনের-মূল্য ঢের বেশি। মত মানুষের দু'বেলা বদলাতে পারে, কেননা ও-বস্তুর অস্তিত্ব মানুষের জ্ঞান ও বিচারবুদ্ধির উপর নির্ভর করে। মত একদিনে গড়া যায় একদিনে ভাঙা যায়, কিন্তু মন জিনিসটি মতের চাইতে ঢের বেশি টেঁকসই অতএব নির্ভরযোগ্য। সুতরাং আমার এ অনুমান যদি সত্য হয় যে, এ যুগের বাঙালী-যুবকের ভাবের ধারা যুগপৎ উদারতা ও গভীরতা লাভ করেছে, তাহলে তার চাইতে আর আনন্দের কথা কি হতে পারে। আর আমার অনুমান যে অসঙ্গত নয়, এ পত্রও তার অন্যতম প্রমাণ।

পত্রলেখক বলেছেন যে, তাঁর সঙ্গে পূর্ব্বোল্লিখিত যুবকদের মতের অমিলও সম্ভবত খুব কম। তাঁর এ কথাও ঠিক। তাঁর সঙ্গে অপর তিনজনের প্রভেদ এইমাত্র যে, তিনি নন-কো-অপারেশন সম্বন্ধে মত স্থির করেছেন, অপর কজন

আজও তা করে উঠতে পারেন নি। কিন্তু লেখক নন-কো-অপারেশনের যা অর্থ করেছেন সে অর্থে উক্ত মত গ্রাহ্য করতে বোধ হয় অপর ক'জন তিলমাত্রও দ্বিধা করবেন না। নিজের ঘর ঝাঁট দিতে হলে যে ঘরে ঢোকা দরকার এ-বিষয়ে বোধ হয় মতভেদ নেই।

সে যাইহোক্, নন-কো-অপারেশনের অর্থ যদি হয় জনসেবা তাহলে তার বিরুদ্ধে একটি কথাও বলবার নেই।

দেশ-উদ্ধারের যে প্রথম ও প্রধান উপায় হচ্ছে দেশের পতিত-উদ্ধার, এ মত সবুজপত্র-এ বহুবার প্রকাশিত হয়েছে; সুতরাং দেশের যুবক-সম্প্রদায় যে সেই পতিত-উদ্ধারের ব্রত সোৎসাহে অবলম্বন করছেন এ আমাদের কাছে নিতান্তই আনন্দের বিষয়। আশা করি যে, যাঁরা এ কার্য্যে ব্রতী হচ্ছেন তাঁদের এ জ্ঞান আছে যে জনগণের আর্থিক সামাজিক ও মানসিক উন্নতি সাধনের কোন সহজ উপায় নেই, এবং কোন কার্য্যে সফল হবার জন্য সদিচ্ছাই একমাত্র সম্বল নয়। আমার একথা শুনে কেউ যেন মনে না করেন যে, আমি আমাদের যুবক-সম্প্রদায়কে এই লোকহিত-ব্রত থেকে নিবৃত্ত করতে চাচ্ছি। তাঁদের এই নব-চেষ্টার ফলে তাঁরা দেশের দুর্দ্দশার problem-টার সমাধান করতে পারুন আর নাই পারুন—problem-টা যে কি তা তাঁরা জানতে ও বুঝতে পারবেন। এ-ও ত একটা মহালাভ। আমাদের শিক্ষিত-সম্প্রদায় যে-জ্ঞানটি হারিয়ে বসে আছেন সে হচ্ছে reality-র জ্ঞান। এই village organisation-সূত্রে আমাদের যুবক-সম্প্রদায় সেই reality-র সাক্ষাৎ পরিচয় লাভ করবে, যার সঙ্গে আমাদের পলিটিক্যাল বক্তাদের ভাসুর-ভাদ্রবধূর সম্পর্ক।

এ সম্বন্ধে আমার আর একটি মাত্র বক্তব্য আছে। বাঙালীর হাতে পড়ে কংগ্রেসি নন-কো-অপারেশনের খোল নইচে দুই-ই বদলে গিয়েছে। কংগ্রেসের প্রস্তাবে village organisation-এর নাম-গন্ধ ও নেই। কলিকাতা থেকে নাগপুরে বদলি হয়ে কংগ্রেস নূতনের মধ্যে এইটুকু করেছেন যে, "স্বরাজ"-বিশেষ্যকে, democratic বিশেষণের স্পর্শমুক্ত করেছেন। শ্রীযুক্ত

চিত্তরঞ্জন দাশ-প্রমুখ বাঙলা পলিটিক্সের মুখপাত্রেরা বহুচেষ্টাতেও উক্ত democratic শব্দটিকে কংগ্রেসী-স্বরাজের সঙ্গে এক পংক্তিতে বসাতে পারেন নি। যাঁদের কাছে demos অস্পৃশ্য তাঁদের কাছে democratic শব্দ গ্রাহ্য হওয়া অসম্ভব। আশা করি আমাদের নন-কো-অপারেশনে যুবক-সম্প্রদায় এ উভয়কেই জাতে তুলে নিতে কৃতকার্য্য হবেন।

সম্পাদক

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ও যুগসাহিত্য

—:০:—

পৌরাণিক যুগের সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের এবং লোকাচারের সুনির্দ্দিষ্ট বিধি-নিষেধের মধ্যে যখন আমাদের জীবন অতিবাহিত হত, তখন প্রকৃতিকে আমরা ভাববিহ্বলচিত্তে দেখতুম,, এখন সে দিক্‌ হতে না দেখে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে অভিব্যক্তির দিক হতে দেখে থাকি। ভক্তির চন্দনপ্রলেপে এবং কুসুমঅর্ঘ্যে স্ব-এর-অধীন জ্ঞানপথ পৌরাণিক যুগে আচ্ছন্ন হয়ে এক রকম অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল; ধূপ ধুনোর গাঢ় বাষ্প ভেদ করে দেবতাকে দেখবার আশা অবিজ্ঞ জনসাধারণের ত্যাগ করতে হয়েছিল; পুরোহিতের পিছন থেকে মন্দিরের দ্বারদেশ হতেই দেবতার উদ্দেশে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করেই তখন তাঁদের তৃপ্ত থাকতে হত।

কিন্তু ছাঁচে-ঢালা ব্যবহারের-জন্য-প্রস্তুতরূপে সত্যদেবতাকে জগতে কোথাও পাওয়া যায় না; জগতে আমরা তাঁর প্রকাশই দেখতে পাই, সত্য নানা রূপে জগতে দিন দিন এইরূপেই অভিব্যক্ত হচ্ছেন। প্রকৃতিকে বিশ্বাত্মার অনন্ত আকাঙ্ক্ষার অভিব্যক্ত মূর্ত্তিও বলা যেতে পারে।

সেই জন্য সাহিত্যে, অন্তঃপ্রকৃতিকেও আমরা এখন অন্য দিক হতে দেখি। এখানে দেখতে পাই, প্রাণশক্তি মনের অজানা দেশ হতে উদ্‌ভাসিত হয় এক একটি বিশেষ বিশেষ আকাঙ্ক্ষায়, এক একটি প্রবৃত্তির বিদ্যুচ্ছটায়। জীবন, এইরূপে মহাকাব্যের ন্যায়, অধ্যায়ে অধ্যায়ে

প্রকাশিত হয়। আকাঙ্খার স্ফুরণে আমরা এখন আর বিমূঢ় হই নে বিস্মিত হই নে শঙ্কিত হই নে, বরং তার মধ্যে আমরা বিশ্বজনীন আত্মাকে জানবার এবং লাভ করবার চেষ্টা করি। এই বিশ্বাসও আমাদের দৃঢ় হয়েচে যে, সে শক্তির মূলে সত্য আছে। চিৎ-শক্তির দ্বারা হৃদয়ের আকাঙ্খাসকল পরিচালনা করতে পারলে তারা সমাজের অনিষ্ট না করে হিতসাধন করেই তাদের অন্তঃনিগূঢ় সত্য প্রমাণ করবে।

প্রকৃতির এই সত্য আমরা বিশেষভাবে পেয়েচি শ্রীরবীন্দ্রনাথের আজীবন সাহিত্যের সাধনায়। তিনি মনোজগতের কি অসংখ্য শক্তিই না আবিষ্কার করচেন এবং তাদের চিৎশক্তির দ্বারা পরিচালিত করে আমাদের জীবন গঠন করচেন, এই জন্যই আমরা তাঁকে যুগ-কবি বল্‌তে পারি।

(২)

শ্রীরবীন্দ্রনাথের জীবনকে তিন অঙ্কে লিখিত একখানি অপূর্ব্ব নাটক বলা যেতে পারে। প্রথম অঙ্ক শেষ হয়েচে "ক্ষণিকায়"। এই সময় দেখতে পাই তিনি ব্যক্তিগত সীমার মধ্যে আপন অন্তরের নিকুঞ্জছায়ায় একটি আত্মগত মনের বিচিত্র আকাঙ্খার উত্থান পতন নির্ণিমেষ নেত্রে দেখছেন এবং কবিতায় গল্পে উপন্যাসে নাটকে গানে তাদের বিচিত্র গতির ইতিহাস লিখে রাখছেন। কি বৈচিত্র্যপূর্ণ এই বিশিষ্ট মনের বিকাশ এবং সেই মনটিই বা কি বিশাল! একদিকে বাস্তবজীবনকে তার সত্য আকারে সত্য বর্ণে দেখবার অশ্রান্ত চেষ্টা, অন্যদিকে তাই আবার বাক্য-মনের অতীত অসীমের

বিপুল প্রাণ-প্রবাহে আনন্দহিল্লোলে হিল্লোলিত করে তোলা। একদিকে প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য সভ্যতার সকল মহৎ ভাবের জন্য হৃদয় উন্মুক্ত, অন্যদিকে হৃদয়তন্ত্রী গানে গানে ঝঙ্কৃত।

"এবার ফিরাও মোরে" কবিতায় দেখতে পাই, কবি অন্তরের নির্জনতা হতে বের হয়ে বাঙলার কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করবার জন্য চঞ্চল হয়েছেন; ক্ষণিকার পর যৌবন তরীকে বিদায় দিয়ে কবি কল্যাণের আদর্শ নিয়ে বাঙলার কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করলেন, দ্বিতীয় অঙ্কের আরম্ভ এইখানে।

এই প্রবন্ধে আমরা তাঁর দ্বিতীয় অঙ্কের সামাজিক ভাবেরই আলোচনা করব। এবং দেখব যে, যখন তিনি বাঙলার এবং ভারতবর্ষের কর্ম্মক্ষেত্রে জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তিতে দণ্ডায়মান তখনই তাঁর অলক্ষ্যে দিব্যশক্তির অনুপ্রেরণায় তিনি তৃতীয় অঙ্কের জন্য প্রস্তুত হয়েছেন। এখন তিনি প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন—বিশ্বমানবের মিলন ঘটিয়ে তুলবার জন্য।

(৩)

তিনি যখন কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেন তখন "উদ্বেলিত পশ্চিম সমুদ্রের উদ্গীর্ণ ফেনরাশি"তে বাঙলা এবং ভারতবর্ষ আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল, শস্যশ্যামলা সোনার বাঙলার এবং ঐশ্বর্য্যশালিনী ভারত-মাতার অসহায় সন্তানগণের উদরের অন্ন ক্রমশই দুর্ল্লভ হয়ে উঠছিল, দুর্ভিক্ষে এবং মহামারীতে ভারতবাসী কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিল, মহারাণীর ঘোষণাপত্রে বিশ্বাস, ইংরাজি ভাষায় বাকপটু শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের অন্তরেও শিথিল হয়ে আসছিল এবং গবর্ণমেণ্টের

মাঝে মাঝে অনাত্মীয় আচরণে তাঁদের এই উপলব্ধি হচ্ছিল যে, খৃষ্টের ধর্ম্ম কিম্বা মিল বেন্থামের দর্শনে শাদায় কালোয় ভেদ না থাকলেও, খৃষ্টান-ইংরাজের আচরণে স্পষ্টই এবং প্রত্যহই সে ভেদ দেখা যায়। তখন এশিয়া এবং আফ্রিকার দুর্ব্বল জাতিগণকে গ্রাস করবার চেষ্টায় য়ুরোপের প্রবল জাতিগণের মধ্যে প্রতিযোগীতা আরম্ভ হয়েছিল; তখন প্রাচ্যের সহিত প্রতীচ্যের দ্বন্দ্ব তীব্র হয়ে উঠছিল, আমাদের বিশিষ্টতা রক্ষা করতে সমর্থ এমন কোন প্রবল ক্ষাত্র শক্তি না থাকাতে আমাদের এই আশঙ্কা প্রতিদিনই বাড়ছিল যে, য়ুরোপ বুঝি বা আমাদের অস্তিত্ব পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত করে দেয়।

শ্রীরবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি যদিও, যে সকল উপাদানে গঠিত, তাতে ললিত-কলার প্রতি অনুরাগই সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল; কিন্তু আমাদের জীবনের এই সত্য ঘটনাটি তাঁকে তাঁর অন্তরের নিকুঞ্জছায়ায় শান্তিতে বীণাপাণির সেবা করতে দেয় নি; বাস্তব জীবন, সংসার, সমাজ, ধর্ম্ম নিয়ে প্রতি দিনের প্রত্যক্ষ জীবন;—অপমান, অনাহার, শত লাঞ্ছনা নিয়ে যে ত্রাসরুদ্ধ জীবন তা কবির চিত্তকে আঘাত করেছিল, মথিত করেছিল, তাঁর কল্যাণ-প্রথিষ্ট ইচ্ছা-শক্তিকে ত্যাগ-শক্তিকে উদ্বোধিত করেছিল। সংসারের লাভ ক্ষতির দিকে, মান অপমানের দিকে, রাজশক্তির সন্তোষ অসন্তোষের দিকে দৃক্‌পাত না করে "ওঁ পিতা নোঽসি" অঙ্কিত ধ্বজা নির্ভয়চিত্তে, আনন্দমনে বহন করে তিনি কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেছিলেন।

"তোমার পতাকা যারে দাও, তারে বহিবারে দাও শকতি,
তোমার সেবার মহান দুঃখ সহিবারে দাও ভকতি।"

ইহাই হয়েছিল সাধকের মূল মন্ত্র।

বঙ্কিমচন্দ্রের যে ‘বঙ্গদর্শন’ এক সময়ে আমাদিগকে বাঙলা সাহিত্যে অনুরাগী করেছিল, সেই ‘বঙ্গদর্শন’ নব-পর্য্যায়ে তাঁর সম্পাদকত্বে পুনরায় প্রকাশিত হল। ইংরাজের শাসনে এবং ঘরে-বসে-পাওয়া পাশ্চাত্য ভাবের উপদ্রবে আমাদের জীবন একটা অস্পষ্ট কিম্ভুতকিমাকার মূর্ত্তি ধারণ করেছিল—শ্রীরবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবে আমাদের হৃদয়ের আবেগসকল সুস্পষ্ট আকারে প্রকাশ হতে আরম্ভ হল। আমাদের জীবনের লক্ষ্য কি, না জেনে আমাদের patriot-গণ কংগ্রেসে বক্তৃতা দিতেন, সাহিত্যিক গ্রন্থ রচনা করতেন, ধর্ম্ম এবং সমাজ সংস্কারকগণ ভারতের উদ্ধারের আশা নেই মনে করে হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়, (যেখানে একমাত্র মাতৃভাষা ভিন্ন সকলই শিখান হয়) বিশৃঙ্খলভাবে পাশ্চাত্য সাহিত্য দর্শন কণ্ঠস্থ করবার আমাদের শক্তি পরীক্ষা করতেন।

এ অবস্থায় একমাত্র সাহিত্যের সাহায্যেই শ্রীরবীন্দ্রনাথকে আমাদের জীবন গঠন করতে হয়েছিল। আত্মশক্তির এ কি অলৌকিক উন্মেষ!

(৪)

যে সকল বাইরের ঘটনা সে সময়ে ঘটেছিল, তার মধ্যে ‘সম্রাট-নায়েব’ লর্ড কার্জনের রাজনীতি, তাঁর দিল্লীর দরবার এবং বঙ্গ-বিভাগই বাঙালীর এবং ভারতবাসীর অন্তরে সর্ব্বাধিক আঘাত দিয়ে-

ছিল। কিন্তু কবি দ্বিধা-বিভক্ত বাঙালীর মুমূর্ষু চিত্তকে আনন্দে সঞ্জীবিত এবং শতধা বিভক্ত বাঙালী মনকে—

"একবার তোরা মা বলিয়া ডাক্"

মন্ত্রে দীক্ষিত করে একই ভাববন্ধনে বাঁধতে সমর্থ হয়েছিলেন।

"বাঙালীর পণ বাঙালীর আশা, বাঙালীর কাজ বাঙালীর ভাষা,
সত্য হউক্ সত্য হউক্ সত্য হউক্ হে ভগবান।"

এই প্রার্থনার আনন্দে সঞ্জীবিত করতে পেরেছিলেন। আমাদের অস্পষ্ট জীবন এই রূপেই তাঁর দ্বারা স্পষ্ট মূর্ত্তি ধারণ করেছিল।

যে জগৎ আমাদের অন্তরে বাহিরে রয়েচে তা একদিকে যেমন দেশ এবং কালের দ্বারা সীমাবদ্ধ, অন্যদিকে বিরাট প্রাণশক্তি জড়ের বাধা ভেদ করে অভিব্যক্ত হতে হচ্চে বলে সেই জগতে দ্বন্দ্বের অন্ত নেই। মানুষকেও প্রতিদিন অগ্রসর হতে হচ্চে দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়ে, তার বিশ্বাস দৃঢ়, চরিত্র বলবান হচ্চে শক্তির সংঘর্ষণ সহ্য করবার সামর্থ্যে। একদিকে ছোট ছোট আত্মসুখান্বেষিনী প্রবৃত্তিগুলি মানুষকে পারিবারিক গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখবার চেষ্টা অবিরাম করে থাকে, অন্যদিকে এ-ও সত্য যে, মানুষের প্রকৃতিতেই এমন এক পুরুষ নিত্য বিরাজ করছেন, যার জন্য সে মনুষ্যত্ব লাভ করে মহৎ হতে ব্যাকুল হয়। শ্রীরবীন্দ্রনাথ আমাদের সেই আত্মাকে আহ্বান করেছিলেন তার জ্যোতির্ম্ময়ী প্রতিভায়।

"রাজা তুমি নহ, হে মহাতাপস, তুমিই প্রাণের প্রিয়!
ভিক্ষা-ভূষণ ফেলিয়া পরিব তোমারি উত্তরীয়।"

"যে জীবন ছিল তব তপোবনে, যে জীবন ছিল তব রাজাসনে,
মুক্ত দীপ্ত সে মহা জীবনে চিত্ত ভরিয়া লব
মৃত্যু তারণ শঙ্কা হরণ দাও সে মন্ত্র তব।"

সমাজের কল্যাণ এবং আত্মার কল্যাণ বিষয়ে তাঁর চেতনা সকল সময়েই জাগ্রত ছিল বলে তিনি প্রকৃতি-রাজ্যে দ্বন্দ্ব অবশ্যাম্ভাবী জেনেও কল্যাণ-ভ্রষ্ট হন নি। তাঁর সামাজিক প্রবন্ধে, "চোখের বালি," "নৌকাডুবি" প্রভৃতি উপন্যাসে একদিকে সেইজন্য দেখা যায় অসংখ্য ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে কল্যাণের অভিব্যক্তি, অন্যদিকে তাঁর গানে উপলব্ধি করি তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনের আনন্দ। শ্রীরবীন্দ্রনাথ কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেও দেশ কালের সীমার মধ্যে তাঁর আত্মাকে আবদ্ধ রাখতে পারেন নি; কর্ম্মজীবন এবং আধ্যাত্মিক জীবন, এই দুটি ধারা পরস্পরকে ঘাত প্রতিঘাতের দ্বারা অভিব্যক্ত করতে করতে তাঁরই দিকে চলেছিলেন যিনি শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্। কোনো দেশাচারের কিম্বা সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের আক্ষরিক আনুগত্যে পরিচালিত হয়ে নয়, একমাত্র অন্তর্য্যামিনী চিৎশক্তির দ্বারাই তিনি হৃদয়ের বিচিত্র শক্তিসকল পরিচালনা করেছিলেন। ইহাকেই আমরা যথার্থ স্ব-এর অধীনতা বলতে পারি। এবং সামাজিক জীবনের মধ্যে আত্মার এই স্বাধীনতার উপলব্ধিই তাঁকে বিশ্ব-বরেণ্য করেচে। আমাদের সাধনা সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের এবং ভৌগলিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ না হয়ে বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে ব্যাপ্ত হয়েচে।

(৫)

সাহিত্যই হোক, বিজ্ঞানই হোক, আর ধর্ম্মই হোক—জাতির

সর্ব্বজনীন চেতনা এবং উপলব্ধির মধ্যে যার প্রতিষ্ঠা নেই, তা কখনই স্থায়ী হতে পারে না, কল্যাণকরও নয়।

নবযুগের বাঙালী-সভ্যতা জন্ম গ্রহণ করেচে একটি পবিত্র আধ্যাত্মিক তৃষ্ণায়—রামমোহন যাকে বিবেক এবং বৈরাগ্যে দীক্ষিত করেছিলেন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁকে স্নেহময় ক্রোড়ে লালন পালন করেছিলেন। যুগ-কবি সেই সময়েই ভূমিষ্ট হন যখন হিমালয়ে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করছিলেন, যখন তাঁর আত্মা ব্রহ্মোপলব্ধির দিব্য জ্যোতিতে উদ্ভাসিত।

নবযুগের বাঙালী-সভ্যতা শ্রীরবীন্দ্রনাথের প্রাণশক্তিতে প্রতিভায় যৌবন লাভ করে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেচে। কি এক সুদূর আশার পানে প্রহরের পর প্রহর অনিমেষ নেত্রে চেয়ে আছে, প্রাণের প্রতি নিশ্বাসে, কামনার প্রতি লহরে ইহা সেই সুদূরের পানেই যুগ-কবির অধিনায়কত্বে চলেচে, ইহা একদিকে নানা রসসম্ভোগের আকাঙ্খায় চঞ্চল, জগতে দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে দৃঢ়সঙ্কল্প, অন্যদিকে—

"ঘাটে বসে আছি আনমনা।"

বলে জীবনসমুদ্রের এ তীরে একা বসে আছে।

"সে বাতাসে তরী ভাসাব না
যাহা তোমা পানে নাহি বয়।"

ইহাই এই অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ যুবকের সঙ্কল্প। এ সঙ্কল্প যুগ-কবিই বাঙালী সভ্যতাকে দিয়েছেন এবং তার উপর বিশ্বাত্মার শীলমোহরও স্পষ্ট পাঠ করা যাচ্চে।

কিন্তু এর পথ কুসুমাস্তৃত নয়। একে প্রতিপদ অগ্রসর হতে হচ্চে তিন তিন্‌টা শক্তির সহিত সংগ্রাম করে। প্রথম সংগ্রাম করতে হচ্চে, এবং জয়ী হয়ে আত্মসাৎ করে নিতে হচ্চে পৌরাণিক যুগের সমাজশাসনযন্ত্রটিকে। দ্বিতীয়, আস্তিক্যবোধহীন "কয়েকজন শিক্ষাচঞ্চল যুবক যারা বিলাসে, অবিশ্বাসে, অনাচারে, অনুকরণে" ভারতবর্ষের সনাতন প্রকৃতি হতে বিচ্যুত হওয়াতে, তাদের "চরিত্র ভগ্ন বিকীর্ণ, তাদের চিত্ত বিক্ষিপ্ত এবং তাদের চেষ্টা ব্যর্থ"। তৃতীয়, ভারতবর্ষের, কি দেহ কি আত্মার সহিত লেশমাত্র নাড়ির যোগ নেই যে ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট তার সঙ্গে।

যে যন্ত্রের দ্বারা পৌরাণিক যুগে সমাজ শাসিত হত, সেই যন্ত্র এখন আমাদের স্বার্থের অনুকূল নয়, এইজন্য যে তা অপেক্ষাও একটি প্রবলতর যন্ত্রের, শক্তিশালী জাতির এবং সভ্যতার সহিত আমাদের প্রতিযোগিতা বেধে গেছে। আমাদের আত্মবোধ যে মাঝে মাঝে জেগে আবার ঘুমিয়ে পড়ে, তার কারণ আমরা নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত। ভারতবর্ষের নানা সম্প্রদায় বহুদিনের অভ্যাসে নানা সঙ্কীর্ণ পথ ধরে চলেছেন, নবযুগের আদর্শ এরা এখনো গ্রহণ করে জাতিভেদের প্রাচীর ভেঙে ফেল্‌তে সাহস করছেন না, সমাজের নারী-শক্তিকে এখনো বৃহত্তর কর্ম্মক্ষেত্রে কল্যাণসাধন করবার স্বাধীনতা, গুণ এবং কর্ম্মের বিচার দ্বারা মানুষের প্রাপ্য মর্য্যাদা মানুষকে দিচ্ছেন না। এইজন্যই এ যন্ত্র স্বার্থের, আত্মরক্ষার অনুকূল নয়।

তারপর "শিক্ষাচঞ্চল যুবক"-সম্প্রদায়, যারা বিশ্বের অমিত্র ঋষির প্রলোভনে মুগ্ধ হয়ে ত্রিশঙ্কুর মত শূন্য অবস্থান করছেন এবং সকল প্রকার মহৎ ভাবকে অশ্রদ্ধার চোখে দেখে থাকেন, আত্মশক্তিতে

বিশ্বাস নেই ; কেবল সুযোগের অপেক্ষায় কাতরনেত্রে বিশ্বের অমিত্র ঋষির পানে শূন্যে হতে চেয়ে আছেন।

রাজশক্তির সহিত সমাজের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ। রাজাই সমাজের প্রাণ অর্থ জ্ঞান শক্তি প্রতিভা রক্ষা করেন, কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষের অবস্থা ইতিহাসের একটা প্রহেলিকা। সমাজের স্বার্থ এবং বিশিষ্টতা রাজশক্তিই রক্ষা করেন। কিন্তু রাজশক্তির সহিত ভারতের নাড়ির যোগ যে আছে, এ কথা কেউ বলতে পারেন না ; হৃদয়ের যোগ, ভারতের স্বার্থরক্ষা করবার জন্য চির জাগ্রত ইচ্ছা, যুগ-কবি শ্রীরবীন্দ্রনাথও সকল সময়ে দেখতে পান নি।

এই সকল শক্তির নিত্য সংঘর্ষণের ভিতর দিয়ে যুগ-কবিকে অগ্রসর হতে হয়েছিল এবং এখনও হচ্চে—শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম-এর দিকে। এইজন্য তাঁর প্রকৃতি স্বভাবতই কবির রসতন্ময়, ভাব-বিহ্বল প্রকৃতি হলেও, কর্ম্মজীবনের ঘাত প্রতিঘাতের চিত্র এই সময়ের সাহিত্যে যে পরিমাণে প্রতিবিম্বিত হয়েচে, ভাব-রস-বিহ্বলতা তত নয়। তাঁর প্রতিভায় এমন একটি গদ্য সাহিত্যের আবির্ভাব হল যার মধ্যে আছে একদিকে প্রাচ্যের আস্তিক্য-বোধ, অন্যদিকে প্রতীচ্যের বৈজ্ঞানিক বিচারপ্রণালী ; একদিকে আমাদের প্রকৃতিগত ভাবপ্রবণতা, অন্যদিকে কর্ম্মীর কর্ম্মকুশলতা। একদিকে ছন্দের গতি-বৈচিত্র্য, অন্যদিকে গদ্যের গাম্ভীর্য্য পাশাপাশি নয়, একই কালে অখণ্ডভাবে দেখা যায়।

তখন কেউ কেউ আশঙ্কা করেছিলেন যে, তিনি বুঝি বাঙলা এবং ভারতবর্ষকে পৌরাণিক যুগের কোনো একটি ছাঁচে ঢেলে গড়বার সঙ্কল্প করেছেন। "স্বদেশী সমাজ" পাঠ করে অনেকের মনে এইরূপ

আশা হয়েছিল; কিন্তু প্রতিভার দৃষ্টি সম্মুখে, মানুষের চক্ষু তার কপোলের অস্থিতে, পশ্চাৎভাগের মস্তিষ্কের খুলিতে নয়;—প্রতিভা সৃজন করে, নকল করে না।

যুগ-কবির কর্ম্মজীবনের সহিত বোলপুরের "শান্তি-নিকেতন"-এর সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ট। নিশ্চিন্ত মনে, সুস্থদেহে, পারিবারিক জীবনের শান্তি এবং আনন্দ ভোগ করবার সৌভাগ্য হতে তিনি যতই বঞ্চিত হচ্ছিলেন, "প্রয়োজনহীন বিপুল রিক্ততার মাঝখানে স্নিগ্ধচ্ছায় আশ্রম"টি এবং তার স্নেহময়ক্রোড়ে "বিদ্যালয়"টি ততই প্রিয় হয়ে উঠেছিল।

আমাদের সনাতন আদর্শটি কি?—কেবলমাত্র নিয়ম পালন নয়। সে ত একটা বাইরের ঘটনা। "নব বর্ষ" প্রবন্ধে সাধক বলছেন, "কর্ম্মের চতুর্দ্দিকে অবকাশ, চাঞ্চল্যকে ধ্রুবশান্তির দ্বারা মণ্ডিত করে রাখা, প্রকৃতির চির নবীনতার ইহাই রহস্য।"......"সকল জাতির স্বভাবগত আদর্শ এক নয়, তাহা লইয়া ক্ষোভ করিবার প্রয়োজন দেখি না। ভারতবর্ষ মানুষকে লঙ্ঘন করিয়া কর্ম্মকে বড় করিয়া তোলে নাই। ফলাকাঙ্ক্ষাহীন কর্ম্মকে মাহাত্ম্য দিয়া সে বস্তুত কর্ম্মকে সংযত করিয়া লইয়াছে। ফলের আকাঙ্ক্ষা উপ্‌ড়াইয়া ফেলিলে কর্ম্মের বিষদাঁত ভাঙিয়া ফেলা হয়। এই উপায়ে মানুষ কর্ম্মের উপরেও নিজেকে জাগ্রত করিবার অবকাশ পায়। হওয়াই আমাদের দেশের লক্ষ্য, করা উপলক্ষ্যমাত্র।"

ভারতবর্ষ একদিকে কর্ম্মী, অন্যদিকে নির্লিপ্ত যোগী! আত্মাকে একদিকে লাভ করতে হবে ইহার বহির্ম্মুখী শক্তির বিকাশে, অন্যদিকে তাহাদিগকে বাইরের বৈচিত্র্য হতে গুটিয়ে এনে একের ধ্যানে, একের সমাধিতে।

এইজন্যই রামমোহনের সম্বন্ধে Miss Collet যা বলেছেন, শ্রীরবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধেও আমরা তাহাই বল্‌তে পারি, "If we follow the right line of his development we shall find that he leads the way from the orientalism of the past, not to but through Western Culture towards a Civilization which is neither Western nor Eastern but something vastly larger and nobler than both."

(৬)

৭ই পৌষ এবং ১১ই মাঘের উৎসব উপলক্ষ্যে তিনি যে সকল প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন, সে সকল আমাদিগকে দেখিয়ে দেয়, তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনের গভীরতা এবং তার প্রবল গতি। মানুষ মানুষের মধ্যে যতই কেন না শক্তিশালী হউন, বিশ্বপ্রকৃতির প্রচণ্ড শক্তি সংঘর্ষণের মধ্যে তাঁর অবস্থা কি অসহায়। সেইজন্য যিনি "সম্রাট-নায়েব" কার্জনেরও ভ্রূকুটীতে ভীত হন নি, তিনি তাঁর ইষ্টদেবতার চরণে কাতর প্রার্থনা করছেন "নমস্তেঽস্তু মা মা হিংসী।"

কর্ম্মক্ষেত্রে শ্রীরবীন্দ্রনাথকে পৌরাণিক বিধি-নিষেধের দ্বারা পরিচালিত সম্প্রদায়সকল তাঁদের মধ্যে লাভ করেও কেন যে তাঁদের গণ্ডীর মধ্যে ধরে রাখতে পারে নি, তার কারণ, তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনের বিশিষ্টতা এবং দ্রুতগতি। তাঁর মধ্যে যে বৈরাগ্য দেখা যায় তা পৌরাণিক সমাজের বাস্তব জীবনের প্রতি অবজ্ঞাসূচক ঔদাস্য নয়—

"জড়তা হতে নবীন জীবনে, নূতন জনম দাও হে।
আমার ইচ্ছা হইতে প্রভু, তোমার ইচ্ছা মাঝে,
আমার স্বার্থ হইতে প্রভু তব মঙ্গল কাজে,
অনেক হইতে একের ডোরে, সুখ দুখ হতে শান্তিক্রোড়ে,
আমাহতে নাথ, তোমাতে মোরে, নূতন জনম দাও হে।"

কিন্তু এই নব-জন্ম সাধককে লাভ করতে হয়েচে দুঃখকে নত মস্তকে কোন রকমে বহন করে নয়—

"দুঃখের বেশে এসেছ বলে তোমারে নাহি ডরিব হে!
যেখানে ব্যথা তোমারে সেথা নিবিড় করে ধরিব হে।
আঁধারে মুখ ঢাকিলে স্বামী
তোমারে তবু চিনিব আমি,
মরণ রূপে আসিলে প্রভু, চরণ ধরি মরিব হে!
যেমন করে দাও না দেখা, তোমারে নাহি ডরিব হে!"

সাধকের ইহাই একমাত্র প্রার্থনা, "আবিরাবীর্ম্ম এধি। হে আবিঃ তুমি আমার কাছে আবির্ভূত হও। হে প্রকাশ তুমি আমার কাছে প্রকাশিত হও; এ প্রকাশ ত সহজ প্রকাশ নহে। এ যে প্রাণান্তিক প্রকাশ। অসত্য যে আপনাকে দগ্ধ করিয়া তবেই সত্যে উজ্জ্বল হইয়া ওঠে, অন্ধকার যে আপনাকে বিসর্জ্জন করিয়া তবেই জ্যোতিতে পরিপূর্ণ হইয়া ওঠে এবং মৃত্যু যে আপনাকে বিদীর্ণ করিয়াই তবেই অমৃতে উদ্‌ভিন্ন হইয়া ওঠে। রুদ্র, যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্।"

প্রভাতের আলোক, আকাশের নীলিমা, বসুন্ধরার শ্যামলতা, ভাগীরথীর হীরা বসানো তরঙ্গমালা এখন কবির নিকট জড়শক্তির প্রকাশমাত্র নয়, তাই কবি গাইছেন—

"দাঁড়াও আমার আঁখির আগে
যেন তোমার দৃষ্টি হৃদয়ে লাগে !
সমুখ আকাশে চরাচর লোকে
এই অপরূপ আকুল আলোকে
দাঁড়াও হে !
আমার পরাণ পলকে পলকে
চোখে চোখে তব দরশ মাগে ।"

(৭)

যে সকল ভাবের উপলব্ধির উপর ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায় স্থাপিত, ভক্ত-কবির অসংখ্য সঙ্গীতে সেই সকল ভাবের প্রকাশ দেখা যায়। তিনি কখনো তাঁকে সখাভাবে উপলব্ধি করে গাইছেন, "চির সখা, ছেড় না মোরে, ছেড় না," কখনো তাঁর অনন্ত অসীম শক্তি দেখে বল্‌ছেন—

"হে মহা প্রবল বলী,
"কত অসংখ্য গ্রহ তারা তপন চন্দ্র
ধারণ করে তোমার বাহু,
নরপতি ভূম্যপতি হে দেববন্দ্য !"

আবার কখনো বা তাঁর মাতৃভাব উপলব্ধি করে গান করছেন—

"জননি, জীবন জুড়াও প্রসাদ সুধা সমীরণে"

কখনো তাঁর পিতৃভাব নিরীক্ষণ করছেন—

"আজি শুভদিনে পিতার ভবনে অমৃত সদনে
চল যাই, চল চল চল ভাই।"

কখনো মধুর ভাবে—

"একি লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ প্রাণেশ হে!"

কখনো দাস্য ভাবে—

"পাদপ্রান্তে রাখ সেবকে।"

আবার কখনো বা তাঁর স্তব্ধভাব দেখছেন

"জাগ্রত বিশ্বকোলাহল মাঝে, তুমি গম্ভীর
স্তব্ধ, শান্ত, নির্বিকার পরিপূর্ণ মহাজ্ঞান।"

(৮)

সান্ত মানবাত্মায় অনন্তের প্রকাশ এইরূপেই বিচিত্রভাবে হয়ে থাকে, ভক্তের জীবনে একি এক আশ্চর্য্য ঘটনা—"কি অপূর্ব্ব মিলন তোমায় আমায়!" আমাদের মত বিষয়ের ভারে যারা ভারাক্রান্ত, তাদের উৎসাহ দিয়ে কবি গাইছেন, "শ্রান্ত কেন ওহে পান্থ পথ প্রান্তে বসে একি খেলা!" তাই বটে। কিন্তু এ শ্রান্তি যে মর্ম্মান্তিক আমাদের ইহা সত্যই সব সময়ে মনে থাকে না—

"আমার প্রাণ তোমারি দান"

তাই আমাদের চিত্ত আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে গান গেয়ে ওঠে না —

"তুমিই ধন্য, ধন্য হে।"

(৯)

আমরা দেখলুম সামাজিক জীবনের ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যেই তাঁর আধ্যাত্মিক জীবন অভিব্যক্ত হয়েচে। সামাজিক জীবন ভারতের চিত্তকে তার অধীন করে, সাম্প্রদায়িক মোহে আছন্ন করে ইহা তত সত্য নয়, যত সত্য সে সাধকের চিত্তকে ভগবৎ প্রেমে জাগ্রত করে তাঁর মনকে স্তরে স্তরে বিশাল হতে বিশালতর জীবনের মধ্যে নিয়ে যায়। বালক ইন্দ্রিয়ের দ্বারে কেবলমাত্র অনুভব করে রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দের স্থূল জগৎ, সাধক তাহা অপেক্ষাও স্পষ্ট উপলব্ধি করেন একদিকে আকাঙ্ক্ষাময়ী প্রকৃতিকে, অন্যদিকে তাঁর অধিষ্ঠাত্রী পুরুষকে।

অসংখ্য ভাবে তাঁকে উপলব্ধি করেও ভক্ত কবি দেখছেন যে, তাঁর মধ্যে এমন একটি ভাব আছে যাকে কোনো নামের দ্বারা সঙ্কীর্ণ করা যায় না, অথচ তার অস্তিত্ব অন্তরে বাহিরে উপলব্ধি করা যায়। শ্রীরবীন্দ্রনাথ তাঁকে একমাত্র "তুমি" ছাড়া আর কোনো ভাবেই প্রকাশ করতে পারেন নি, আমাদের সাহিত্যে এই ভাবটি সম্পূর্ণ নূতন, ইহা যুগ-কবির বিশেষ দান। একটা অস্পষ্ট বেদনা এর সঙ্গে জড়িত আছে, যার আভাস উপনিষদে মাঝে মাঝে পাওয়া যায়। এ অস্পষ্টতা অজ্ঞানীর অস্পষ্টতা নয়, এ যে সীমার মধ্যে অসীমের

আত্মঘোষণা! এ অস্পষ্টতার মূল তিনিই, যিনি বাক্যের অতীত, মনের অতীত।

অথচ তাঁকেই বিশ্বপ্রকৃতিতে এবং অমাদের হৃদয়ের তারে তারে আঘাত করতে দেখে কবি বলছেন—

"সমুখ দিয়ে স্বপন সম যেয়ো না মোরে হেলায় ঠেলে!"

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য

—:o:—

(Léon Chenoy-এর ফরাসী হইতে)

এস আমরা আর সব ভাবনা ভুলে শুধু কাজ করে' যাই : সে কাজের উপর কোন্ নামের ছাপ দেব, সে জন্য যেন ব্যস্ত না হই। যদি দৈবাৎ আমাদের কাজ স্থায়ী হবার যোগ্য হয়, তাহলে উত্তরকালের লোকে তাকে ঠিক কোঠায় ফেল্‌বে এখন।

আমরা কেবল নিশ্চিন্ত মনে কাজ করে' যাব। এ কথা বুঝতে বেশি সময় লাগে না যে, সত্য সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান কারো নেই। আমাদের মধ্যে যাঁরা শ্রেষ্ঠ, তাঁরা সত্যের আংশিক রূপ দেখতে পান, সত্য খণ্ডভাবে তাঁদের আশ্রয় করে ; কিন্তু কেউ কখনো সমগ্রভাবে সত্যকে আয়ত্ত করে নি। তবুও সত্যের অস্তিত্ব মানতেই হবে।

তাই বলে' যদি আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, একপ্রকার নির্লিপ্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ নাস্তিকতাই বিজ্ঞতাসঙ্গত মনোভাব,—তাহলে কিন্তু বড় স্থূল দৃষ্টির পরিচয় দেওয়া হয়। সন্দেহ, শ্লেষ, সূক্ষ্ম সৌখীন সংশয় যে সৃষ্টির মূলে বর্ত্তমান, সে সৃষ্টি কেবলমাত্র নেতিবাচক। নেতিবাচক ভাব কখনো কখনো ভাঙ্গে বটে, কিন্তু কখনো কিছু গড়ে' তোলে না ; আর আমার ত মনে হয় ইতিবাচক মনোভাব বা গঠনের প্রবৃত্তিই সৌন্দর্য্যের মূলবিশেষ।

সাহিত্য বা শিল্পকলার কোন প্রকৃত মহান ও শক্তিশালী রচনা

যে মানবসমাজের পরমসম্পদরূপে থেকে যায়, তার কারণ এ নয় যে, সত্য তা'তে মূর্ত্তিমান হয়ে উঠেছে; তার কারণ এই যে, সেই রচনায় রচয়িতার উৎসাহ, সত্যনিষ্ঠা এবং ব্যক্তিবিশেষত্বকে মানুষে উপলব্ধি করে। অর্থাৎ—সার সত্য বা অখণ্ড সত্য সম্বন্ধে তাঁর অবশ্য-সীমাবদ্ধ ধারণায় তিনি যা-কিছু বুঝতে বা অনুভব করতে পেরেছেন, সেই জিনিসটিকে আমরা পাই।

যদিও উক্ত রচনা ব্যক্তিগত ও সেই কারণেই অসম্পূর্ণ হতে বাধ্য; তবুও যে সত্যবাণী তার স্রষ্টার কম্পিত অধরে সবপ্রথম স্ফুরিত হয়েছিল, সেগুলি পূর্ণরূপেই তা'তে প্রকাশ লাভ করে। সেই রচনা কেবলমাত্র একটি মনোভাবের, একটি মূলমন্ত্রের, একটি অপূর্ব্ব বিশ্বাসের জীবন্ত প্রকাশ,—আর কিছুর নয়। সে বিশ্বাস যেন জেদ করে' সঙ্গে লেগে থাকে, সারাজীবন ধরে' বারম্বার ছাড়ালেও যেন সে ছাড়তে চায় না। এ স্থলে বুঝিয়ে বলা দরকার যে; রচয়িতার বুদ্ধির সঙ্কীর্ণতাবশতঃ যে এমনটি হয় তা' নয়,—বরং তিনি যা বুঝেছেন তা' অত্যুত্তমরূপে বুঝেছেন বলেই কেবলমাত্র এইপ্রকার রচনাই রক্ষা পায়। অথবা "অত্যুত্তমরূপে বুঝেছেন" বলাও আমার ভুল;—সাধারণতঃ একটা শক্তি, একটা চিরঅদম্য বিরাট সংস্কার সর্ব্বদা একই দিকে, একই লক্ষ্যের প্রতি সৃষ্টিক্ষম মনকে চালনা করে।

যাঁরা জ্ঞাতসারে নিজের রচনার লক্ষ্যের ঐক্য প্রতিপন্ন করেন, তাঁদের সংখ্যা কম। তাঁরা যে ভুল করেন, সে কথা বলছি নে;—কেনই বা তাঁরা যুক্তিপূর্ব্বক নিজমতের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে ব্রতী হবেন না;—কিন্তু এক অজ্ঞাত শক্তির বলে স্বভাবতঃ নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যের উদ্দেশে

চলা,—সেইটিই হল আদর্শ; স্বীয় বুদ্ধিগত ইচ্ছা শুধু অক্লান্তভাবে সেই শক্তির সমর্থন করবে, তার পথে আলো ধরবে।

এই দুয়ের সংযোগে যে রচনা উৎপন্ন, তা'তে পরম গভীর সাফল্য-সহ সত্যের সেই অংশ অঙ্গীকৃত হয়, যা পুর্ব্বেই বলেছি শ্রেষ্ঠ মানবের পুরস্কার।

কায়ার পিছনে ছায়ার মত, এক ভাগ মিথ্যাও এই খণ্ডসত্যের অনুগামী হয়। কিন্তু সে জন্য দুঃখ যেন না করি। রচনাবিশেষের মধ্যে বোঝবার ভুল কত কম আছে, তার উপর তার প্রভাব, ঔজ্জ্বল্য বা চরম মনোহারীত্ব তত নির্ভর করে না,—সে ত কেবল অভাবাত্মক হত;—কিন্তু তার মধ্যে ব্যক্তিগত ধারণার তেজ কত, উদারতা কত, সত্য কত গভীরভাবে প্রকাশিত হয়েছে, তার উপর করে নির্ভর। এইগুলিই থেকে যায়, ও শিল্পীর পরিচয় প্রদান করে।

আমাদের এই খণ্ডসত্যগুলি মিলেমিশে, এই বাস্তবের খণ্ডদৃষ্ট-গুলি পাশাপাশি সজ্জিত হয়ে অবশেষে একদিন হয়ত সত্যের পরিপুর্ণ স্বরূপ গঠিত হয়ে উঠবে।

এই উদ্দেশ্যে প্রত্যেকে নিজ নিজ ক্ষমতা অনুসারে নিষ্ঠাপুর্ব্বক আনন্দমনে দৃঢ়ভাবে কাজ করে' যাওয়া,—এর সৌন্দর্য্য কে না বুঝতে পারে?—যেন ভবিষ্যতে সেই বিকাশটি সম্ভব হয়, যা'তে করে' বিজ্ঞান, শিল্পকলা, ন্যায়ের বিধান প্রভৃতি বুদ্ধি ও হৃদয়দ্বারা সৃষ্ট বস্তুর সারাংশ একটি সুমহৎ সমষ্টিরূপে পরস্পরকে একদিন সম্পূর্ণ করে' তুলতে পারে।

নিজের অসম্পূর্ণতার জ্ঞানবশতঃ যেন আমরা হতাশভাবে হাল

ছেড়ে দিয়ে নির্ব্বিকার হয়ে বসে' না থাকি। বরং সে কথা মনে করে' আমাদের ক্ষমাশীল হওয়া কর্ত্তব্য এবং অক্লান্ত চেষ্টায় উৎসাহিত হওয়া উচিত।

পরের সমালোচনা, নাস্তিকতা বা সুলভ বিদ্রূপে আমাদের ভোলাতে পারবে না, কারণ সে-সব হচ্ছে সৃষ্টি করবার অক্ষমতারই ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ। সে-সবের মানে হচ্ছে বিশ্বমানবের কাজে ও সংগ্রামে যোগ দেবার অনিচ্ছা; আর আমরা যে যা'ই করি না কেন, স্ব স্ব ক্ষেত্রে সকলেই সেই এক পথের পথিক।

যথাসাধ্য ভাল করে', মন দিয়ে, ধৈর্য্য ধরে' কাজ করে' যাব,—একমাত্র এই সঙ্কল্পদ্বারাই, আমরা এই যে মনুষ্যনাম ধারণ করেছি, সেই মহৎ ও দুঃখময় নাম সার্থক করতে পারব;—যেমন করে' সার্থক করে মাঠের কাজে কৃষাণ, এবং হাতের কাজে কারিগর।

শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী

বসন্ত বাতাসে

—:*:—

নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে বসন্ত বাতাসে
ভরিয়া গিয়াছে মোর মন,
ধরণীর তরুণ জীবন
শিরায় শিরায়,
কিশলয়- রক্তিম ধারায়
ফিরাইল শৈশব বারতা,—
"জরা নাই," "জরা নাই," শুধু অমরতা !

বসন্ত ছুঁইল তাই দেখা দিল
কচি পাতা গোলাপের গাছে ;
সাথে আনিয়াছে, ফুলেরি মতন
পত্রলেখা, তেমনি বরণ !
ফলের মূরতি কলিকার,—
আদি আর অন্ত যেন দুই একাকার !

ফুরাবার কথা, ঝরিবার ব্যথা
কোথাও পড়ে না আজি চোখে,
পল্লবের পল্লবিত শ্লোকে, পুষ্পের গাথায়,
দিবসের পাতায় পাতায়,
লেখা হয় যে অমরকোষ,—
একই ছন্দে গাঁথা সেথা প্রভাত-প্রদোষ !

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী

মায়ের প্রতিশোধ

——:০:——

(Maupassant-র ফরাসী হইতে)

প্রায় এগারো বৎসর আমি ভিরলোঁতে আসি নি।

তারপর শরৎকালের একটি সুন্দর দিনে সেখানে এলেম শীকার চর্চ্চার মতলবে, আমার বন্ধু সেরভালের গৃহে। বন্ধুটি এতদিন পরে তবে সেই যে তাঁর বাড়িটি প্রুসীয়ানরা ভেঙ্গে দিয়েছিল, তার সংস্কার শেষ করতে পেরেছেন।

এ জায়গাটি আমার অতি প্রিয়। এক কোণে ছোটখাটো গাঁ-খানি—তার রূপটুকু যেন চোখে নেশা ধরিয়ে দেয়। তার উপর আমার যে টান, সেটা ঠিক মানুষের উপর টানের মতই প্রবল। অন্যমনস্ক হয়ে চলেছি, পথের সৌন্দর্য্য জোর করে চোখকে টেনে এনে কাজে লাগিয়ে দেয়।—হয়ত মনে পড়ে যায় আগেকার চেনা কোন ঝরণা, ঝোপ, খাল বা পাহাড়ের কথা—যা বারবার দেখা হয়েছে ও মনে কোন সুখস্মৃতির সঙ্গে গাঁথা রয়েছে। থেকে থেকে মন হয়ত বনের অদৃশ্য এক কোণে গিয়ে লুকোয়, কিংবা নদীর ধারে বা ফুলে-ঢাকা ছোট্ট একটি বাগানে গিয়ে পড়ে—যা একটিবারমাত্র কোন শুভ মুহূর্ত্তে চোখে পড়েছে, আর সেই থেকে মনকে আঁকড়ে ধরে রয়েছে:—যেমন কোন বসন্তের সকালে, চক্‌চকে ঝক্‌ঝকে পোষাকে উজ্জ্বল, সুন্দর কোন নারীমূর্ত্তি পথে দেখে, তার স্মৃতি

আমাদের দেহে ও মনে চিরকালের মত একটা অতৃপ্ত আকাঙ্খা ও অভাববোধ রেখে যায়; কিম্বা হাতে-পাওয়া সুখকে হেলায় দূরে ঠেলে ফেলে দিল পরে আমাদের মনের ভাবটি যেমন হয়।

আমার টান ছিল ভিরলোঁর সকল জায়গাটুকুর উপর—সেই ছোট ছোট বনজঙ্গলে ছিটোনো মাঠ, আর তারি মাঝ দিয়ে এঁকে বেঁকে চলে যাওয়া অতি শীর্ণকায় সব নালা, যেগুলো সূর্য্যের আলোয় দেখায় ঠিক যেন আঁকাবাঁকা শিরা পৃথিবীর রক্তপ্রবাহ বহন করে চলেছে। ঐ গুলিতে সকলে তেমনি ছোট সব মাছ ধরত। এখানে সেখানে নাইবার মত জায়গা ছিল—আর নালার ধারে যে-সব লম্বা ঘাস জন্মাত, তার মধ্যে দুই একটা শীকারের পাখীও মিলত।

আমার কুকুর দুটোয় মিলে চারিদিকে খোঁজ করছে—আর তাদের উপর চোখ রেখে আমি আস্তে আস্তে এগিয়ে চলছি। সের-ভাল আমার একশো হাত দূরে ডাইনে দেখছিল। দুই একটা ঝোপ পার হতেই, যে জঙ্গলটার ভিতর দিয়ে এতক্ষণ আসছিলেম সেটা শেষ হয়ে গেল। তখন দূরে নজরে পড়ল একটা ভাঙ্গা পোড়ো-বাড়ী।

চট্ করে মনে পড়ে গেল গেলবারে, অর্থাৎ ১৮৬৯ সালে বাড়ী-টাকে যে অবস্থায় দেখেছিলেম—সেই আঙুরপাতায় ঢাকা ঘরের চালা ও দেয়াল, সামনে আহার-অন্বেষণে রত মুরগীর পাল। কি বুকভাঙ্গা দৃশ্য একটা পোড়োবাড়ী!—হাঁ করে তার খুঁটি দেয়াল দাঁড়িয়ে আছে, আর বাকী যত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ খসে গলে পড়েছে!

আরো মনে পড়ে সেই স্ত্রীলোকটির কথা,—একদিন আমি ভারি ক্লান্ত হয়ে সেখানে উপস্থিত হলে, যে আমাকে ভিতরে ডেকে নিয়ে

গিয়ে এক গ্লাস মদ খেতে দিয়েছিল। তারপর সেরভালের কাছে শুনেছিলেম তাদের যত ইতিহাস। বাড়ীর কর্ত্তা ছিলেন "পোচার,"—বনরক্ষীদের গুলি খেয়ে মারা যান। তার ছেলেকে আগের বার দেখেছিলেম—এক ঢ্যাঙ্গা, শুখ্‌নো মূর্ত্তি; পৈতৃক ব্যবসায়ে বাপের মতই তার সুনাম ছিল।

আমি সেরভালকে ডাকলেম। সে শীকারী-জনোচিত লম্বা লম্বা পা ফেলে এসে হাজির হল।

আমি জিজ্ঞেস করলেম—"ও বাড়ীটার মানুষগুলোর কি হল?"

তার উত্তরে সে এই গল্পটি বল্লে।

যুদ্ধ আরম্ভ হলে বাড়ীর তেত্রিশ বছরের ছেলেটি মাকে বাড়ীতে একলা ফেলে রেখে পণ্টনে নিজের নাম লিখিয়ে দিয়ে সরে পড়ল। পাড়াপ্রতিবাসীরা জানত বুড়ীর হাতে কিছু পয়সা আছে,—বিশেষ কোন কষ্ট তার হবে না।

সেই হতে বুড়ী গাঁ থেকে এতদূরে জঙ্গলের ধারে একা ঘরে নিঃসঙ্গ অবস্থায় থাকৃত। ভয়ভীতি তার মনে বোধহয় ঠাঁই পেত না—কারণ চেহারায় ছিল সে বাড়ীর বেটাছেলেদের মতই,—ঢ্যাঙ্গা, শুখ্‌নো, চোয়াড়ে গোছের। হাসি তার মুখে লোকে কমই দেখেছে; আর বোধহয় তার সঙ্গে ঠাট্টা করতে কেউ কখনো সাহস করে এগোয় নি। বিশেষ করে চাষার ঘরের মেয়েদের মুখে হাসি বড় কম—যত স্ফূর্ত্তি সব পুরুষদের। বৈচিত্র্যহীন, একঘেয়ে, নীরস দুঃখের জীবন মেয়েদের; তাদের মনটি তাই অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ ও দুঃখের ভারে মুষড়ে-পড়া। পুরুষরা মদের দোকানের হট্ট-গোলে কিছু আমোদের

স্বাদ পায়—কিন্তু মেয়েদের স্বভাব হয়ে যায় গম্ভীর, আর তাদের মুখের চেহারা হয়ে যায় রসলেশহীন! একটু হাসলে মানুষের মুখের পেশী-গুলার যে পরিবর্ত্তন হয়, সেটুকুর সঙ্গেও তাদের মুখের কোন পরিচয় নেই।

বুড়ীর দিনগুলো ঐ বাড়ীতেই চুপচাপ কেটে যেতে লাগ্‌ল। শীতকাল এলে বরফে বাড়ীটাকে ছেয়ে ফেল্‌ত। বুড়ী হপ্তায় এক-দিন করে গাঁয়ে আস্‌ত, রুটি ও মাংস কেনবার জন্য—তারপর বাড়ী ফিরে যেত। তখন আবার বাঘের ভয় হয়েছিল, তাই সে তার ছেলের মরচেধরা, ক্ষয়ে-যাওয়া-বাঁটয়ালা বন্দুকটি পিঠে বেঁধে বাইরে আস্‌ত; ঐ সময়ে কি অপুর্ব্ব চেহারাই তার হত—সেই কোমরভাঙ্গা লম্বা ধড়, বরফের উপর দিয়ে টেনে-আনা দুই সরু ঠ্যাং, আর পৃষ্ঠে দোদুল্যমান বন্দুক, যা তার শাদা চুলঢাকা মাথায় বাঁধা কালো "রুমাল" ছেড়েও ঠেলে উঠেছে!

তারপর একদিন প্রুসীয়ানরা এসে উপস্থিত। গাঁয়ের সকলের অবস্থা অনুসারে তাদের প্রত্যেক বাড়ীতে বাসা দেওয়া হল। সেই বুড়ীর বাড়ীতে জায়গা পেল চারজন।

দেখতে তারা ছিল ফরসা—যেমন গায়ের রং তেমনি দাড়ীর রং, নীল চোখ, যুদ্ধের কষ্ট পেয়েও দিব্যি মোটাসোটা। পরাজিত দেশ হলেও তার উপর তাদের ব্যবহার ছিল ভাল। বুড়ীর প্রতি তাদের বেশ টান দেখা যেত। তারা যতদূর পারত তার খরচ ও পরিশ্রম কম করতে চেষ্টা করত। সকালে প্রায়ই দেখা যেত তারা খালি সার্ট গায়ে একটা কুয়োর ধারে স্নান করছে—বুড়ী ততক্ষণ তাদের সুরুয়া তৈরী করছে। তারপর স্নান সেরে তারা হেঁসেল সাফ, মেঝে

ধোয়া, কাঠ চ্যালা করা, আলুর খোসা ছাড়ানো, কাপড় ধোওয়া ইত্যাদি ঘরকন্নার সকলরকম কাজেই যেন বুড়ীর চারটি সুবোধ ছেলের মতই লেগে যেত।

বুড়ী মনে মনে তার নিজের ছেলেটির কথাই সারাক্ষণ ভাবত,—সেই শুখ্‌নো কাঠের মত চেহারা, বাঁকা নাক, বাদামী রংয়ের চোখ, আর কালো চুলের তৈরী একখানা বুরুষের মত গোঁফ। সে রোজ সেই চারজন জর্ম্মান সৈন্যের একজন-না-একজনকে জিজ্ঞাসা করত,—"ফরাসী রেজিমেণ্টের তেইশ নম্বর সৈন্যদলকে কোথায় রাখা হয়েছে জান কি?" তারা বলত তারা কিছুই জানে না। তাদের মধ্যে যারা দূর দেশে নিজের বাড়ীতে মা ছেড়ে এসেছিল, তারা বুড়ীর কষ্টের ও ব্যস্ততার কারণ বুঝত, এবং হাজার রকমে তাকে ঠাণ্ডা করবার চেষ্টা করত। তারা চারজনেই শত্রু হলেও বুড়ী তাদের সবাইকে ভালবাসত, কারণ স্বদেশপ্রেমিকের মনে অন্যজাতি-বিদ্বেষটা যেমন উগ্রমাত্রায় থাকে, চাষার মনে প্রায়ই তেমন থাকে না। ও-ভাবটা সমাজের উপরওয়ালাদেরই একচেটে। গরীব বেচারা চাষাকেই সবচেয়ে বেশি টাকা দিতে হয়, কারণ তার কিছুই নেই—আর সকলরকম নতুন কর তারই ঘাড়ে চাপিয়ে তাকে পিষে ফেলবার পথ আবিষ্কার করা হয়। ওরাই কামানের সুমুখে বুক পেতে ঝাঁকে ঝাঁকে মরে, কারণ সংখ্যায় ওরাই বেশি। যুদ্ধের প্রাণান্ত কষ্টটি ওদেরই সকলের চাইতে বেশি সহ্য করতে হয়, কারণ ওরা বড় দুর্ব্বল, আর তার থেকে উদ্ধারের উপায় ওদের হাতে সব চেয়ে কম। লড়াই করবার উৎকট বাতিক তাদের নেই, "প্রেষ্টিজের" মহিমা তাদের বুদ্ধির অগোচর, আর রকমারি রাজনীতির মারপ্যাঁচ—যা দুই মাসের মধ্যেই

জেতা ও বিজিত উভয় জাতিকেই কাবু করে ফেলে,—তা মোটেই তাদের মাথায় ঢোকে না।

গাঁয়ের সকলে বুড়ীর বাড়ীর চারজন জর্ম্মাণ-সৈন্যের কথা উঠলে বলত, "ঐ চারটি লোক ঠিক যেন নিজের বাড়ীটিতেই রয়েছে।"

তারপর একদিন সকালে বুড়ী যখন একা বসে রয়েছে, দূরে দেখলে একজন লোক সেদিকে আসছে। বুড়ী চিনতে পারলে যে, সে লোকটি হচ্ছে ডাকপিয়ন।

সে ভাঁজ-করা একখানা কাগজ তার হাতে দিলে। সেলাইয়ের বাক্স থেকে তার সেলাই করবার চশমাটি বের করে বুড়ি পড়লে—

"ম্যাডাম—

এই চিঠিতে আপনার জন্য একটা দুঃসংবাদ আছে। গত কল্য আপনার ছেলে ভিক্টর গোলার আঘাতে মারা পড়েছে—গোলাটি তার দেহ দু'খণ্ড করে ফেলেছে। আমি তার কাছেই ছিলেম, কারণ সৈন্যদলে আমাদের স্থান পাশাপাশি ছিল। সে তার কোন দুর্দৈব ঘটলে সেই দিনই আপনাকে খবর দিতে বলে যায়। যুদ্ধশেষে ফিরিয়ে দেব বলে তার পকেট-থেকে ঘড়িটি বের করে নিয়েছি।

আমার নমস্কার জানবেন।

সেজের রিভো

দ্বিতীয় শ্রেণী তেইশ সংখ্যক সৈন্যদল"

চিঠির তারিখ ছিল তিন সপ্তাহ পূর্ব্বেকার।

চোখে তার জল ছিল না। আঘাতের পরিমাণটা হয়েছিল এত বেশি যে, প্রথম চোটে সে শুধু নিস্পন্দ হয়ে রইল;—ভিতরটা অসাড় হয়ে যাওয়ায় তখনকার মত বেদনাবোধটুকুও ছিল না।

সে ভাবছিল—ভিক্টরকে তারা মেরে ফেলেছে। তারপর আস্তে আস্তে চোখে জল দেখা দিল, শোকে সে মুহ্যমান হয়ে পড়ল। একটু একটু করে তার বর্ত্তমান অবস্থা পরিষ্কার হয়ে উঠ্‌তে লাগল তার মনে—উঃ কি অসহনীয়! ছেলেকে বুকে টেনে আনা জন্মের মত শেষ হয়েছে। বাপকে মেরেছে পুলিশে, ছেলেকে মেরেছে প্রুশীয়ানরা......গোলার আঘাতে সে দুখণ্ড হয়ে গিয়েছে......মনে হয় যেন চোখের উপর সেই দৃশ্য......কি ভয়ানক......মাথাটা হেলে পড়েছে......চোখ দুটো হাঁ করে চেয়ে রয়েছে......আর রেগে গেলে তার যেমন অভ্যাস ছিল, গোঁফের মুড়োটা সেইরকম কামড়ে ধরেছে!

তার শবটা নিয়ে কি করেছে ওরা? আহা, সেইটে যদি শুধু ফেরত দিত, যেমন তার স্বামীর শবটা তারা দিয়েছিল, কপালে যে গুলি লেগে তার মৃত্যু হয়, সেটা সুদ্ধ।

হঠাৎ তার কানে গলার আওয়াজ এল। প্রুসীয়ানরা গাঁ থেকে ফিরছে। সে তাড়াতাড়ী চিঠিখানা তার পকেটে লুকাল। তারপর চোখ মুছে ফেলে ঠাণ্ডা হয়ে তাদের সঙ্গে মিল্‌ল।

পথে কার একটা খরগোস চুরি করে তাকে নিয়ে মহা স্ফূর্ত্তিতে হাসতে হাসতে তারা আস্‌ছিল। বুড়ীকে ইসারায় জানালে যে ঐটের মাংস আজ খাওয়া হবে।

সে রান্নার যোগাড় করতে গেল। ছোট্ট ঐ জানোয়ারটিকে মার্‌বার সময়ে তার হাত আর উঠতে চাইল না—যদিচ আরও বহুবার সে এ কাজ করেছে! একজন সৈন্য সেটির মাথায় এক কিল মেরে তাকে শেষ কর্‌ল।

তখন সে তার ছাল ছাড়িয়ে দিল। কিন্তু খরগোসের সেই তাজা রক্তের চেহারা, হাতে মাখা গরম সেই রক্ত, যা দেখতে দেখতে ঠাণ্ডা হয়ে জমাট বেঁধে যাচ্ছে—তাইতে তার পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত কেঁপে উঠল!—মনে তার কেবল ফুটে উঠছিল গোলার আঘাতে দু'খানা হয়ে যাওয়া তার ছেলের চেহারা, আর রক্তে লাল তার শরীর—ঠিক এই মরা খরগোসটারই মত, যেটা এখনও একটু একটু নড়ছিল।

সৈন্যদের সঙ্গে এক টেবিলেই সে বসল, খেতে কিছুই পারল না। তারা নিজেদের মনে খেতে লাগ্‌ল। সে চুপ করে তাদের দিকে চেয়ে মনে মনে একটা মতলব আঁট্‌ছিল, কিন্তু তারা তার কিছুই টের পেলে না।

হঠাৎ সে তাদের বল্‌লে—একমাসের উপর আমরা একসঙ্গে আছি, কিন্তু তোমাদের একজনের নামও আমি জানি নে।

তারা বহু চেষ্টা করে তার কথাটা বুঝ্‌লে; তারপর তাদের নাম বল্‌ল।

কিন্তু এতেও সে ছাড়ল না। একখানা কাগজে তাদের নিজের নাম ও বাড়ীর ঠিকানা লিখতে হল। বুড়ী চশমাখানা টেনে তার লম্বা নাকের উপর রেখে খুব মন দিয়ে সেই অজানা লেখা দেখল। তার পর সে কাগজটা ভাঁজ করে পকেটে রেখে দিল যে চিঠিখানায় তার ছেলের মৃত্যুর খবর ছিল, তার পাশে।

আহার শেষ হলে সে তাদের দিকে চেয়ে বল্‌ল—"আমি তোমাদের কাজ করতে যাই।"

তারপর কতকগুলি খড় নিয়ে, যে ঘরে তারা শুত সেখানে ফেলতে লাগল।

তার কাজ দেখে লোকগুল অবাক্ হয়ে রইল। সে বুঝিয়ে দিল, এতে করে তাদের ঠাণ্ডা কম লাগবে। তখন তারাও সাহায্য করতে আরম্ভ করল, সেগুলো স্তূপাকার হয়ে ঘরের খড়ের চালে ঠেক্‌ল। এই রকমে চমৎকার খড়ের দেয়াল দেওয়া গরম এক শোবার ঘর তৈরী হল।

মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় তাকে কিছুই না খেতে দেখে, একজন ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলে। সে বল্‌ল তার পেটে ব্যথা হয়েছে। তারপর তাদের গরম হবার জন্য বেশ করে আগুন জ্বেলে দিতে বলে' সৈন্যেরা সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেল।

দরজা বন্ধ হবামাত্র বুড়ী সিঁড়িটা সরিয়ে দিল।

তারপর চুপিচুপি দোর খুলে বাইরে এসে বোঝাকয়েক খড় নিয়ে রান্না ঘরে ফেল্‌ল। জুতো খুলে খালি পায়ে এত আস্তে বরফের উপর দিয়ে হেঁটে গেল এল যে, কেউ টের পেলে না।

কিছুক্ষণ কান পেতে সে ঘুমন্ত চারজনের নাক ডাকার শব্দ শুনল। যখন মনে হল সব ঠিক হয়েছে, তখন এক আঁটি খড়ে আগুন ধরিয়ে আর সবগুলর উপর ফেলে দিল। তারপর বাইরে এসে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল।

একটু পরেই বাড়ীর ভিতরটা উজ্জ্বল আলোকে ভরে গেল। এক প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড দাউ দাউ করে জ্বলে উঠ্‌ল। ঘরের ছোট জানলা দিয়ে তার উজ্জ্বল আভা বাইরে এসে শাদা বরফের উপর লাল ছায়া ফেলে দিল।

তখন ঘরের উপরতলা থেকে উচ্চ শব্দ শোনা গেল। কানে

এল মানুষের গলার ভয়ানক চীৎকার—যন্ত্রণা ও ভয়ে উন্মত্ত লোকের কাতর হৃদয়বিদারী সাহায্য-প্রার্থনার শব্দ।

আগুন ঝড়ের বেগে উপরের ঘরে গিয়ে পড়ে' খড়ের চাল ফুটো করে, প্রকাণ্ড এক জ্বলন্ত মশালের আগুনের মত আকাশে ঠেলে উঠ্‌ল। বাড়ীর সকল জায়গায় আগুন ধরে গেল।

তারপর কেবল আগুনের হিস্‌হিস্‌, দেওয়াল ফাটার ফট্‌ফট্‌ ও কড়ি বরগা পড়বার দুমদাম—এ ছাড়া আর কোন শব্দই কানে এল না। হঠাৎ চাল পড়ে গেল—ঘরের জ্বলন্ত অবশিষ্টাংশ মেঘের মত পুঞ্জীকৃত ধোঁয়ার মাঝে অসংখ্য উজ্জ্বল আগুনের ফুল্‌কি আকাশে উড়িয়ে দিল।

বরফে ঢাকা শাদা জমির উপর আলো পড়ে' দেখাতে লাগল যেন একখানা রূপালি চাদরের উপর লাল ছাপ দেওয়া হয়েছে।

দূরে একটা ঘড়ি বাজতে লাগল।

বুড়ী ততক্ষণ বাইরে নিজের ভস্মীভূত বাড়ীর সুমুখে ছেলের বন্দুক হাতে দাঁড়িয়ে রইল, এই ভয়ে পাছে শেষে চারজনের মধ্যে কেউ পালায়।

যখন সব শেষ হয়ে গেল, বন্দুকটা সে আগুনের মধ্যে ফেলে দিল। ধপ্‌ করে একটা আওয়াজ হল।

কয়েকজন লোক উপস্থিত হল, গাঁয়ের চাষা ও প্রুশীয়ান।

বুড়ী তখন একটা গাছের গুঁড়ির উপর সন্তুষ্ট-মনে ঠাণ্ডা হয়ে বসে।

একজন জর্ম্মান অফিসার নিজের মাতৃভাষার মত ফরাসী বলতে পারত, সে জিজ্ঞাসা করলে—সৈন্যেরা কোথায়?

সে রোগা হাতখানা সেই ভস্মস্তূপের দিকে বাড়িয়ে স্পষ্ট-স্বরে জবাব দিল—ঐগুলোর ভিতরে।

সকলে তাকে ঘিরে ধরল।

অফিসার জিজ্ঞাসা করল, "কি করে আগুন লাগ্‌ল?"

সে বল্লে "আমি লাগিয়েছি।"

কেউ তার কথা বিশ্বাস কর্‌লে না, ভাবলে যে এই আকস্মিক বিপৎপাতে তার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। তখন চারদিকের সকলকে উদ্দেশ করে সে সমস্ত ব্যাপার প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত গুছিয়ে বল্‌লে—কেমন করে' সে চিঠি পায়, আর কেমন করে' বাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে ভস্মীভূত চারজনের শেষ চীৎকার তার কানে আসে। তার আপনার মনের ভাব, বা সে কি করেছে, তার তিলমাত্রও সে গোপন করলে না।

তার কথা শেষ হলে পকেট থেকে দুইখানা চিঠি বের করলে। দেখবার জন্য আগুনের কাছে ধরে চশমাজোড়া চোখে লাগিয়ে একখানা সবাইকে দেখিয়ে সে বল্‌লে, "এই খানায় আছে ভিক্টরের মৃত্যুর খবর;" দ্বিতীয়খানা দেখিয়ে, মাথা হেলিয়ে সেই ভস্মস্তূপের দিকে ইসারা করে বল্‌লে, "আর এইখানাতে আছে তাদের নাম, যদি কেউ তাদের বাড়ীতে খবর দিতে ইচ্ছা করে"।

অফিসার ততক্ষণ তার ঘাড়ের উপর হাত দিয়ে ছিল। বুড়ী ফিরে নামলেখা কাগজখানা শান্তভাবে তার হাতে দিয়ে বল্‌লে, "বেশ করে লিখে দেবে কেমন করে তারা মরেছে। আর তাদের বাপ মা'দের খোলসা করে লিখো যে আমিই আগুন ধরিয়েছি। আমার নাম ভিক্‌টোয়ার সিমন লা সোভাজ।"

অফিসার জর্ম্মান ভাষায় কি আদেশ দিল। বুড়ীকে ধরে ধাক্কা দিয়ে তারা তখন জ্বলন্ত দেয়ালের উপর ফেলে দিল।

বারোজন সৈন্য কুড়িহাত তফাতে তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গেল। বুড়ী একটুও নড়্‌ল না। সে বেশ বুঝল কি আস্‌ছে। ধীরভাবে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করতে লাগল।

ফের নূতন আদেশ হল। সাথে সাথেই আওয়াজ। একটার পর একটা করে বারোটা শব্দ হল।

বুড়ী মাটিতে পড়্‌ল না। তার যেন পা দুটো কেটে দেওয়া হয়েছে—এইভাবে বসে পড়্‌ল।

অফিসার এগিয়ে এসে দেখল সে প্রায় দুই টুকরো হয়ে গেছে—তার হাতে তখনও সেই রক্তমাখা চিঠি।

বন্ধু সেরভাল বল্‌লেন,—জর্ম্মানরা বুড়ীর ঐ কাজের জন্য "রেপ্রিজাল" নিয়েছে আমার বাড়ীখানি ভেঙ্গে দিয়ে।

আমি ভাবছিলেম—সেই চারজন শিষ্টস্বভাব যুবক, যারা ঐ বাড়ীর সঙ্গে পুড়ে মরেছে, তাদের মায়েদের কথা; আর ভাবছিলেম ঐ দেয়ালের গায়ে গুলি-করে-মারা আর একজন মায়ের ভীষণ নিষ্ঠুর সাহসের কথা।

তারপর সেই আগুনে-পোড়া কালো একটুকরো পাথর তুলে নিয়ে ঘরে ফিরলেম।

শ্রীননীমাধব চৌধুরী

আবুল ফজলের পত্র

—:•:—

বীরবল সাহেব

বহুদিন আপনার কোন খোঁজ না পেয়ে আপনার দৌলতখানায় খবর নিতে গিয়েছিলুম,—হুরীদের মুখে শুনলুম যে, আপনি মর্ত্যে নেমে গেছেন এবং হিন্দুস্থানের রাজধানীতে মজলিস পাকিয়ে বসেছেন। ঐ সংবাদ শুনে আমি দিল্লীতে বহুদিন ধরে আপনার তল্লাস করেছিলুম ব্যর্থ মনোরথ হয়ে। এমন সময়ে আপনার চিঠি-খানা পেলুম কলিকাতা থেকে লেখা। তখন আমার ঘুম ভাঙল— সত্যি ত—ইংরেজ-হিন্দুস্থানের রাজধানী ত দিল্লী নয়,—কলিকাতা। তা দিল্লীর পিছনে যত কোটী টাকাই খরচ করা হোক না কেন। কলমের এক আঁচড়ে রাজধানী স্থানান্তরিত করা চলে কিন্তু রূপান্তরিত করা চলে না। দু'শ' আড়াই শ' বছরের অতীত দিয়ে ইংরেজ যে কলিকাতা গড়ে' তুলেছে তাকে রাতারাতি বাতিল করা চলে না— লকেব দিল্লীতে কতগুলো অট্টালিকা বসিয়ে। কলিকাতার পিছে রয়েছে কয় শতাব্দীর ইংরেজের মন আর দিল্লীর নীচে রয়েছে কয় বছরের ইংরেজী মুদ্রা। মন জিনিসটা যে মুদ্রার চাইতে বড় তা আপনি হিন্দু আপনার কাছে আর কি বলব। সুতরাং ইংরেজ-হিন্দুস্থানের রাজধানী কলিকাতা থেকে দিল্লীতে স্থানান্তরিত করা হল, এই বাইরের বিজ্ঞাপনে যে ভুলেছিলুম তাতে আমি বিশেষ লজ্জিত।

আপনার কথা খুব ঠিক, ইংরেজ-হিন্দুস্থানের ইতিহাস খুবই মজাদার ও উপভোগ্য হ'য়ে উঠেছে। বিশেষ করে' হিন্দু-মুসলমানের স্বায়ত্ত-শাসন লাভের জন্য সংগ্রাম। আপনি একটা কথা বোধ হয় জান্‌তেন না যে, হিন্দুস্থান ইংরেজের দখলে আসবার সময় থেকেই আমি সেখানকার ইংরেজের রাজনীতি ও দেশবাসীর সমাজনীতি বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ কর্‌ছি—কেননা "আইন-ঈ-আংরেজী", নাম দিয়ে ইংরেজ-হিন্দুস্থানের একখানা ইতিহাস আমার লেখবার ইচ্ছা আছে। এর থেকেই বুঝতে পার্‌ছেন যে, ও সুবে বাঙলার শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ-ই হোন বা গুজরাতের শ্রীযুক্ত মোহনচাঁদ করমচাঁদ গান্ধী-ই হোন, কারোই কার্য্য ও কথা আমার চোখ কান এড়িয়ে যায় নি। কেননা একটা দেশের ইতিহাস মানে যে কতগুলো মানুষের ইতিহাস এ জ্ঞান আমি হারাই নি—আর কতগুলো মানুষের ইতিহাস মানে যে কয়েকটি মানুষের জীবন-চরিত এ জ্ঞানও আমার আছে। সুতরাং বুঝ্‌তেই পারছেন যে, নন্‌-কো-অপারেশন ব্যাপারটার দিকে আমি বিশেষভাবেই চোখ কান খুলে' রেখেছি।

বর্ত্তমানে নন্‌-কো-অপারেশন মুভ্‌মেণ্টের সবার চাইতে interesting ব্যাপার হয়ে উঠেছে কলিকাতায় ছাত্রদের ইস্কুল-কলেজ ত্যাগ। (এইখানে আপনাকে বলে রাখা ভাল যে, "আইন-ঈ-আংরেজী" লিখব বলে' আমি ইংরেজী ভাষাটাও কিছু কিছু আয়ত্ব করেছি এবং ইংরেজী সাহিত্যও কতক কতক অধ্যয়ন করেছি) যাই হোক, বল্‌ছিলুম ছাত্রদের শিক্ষার মধ্যে নন্‌-কো-অপারেশন খুবই interesting হ'য়ে উঠেছে।

আগরাতে বাদশার খুশ্‌বাগে আমাদের দাবার আড্ডা বসত আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে। তখন আমরা দেখতুম যে, যাঁরা দর্শক তাঁদের এমন কতগুলো চা'ল চোখে পড়্‌ত যা খেলোয়াড়দের দৃষ্টি এড়িয়ে যেত'। সুতরাং ঐ নন্‌-কো-অপারেশনের ভিড়ের বাইরে থেকে ছাত্রদের কথা ও কার্য্য কি রকম শুনতে ও দেখতে লাগে তা আপনার কাছে বললে হয় ত নেহাৎ uninteresting হবে না।

যে জিনিসটি কিছুতেই চোখ এড়িয়ে যায় না সেটি হচ্ছে ছাত্রদের ইস্কুল-কলেজ ছেড়ে দেবার suddenness. গত সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতার স্পেশাল কংগ্রেসে নন্‌-কো-অপারেশন প্রস্তাব পেশ হয় ও পাশ হয়। তখন কলিকাতার ছেলেদের তা কানেও বাজে নি প্রাণেও বাজে নি। তারপর আলিগড় কলেজ ইস্‌মালিয়া কলেজে গোলমাল বাধল। তখনও কলিকাতার ছাত্ররা নিতান্ত pessimist হ'য়ে চুপ করে ছিল। বাঙলায় গান্ধীজি এলেন ঘুরলেন ফিরলেন বক্তৃতা দিলেন চলে' গেলেন—কোন দিকে কিচ্ছু না। তারপর গত ডিসেম্বর মাসে আবার নন্‌-কো-অপারেশন প্রস্তাব পেশ হয় ও একটু উনিশ-বিশ করে' পাশ হ'ল। তখনও কিছু না। তারপর ঐ সময়ে নাগপুরে Students' Conference-এও ইস্কুল-কলেজ ছেড়ে দেবার প্রস্তাব উত্থাপিত ও গৃহীত হ'ল, তখনও কলিকাতার ছেলেদের মধ্যে কোন চাঞ্চল্য দেখা গেল না। কিন্তু যেমনি ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জন দাশ ঘোষণা করলেন যে, তিনি ইংরেজের আদালতে আইনের মুন্সিগিরি আর করবেন না—অমনি কলিকাতা ব্যাপী হৈ হৈ ব্যাপার রৈ রৈ কাণ্ড। ছাত্ররা কতক ইস্কুল-কলেজ ছাড়ল আর কতককে ছাড়াল। উদ্দীপনা উত্তেজনা আলোচনা বিলোচনা তর্ক বিতর্ক কুতর্ক আর

সবার মাথার উপরকার নৈবেদ্য অনিবার্য্যবক্তৃতায় চারিদিক সরগরম হ'য়ে উঠল। বক্তৃতা দেবার সুবর্ণ সুযোগ দেখে বক্তাদের মুখে আর হাসি ধরে না। অন্যান্য প্রদেশ থেকে বক্তারা ছুটে এল গলা শ্যানিয়ে। এ ব্যাপারটা আমার কাছে কি রকম প্রতীয়মান হচ্ছে জানেন?—এটা ছাত্রদের নন্‌-কো-অপারেশনও নয়, পলিটিক্স করাও নয়,—এটা হচ্ছে তাদের ভক্তিযোগ বা ভক্তিরোগ। রোগ বলছি এই জন্যে যে, যে-কোন বস্তুর আত্যন্তিক অবস্থাই রোগবিশেষ। সে যাই হোক্ বাঙালী জাতটা emotional, অর্থাৎ—ভাবপ্রবন, এটা আপনি জানেন। চিত্তরঞ্জনের ঐ স্বার্থত্যাগে তরুণপ্রাণ বাঙালী-ছাত্রদের চিত্তে emotion একেবারে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠেছে। এবং তাদের ধর্ম্মঘট হচ্ছে তারই একটা বাইরের নিদর্শন। ও-ব্যাপারটা হচ্ছে চিত্তরঞ্জনের পদে তাদের প্রাণের আবেগ মাখা ভক্তি-অর্ঘ্য প্রদান। তাই আমি ভাবি যে হিন্দুর অন্তর প্রকৃতির পরিবর্ত্তন বড় বিশেষ হয় নি—ভোল ফিরিয়েছে মাত্র। সেকালে তারা মন্দিরে মন্দিরে করত পাথর-গড়া প্রতিমাপূজো, একালে ইংরেজী শিখে তারা করছে পুলপিটে পুলপিটে রক্ত-মাংসে-গড়া মানুষপূজো। এই তফাৎ। এবং এ তফাতে তফাৎ হচ্ছে এই যে, মানুষ প্রতিমা যখন গড়ে তখন সে তাকে নিজের মনের মধ্যে থেকেই গড়ে, সুতরাং তার পূজোয় মানুষ আপনাকেই ফিরে পায়, কেননা নির্জ্জীব প্রতিমায় সে আপনার সত্বাকেই আরোপ করে। কিন্তু মানুষ যখন মানুষকে পূজো করে তখন সে আপনাকে হারায়, কেননা তখন পূজ্য মানুষের সত্বা দিয়ে আপনার সত্বাকে ঢেকে ফেলে। কথাটা যে স্বদেশী-পেনাল কোডের ১২৭ক ধারায় আলবৎ পড়বে সে বিষয়ে আমার দিব্য জ্ঞান আছে,

তবুও যে ভরসা করে' কথাটা বলে ফেললুম সেটা এই সাহসে যে, আমি হিন্দুও নই ও বর্ত্তমানে সশরীরে হিন্দুস্থানেও নেই।

মনে করবেন না যে আমার জানা নেই—না, তা জানি যে ইংরেজীতে Hero-worship বলে' একটা জিনিস আছে। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে আমি এটাও আপনাকে স্মরণ করিয়ে দেব যে, ঐ ইংরেজীতেই mass ও class বলেও দু'টি কথা আছে। মানুষ পূজো করে mass-এ আর Hero-worship করে' class-এ। কারণ ওর প্রথমটা করতে হয় চোখ বুঁজে আর শেষেরটি চোখ খুলে। গুজরাতের শ্রীযুক্ত মোহনচাঁদ করমচাঁদ গান্ধী যে mass-এর কাছে দেবতা হ'য়ে উঠেছেন তা ত চোখেই দেখছেন ও কানেই শুনছেন। কিন্তু তিনি যদি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছেও তাই হ'য়ে ওঠেন তবে গান্ধীজির পূজো চলতে পারে বটে কিন্তু দেশসেবায় মন অন্যমনস্ক হবেই হবে কিছু। কেননা দেশ জিনিসটার অনেকখানিই abstract, অন্তত একালে তাই হয়ে উঠেছে; সুতরাং তা বুঝতে হ'লে জ্ঞান জিনিসটা আহরণ দরকার, অপর পক্ষে মানুষ জিনিসটার অনেকখানিই Concrete,—তা দেখতে হ'লে চোখ খুললেই যথেষ্ট। এবং আপনাদের হিন্দু জাতটা আজকাল মন বুদ্ধিতে এমনি আলসে হ'য়ে উঠেছে যে, তারা কি ভৌতিক লোকে কি আধ্যাত্মিক লোকে জ্ঞানযোগকে দূরে রেখে ভক্তিযোগে কেল্লা ফতে করতে চায়। সুতরাং তাদের কাছে দেশের কথা ভাবার চাইতে একটি লোকের কথা শোনা যে আরামের তা বলাই বাহুল্য। এবং ঐ ব্যবস্থার পরিণাম ফল হচ্ছে দেশসম্বন্ধে বিশেষ অজ্ঞানতা ও ঐ মানুষসম্বন্ধে অতিরিক্ত সজ্ঞানতা। আর ওর ফল ধীরে ধীরে দেশবাসীর দেশের সেবক না বনে' ঐ মানুষের

শিষ্য বনে' যাওয়া। ওর ফলে সহজেই দেশের কথা একটু নীচে পড়েই পড়ে।

কিন্তু ডেমোক্রাসির গোড়াকার principle হচ্ছে mass-কে class-এর দিকে ধরে' তোলার চেষ্টা করা, class-কে mass-এর দিকে টেনে নামাবার মতলব করা নয়। কেননা mass যত class-এর দিকে যাবে, ডেমোক্রাটিক গভর্ণমেণ্টও তত সহজ ও সত্য হ'য়ে উঠবে আর class যত mass-এর দিকে ঝুঁকবে তত তাদের জন্য অটোক্রাটিক গভর্ণমেণ্ট অনিবার্য্য হ'য়ে উঠবে। আর অটোক্রাটিক গভর্ণমেণ্ট মানে যে ব্যুরোক্রাটিক গভর্ণমেণ্ট তা অভিধান খুঁজে না পেলেও অভিজ্ঞতা খুঁজে পাওয়া যায়ই। আর বর্ত্তমানে হিন্দুস্থানের রাজনৈতিক বক্তাদের মুখে যে বক্তৃতা শুনেছি তাতে আমার মনে হয়েছে যে, তাদের সংগ্রাম ঐ অটোক্রাটিক ও ব্যুরোক্রাটিক গভর্ণ-মেণ্টের সঙ্গে। এই অটোক্রাসি বা ব্যুরোক্রাসির সঙ্গে সংগ্রাম এক দিন দুদিনের নয়, তা চিরকালের। কেননা সর্ব্বে সর্ব্বা হবার ইচ্ছার একটা বীজাণু প্রত্যেক মানুষের অন্তরের একপাশে চিরকাল বর্ত্তমান র'য়েছে।

মানুষ যেখানে প্রাণবান ও বুদ্ধিমান সেখানে সে প্রতি মুহূর্ত্তের অভিজ্ঞতা দিয়ে তার পরের প্রতি মুহূর্ত্ত নিয়ন্ত্রিত করবার চেষ্টা করে। রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন সম্বন্ধে মানুষ বহুদিনের অভি-জ্ঞতার ফলে এই জ্ঞান লাভ করেছে যে, যখন সেটা এক জনের উপর নির্ভর করে তখন সেটা একদিকে যেমন খুবই ভাল হতে পারে অন্যদিকে আবার তেমনি খুবই খারাপ হতেও আটক নেই। কিন্তু যখন সেটা দশজনের উপর নির্ভর করে তখন সেটা ভালর দিকে যত

ভালই হোক্ না কেন, খারাপের দিকে খুব খারাপ একেবারে হতে পারে না। অটোক্রাসির মধ্যেই নিরোর আবির্ভাব সম্ভব, অটোক্রাসির মধ্যেই মাদাম পম্পাদোর মাদাম ড্যুবারির সম্মোহন মন্ত্রের সফলতার সম্ভাবনা। দেখে শুনে মানুষ বললে—কাজ নেই আমার চতুর্দ্দশ লুইয়ের দেওয়া সম্পদ গৌরব, ষোড়শ লুইয়ের দেওয়া-বেদনা ও অশ্রুর সম্ভাবনাকে অসম্ভব করে' তুলতে হবে। দুঃখে কষ্টে ক্লান্ত মানুষ তখন বলেছিল—সুখে আমার কাজ নেই, স্বস্তিই আমার ভাল। উৎকৃষ্টের সম্ভাবনা অপকৃষ্টের সম্ভাবনাকেও জাগিয়ে রাখে। দুঃখের কষাঘাত সহ্য করতে না পেরে মানুষ বলে' ফেল্‌লে—উৎকৃষ্টের আশা একেবারে ছাড়তে হয় তাও স্বীকার কিন্তু অপকৃষ্টের অবিচার অজ্ঞানতা ও হৃদয়হীনতা আর চাই নে। সে দিন থেকে এ-যুগের ডেমোক্রাসির সূত্রপাত। আজ হিন্দুস্থানে রাজনৈতিক বক্তাদের মুখে ঐ ডেমোক্রাসিরই সূত্র টীকা ও ভাষ্য শোনা যাচ্ছে।

ডেমোক্রাসির মতলব হচ্ছে এই যে, পাঁচজনে মিলে দেশশাসন কর্‌বে আর দশজনের মতামত নিয়ে। কেননা এটা সত্য বলে' ধার্য্য হয়েছে যে, দেশের দশজন সমাজের মঙ্গল কিসে হবে তা বুঝতে না পার্‌লেও অমঙ্গল কিসে হচ্ছে তা টের পায়। কারণ মানুষমাত্রই নিজের ইষ্ট না বুঝলেও নিজের কষ্ট বোঝবার বেলায় দেরী করে না। কল্পনা থাকে দু'একজনের কিন্তু বাস্তবের জ্ঞান থাকে সবারই। ডেমোক্রাসির ব্যবস্থা হচ্ছে দু'এক জনের কল্পনাকে না-মঞ্জুর করে' সবার বাস্তব জ্ঞান দিয়ে কাজ চালান। কারণ এটা দেখা গেছে, দু'একজনের কল্পনা দেশকে যেমন আকাশেও উড়োতে পারে তেম্‌নি আবার পাতালেও ঠেলতে পারে।

সুতরাং এই ডেমোক্রাসির পরিপন্থী হচ্ছে কোন ব্যক্তিবিশেষের প্রভাব—যদি সে প্রভাব class-কেও অন্ধ করে' তোলে—অবশ্য mass চিরকালই অন্ধ এবং ব্যক্তিবিশেষের প্রভাবেই হেলে দোলে টলে ও গলে। বর্ত্তমানে হিন্দুস্থানের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শ্রীযুক্ত মোহনচাঁদ করমচাঁদ গান্ধীর প্রভাবও কতকটা ঐরকম হয়ে দাঁড়িয়েছে। গান্ধীজির প্রভাব দেশের জনসাধারণকে ত একরকম অন্ধ করে' তুলেছেই, শিক্ষিত সম্প্রদায়েরও অন্তত এক চোখ কানা করেছে। অবশ্য গান্ধীজির প্রভাবের যে, একটা সুফল না আছে তা নয়। ওর সুফল হচ্ছে এই যে, তা অন্ধ mass-কে সচল করেছে—আর ওর কুফল হচ্ছে এই যে চোখওয়ালা class-কে অন্ধ করে' তুলেছে। ওই সুফলটা হচ্ছে দেশের রাজনৈতিক সুফল—সাময়িক ও বর্ত্তমানের, আর ওই কুফলটা হবে দেশবাসীর psychological কুফল—ভবিষ্যতে যেটা থেকে যাবে। গান্ধীজির মুখের কথা আজ সমস্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়কে চিন্তার হাত থেকে অব্যাহতি দিয়েছে। ওর কুফল বর্ত্তমানের গণ্ডগোলে ধরা না পড়লেও ভবিষ্যতের পটে আঁকা রয়েছে। গান্ধীজি খুবই বড় কর্ম্মী, তবে তিনি খুব বড় thinker নন; কিন্তু তাঁর প্রভাব আজ সবার চিন্তা-শক্তিকে আড়ষ্ট করে' দিয়েছে। জ্ঞান বিজ্ঞানের কথাও আজ গান্ধীজির মুখ থেকে বেদবাক্য বলে গ্রাহ্য হচ্ছে। ঐ অবস্থা ডেমোক্রাটিক স্বরাজ লাভের অবস্থা নয়। ও-অবস্থার logical conclusion হচ্ছে slave mentality কায়েম হওয়া।

আপনি বলতে পারেন যে, গান্ধীজি যে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের চিন্তাশক্তি আড়ষ্ট করে' দিয়েছেন তার প্রমাণ কি?—প্রমাণ আছে, দু' একটা দিচ্ছি।

গান্ধীজির মতলব হিন্দুস্থানের মাতৃভাষাগুলোকে অপ্রধান করে' একমাত্র হিন্দুস্থানীকে সবার কণ্ঠে বসিয়ে দেওয়া—ভারতবর্ষের পলিটিক্যাল-একতার খাতিরে। এতবড় একটা আত্মহত্যাকর ব্যাপারের প্রতিবাদ কিন্তু কোনখান থেকেই শোনা যাচ্ছে না। গান্ধীজির কণ্ঠস্বরের আভাসে সবার বিচার বিবেচনা সব কোথায় তলিয়ে গেছে। পলিটিক্স যে জাতীয় আত্মার মূল নয়, সেটা জাতীয় আত্মার ফুল এটা সবাই ভুলেছে। আর এই জাতীয় আত্মা গড়বার প্রধান ও শক্তিমান যন্ত্র ও মন্ত্র হচ্ছে সেই জাতির সাহিত্য—আর সাহিত্য জিনিসটা প্রত্যেক জাতি নিজ নিজ মাতৃভাষাতেই গড়তে পারে। অথচ সেই মাতৃভাষার বিরুদ্ধেই অভিযোগ যে, তা জাতীয় একতার বিঘ্ন! জাতীয় আত্মা থাকবে না অথচ জাতীয় সত্তা থাকবে এ কেবল পলিটিশিয়ানদের মুখ দিয়েই বের হওয়া সম্ভব। পলিটিক্যাল মুক্তি মানে যে আধ্যাত্মিক মৃত্যু তা হিন্দি ভাষার ভিতর দিয়ে বাঙালী ও পেশোয়ারীকে এক করবার মতলবেই বোঝা যাচ্ছে। একাকার করে' একতা লাভের ইচ্ছার জন্ম হচ্ছে পলিটিক্যাল অধীরতায়। প্রত্যেক মানুষটিকে খাটো করে' সমাজকে দেবতা করে' তোলার যে কি ফল তা হিন্দুসমাজই ঘোষণা করছে। জীবাত্মাকে বাদ দিয়ে পরমাত্মা লাভের চেষ্টা নিশ্চয়ই দর্শন শাস্ত্রের বাইরে। বঙ্গ বিহার উৎকল মাদ্রাজ মারহাট্টা গুর্জ্জর পঞ্জাব রাজপুতনা বাদ দিয়ে ভারতবর্ষটা মানচিত্রে দেখা গেলেও মনচিত্রে দেখা যায় না। চোখে-দেখা সোজা রাস্তাটাই যে সোজা নয় এ-জ্ঞান সবাই হারাত না—যদি না মহাত্মা গান্ধীজির মুখ দিয়ে হিন্দুস্থানীর গুণগান বেরুত। আসলে কিন্তু যা দরকার সেটা হচ্ছে হিন্দুস্থানের প্রত্যেক প্রদেশের মাতৃ-

ভাষার পুষ্টি, তার সাহিত্যের সৃষ্টি; তবেই দেখা যাবে যে সমস্ত হিন্দুস্থানের মনের চেহারা বদ্‌লে গিয়েছে এবং প্রাণ ও আত্মা রস পেয়ে সঞ্জীবীত হয়েছে। "আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি" এর হিন্দিও হয় না হিন্দুস্থানীও হয় না। অথচ বাঙলা ঐ কথা বল্‌তে পেরেছে বলে বাঙালী ঐ কথা শুন্‌তে পেয়েছে বলে ভারতবর্ষ আজ যা তাই। নইলে কেবল আমদানী রপ্তানীর statistics ঘেঁটে যে স্বাদেশিকতা তা জাতিকে ধনী কর্‌তে পারে কিন্তু বড় কর্‌তে পারে না। দেশকে ধনী ত হতেই হবে কিন্তু তার চাইতে বড় কথা যে, দেশকে মানীও হতে হবে। ধনী-হওয়া বস্তু জগতের ব্যাপার কিন্তু মানী হওয়া মনোজগতের কথা। মাতৃভাষার অঙ্গে আঘাত অর্থ মনেই আঘাত। মানুষের সভ্যতার ধর্ম্ম ও নিরিখ হচ্ছে ধন ও মন পাশাপাশি এগিয়ে চলা। মানুষের মাতৃভাষাকে আঘাত করা মানে soul force-কে আঘাত করা। কেননা মাতৃভাষার পিছনে রয়েছে—মানুষের শক্তিমান আত্মা।

আসলে হিন্দুস্থানের সমস্যা হচ্ছে অপূর্ব্ব, সে সমস্যার সমাধানও হতে হবে অপূর্ব্ব। আজকাল রাজনৈতিক বক্তাদের মুখে হামেশা শোনা যাচ্ছে ভারতবর্ষ এক। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, তাই যদি হয় তবে পাঁচ সাত হাজার বছরেও ভারতবর্ষে এই একত্বটা দানা বেঁধে কঠিন হ'য়ে উঠল না কেন? আসলে সারা ভারতবর্ষ এক, কিন্তু এই একত্বটা সহজ নয়। সহজ যদি হত তবে পাঁচসাত হাজার বছরেও সেটা মিথ্যা হ'য়েই রইল কেন? আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, হিন্দুস্থানের দেশ প্রদেশগুলোকে জাতিগুলোকে (তাও সম্পূর্ণ ভারতবর্ষ, হিমালয় থেকে কন্যা কুমারিকা পর্য্যন্ত কোন দিনই নয়) এককরে' রাখতে পেরেছে

তখনই যখন তার মাথায় ছিল একটা শক্তিশালী রাজসরকার। ঐ এক অশোক এক চন্দ্রগুপ্ত এক আকবর। আবার যখনই তাঁদের অভাব হয়েছে তখনই আবার ছিন্ন বিচ্ছিন্ন অবস্থা। হিন্দুস্থানের ইতিহাসে এ-খেলা অবশ্য দু' একবার হয় নি, বার বার হয়েছে। ওটা অবশ্য সারা হিন্দুস্থানের সহজ একত্বের প্রমাণ নয়।

কিন্তু হিন্দুস্থান সম্বন্ধে মজা ও মুস্কিলের কথা এই যে, সব জাতি-গুলো এক নয় বলেই যে উল্টোটাই সত্যি, তাও নয়। এটা একটা মস্ত বড় paradox সন্দেহ নেই—আপনাদের উপনিষদের ব্রহ্মের মত। এই paradox-সমস্যার সমাধান করবার জন্যে যুগে যুগে হিন্দুস্থানের বুকে নতুন নতুন ব্যথা বেজেছে, নব নব চেষ্টা ব্যর্থ হ'য়ে ফিরেছে। সারা হিন্দুস্থান এক এই হিসেবে যে, সারা হিন্দু-স্থানের পিছনে রয়েছে আর্য্য ও অন-আর্য্য সভ্যতার মিশ্রণের ধাক্কা, আবার সারা হিন্দুস্থানের জাতিগুলোর পার্থক্য এই কারণে যে, ঐ দু-রকম সভ্যতার মন্ত্র তন্ত্র যন্ত্রগুলো এক এক জাতির হাতে পড়ে' এক এক আকার ধারণ করেছে। তাই বাঙালীর মুখের জায়গায় তামিলের বসেছে নাক, আবার তামিলের নাকের জায়গায় বাঙালীর বসেছে মুখ।* বাঙালী ও তামিলের মুখ ও নাকের এই পার্থক্য ঘোচান যায় কি না জানি নে, কিন্তু ঐ পার্থক্য ঘোচান মানে ও-দুই জাতির বাগেন্দ্রিয় ও ঘ্রাণেন্দ্রিয় জখম্ করা। অবশ্য যৌগিক অবস্থায় ইন্দ্রিয়দ্বার বন্ধ করে' সমাধি লাভ করলে মনের কি অবস্থা দাঁড়ায় তা আমি জানি নে; কিন্তু মানুষের সহজ জীবনে ইন্দ্রিয়ের হানিতে যে মনেরও হানি তা কানা ও কালাকে দেখলে শুন্‌লেই

* তামিল "মুক্কু" মানে নাসিকা এবং "নাক্‌কু" মানে জিহ্বা।

বোঝা যায়। এখন মন যদি আত্মার প্রকাশের যন্ত্র হয় তবে মনের হানিতে মনের দৌর্ব্বল্যে soul force-ও আপনাকে প্রকাশ করবার ও সার্থক করবার সুযোগ পাবে না। যে বাণী ধীরে ধীরে মানুষের আত্মাকে উদ্বোধিত করবে—যে বাণীর শক্তি স্পর্শ তিলে তিলে জাতীয় আত্মার শক্তিকে জাগরিত করে' তুলবে পলিটিক্যাল বুদ্ধির ক্ষেত্রে সেই বাণীকেই লাষ্ট ক্লাশে ফেলে soul force এর ব্যাখ্যা চল্‌ছে অথচ দেশের কোথাথেকেও তার প্রতিবাদ শোনা যাচ্ছে না।

তারপর ধরুন শিক্ষার কথা। নন্‌ কো-অপারেশন মুভ্‌মেণ্টের সুরু থেকে গান্ধীজি ও তাঁর লেফ্‌টেনাণ্টদের মুখ থেকে কোথাও স্পষ্টভাবে কোথাও অস্পষ্টভাবে এই রকমের কথা শোনা যাচ্ছে যে, ছেলেদের ইস্কুল-কলেজ ছাড়াটাই একটা বড় কথা—ইংরেজ-রাজ-সরকারের স্থাপিত বিদ্যাপীঠগুলো বয়কট করাই একটা মস্ত কাজ। ছেলেরা আর যদি কিছু না-ও করে, খালি ঐ বিদ্যালাভে আপনাদের বঞ্চিত করলেই স্বরাজ-লাভটা অনেক এগিয়ে যাবে। ও-কথার স্পষ্ট ব্যাখ্যা কর্‌লে দঁড়ায় এই যে, হিন্দুস্থানের স্বরাজ লাভে আর যে জিনিসেরই দরকার হোক্ না কেন, যে-বস্তুটি নিতান্ত অনাবশ্যক সেটি হচ্ছে হিন্দু-মুসলমানের জ্ঞানার্জ্জন। অবশ্য এর উত্তরে শোনা যাবে যে, ইংরেজ-রাজসরকারের ইস্কুল-কলেজ থেকে জ্ঞানার্জ্জন হয় কে বল্‌লে?—ওখানে আসলে যে বস্তু অর্জ্জিত হয় সে হচ্ছে slave mentality. না হয় মেনেই নেওয়া গেল যে ইংরেজ-রাজসরকারের বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলোর "গুণ লখইতে লেশ না পাওবি দোষ গনইতে নাহি শেষ" এবং কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় স্থাপিত হবার পূর্ব্ব

পর্য্যন্ত বাঙালী হিন্দুর mentality-টা একেবারে ইংলণ্ডের রাজা অষ্টম হেনরীর মত lordly ছিল; কিন্তু তবুও উল্টো প্রশ্ন ওঠে এই যে, যে শিক্ষা slave mentality গড়ে' তুলেছে সেই শিক্ষার অভাব হলেই কি সবাই স্বাধীন-চেতা হ'য়ে উঠবে? তাই যদি হয় তবে নিরীহ নির্দ্দোষ নিষ্পাপ দীনুদাসের বিশ্বই হোক্ বিদ্যালয়ই হোক বা—বিশ্ব বিদ্যালয়ই হোক্ এ সবের ত কোন বালাই নেই—বিদ্যা-লয়ে যাওয়া ত দূরের কথা, একটা সে চোখেও দেখে নি—সে কোন রকমের হরফ চেনে এ অপবাদও কেউ কোনদিন দিতে পার্‌বে না—গাঁয়ে দারোগো ঢুক্‌লে তারই বুকের পাঁজরায় তার হৃদ্‌পিণ্ডটা সবার প্রথমে অস্বাভাবিক ভাবে আছাড় খেয়ে পড়তে থাকে কেন। Negativism দিয়ে positive কিছু লাভ হয় কেবল এক বৈদান্তিক-বিদ্যালয়ে, পলিটিক্যাল-পাঠশালায় তার কোন সম্ভাবনা নেই। বৈদান্তিক মুক্তি আর পলিটিক্যাল মুক্তি যে এক কথা নয়, তা ত চোখের সামনেই দেখা যাচ্ছে। পৃথিবীতে বেদান্তের কোন ধারও ধারল না যারা তারা আজ পলিটিক্যালহিসেবে মুক্ত—আবার যারা জন্ম জন্ম বেদান্তের ব্যাখ্যা করে' কাটাল তারা আজ পলিটিক্যাল মুক্তির জন্য হাঁকা হাঁকি সুরু কর্‌ল।

আসলে কিন্তু যে জিনিসটা সবার আগে সবার মাঝে সবার পিছনে দরকার সেটা হচ্ছে জাতির জ্ঞানার্জ্জনের স্পৃহা জাগিয়ে রাখা জ্ঞানার্জ্জনের পন্থা খুলে রাখা। Light, light more light. এ-যুগের এক বাঙালী হিন্দু-কবিও গান করেছেন—"আলো আমার আলো ওগো আলো ভুবন-ভরা।" দেশের হিন্দু-মুসলমান নেতারা যদি সমঝেই থাকেন যে, সরকারী বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলো আলো খালি অল্প

করেই বিতরণ করছে তবে প্রথমেই তাঁদের দরকার বিদ্যাপীঠকে নিজ হাতে গড়ে' তোলা যেখান থেকে জাতির অন্তরে বাহিরে আলোর অজস্র রেখা সম্পাত হবে। জাতির জ্ঞানের প্রদীপ অত্যুজ্জ্বল হয়ে না উঠলে স্বরাজ লাভও হবে না আর লাভ হলেও তা টিকবে না। সুতরাং নেতাদের পক্ষে ঐ দায়িত্ব এড়িয়ে গিয়ে শুধু বক্তৃতা করে' বেড়ানো' খুব সহজ হ'তে পারে কিন্তু তাই বলেই যে তা শিব, তা অবশ্য নয়। এর চাইতেও বড় মজার কথা আছে। Village organisation-এর কথা উঠেছে। Village organisation করবে কারা ?—ছেলেরা, যারা সরকারী কলেজ থেকে বেরিয়ে এসেছে। কলেজের ছেলেরা যারা পড়া ছেড়েছে, তারা প্রত্যেকে নিশ্চয়ই অন্তত পক্ষে চোদ্দটি বছর করে' কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইস্কুল-কলেজে কাটিয়েছে। এটা সত্য বলে' ধার্য্য হয়েছে যে, ওখানকার শিক্ষা কেবল slave-ই গড়ে তোলে। সুতরাং চোদ্দ বছরে ঐ ছেলেরা নিশ্চয়ই পাকা slave হ'য়ে উঠেছে। এই সব slave-দেরই পাঠান হবে village organisation করবার জন্যে! অথচ এতে দেশের শিক্ষিত কেউ-ই শঙ্কিত হ'য়ে উঠেন নি। একদিকের হিসেবে যারা কেবলই slave আর একদিকের হিসেবে তারা যে কি করে' স্বাধীনতার বাণী প্রচার করবে, মুক্তির স্পর্শ পল্লীতে পল্লীতে সংক্রামিত করে' দেবে তা বুঝবার ক্ষমতা আছে কেবলমাত্র এক পলিটিক্যাল বুদ্ধির। Slave-দের সংস্পর্শে এসে তাদের আত্মার স্পর্শে পল্লীতে পল্লীতে সব village Hampden-এর জন্ম হবে এমন অদ্ভুত কথা অবশ্য soul-force-এর উপাসকদের বিশ্বাস করা চলে না। তবুও যে এই ব্যবস্থাই হচ্ছে তার কারণ বোধ হয় শিক্ষিতেরা হয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের slave গড়া

কথাটা বিশ্বাস করেন না, নয় soul force-কে তাঁরা অত উঁচুতে স্থান দেন না, হয় ত তাঁদের বিশ্বাস যে soul force-এর চাইতেও বড় force হচ্ছে মুখের কথা। কথার সঙ্গে কাজের যে এমন নন্-কো-অপারেশন চলছে সে কেবল Non-co-operation-এর দৌলতে। অথচ কোনখান থেকে এর তেমন সমালোচনা চলছে না। বলুন ত এতে democratic স্বরাজ এগুচ্ছে, না পেছুচ্ছে? এখন মনে পড়ছে এক Non-co-operator ছোকরার কথা। সে বলছে, "মহাত্মা গান্ধী যখন বলেছেন ন' মাসে স্বরাজ লাভ হবে তখন তা নিশ্চয়ই হবে, তবে আমাদের independence লাভ করতে আরও কিছু সময় লাগতে পারে।" মনে করবেন না ছোকরাটি ঐ কথাটা বলেছিল কৌতুক করে,—মোটেই না। কেননা সে ছোকরাটির আর যে দোষই থাক না কেন, এ অপবাদ তাকে কেউ দিতে পারবে না যে, wit বা humour বলে' পদার্থ তার দেহে বা মনে কোথাও আছে। বিশেষত গান্ধীজির কথা নিয়ে satire করা তার কাছে একটা অত্যাশ্চর্য্য অদ্ভুত অসম্ভব ব্যাপার, কেননা গান্ধীজি তার কাছে একজন অবতার-বিশেষ।

তবে অবশ্য নিরাশার কিছুই নেই। কেননা জেগেছে যে জাত, প্রাণবন্ত হয়েছে যে জাত, তার সাম্নে কোন বাধাই বাধা নয়—কোন ভুলই ভুল নয়। আমরা সূক্ষ্মজগতের জীব যারা তাদের কাছে ভুল ভুল বলে' এম্নিই ধরা পড়ে—কিন্তু স্থূলজগতের যারা তাদের ভুলকে ভুল বলে' জান্তে হয় অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে। এক Non-co-operator কলেজের ছেলে উত্তর বাঙলার গাঁয়ে মাসখানেক ঘুরে শহরে ফিরেছে—এইবার তার চোখ ফুটেছে। তার চোখ ফুটেছে

এই যে, দেশের mass-কে জাগাতে হলে খালি দু' দশজন ঘুরে বেড়িয়ে বক্তৃতা দিলে চল্‌বে না—চাই এমন কতগুলো লোক, যারা পল্লী-জীবনকে বরণ করে' সারা জীবন ঐ পল্লীতে থাকবে পল্লীর সুখে দুঃখে আপনাদের জীবন মেশাবে। সে আজ পল্লীবাসীদের বিরাট অজ্ঞতার সন্ধান পেয়েছে—যে অজ্ঞতার পাহাড় বক্তৃতায় টলবেও না গল্‌বেও না। চাই অনেক লোকের জীবনব্যাপী সাধনা। চাই শিক্ষার ব্যবস্থা শিক্ষার বিস্তার। পল্লীকে সামনা সামনি দেখে আজ সে বুঝেছে যে, সেখানে romance-এর স্থান নেই—আছে কেবল কঠিন উৎকট reality. কথায় কথায় সে বলছিল কোন গ্রামে একটা ইস্কুলের কথা। ইস্কুলটি বেশ চলছিল--ছাত্রও জুটেছিল মন্দ নয়। কিন্তু ইস্কুলটি Non-co-operation-এর ধাক্কায় ভেঙে গেল। ছেলেটি ওর উপরে অবশ্য কোন মন্তব্য করলে না। কিন্তু আমার কানে যেন এসে বাজল—a suspicion of regret.

আজ এইখানেই ইতি করি। মাঝে মাঝে আমাকে আপনার খবর দেবেন। জানেন ত আপনার খবর পেলে আমি কত খুশী হই। তবে আসি এখন। সালাম। ইতি—

আপনার দোস্ত

আবুল ফজল

একখানি পত্র

অনেকদিন পরে আপনাকে চিঠি লিখছি। বহুকাল নানারকম গণ্ডগোলে আর নানা বাজে জিনিষ নিয়ে সময় গেল। তার মধ্যে প্রধান, আমার বি, এ, পরীক্ষা। পরীক্ষার এক মাস আগে থাকতে পরীক্ষা-সমরে অবতীর্ণ হবার জন্যে প্রস্তুত হতে হল; পরীক্ষাও চলল পুরো এক মাস; আর পরীক্ষা দিয়ে এত শ্রান্তক্লান্ত হয়ে পড়েছি যে, এখনও একমাস লাগবে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পেতে। আমি দেখলাম লোকসমাজে মেশবার মত শক্তি বা চেহারা আমার নেই, তাই * *-এর মত নীরব নিস্পন্দ জায়গাই প্রশস্ত মনে করে আমি এখানে সোজা চলে এলাম। এখানে এখন কিছুদিন আমি একেবারে চুপচাপ করে থাকব। মস্তিষ্ক চালনা করব না। * * *

কিন্তু এত পড়া শোনার ফলে ঐ মস্তিষ্ক-চালনাটাই যা একটু আধটু হয়েছে। হয় ত খাটবার ক্ষমতা, একটানা পড়বার ক্ষমতা, স্মৃতিশক্তি—এই সব একটু বেড়েছে। কিন্তু এ আর বেশি কি হল?—শিক্ষার উদ্দেশ্য ত এ নয় যে, সুচারুরূপে মানসিক ব্যায়াম প্রভৃতি সম্পন্ন করতে পারব। তার উদ্দেশ্য এর চাইতে ঢের বেশি কিছু। আজ আমি ভাবছিলাম, প্রবেশিকা পাশ করবার পর এই চার বছরে কি করলাম?—ভেবে দেখতে গেলে কিছুই না। কেবল

কতকগুলো অসংলগ্ন জিনিষ দরকারমত আওড়াতে পারি। এবার ত ইকনমিক্স ফিলসফি—এসব আমি খেটে পড়েছি। অর্থনীতিশাস্ত্র সম্বন্ধে হয় ত একরকম জ্ঞানার্জ্জন করা গেছে, কিন্তু খুব বেশি অকেজো হয়েছে ঐ দর্শন পড়াটা। এখন কলেজে ও-জিনিষটা যে-ভাবে পড়া হয়, তাতে কেবল কতকগুলো মতামত কণ্ঠস্থ করাই সম্ভব। আর ওরাও তাই চায়। বেশি পড়লে বা স্বাধীন চিন্তা দেখাতে গেলেই বিপদ। Psychology জিনিষটা তবু একটা exact science; ওটা পড়ে ফল আছে। কিন্তু metaphysics-এর মানেই হচ্ছে জীবনের প্রকৃত সত্য সম্বন্ধে আলোচনা করা। আমি "জীবন" কথাটা ব্যবহার করেছি, কারণ যদি মানুষের চিন্তা ও আকাঙ্খা প্রবৃত্তি এই সব জিনিষের সঙ্গে দর্শনের কোনো সম্বন্ধ না থাকে, তাহলে তার কোনো মানেই থাকে না। আমি বলছি না যে, metaphysics-এ তা নেই। কিন্তু আমার বিশ্বাস, এখন যে-ভাবে ও জিনিষটা পড়ানো হয়, তার একমাত্র ফল এই হয় যে, চিরজন্মের মত ঐ বিষয়ে ছাত্রের আন্তরিক বিতৃষ্ণা জন্মে যায়। সমস্ত বইটা সে পড়ে যায়, কিন্তু নিজের চিন্তা আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে তার কোনো যোগাযোগ সে আবিষ্কার করতে পারে না। কি করেই বা পারবে?—তার মধ্যে জানবার ঔৎসুক্যের ত সঞ্চার করতে হবে। তাকে ত জানিয়ে দিতে হবে, বুঝিয়ে দিতে হবে জিনিষটা আমাদের কাছে কত দরকারী, তার অর্থ কত নিগূঢ়। আই. এ. পাশ করে সে হঠাৎ দেখে তার সামনে একটা প্রাণহীন, অতি সূক্ষ্মতত্ত্বপূর্ণ বিষয়। এই জিনিষটা যে কি, সে কথা তাকে কেউ বোঝালে না। যার মনের স্বাভাবিক ক্ষমতা খুব বেশি, তারও যে কিছু ক্ষতি হয় না, তা

নয়—তবে সে এই সব বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে এগিয়ে যায়। কিন্তু সাধারণ ছেলে ?—সে ঐখানেই আট্‌কে গেল।

একটা নতুন জিনিষ শিখতে হবে। সে ত খুবই ভাল; কত কি জানব, কত জ্ঞান জন্মাবে, আনন্দ পাব। একটা একেবারে নতুন দেশ দেখা যেমন। কিন্তু দেশ দু'রকমে দেখা যেতে পারে। এক, এইরকম ভাবে যে, প্রথম থেকে ঐ দেশের বিষয় কিছু বলে দেওয়া গেল, সে সম্বন্ধে জানবার আকাঙ্খা জাগরিত করা গেল; তারপর নতুন দর্শককে সেই দেশের একটা কোনো জানাশোনা ভালো জায়গায় নিয়ে গিয়ে সেখানকার বিশেষত্ব প্রভৃতি বোঝানো হল। আর একরকম দেখা হচ্ছে, American tourist-দের মত দেখা। তারা জায়গা দেখতে হবে বলে পৃথিবী পর্য্যটনে বেরিয়ে পড়ে। প্রথমেই খুব একটা বড়রকম programme করে ফেলে, তাতে ঠিক করা থাকে কোন্ দেশে কতদিন কোন্ শহরে কত ঘণ্টা সে খুব জোর থাকতে পারে। তার পর সে বিষম দ্রুতভাবে একস্থান থেকে একস্থান অক্লান্তভাবে পরিভ্রমণ করে বেড়ায়, আর সব বিষয়ে তার ছোট নোটবুকে দু'চার লাইন লিখে ফেলে। তার-পর সে পরম পরিতুষ্ট হয়ে দেশে ফিরল, হয়ত পৃথিবী সম্বন্ধে একটা বইও লিখে ফেল্‌ল। সে বই সাধারণত ভাল-বাঁধানো আর দেখতে শুনতে চমৎকার হয়, আর তাতে ঢের ছবি থাকে বলে লোকে সেই বই কেনে। বই পড়ে কতটা জানা গেল, লোকে তা ঠিক ভাবে না; তারা ভাবে কি আশ্চর্য্য শৃঙ্খলা, কি plan, কি programme, কি ঐশ্বর্য্য, ইত্যাদি। কিন্তু এ দেখার মূল্য কতখানি ?

আমাদের দেশের শিক্ষার উদ্দেশ্যও এই American tourist-

এর মত। ফলে ছাত্রদের খুব জোর একটা "airy omniscience" হয়, যেটা মানসিক উন্নতির পক্ষে মারাত্মক জিনিস।

আমি এ সমন্ধে এত কথা বল্লাম এইজন্য যে, আমার মনে হয় জীবনের সঙ্গে যোগ না রাখতে পারাই আমাদের শিক্ষার অবনতির প্রধান কারণ। বিদেশ থেকে একটা আস্ত জিনিষ এ দেশে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে, এ দেশের জল-হাওয়ায় সে টিঁকে থাকতে চায় না, তাই অনেক অনেক অস্বাভাবিক উপায় অবলম্বন করে তাকে বাঁচিয়ে রাখা গেল। মানুষের মনের ধর্ম্ম কোনরকমে নিজেকে উপস্থিত অবস্থার সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া, তাই অনেক টানাটানি করে যেমন করে হোক্ চলছে। কিন্তু বাইরে যতটা না হোক্, ভিতর থেকে দেশের মন অসার, নিস্পন্দ, প্রাণহীন হয়ে আসছে। শিক্ষা জিনিষটা আমাদের মন পর্য্যন্ত পৌঁছয় নি। লজিক, কেমিষ্ট্রী সবই আমরা কিছু কিছু জানি। যখন তর্ক করবার দরকার হয়, তখন বাইরের পোষাকের মত, বর্ম্মের মত আমাদের জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের আবরণে আমরা আচ্ছাদিত হয়ে নিই। কিন্তু যেই ফের জীবনে ফিরে এলাম, ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলাম, তখনই আমাদের পোষাক অনাবশ্যক হয়ে পড়ল, আর আমরা তাকে যতশীঘ্র পারি ত্যাগ করে নিষ্কৃতি পেলাম। এই জন্যে আমাদের আদর্শে, আমাদের প্রবৃত্তিতে, আমাদের কথায়, আমাদের কাজে এত বৈষম্য। তাই সভায় সমিতিতে স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধে লেক্‌চার দিয়ে ঘরে এসে নিজের পরিবারের সকলের উপর দৌরাত্ম্য করতে আমাদের কিছুমাত্র বাধে না! কারণ স্ত্রীর শিক্ষা যে ভালো—একথা আমরা যুক্তিতে জানি, মনে জানি নে। আমাদের শিক্ষা আর আমাদের জীবন জলের উপর তেলের মত

ভাসছে, মিশছে না। শিক্ষার সংস্কারই আমাদের প্রধান এবং আপাততঃ একমাত্র দরকার। নন্-কো-অপারেশন যদি শিক্ষা-বর্জ্জন করে, তাহলে তার কোনো আশা নেই। এখনকার যুগে যে-জিনিষ মনকে, চিন্তাশক্তিকে স্পর্শ না করে, তার পতন অনিবার্য্য। আমাদের সর্ব্বদাই mental food চাই। এখন যে mental food পাই সেটা tinned food, বিদেশে তৈরি,তাই সেটা হজম করা বাঙালীর জীর্ণ পরিপাকশক্তির পক্ষে অসাধ্য বল্‌লেই চলে। আমাদের স্বাভাবিক আহার্য্য চাই। তাই বলে কি বল্‌বং বিলেতের সব সম্পর্ক ত্যাগ করতে হবে?—কখনই নয়। ওদের মধ্যে যদি কিছু ভাল থাকে, তবে তাকে একশ'বার বরণ করে নিতে হবে। খাবারের কথাই ধরা যাক না। বিদেশের কড়া মদ না হয় ত্যাগ করলাম, তাই বলেই যে শুধু ঘাস-পাতা খেয়ে থাকতে হবে, এমন কোনো কথা নেই। ওদের অনেক খাবার খেতেও সুস্বাদু, তার ফলও ভাল; যতদিন না দেশে কল-কারখানা হয়, ততদিন ছেলের অসুখ হলে তাকে Mellins' food দিতেও কোন দোষ দেখি নে। আমাদের দেশ গরীব, তাই ওদের যা এমনি চলে আমাদের পক্ষে তা বাহুল্য, তা বিলাসিতা। সেই জন্যে কোন্‌টা নিতে হবে, কোন্‌টা ত্যজ্য, সে কথা আমাদের ঠিক করা চাই। ঠিক করা এমন কিছু শক্তও নয়।

জ্ঞান সম্বন্ধে, শিক্ষা সম্বন্ধে এ কথা অধিকতরভাবে সত্য। কারণ জ্ঞানের কাছে দেশকাল বা পাত্র বলে কিছু নেই। জ্ঞানের উদ্দেশ্য অজ্ঞানান্ধকার দূর করা। সেই জন্য যে-দেশেই ব্যবহার হোক্ না কেন, তার কাজ সমানই চলবে। যদি না চলে ত সে জ্ঞান সত্য নয়। Goethe জার্ম্মান বলে অনেক ইংরেজ সমালোচক এখন

তাঁর লেখার দোষ বার করতে আরম্ভ করেছে;—হাজার হোক জার্ম্মান ত, কত আর হবে! বলা বাহুল্য এটা চরম মূর্খতা ও অন্ধ দেশভক্তিরই পরিচায়ক। সেইরকম, এখন অনেকে বলে থাকেন ইংরেজের বই ফেলে দাও, আমরা তাদের সাহিত্য বিজ্ঞান দর্শন প্রভৃতি ছেড়ে দিয়ে নিজেদের কবিকঙ্কন, চণ্ডী প্রভৃতি খুলে বসি। অনেকে প্রমাণ করবেন যে, বিজ্ঞানের উন্নতি আমাদের দেশে অনেককাল আগেই যতটা হয়েছিল, এখন তার সিকির সিকিও হয় নি—দেখ না, রামায়ণ মহাভারতে পর্য্যন্ত পুষ্পকরথের কথা রয়েছে, আর তোমরা aeroplane দেখেই এত আশ্চর্য্য হচ্ছ! এরা দেশের যা কিছু ছিল এবং আছে, তাকেই অমর করতে চায়। কিন্তু কালের সঙ্গে যার যোগ নেই, তার অমরত্ব উপকথার স্বপ্নকাহিনীর মতই অমূলক। একে অমি দেশ-ভক্তি বলি নে। দেশের খারাপ জিনিষের প্রতি ভক্তি ত দেশ-ভক্তি নয়, দেশের মধ্যে যা কিছু চিরকালকার এবং চিরসত্য, তার প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা দেখানো, বর্ত্তমান কালের সঙ্গে সম্মিলিত করে তার উজ্জ্বলতা আরো বর্দ্ধিত করার যে চেষ্টা, তাকেই আমি দেশভক্তি বা স্বদেশপরায়ণতা বলব। অনেকে বি, এ, এম, এ, পাশ করে নিজের যথাসম্বল বুদ্ধি খরচ করে প্রমাণ করতে বদ্ধপরিকর হয় যে, টিকি রাখা স্বাস্থ্যকর ও মঙ্গলজনক। আমি নিজে জানি একজন "বিজ্ঞ" ব্যক্তি টিকির সঙ্গে বৈদ্যুতিক প্রতিক্রিয়ার অতি সূক্ষ্ম যোগাযোগ দেখিয়ে এই কথা প্রমাণ করতে চেষ্টা করছিলেন। এতেই আরো প্রমাণ হচ্ছে আমাদের দেশের শিক্ষার ফল কি রকম হয়।

রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, পোষ্টাপিস্, ইলেক্ট্রিক্ লাইট দূর করে

দিতে যাঁরা বলেন, ভেবে দেখতে গেলে তাঁদের যুক্তিও সমানভাবে যুক্তিশূন্য, অর্থহীন এবং অনর্থকারী।

তা নয়, শিক্ষাকে দূর না করে, তাকে নিজের দেশ এবং অবস্থার সঙ্গে এবং বর্ত্তমান কালের সঙ্গে সম্মিলিত করে তুলতে হবে। নন্‌-কো-অপারেটররা যদি এই কাজ করেন, তাহলে আমার সমস্ত সহানুভূতি ও শ্রদ্ধা তাঁদের কাজের দিকে যাবে। কিন্তু এই চির-পুরাতন চির-নূতন তত্ত্বটি কি তাঁদের মনে পৌঁছেচে?

এইজন্যে রবীন্দ্রনাথ এখন বিদেশে যে কাজ করছেন, অনেকের মনে তার সার্থকতা সম্বন্ধে সন্দেহ থাকলেও, এটা আমি জোর করে বলতে পারি যে, তাঁর চেষ্টা সফল হলে তাতে যতটা দেশের প্রকৃত উন্নতি হবে, অমন আর কিছুতেই হবে না। কারণ তিনি আমাদের শিক্ষার অবস্থা ও প্রণালীর উন্নতি করতে চেষ্টা করছেন, তাকে এমন ভাবে দেশে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করছেন, যাতে তার সঙ্গে জগতের স্বাধীন এবং উন্নত চিন্তার যোগাযোগ থাকতে পারে। শিক্ষাকে এমনি ভাবে প্রাণের জিনিষ করে তুলতে পারলে, সেটা বেঁচে থাকবে। কিন্তু এ বিষয়ে সমবেত চেষ্টা চাই। এ বিষয়ে যদি সকলের চোখ খুলে যায়, তাহলে সবাই বুঝতে পারবে যে, স্বাধীনতাই বল, আর স্বরাজ্যই বল, শিক্ষার উন্নতি এবং সমস্ত দেশে তার প্রচার ভিন্ন কিছুতেই কিছু সম্ভবপর হবে না। শান্তিনিকেতনের জন্যে যে আদর্শ রবীন্দ্রনাথ সম্ভব করে তুলতে চেষ্টা করছেন, সমস্ত দেশের শিক্ষাপদ্ধতির সেই আদর্শ হওয়া উচিত, এবং সেইটেকে সম্ভবপর করে তুলতে চেষ্টা করা উচিত। এখন দিনের পর দিন আমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে আসছে। সমস্ত আলো যে ক্ষীণজ্যোতি হয়ে

পড়ছে, কখন্ যে নিভে যাবে কে জানে? এখনই সকলের জেগে উঠে কাজ করা উচিত। সবাই চেস্টা করলে ব্যাপারটা এমন কিছু কষ্টসাধ্য বা গুরুতর নয়। বাইরের কাছে হাত-পাতা আর নয়; যারা নিজেরা কাটাকাটি করে, আর প্রতিবেশী একজাতীয় লোকের উপর অযথা অত্যাচার করতেও যাদের বাধে না, তারা কি করতে আমাদের কাছে সদয় হয়ে উঠবে? ওদের হাসিকেই আমি আরো ভয় করি। আবার এটাও ঠিক যে, পুরাতনের দিকে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা আরো মারাত্মক। মুনিঋষির যুগ গেছে। গেছে মানে এই ভাবে গেছে যে, তার হুবহু নকল করা আর চলে না। তার মধ্যে যা ভাল ছিল, তা তখনকার পক্ষে যতটা সত্য ছিল এখনও নিশ্চয়ই ঠিক তেমনই সত্য আছে; সেই ভালটাকে নিতে হবে, আর এতদিনকার চিন্তার যে ফল, তাকেও নিতে হবে। কেবল বাড়াবাড়ির দিকে কেন যেতে হবে? স্থিরচিন্তার ফলে কোণাকোণি না গিয়ে যে মধ্য পথে যাবার উপায় আবিষ্কৃত হয়, বিপরীত অবস্থার মধ্য থেকে যে সামঞ্জস্যপূর্ণ সত্য আবিষ্কৃত হয়, সেইটেকেই গ্রহণ করতে হবে। আমাদের একটা শিক্ষার, উন্নতির আদর্শ ঠিক করে নেওয়া হোক; আর এই দুর্দ্দিনের সমস্ত বাধাবিঘ্ন দুঃখকষ্টকে বরণ করে নিয়ে, সংগ্রামের জন্যে প্রস্তুত হয়ে চলতে আরম্ভ করা হোক্। সমস্ত জীবনটাই ত একটা সংগ্রাম! এই যুদ্ধ করবার আনন্দটাই কি কম? যদি সম্মুখে অটল অচল ধ্রুব আদর্শ থাকে ত তার কাছে পৌছবার জন্য কি না করা যায়? সেই আদর্শকে পাবার জন্যে যে স্বর্গীয় প্রেরণা আসে, তার কাছে কোথায় আচার অত্যাচার বা ভয় বাধা বিঘ্ন! তখন দেখা যাবে যে "পৃথিবীর

অধিকাংশ দুঃখই হেসে উড়িয়ে দেওয়া চলে। অন্ধকারে প্রত্যেক ছায়াটাকেই ভূত বলে মনে হয়—মনটা অন্ধকার করে থাকলে আমাদের ভাগ্যলক্ষ্মীকে অকারণে বা অল্পকারণেই অপদেবতা বলে কেবলি ভ্রম হতে থাকে। খুব জোরে হাস্‌তে শিখলে তারই আলোয় অন্তত সংসারের মিথ্যে ভূতগুলো দৌড় মারে। খুব গলা ছেড়ে ঐ হাসতে পারাটাই পৌরুষ। এই হাসতে পারা, বিপদকে অগ্রাহ্য করার শক্তি কোথা থেকে আসে?—মনের মধ্যে জ্ঞানের আলো সঞ্চারিত হলে, নিজের আদর্শের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস থাকলে। এই আদর্শকে স্থিরীকৃত করা, এবং তার উপর অসীম অটল বিশ্বাস স্থাপন করাটাই আমাদের প্রধান দরকার। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে এবং জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে আমার স্থির বিশ্বাস হয়েছে যে, আমাদের দেশের অবনতির মূল কারণ চিন্তাশক্তির অভাব, শিক্ষার অভাব। চিন্তা-শক্তির পরিচালনা হলে তবে মানুষ কোনো জিনিষকে চারিদিক থেকে দেখতে পায়, সত্যলাভের আকাঙ্খা তার মধ্যে জাগে, সে স্বাধীন হতে চায়, এবং স্বাধীনতা না পেলে কিছুতেই ছাড়ে না। যারা ঘুমোচ্ছে, বা তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাবে ভাত খাচ্ছে, বেড়াচ্ছে, পরনিন্দা করছে, বা আচারবিচার নিয়ে অর্থহীন প্রহেলিকা সৃজন করছে,—তারা স্বাধীনতার মূল্য কি করে বুঝবে? আমাদের দেশের শত-করা নিরানব্বই জনের উপর লোক শিক্ষা পায় নি, তারা ঘুমোচ্ছে; তারা সমস্ত জগৎসংসার, ভালমন্দ, উচিত-অনুচিত সম্বন্ধে অজ্ঞ, এবং যা আরো খারাপ—সম্পূর্ণ উদাসীন। এই ঔদাসীন্যই জ্ঞানলাভের প্রধান শত্রু, এবং এই ঔদাসীন্য দূর করবার কোনো miraculous উপায় নেই—যে এক মুহূর্ত্তে সেরে যাবে।

তার জন্যে অনেক সময়, অনেক সহিষ্ণুতা দরকার। সব বিষয়েই দেখা যায় "the longest cut is the shortest one in the long run." আর একবার আরম্ভ করে দিলে শেষ হতে কতক্ষণ ?

আমার মনে হচ্ছে আমি "সেকেলে" লোকের মত কথা বলছি ! কিন্তু আমি "সেকেলে" লোক মোটেই নই। সববিষয়েই আমি কালের সঙ্গে পা ফেলে চলতে চাই। তবে কতকগুলো platitude-এর মধ্যে অনেক সত্য থাকে। অনেক পুরোনো কথা চিরনূতন। Prudence জিনিষটা যে অনেক সময়ে sin এ গিয়ে দাঁড়াতে পারে, সে কথা আমি ভাল করেই জানি। তবে অনেক জায়গায়, বিশেষত বিপদের সময়, স্থির চিন্তা দরকার। তা ছাড়া উপায় নেই।

আমার এখন স্থির বিশ্বাস যে, আমাদের দেশের উন্নতির জন্য আমাদের প্রধান কাজ হওয়া উচিত, এ দেশের শহরে এবং গ্রামে শিক্ষার আদর্শ ঠিক করা, এবং সেই আদর্শকে পাওয়ার চেষ্টা গ্রামে গ্রামে সঞ্চারিত করে দেওয়া। এজন্যে দেশের বড়লোকদের দান, চিন্তাশীল ব্যক্তিদের সাহায্য, এবং প্রফেসর ও ছাত্রদের সমবেত চেষ্টা আবশ্যক।

আমি যখন চিঠি লিখতে আরম্ভ করি, সত্যি বলছি তখন মোটেই মনে করি নি যে, শিক্ষা সম্বন্ধে এতগুলো কথা লিখে ফেলব। আমি দেখছি নিজের প্রবৃত্তিকে দমন করতে পারি নে। আর লিখতে আরম্ভ করলে আমি চলি নে, আমার কলম চালায়। এই কথাগুলো আমার মনে কিছুদিন থেকে ঘুরছে, তাই আপনাআপনি এতটা বেরিয়ে গেল। আপনি এ সম্বন্ধে কি মনে করেন জানতে ইচ্ছে

হয়। আজ আরো অনেক কথা লিখব মনে করে বসেছিলাম, তবে এই একটা কথা নিয়েই এতটা লিখে ফেলেছি যে, আর লেখা উচিত মনে হচ্ছে না। জানি নে আপনি এতটা বাজে-বকা সহ্য করতে পেরেছেন কিনা!

আমি এখন কিছুদিন এখানে থেকে পরে কলকাতায় যাব। আমি বোধহয় কলকাতায় এম, এ-ই পড়ব। তবে সেইটে ঠিক করতে পারছি নে। অনেকে বলছেন, Bombay-তে কোনো ভাল Commercial College-এ গিয়ে পড়তে,—খুব ভাল prospects. সে কথা শুনলে এক একবার লোভ হয়, কিন্তু সারাজীবনের মত বাণীর মন্দিরকে ছেড়ে দিয়ে ব্যবসাবাণিজ্য নিয়ে দিন-কাটানোর কথা মনে করলে কেমন যেন বোধ হয়! অবশ্য এটাও ঠিক যে, general line এ গেলে market-value কিছুই থাকবে না। এ বিষয়ে ভাল করে ঠিক করতে হবে, আমি কোনোদিকেই জোর দিতে পারছি নে। এখন যা করব হয়ত তাই নিয়েই ভালয়-মন্দয় জীবন কাটাতে হবে; গোড়াতেই ভুল না করে বসি!

আমি এখন Psychology-র নেশায় পড়ে গেছি। Mac Dougall আর Munsterbery আর James নিয়ে আছি। কিন্তু এবার কিছু লিখতে হবে। বেশি পড়লে creative instinct কমে যায়। Bryce বলেছেন Lord Acton অত বড় genius হয়েও বেশি পড়ার নেশার জন্যে কিছু লিখলেন না। লেখার কথা ভাবলেই তিনি দেখতেন, সে বিষয়ে আরো ঢের পড়ে তবে লেখা উচিত। কিন্তু পড়তে পড়তে পড়া আর শেষ হত না। তাই লেখা আর হয়েই উঠল না। এ ত গেল বড় বড় লোকদের কথা,—আমাদেরও ছোট-

খাটো ভাবে এই ভয় যে নেই, তা নয়। একদিন সব বই সরিয়ে ফেলে, তার পর থেকে চুপ করে বসে চেয়ে থাকব, নয় কিছু লিখতে আরম্ভ করব। দেখি কি হয়।

তবে আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্যের সঙ্গে যোগ না রেখে পারব না। ওটা না করে পারি নে। আমি Wells-এর The Outline of History অল্প অল্প করে পড়ছি—জায়গায় জায়গায় হয়ত একটু sketchy হলেও, অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। একজন মানুষের পক্ষে এটা একটা stupendous effort. আর লেখার কায়দা! W. R. Inge-এর Outspoken Essays বলে একটা বই পড়ছি, ভারি ভাল লাগছে। Wells-এর Russia in the Shadows ভারি interesting বই; তবে তার সঙ্গে Russell-এর The Theory and Practice of Bolshevism বইটা বোধহয় পড়া দরকার।

সেবিকা

——:০:——

মন্দিরের দেবদাসী—দেবতার চিত্তবিনোদন করাই ছিল তার কাজ।

প্রত্যূষে দেবতার নিদ্রা ভাঙত—তারই নূপুর-শিঞ্জনে; মধ্যাহ্নে দেবতার ভোগ-নিবেদন সার্থক হ'য়ে উঠত—তারই দেহযষ্টির ললিত কম্পনে; তারই লীলায়িত হস্তের গন্ধমাল্যে দেবতার প্রসাধন সমাপন হ'ত; মধ্যরাত্রে তারই কণ্ঠের মৃদু গুঞ্জন দেবতার কাছে সুপ্তিরাজ্যের বার্তা ব'হে এনে দিত।

আরতির সময় সে দেখ্‌ত—দেবতা শুধু তারই দিকে চেয়ে রয়েছেন। তাঁর বদন প্রসন্ন হাস্যে উজ্জ্বল।

ত্রুটি-অত্রুটির কথা তার মনেই উঠত না;—দেবতার কাজে কি কখনো ত্রুটি হওয়া সম্ভব?

*　　*　　*　　*

সে যে কোথা থেকে এসেছিল—তা নিজেও জানত না। কোন্ গোপন প্রেমের গভীর আকর্ষণ তাকে স্বর্গচ্যুত ক'রেছিল; মর্ত্ত্য-সমাজের কোন্ ভয়-সঞ্জাত ঘৃণা তাকে মন্দির-সোপানে ফেলে রেখে গিয়েছিল—তা' জানতেন এক অন্তর্য্যামী, আর বোধহয় মন্দিরের বৃদ্ধ পূজারী।

কৈশোরে অর্জ্জিত ললিতকলা যৌবনের প্রারম্ভে সে দেবতারই চরণে উৎসর্গ করেছিল।

কণ্ঠে তার মাখানো ছিল স্বর্গের সুধা; দেহযষ্ঠিতে তার জড়ানো ছিল পারিজাতের সুষমা; বিশ্বপ্রেমের ইঙ্গিত ছিল তার ললিত বাহুর ভঙ্গিমায়; সৃজনের তাল বেজে উঠত তার চরণ-নূপুরে।

তার বুকের মাঝে লুকানো ছিল যে অনাবিল পবিত্রতা—অনাঘ্রাত ফুলের গন্ধটুকুর মত—সে কথা জানতেন শুধু অন্তর্য্যামী।

আর তার রূপের সাথে মিশানো ছিল যে তীব্র মাদকতা—দ্রাক্ষা-ফলের চোয়ানো রসের মত—সে কথা জানত শুধু মন্দিরের বৃদ্ধ পূজারী।

(২)

রাসোৎসবের সঙ্গীত-লীলায় নর্ত্তকী ছিল বিভোর। কোন্ এক অতীত যুগের মিলনক্ষণটি স্মৃতির দুয়ার খুলে আজ বেরিয়ে এসেছিল!......

সে দেখছিল—চন্দ্রকরোজ্জ্বল রাত্রি, নূপুর-মুখর যমুনার বেলাভূমি, গোপী-নেত্রের তৃপ্তি-বিভোল চাহনি, দেবতার দীপ্ত প্রসন্ন মুখ। সেদিন বিশ্বে কোথাও অতৃপ্তি ছিল না, অতৃপ্তিজনিত আকাঙ্ক্ষা ছিল না;—শুধু ছিল একটা বিরাট মিলনের শান্ত মধুরিমা; সৃষ্টির একটা বিশ্রাম-মুহূর্ত্ত—পূর্ণ, স্থির, অক্ষুব্ধ।......

পূজারীর কণ্ঠস্বরে তার স্বপ্ন টুটে গেল:—বৎসে, এরূপ ভাবে তো আর চলে না।

নর্ত্তকী সন্ত্রস্ত হ'য়ে উঠে, বল্লে—প্রভু, কোন অপরাধ হ'য়েছে কি ?

—অপরাধ নয়, ত্রুটী। সমস্ত মন দিয়ে তুমি দেবতার তৃপ্তি সাধন ক'রচ—সত্য। কিন্তু দেবতার চরণে শুধু ভক্তি অর্ঘ্য দিলেই তো হয় না।

—আরও কি করতে হবে বলুন।

—দেবতাকে পূজা ক'রতে হয়—তনু, মন, ধন দিয়ে। তুমি শুধু একটি দিয়েছ; তাতে তো দেবতার তৃপ্তি সম্ভব নয়; সে পূজা যে অসম্পূর্ণ।..........তোমার বিত্ত নাই, কিন্তু রূপ আছে। তুমি তনু উৎসর্গ করে' ধন উপার্জ্জন ক'রতে পার—দেবতার অভাব পূরণের জন্য।

নর্ত্তকীর কুমারী-হৃদয়ে পূজারীর ইঙ্গিতে প্রথমটা কোন সাড়াই প'ড়ল না। যখন সে বুঝলে, তখন তার দেহমন একেবারে অসাড় হ'য়ে গেল; সে বল্‌লে—প্রভু, অন্তরের দেবতা যাতে ক্ষুন্ন হন, বাহিরের দেবতা কি তাতে তুষ্ট হবেন?

পূজারী অসঙ্কোচে উত্তর করলে—অন্তরের দেবতা মিথ্যা। তার বাণী—মায়ার বাণী। বাইরের দেবতাই সত্য, জাগ্রত, স্বপ্রকাশ।

তারপর একটু থেমে সে তীব্রস্বরে ব'ললে—পাপিষ্ঠা; এটুকু বুঝলি নে—দেবতা তোকে রূপ দিয়েছেন, তাঁরই সেবার জন্য। সত্যই তো তাঁর কোন অভাব নেই—এ শুধু তোর একটা পরীক্ষা; তোরই মুক্তির সোপান।

রুদ্ধকণ্ঠে দেবদাসী বল্‌লে—প্রভু, শুধু একটা রাত্রি সময় দিন।

*   *   *   *

গভীর রাত্রে মন্দিরাভ্যন্তরে নর্ত্তকীর রুদ্ধ আবেগ হৃদয়-কবাট খুলে দেবতার চরণে গিয়ে পড়ল।............ওগো অন্তর্য্যামি, হে আমার জাগ্রত দেবতা, ওগো আমার ধ্যান-সর্ব্বস্ব, আমায় বল—নারী-ধর্ম্ম বিসর্জ্জন না দিলে কি আমার সেবাধর্ম্ম ক্ষুণ্ণ হবে? তোমার তুষ্টিসাধনী হবে না?.........ইহাই কি তোমার অভিপ্রেত? ইহাই কি আমারি মোক্ষপথের সোপান?..............

পাষাণ দেবতা নির্ব্বাক, নিশ্চল—সেবিকার প্রশ্নের কোন উত্তরই এলনা।

*   *   *   *

রাত্রিশেষে দেবদাসী মন্দির থেকে বেরিয়ে এল, দেখলে সামনে দাঁড়িয়ে পূজারী; ক্লান্তস্বরে বললে—প্রভু, দেবতার তো কোনও আদেশ পেলুম না।

পূজারী স্মিতহাস্যে বল্‌লে—ওরে অবুঝ, দেবতা কি কথা কন্? তাঁর আদেশ বাক্য হ'য়ে ফোটে আমারি কণ্ঠে—মর্ত্ত্যে আমিই যে তাঁর প্রতিভূ।

যন্ত্রচালিত কণ্ঠে সেবিকা সম্মতি দিলে—তবে তাই হোক্।

*   *   *   *

সৃষ্টি-প্রকরণ ঠিক পূর্ব্বের মতই চ'ল্‌ছে ;............জগতের কোথাও কিছু পরিবর্ত্তন হয় নাই। শুধু—

নর্ত্তকীর কনক-নূপুরে মাঝে মাঝে তাল ভঙ্গ হয়ে যায়।

মাত্র এইটুকু !

শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ

গীতায় অর্জ্জুন

——:*:——

বঙ্কিমচন্দ্র এবং তাঁর সমসাময়িক ইংরাজীশিক্ষায় শিক্ষিত যুবকগণ একসময়ে সত্যের অনুসন্ধানে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের, দর্শনের, সাহিত্যের দিকে অতি দ্রুত গতিতে ছুটেছিলেন, কিন্তু যে কারণেই হোক্, তাতে তাঁদের আধ্যাত্মিক তৃষ্ণা তৃপ্ত হয় নি। আর্য্য-সভ্যতার আলোচনা করতে করতে বঙ্কিমচন্দ্রের অনুসন্ধিৎসু চিত্তকে মুগ্ধ করেছিল শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা। তিনি সাহিত্যের ভিতর দিয়ে গীতার সঙ্গে আমাদের পরিচয় ধীরে ধীরে ঘটিয়ে দেন। বঙ্কিমচন্দ্রের চিত্তস্রোতের সহসা দিক্‌পরিবর্ত্তনে সে সময়ে অনেকে বিমূঢ় হয়েছিলেন, কেউ কেউ বিদ্রূপও করেছিলেন, কিন্তু গত ত্রিশ বৎসর বাঙলার মনীষীগণের আধ্যাত্মিক প্রকৃতি যে-সকল ভাবে পরিপুষ্ট হয়েছে, তার মধ্যে বিশেষভাবে দেখা যায় গীতা-প্রচারিত কর্ম্ম এবং ভক্তিযোগ।

গীতার দার্শনিক তত্ত্বসকল আলোচনা করবার শক্তি আমাদের নেই, সে সাহসও নেই;—গীতার অর্জ্জুনই এই প্রবন্ধের বিষয়। গীতার কাব্যাংশ, অর্থাৎ—অর্জ্জুনের বিষাদ, বিস্ময়, এবং ভক্তি যতই উপলব্ধি করা যায়, আমাদের হৃদয়ে সেই ভাবের উদ্বেল প্রবাহ সৃষ্ট হয়, ও বাসুদেবকে কেন্দ্রে রেখে ছন্দে-গ্রথিত দার্শনিক তত্ত্বসকল যেন সেই ভাবপ্রবাহের উপর প্রক্ষিপ্তের ন্যায় ভাসতে

থাকে। এর কারণ কি?—ইংরাজী শিক্ষায় আমাদের অভ্যাস হয়েছে জীবনকে অধ্যায়ে অধ্যায়ে অভিব্যক্তরূপে পাঠ করা। এবং অর্জ্জুনের বিষাদে, বিস্ময়ে ও ভক্তিতে এই অভিব্যক্তিটি অতি সুন্দররূপে লক্ষিত হয়। অথচ গীতার বাসুদেব চাইছেন, অর্জ্জুনকে এমন একটা অবস্থায় নিয়ে যেতে, যেখানে দ্বন্দ্ব নেই। সাধকদের লক্ষ্য এই বটে, কিন্তু সাধারণ মানুষ তার নিত্যচঞ্চল মনের কথাই ঠিক প্রকাশ করে বল্‌তে পারে, এবং একজনের বিদ্যুতে-ভরা মন সহস্রজনের মনকে আলোড়িত করে।

গীতায় এমন একটি ছন্দ আছে, যা হৃদয়াবেগের উত্থানপতনের গম্ভীর ধ্বনি ব্যতীত আর কিছুই নয়। সেই জন্য মনে হয় গীতাকার আসলে একজন কবি; দার্শনিক তত্ত্বসকল তাঁর হৃদয়ে প্রক্ষিপ্ত। তাঁর মন বর্ণাশ্রমধর্ম্মের সাহিত্য, দর্শন, সংস্কার ও স্মৃতিতে পুষ্ট হওয়াতে, তাঁর ভক্তিলোলুপ হৃদয়ে ঐ ভাগটি প্রক্ষিপ্ত হয়েছিল বিদ্যালয় হতে। এরকম যে সম্ভবপর হয়, তার প্রমাণ ত আমাদের সাহিত্যেই পাওয়া যায়; বাঙালীর মন কত অসংখ্য পাশ্চাত্য এবং আর্য্য ভাবের প্রক্ষেপ বহন করে চলেছে। য়ুরোপের স্বাধীন জাতিদের সাহিত্য এবং ধর্ম্মই বা কি?—খৃষ্টধর্ম্ম ত য়ুরোপে প্রক্ষিপ্ত।

গতিশীল, জীবন্ত মনে এরূপ হয়ে থাকে, তার বিদ্যালয়ের শিক্ষার ফলে। কিন্তু গীতাকারের লক্ষ্য ছিল দার্শনিক সূত্রগুলির অধীত বিদ্যার উদ্‌গীরণ নয়—তাঁর লক্ষ্য ছিল ভক্তি। এবং ভক্তি সর্ব্বত্রই বস্তুকে অবলম্বন করে থাকে। গীতা যখন প্রথম গীত হয়, তখন দার্শনিক ভাবে জগৎ-তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে দেখা শেষ হয়েছে, এবং উপনিষদের ঋষিগণের পদচিহ্ন অনুসরণ করে সাধারণ মন গহন

বনের ভিতর অনেকদূর অগ্রসর হয়েছে। এবং কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে ধূলিধূসরিত আর্য্যসভ্যতাকে আর একবার বর্ণাশ্রমধর্ম্মের উপর দাঁড় করাবার চেষ্টা আরম্ভ হয়েছে। এই সকলের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে কবি গীতাতে চেষ্টা করেছেন জ্ঞান, কর্ম্ম এবং ভক্তির সমন্বয়ে এক বাসুদেব-ধর্ম্ম প্রচার করতে। কবির হৃদয়ের মধ্যে আমরা দেখতে পাই একটি দ্বৈতবাদী বাসুদেব-ভক্তের প্রার্থনা—"ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি"। এবং এই ভক্তকবির হৃদয়ের বেদনা ও আনন্দ প্রকাশ পেয়েছে গীতার অর্জ্জুনে। আর্য্যসাহিত্য 'নির্ম্মম' বর্ণাশ্রমধর্ম্মের মাহাত্ম্যই এতদিন ঘোষণা করে' আস্‌ছিল,—একমাত্র গীতায় দেখতে পাই বেদের কর্ম্মকাণ্ডের নিন্দা, এবং শুষ্ক জ্ঞানযোগকে হৃদয়ের ভক্তিতে নবীন এবং রঙীণ করে তোলবার চেষ্টা। মনে হয় অর্জ্জুন আর কেহই নয়—আমাদের সহজ মানবপ্রকৃতি; মানবহৃদয় বিশ্ব-তত্ত্বকে পরীক্ষা করে বিশ্লেষণ করে পাবার চেষ্টায় দেখেছে, হৃদয় ভক্তিরসে মধুর হয় না;—সকাম যজ্ঞ করে, বিধিমতে আশ্রমধর্ম্ম পালন করে দেখেছে, জীবহত্যার দ্বারা শান্তি পাওয়া যায় না। যে আত্মা বিশ্বের সৃষ্টিস্থিতিলয়ের সহিত লিপ্ত নয়, বিশ্বে যার প্রকাশ নেই, যে আত্মার ইচ্ছা নেই, জীবের হিতার্থে আত্মাকে অবতার-রূপে যুগে যুগে দান করা নেই, যে আত্মা কেবলমাত্র দ্রষ্টা,—সেই আত্মার ধ্যানে হৃদয় আনন্দে পুর্ণ হয় না। কিন্তু যে পরম পুরুষের ইচ্ছায় জগতে এই সৃষ্টিস্থিতিলয় প্রতি মুহূর্ত্তেই হচ্ছে, যে আত্মা বিশ্বে নিজেকে দান করেছে, সেই পরম পুরুষের চরণে আশ্রয় নিয়ে ভক্ত-কবি উচ্ছসিত কণ্ঠে গান গেয়ে উঠছেন—

নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে নমোঽস্তুতে সর্ব্বত এব সর্ব্ব
অনন্ত বীর্য্যামিতবিক্রমস্ত্বং সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্বঃ।

এই যে জন্ম মৃত্যু, হিংসা প্রেম, ধর্ম্ম অধর্ম্মের দ্বন্দ্ব নিয়ে জগৎ—এর রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে অসমর্থ হয়ে ভক্ত-কবি বলেছেন "ন হি প্রমাণামি তব প্রবৃত্তিম্"। এই অর্জ্জুন তার বিষাদে ও বেদনায়, তার বিশ্বাসে ও ভক্তিতে এক বিশিষ্ট মূর্ত্তি লাভ করেছে। আমরা সেই আলোচনাই করব।

(২)

প্রথমেই মনে হয় বর্ণাশ্রমধর্ম্মের শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে, গীতার কবি অর্জ্জুনের ন্যায় একটি চরিত্র সৃষ্টি করলেন কি প্রকারে? গীতার অর্জ্জুন ত মহাভারতের অর্জ্জুন নয়। মহাভারতের অর্জ্জুনের প্রকৃতিতে ক্ষাত্রধর্ম্মের প্রতি অনাস্থা, পিতামহ ভীষ্ম, পরম সখা বাসুদেব এবং অগ্রজ যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত কর্ম্মে পাপবোধ—এরকম আভাস আমরা কোথাও পাই নে; বরং তার বিপরীতই দেখতে পাই। একটা ভয়ানক যুদ্ধ যে অবশ্যম্ভাবী, এ সম্বন্ধে সংশয় কারোই ছিল না; অন্যান্য ক্ষত্রিয়ের ন্যায় অর্জ্জুনও বিশেষভাবে বনবাসকালে অস্ত্রধারণ এবং অস্ত্রপ্রয়োগবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করবার জন্য কখনো ভবানীপতির আরাধনা, কখনো ইন্দ্রের উপাসনা করেছিলেন। কুরুক্ষেত্রে অর্জ্জুনই বজ্রপাণির কাছে শেখা, বজ্রাখ্য নামে অটল ও দুর্জয় ব্যূহ রচনা করেছিলেন।

কিন্তু কবি অর্জ্জুনকে যে-ভাবে পাঠকের সম্মুখে প্রথমেই এনেছেন,

তা একবার স্মরণ করুন। দিগ্‌দিগন্তবিস্তৃত যুদ্ধস্থলে একদিকে ভীষ্মাভিরক্ষিত কৌরবগণ এগারো অক্ষৌহিনী ব্যূহিত করে সঙ্কেতের প্রতীক্ষা করছে; অন্যদিকে ভীমাদিরক্ষিত পাণ্ডবগণ সেই কাল মুহূর্ত্তের অপেক্ষা করচে যখন পিতা পুত্রের, বন্ধু বন্ধুর, গুরু শিষ্যের কণ্ঠচ্ছেদ করতে লেশমাত্র দ্বিধা বোধ করবে না। সেই সময় অর্জ্জুন দেখলেন কাহাদের ?—

তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্ পার্থ পিতৄনথ পিতামহান্
আচার্য্যান্ মাতুলান্ ভ্রাতৄন্ পুত্রান্ পৌত্রান্ সখীংস্তথা
শ্বশুরান্ সুহৃদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি ।১।২৬॥

কেহই ত পর নয়। একটা যে পারিবারিক সম্বন্ধ সকলের সঙ্গেই রয়েছে। এই সম্বন্ধটি বিশেষভাবে মনে করিয়ে দেবার জন্য রথীমহারথীগণকে বিশেষণের ভারে কবি ভারাক্রান্ত করেন নি; গীতিকাব্যে যেটুকু প্রয়োজন—হৃদয়ের সম্বন্ধ—কবি সেইটুকুই দেখিয়ে দিয়েছেন। মহাসাগরের দুইটি তরঙ্গের সংঘর্ষণ বুঝিবা অনিবার্য্য, অসীম তিমিরগগনে দুইটি ধূমকেতুর সংঘর্ষণ বুঝিবা আর কেহই রোধ করতে পারে না। সখা এবং সারথী কৃষ্ণ ত অর্জ্জুনের সম্মুখেই—তিনি কি আর একবার শেষ চেষ্টা করবেন এই পারিবারিক অনর্থ নিবারণ করতে ?

আসন্ন যুদ্ধের অব্যবহিতপূর্ব্বে কি গম্ভীর স্তব্ধতা !—সেই স্তব্ধতা ভেঙে গেল ভীষ্মের সিংহনাদে, এবং তাঁর শঙ্খধ্বনিতে। সেনাপতির ইঙ্গিত লাভ করে চারদিক হতে রণবাদ্য বেজে উঠল, পাণ্ডবপক্ষও তার যথোচিত প্রত্যুত্তর দিলেন। পাণ্ডবপক্ষের সকল শিবির হতে

পৃথক্ পৃথক্ শঙ্খ বেজে উঠ্‌ল, হৃষীকেশ এবং অর্জ্জুন শুভ্রবর্ণ বিশাল রথে অবস্থিত থেকে পাঞ্চজন্যের এবং দেবদত্তের ধ্বনিতে দিগ্‌দিগন্ত সন্ত্রাসিত করলেন; যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব, শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, সাত্যকি, দ্রুপদ, দ্রৌপদীর পুত্রগণ এবং সুভদ্রাতনয় অভিমন্যু, ধৃতরাষ্ট্রপক্ষীয় যোদ্ধাগণের হৃদয় বিদারণ করে গম্ভীর শঙ্খধ্বনি করলেন।

সেই পারিবারিক মহাযুদ্ধের প্রথম ঘোষণাধ্বনি এখনও আমাদের হৃদয়কে আলোড়িত করে। আমরা সেই যুদ্ধের ভীষণতা উপলব্ধি করি তার তুমুল শঙ্খধ্বনি হতে, যেমন ঘূর্ণাবায়ুর প্রচণ্ডতা বুঝতে পারি অতিদূর হতে শ্রুত তার ভয়ঙ্কর কল্লোল হতে। কবি মহা-কাব্যের প্রথা অবলম্বন করে শ্লোকের পর শ্লোকে যুদ্ধক্ষেত্রের বর্ণনা না করে, কেবলমাত্র তার তুমুল শঙ্খধ্বনির দ্বারাই সেই মহাযুদ্ধের প্রচণ্ডতা প্রকাশ করেছেন।

অর্জ্জুন ধনু উত্তোলন করে হৃষীকেশকে উভয় সেনার মধ্যে রথ স্থাপন করতে বল্লেন। রথ অভীষ্টস্থলে উপস্থিত হলে, হৃষীকেশ অর্জ্জুনকে উভয়পক্ষে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত যোদ্ধাগণকে দেখিয়ে দিলেন।

সেই মহাযুদ্ধে কে কে ছিলেন, তা মহাভারতের অর্জ্জুন ত জানতেন। কিন্তু সে অর্জ্জুন যে ক্ষত্রিয় এবং ক্ষাত্রধর্ম্মপরায়ণ। অর্জ্জুনের হৃদয়সাগর মন্থন করে তার ভিতর থেকে পারিবারিক মানুষটিকে বাহির করে দেখানই যে গীতাকারের উদ্দেশ্য,— মহাভারতের ক্ষত্রিয় অর্জ্জুনকে নয়। সেইজন্য অর্জ্জুন তাঁর

বিপক্ষে অস্ত্রধারী মহারথী এবং অস্ত্রত্যাগে উদ্যত শত্রুগণকে না দেখে, দেখলেন ঃ—

আচার্য্যান্ মাতুলান্ ভ্রাতৃন্ ইত্যাদি।

গীতার কবির কবিত্ব এইখানেই হৃদয়কে মন্থন করে। অথচ কি সহজে! এই অর্জ্জুনকে নিয়ে মহাকাব্য রচিত, কিম্বা ছন্দে-গ্রথিত দর্শনশাস্ত্রের সূত্রসকল প্রচারিত হতে পারে কিনা সন্দেহ হয়। এই মন্থনে কি উঠল?—যুদ্ধ করবার প্রবৃত্তি নয়, অর্জ্জুনের হৃদয়ে স্বজনবোধ। যে কৌরবগণ বাল্যকাল হতে পাণ্ডবগণকে শত অত্যাচারে উৎপীড়ন করে এসেছে, কখনো নদীবক্ষে সন্তরণছলে, কখনো ক্রীড়াপ্রাঙ্গনে, কখনো জতুগৃহে, কখনো বা কপট অক্ষক্রীড়ায় যে দুর্য্যোধন তাদের সঙ্গে শত্রুতাই করে আসছে,—এমন কি যদুপতি যখন মধ্যস্থ হয়ে বিবাদ মিটিয়ে দেবার জন্য দুর্য্যোধনের পুরীতে গিয়েছিলেন, তখন যে পাপাত্মারা কৃষ্ণের প্রাণনাশ করতে কৃতসংকল্প হয়েছিল—সেই কৌরবগণকে অর্জ্জুন সেই ভীষণ যুদ্ধের প্রাক্কালে কি সহজে স্বজনরূপে বোধ করছেন! একই প্রাণের উত্তাপে সে সকলেই সঞ্জীবিত হয়ে আছে; সেই "সমবেতা যুযুৎসবঃ" আত্মীয়গণের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে, এই চিন্তাতে তিনি বলছেন "সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি"। এই হৃদয়ের গভীরতা এবং বিশালতা একমাত্র গীতিকাব্যেরই বিষয় হতে পারে। বেদনার আঘাতে অর্জ্জুনের দিব্যদৃষ্টি আর কুহেলিকাবৃত নয়, অর্জ্জুন স্পষ্টই দেখছেন ক্ষাত্রধর্ম্ম, পারিবারিক মানুষটিকে যুদ্ধরূপ মহাপাপে লিপ্ত করে; তাই তিনি বলছেন "ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ"। কেন না— "রাজ্যসুখ কাদের নিয়ে? যাদের জন্য আমরা রাজ্য, ভোগ ও ধনের

অভিলাষ করে থাকি, তারাই ধনপ্রাণ পরিত্যাগ করতে উপস্থিত হয়েচে।...আমি এঁদের বিনাশ করব, কি প্রকারে এ সম্ভব? বিনাশ করলে আমরা পাপী হব, স্বজন বিনাশ করে আমরা কি প্রকারে সুখী হব?...হায়! আমরা অতিশয় পাপ করতে প্রবৃত্ত হয়েছি, যেহেতু রাজ্যসুখের লোভে আমরা স্বজন বিনাশ করতে উদ্যত হয়েছি,... শস্ত্রপাণি ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ, যদি প্রতিকার করতে বিরত ও অশস্ত্র আমাকে রণে বিনাশ করে, আমাদের পক্ষে তাহাই বিশেষ মঙ্গল হবে।

রণক্ষেত্রে শোকব্যাকুল হৃদয়, রথোপরিস্থিত অর্জ্জুন এইপ্রকার বলে ধনু ও শর পরিত্যাগ করে উপবেশন করলেন"।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত হয়েছে একটি পারিবারিক হৃদয়ের জাগরণে। ইহা কি একটা অলস ভাববিহ্বলতা? এ বিষাদ কি মনকে মোহে আচ্ছন্ন করে? না, বর্ণাশ্রমধর্ম্মের অষ্টবন্ধন হতে মনকে মুক্ত করে, তার চেয়েও এক বিশালতর ধর্ম্মের জন্য হৃদয়কে প্রস্তুত করে? এ অর্জ্জুন যে বাহির হতে অন্তরে প্রবেশ করবার জন্য প্রস্তুত হয়েছে—বাহিরের বর্ণাশ্রমধর্ম্ম যে জাগ্রত হৃদয়ের নিকট অতি তুচ্ছ বোধ হচ্ছে।

অন্যান্য দেশের সভ্যতার ন্যায় আর্য্যসভ্যতাও, নব নব স্তরে অভিব্যক্ত হয়েছে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর দেখতে পাওয়া যায় আর্য্যসভ্যতা কেবল যে নব মূর্ত্তি ধারণ করেছিল তা নয়, কর্ম্ম এবং জ্ঞান আর তার মেরুদণ্ড ছিল না; হৃদয়ের কোমল বৃত্তির উপর তার নব প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। যাঁরা এক সময়ে তপোবনে মুক্তি সাধন করতেন, তাঁদেরই প্রপৌত্রগণ সংসারে ভক্তি, শান্ত, দাস্য, সখ্য

বাৎসল্য এবং মাধুর্য্য রসের জন্য ব্যাকুল হয়েছিলেন। বৈদিক যুগের দেবর্ষি নারদে, এবং 'রসো বৈ সঃ "মন্ত্রের দ্রষ্টা ঋষিগণের মধ্যে ইহার আভাস থাকলেও, পূর্ণ বিকাশ দেখা যায় না।

এই দিক্‌পরিবর্ত্তনের প্রধান কারণ যে কুরুক্ষেত্রের পারিবারিক যুদ্ধ, সে বিষয়ে লেশমাত্র সংশয় নেই।

এটা খুবই স্বাভাবিক, কেননা বর্ণাশ্রমধর্ম্ম যতই বড় হোক্, তাতে হৃদয়ের তৃপ্তি ছিল কোথায় ?

বর্ণাশ্রমধর্ম্মের অনুশাসনে আর্য্যের পারিবারিক জীবনটি গঠিত হত একদিকে সামাজিক জীবনের প্রতি লক্ষ্য রেখে, অন্যদিকে তার সীমা লঙ্ঘন করে নিঃসঙ্গ নির্ম্মম আত্মগত জীবন যাপন করবার প্রতি। সুদূরের এক একটি শ্যামসুন্দর তপোবন মুমুক্ষুর চিত্তকে অলৌকিক আনন্দে আহ্বান করত।

আশাহীন, কর্ম্মহীন, মৃত্যুর শোকেবিহ্বল মানবজীবন আর্য্যের স্বাভাবিক আস্তিক মনকে কখনো আকর্ষণ করে নি ; অজ্ঞানী যে মৃত্যুকে প্রকৃতির সর্ব্বত্র নিরীক্ষণ করে ভীত হয়, কর্ম্মে উদাস হয়, সঞ্চয়ে বীতরাগ হয়, অন্তরে বাহিরে শূন্যতা দেখে স্তম্ভিত হয়, আর্য্য সাধক সেই মৃত্যুকে, শূণ্যতাকে কোথাও তাঁর জ্ঞানদৃষ্টিতে দেখতে পান নি ; একটি প্রাণের পরিপূর্ণ ধারায় জগৎ পূর্ণ দেখে আনন্দের উচ্ছ্বাসে ঋষি বলতেন—প্রাণই ব্রহ্ম।

মৃত্যুকে কোথাও দেখতে না পাওয়া, বরং ধর্ম্মপালনের জন্য হৃদয়কে জ্ঞানের নয় প্রতিজ্ঞার অধীনে রাখা,—এই আদর্শটি আর্য্যগণের সাধনাকে যে অনেকটা কোমলতা-বর্জ্জিত করেছিল, তা জানতে পারি অনার্য্যগণের সঙ্গে তাদের সংগ্রামে, এবং যজ্ঞে পশুহত্যায়! যদিও

তাঁদের মধ্যে জ্ঞানপন্থীদেরও সাধনা ছিল সর্ব্বত্রই এক আত্মাকে উপলব্ধি করা, তথাপি কর্ম্মবাদী আর্য্যগণ যখন বৃহৎ যজ্ঞে শত শত পশু বলি দিতেন, ক্ষত্রিয় যখন দিগ্‌বিজয় করতে বাহির হতেন, তখন তাঁদের হৃদয়ের একটি তন্ত্রীও "না" "না" "না" রবে নিষেধ করে উঠত না। উত্তোলিত অসি পশুর মুণ্ডকে দেহ হতে বিচ্ছিন্ন করত; এবং তাঁরা দেখতেন সেই প্রেক্ষিত জীবের আত্মা দিব্যমূর্ত্তি ধারণ করে স্বর্গে গমন করছে। আত্মা যে অমর, এ সম্বন্ধে ধর্ম্মপরায়ণ আর্য্যগণের লেশমাত্র সংশয় ছিলনা।

ধর্ম্মপরায়ণতার আদর্শ তাঁদের এত তুষারশীতল ছিল যে দাতা-কর্ণের ন্যায় নিজের পুত্রকেও করাতে কুরে কুরে কেটে সত্য তাঁরা রক্ষা করতে চাইতেন। ঘটনাটি সত্য না হতে পারে, কিন্তু এ থেকে বুঝতে পারি তাঁদের ধর্ম্মপরায়ণতার আদর্শ কি ছিল।

এর একমাত্র কারণ, যেহেতু হৃদয়ের আবেগগুলির উৎপত্তি আছে, সেইজন্য তাদের বিনাশও ধ্রুব; অতএব অনিত্যের বশীভূত হওয়া শ্রেয় নয়; 'একমাত্র আত্মাই নিত্য, এবং ধর্ম্মপরায়ণতার দ্বারাই আত্মাকে লাভ করা যায়; সেইজন্য ধর্ম্মপালন করাই পারিবারিক এবং সামাজিক মানুষের কর্ত্তব্য, হৃদয়ের অধীন হওয়াটাকে তাঁরা ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্ব্বল্য জ্ঞান করতেন। এই ছিল ধর্ম্মশাস্ত্রের এবং মোক্ষশাস্ত্রের অনুশাসন। এ কর্ত্তব্য কঠোর হলেও ধর্ম্মপরায়ণ আর্য্যকে ইহা পালন করতেই হত; এবং এতে তাঁদের কত আশা, আনন্দ ছিল। কর্ম্মবাদী তাঁর সুমুখে সুখৈশ্বর্য্যপুর্ণ স্বর্গ দেখতেন জ্ঞানবাদী দেখতেন মুক্তি। গুরুই হউন কিম্বা আত্মীয়ই হউন, বালকই হউন কিম্বা বৃদ্ধই হউন, শত্রুর সঙ্গে যোগ দিলে তাকে

সংহার করাই ছিল ধর্ম্ম; মমতার বশীভূত হয়ে এ কর্ত্তব্যপালনে পরাঙ্‌মুখ হয়েছেন এমন কোন ক্ষত্রিয় নৃপতির ইতিহাস, রামায়ণ কিম্বা মহাভারতে পাওয়া যায় না।

কেবলমাত্র পাওয়াযায়, গীতার অর্জ্জুনে। গীতার অর্জ্জুনের এতেই বিশেষত্ব। বর্ণাশ্রমধর্ম্মের শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে, গীতার কবি এইরূপ একটি নতুন চরিত্র সৃষ্টি করলেন কি প্রকারে?—

আমাদের মনে হয় কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পরিণাম দেখে। মস্তিষ্ক তার গর্ব্বে হৃদয়ের অস্তিত্ব প্রথমে অস্বীকার করতে পারে, কর্ত্তব্য-বোধে যজ্ঞে পশুহত্যা এবং যুদ্ধে নরহত্যা করতে পারে কিন্তু এ গর্ব্বের মধ্যে একটা দুর্ব্বলতা প্রচ্ছন্ন আছে। হৃদয় ধীরে ধীরে মস্তিস্কের উপর তার কমনীয় প্রভাব বিস্তার করবার উপক্রম যে সময়ে করছিল, আর্য্যহৃদয় যখন বর্ণাশ্রমধর্ম্মের প্রচ্ছন্ন নিষ্ঠুরতার মূর্ত্তি কুরুক্ষেত্রের শবাচ্ছন্ন প্রান্তরে দেখে শিউরে উঠেছিল। ঐ এক পারিবারিক যুদ্ধের পরিণামে যখন তার পুরীসকল জনশূন্য হয়েছিল, অনাথিনী বিধবাগণের কাতর আর্ত্তনাদ যখন তাদের হৃদয়কে আলোড়িত করেছিল, আর্য্যগণ যখন তাদের কুল রমণীগণকে স্বেচ্ছাচারিণী, আবালবৃদ্ধবনিতাশোভিতা পুরীকে নীরব, কর্ম্মকোলাহলমুখরিতা মহানগরীসকলকে নিস্তব্ধ, সামগাথা ধ্বনিত তপোবনসকলকে ব্রহ্মচারীশূন্য, এবং গৃহস্থের যজ্ঞাগ্নিকে একে একে পল্লীতে পল্লীতে নির্ব্বাপিত হতে দেখেছিলেন; অনার্য্যের অভ্যুদয়ে আর্য্য সভ্যতার অস্তিত্ব যখন টলমলায়মান হয়েছিল; একটা আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে আর্য্য সমাজ যখন ভস্মাচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল; তখন হিংসাবৃত্তির সেই ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখে আর্য্য হৃদয় সন্ত্রাসিত হয়ে

জেগে উঠে আত্মজিজ্ঞাসা করেছিল। যে সভ্যতা গড়ে উঠেছিল কত জ্ঞানীর জ্ঞানে, ত্যাগীর ত্যাগে, শক্তিশালী নরপতির শৌর্য্যে, এবং কলাবিদের কলানৈপুণ্যে, কত সহস্র বৎসরের সাধনার ও স্মৃতির অক্লান্ত অধ্যবসায়ের বলে; সেই সভ্যতার নিদারুণ সমাপন দেখে আর্য্য হৃদয় তার ক্রন্দনটিকে মুর্ত্তিমান করেছিল গীতার অর্জ্জুনে। গঙ্গা যমুনা একদিন কত হাজার হাজার বণিকের পণ্যপরিপূর্ণ তরী বহন করত, সে-সকল অদৃশ্য হল—রইল কেবল জীবরক্তপানে তৃষাতুর কুরুক্ষেত্রের উপর মৃত্যুর ভীষণ শূন্যতা! উনিশ দিনের প্রভাত আর্য্য সমাজের উপর কি ভাবে উদয় হয়েছিল তা আমরা উপলব্ধি করতে পারি কৌরব রমণীগণের আর্ত্তনাদে, গান্ধারী এবং কুন্তীর ভাষাতীত বেদনায়। অস্তাচলচূড়াবলম্বী আর্য্যসভ্যতাসূর্য্যের সেই কালো রশ্মি, আর্য্য হৃদয়কে স্তব্ধ করেছিল, এবং এই বেদনা হতেই গীতার অর্জ্জুনের উৎপত্তি। ভক্ত কবির অন্তরে ভক্তির জন্য ক্রন্দন!

সেইজন্য মনে হয়, গীতা পৃথিবীর সাহিত্যে একখানি অপূর্ব্ব গীতিকাব্য,—কেন না তার উৎপত্তি বেদনায়, এবং তার পরিসমাপ্তি ভক্তিতে।

ইহা প্রথমে শত শত শ্লোকে রচিত হয়েছিল কি না সন্দেহ করা যেতে পারে। আমাদের মনে হয় মূল আকারে ততটুকুই ছিল, যা একই অপরাহ্নে একই আসনে উপবেশন করে অস্তগত আর্য্য সভ্যতা-সূর্য্যের পানে চাইতে চাইতে পাঠ করে শেষ করা যায়, এবং যাতে আত্মাভিমান অন্তর্হিত হয়ে হৃদয়ে ভক্তি প্রগাঢ় হয়। শ্রোতৃ-বর্গকে এ কথা কখনো বিষাদে ম্রিয়মান, এবং কখনা বিস্ময়ে অভিভুত করত। যিনি বৃক্ষতলে বসে গান করতেন, তাঁরও হৃদয় ভক্তিতে

ভরে উঠত; আর যাঁরা শ্রবণ করতেন, তাঁদের হৃদয়ে সেই ভাবই গাঢ় হত, যার বর্ণ একমাত্র দেখতে পাওয়া যায় গোধূলি আকাশের ম্লান গম্ভীর রক্তিম আভায়।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

গাছ

(মোটামুটি কথা)

———:※:———

বছর তিনেক আগে আমরা জনকয়েক বন্ধুতে মিলে বাঙলা-ভাষায় খান-কতক বিজ্ঞানের বই লেখবার সংকল্প করি। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল এই উপায়ে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে নানা বিজ্ঞানের জ্ঞান চারিয়ে দেওয়া। অনেকে অনেক রকম বিজ্ঞানের বই লেখবার ভার নিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে বঙ্গ-সাহিত্য-জগতে সুপরিচিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘটক, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত গুরুদাস দত্ত এই ক'জন সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক বন্ধুর সহযোগিতায় উদ্ভিদ্-বিজ্ঞানের একখানি বই লিখে শেষ করেছেন। সেই বইখানির ভূমিকা-অংশটুকু প্রকাশ করা গেল। এই নমুনা থেকে পাঠকমাত্রেই দেখতে পাবেন যে, এ লেখার ভিতর কি অসামান্য শক্তি, কি অসাধারণ পরিশ্রম আছে। কোনও বৈজ্ঞানিক বিষয়কে এত সরস করে এত সরল করে বাঙলা-ভাষায় ইতিপূর্ব্বে আর কেউ লিখতে পেরেছেন বলে আমার জানা নেই। সতীশবাবু যে দেশ-শিক্ষা-সমিতি গড়ে তুলেছেন, তা থেকে জন-শিক্ষা ধারা, নারী-শিক্ষা ধারা, শিশু-শিক্ষা ধারা এই ত্রিধারায় প্রত্যেক বিজ্ঞানের এক একখানি করে বই বেরোবার কথা আছে। সমিতির জন-শিক্ষা-ধারার উদ্ভিদ্-বিজ্ঞান দেখে আমার মনে হচ্ছে এরকম পাঁচ সাতখানা বিজ্ঞানের বই বেরোলেও দেশের অসীম কল্যাণ হবে।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

গাছ আমরা সকলেই দেখেছি, সকলেই চিনি। আঁব কাঁঠালের গাছও গাছ, যুঁই মল্লিকার গাছও গাছ, ধান সরষের গাছও গাছ, মুলো পালঙের গাছও গাছ—এমন কি মাঠের ঘাস, পুকুরের পানা, দেওয়ালের ছ্যাত্‌লা, এরাও গাছ।

দু'চারটা গাছ না আছে এমন জায়গাই পৃথিবীতে নেই। কি ক্ষেতের মাটীতে, কি পাহাড়ের পাথরে, কি মরুভূমির বালিতে, কি সমুদ্রের জলে, কি বারমেসে বরফে, কোথায় না গাছ দেখা যায়?

গাছের মধ্যে সবুজ গাছই বেশী। সবুজ রঙ দেখলেই গাছের কথা মনে পড়ে। তবে সব গাছের রঙ সমান সবুজ নয়। বট কাঁঠাল ঘোর সবুজ, ধান দূর্ব্বা মাঝারি সবুজ, আকাশবেল ফিকে সবুজ।

অন্য রঙের গাছও আছে। তবে সবুজ গাছের চাইতে ঢের কম। লাল-শাক লাল, কাল-তুলসী কালো, ব্যাঙের ছাতা শাদাও হয় হল্‌দেও হয়, আর পাতাবাহার (ক্রোটন) যে কত রঙ-বেরঙের আছে তা বলাই শক্ত। যে সব জায়গায় শীতকালে বরফ পড়ে সেখানে সেই বরফের নীচে একরকম গুঁড়ো গুঁড়ো গাছ হয়, যার রঙ গোলাপী; বরফ গল্‌বার সময় গাছগুলো জলের সঙ্গে মিশে সমস্ত জলটাকে গোলাপী করে তোলে। সমুদ্রের তলাতে একরকম ঝাঁঝি জন্মায়, যার রং আলতার মত টক্‌টকে। খুব বেশী ঝড় হলে ঝাঁঝি-গুলো উপ্‌ড়ে এসে তীরের বালির উপর পড়ে।

কোন কোন গাছ এত ছোট যে, চোখে দেখা যায় না। এদের অণু-গাছড়া বলে। কাঁচা দুধ যে আপনা হতে ছিঁড়ে যায়, রাঁধা তরকারী যে আপনা হতে টকে' ওঠে, তার মানে একরকম অণু-গাছড়া তার মধ্যে জন্মায়। যে রোগকে আমরা ক্ষয়কাশ বলি, তা হয় এক

রকম অণু-গাছড়া বুকের মধ্যে চাপ্ড়া বাঁধে বলে। এই সব গাছ এত ছোট যে খুব জোরালো অণুবীন্ * ছাড়া এদের দেখা যায় না। এদের পঁচিশ হাজার-টাকে লম্বালম্বি করে সাজালেও দেড় আঙুলের বেশী জায়গা জুড়বে না।

কোন কোন গাছ আবার এত বড় হয় যে, এক নজরে তাদের দেখেই ওঠা যায় না। তোমরা হয় ত মনে করতে পার, তাল নারকোলের গাছই সব চাইতে উঁচু, কিন্তু তা নয়। হিমালয় পর্ব্বতে যে সব শালগাছ জন্মায়, তাদের এক একটা দেড়শ' দু'শ' হাত উঁচু, পঁচিশ ত্রিশ হাত মোটা।

নিউজিল্যাণ্ড আর কালিফর্ণিয়া দেশে দেবদারু গাছের মত একরকম গাছ আছে যা হিমালয়ের শালগাছের মতই উঁচু। নর্ফোক দ্বীপের পাইন গাছ আবার এদের চেয়েও উঁচু; এক একটা আড়াইশ' হাত পর্য্যন্ত দেখা গিয়েছে।

ওয়েলিংটনিয়া জাইগাণ্টিয়া নামে এক গাছ আছে, যা যেমন উঁচু তেমনি মোটা। বড় গাছগুলো উঁচুতে তিনশ' হাতের কম তো নয়ই ঘেরেও কমসম করে ষাট-সত্তর হাত।

আফ্রিকায় সেনেগাল নদীর মোহনায় বোবাব্ বলে একরকম গাছ আছে। এ গাছ মাথায় তত উঁচু নয়, যত গুঁড়িতে মোটা।

---

* অণুবীন হচ্ছে একরকম যন্ত্র যার ভিতর দিয়ে ছোট জিনিষকে বড় দেখায়। অণুবীন যত জোরালো হয়, জিনিষটাও তত বড় দেখায়। এমন জোরালো অণুবীনও আছে যা দিয়ে একটা জিনিষকে পাঁচশো গুণ, কি হাজার গুণ, কি তার চেয়েও বড় করে দেখা যায়।

এর গুঁড়ির একটা কোটরের মধ্যে বিশ-ত্রিশ জন লোক হেসে খেলে শুয়ে থাক্‌তে পারে।

যে গাছের পাতার তেল আমরা সর্দ্দি হলে শুঁকি, সেই ইউকালিপ্‌টাস্‌ গাছও কম বড় নয়। অষ্ট্রেলিয়া দেশে একবার একটা ইউকালিপ্‌টাস্‌ গাছ কাটা হয়—তার গুঁড়ির চাকার উপর গোল হয়ে বসে পঞ্চাশ জন লোক ব্যাণ্ড বাজিয়েছিল।

এট্‌না পর্ব্বতে একটা চেষ্টনাট্‌ গাছ ছিল, যা এর চাইতেও মোটা। তার ঘের ছিল প্রায় ১২০ হাত। কিন্তু সব চেয়ে মোটা আমাদের বোম্বাই শিমূল। বোম্বাই শিমুলের এক একটা গুঁড়ি ১২৫।১৩০ হাত পর্য্যন্ত মোটা হয়ে থাকে।

এদেশের বটগাছও, এক হিসাবে কোন দেশের কোন গাছের চেয়ে ছোট নয়। ডাল-পালা ছড়িয়ে আশে পাশে এতখানি জায়গা জুড়তে আর কোন গাছই পারে না। কল্‌কাতার ওপারে শিবপুরের বাগানে যে মহা-বটটি আছে, তার তলায় হাজার দেড় হাজার লোক স্বচ্ছন্দে বসে জিরোতে পারে। নর্ম্মদা নদীর ধারে যে নামজাদা বটগাছটা ছিল তার থামের মত ঝুরিই ছিল তিন হাজার তিনশ'টা। তার মধ্যে তিনশ'টা এত মোটা যে, বেড়িয়ে পাওয়া যেত না। ঐ গাছের তলায় সাত আট হাজার লোকের মেলা বস্‌তো। শোনা যায়, এই রকমই একটা বটগাছের নীচে আলেক্‌জাণ্ডার তাঁর সমস্ত সৈন্য নিয়ে একটা গোটা রাত ছাউনি করে' ছিলেন।

কোন কোন গাছ আছে, যার আর কিছু বড় নয়, কেবল পাতাটা কি ফুলটা বেমক্কা রকম বেড়ে গেছে। একটা একরত্তি মানুষের

জালার মত মাথা কি কূলোর মত কান হলে যে রকম দেখায়, এদেরও দেখতে তেমনি। আমাদের কচু কলা গাছের গাছ বড় কি পাতা বড় তা বলাই শক্ত। ভিক্টোরিয়া রিজিয়া বলে' একরকম পদ্ম গাছ আছে, যার পাতার বেড় চব্বিশ হাত পর্য্যন্ত। সেই পাতার উপর একটা ছোট্ট ছেলেকে বসিয়ে রাখলেও তা ডোবে না।

পদ্ম নামে আর একরকম গাছ আছে যার ফুলের ঘের চার হাত। সুমাত্রা-দ্বীপের র‍্যাফ্লেসিয়া ফুল আরো বড়। অত বড় ফুল আর পৃথিবীতে নেই। এ ফুলের ঘের ছ হাত, পাপড়ীগুলো এক ফুট করে লম্বা। গোটা ফুলটার ওজন সাত আট সের; ফুলের খোলে জলও ধরে সাত আট সের।

(২)

পৃথিবীতে দু'রকমের জিনিষ আছে; এক জীব—যাদের প্রাণ আছে, আর জড়—যাদের প্রাণ নেই। যারা জীব তারা ছোট থেকে বড় হয়, খায় দায়, বংশ বাড়ায়, তারপর মরে যায়। তোমরা সকলেই জান ইট লোহা পাথর জড়, মানুষ গরু চিল জীব। কি করে জান?—এইজন্যে জান যে একটা ইটকে যত দিন ইচ্ছা যেখানে হোক্ ফেলে রাখ, সে বাড়ে না, তাকে খাবার দিতে হয় না, তার বাচ্চা হয় না, সে মরেও না। কিন্তু একটা গরু দিনদিনই বাড়ে, ঘাস-বিচালি খায়, বাচ্চা করে, বুড়ো হয়, মরে যায়। জীবেরা খায় দায় বলেই বাড়ে—না খেতে পেলে কোন জীবই বাঁচে না।

গাছ তাহলে কি? জীব না জড়? আমরা যখন দেখি একটা প্রজাপতি এ-গাছ থেকে ও-গাছে উড়ে উড়ে বসছে, আর গাছগুলো যে

যার জায়গায় চুপ্ করে দাঁড়িয়ে আছে, তখন আমাদের মনে হয় বুঝি প্রজাপতিটারই প্রাণ আছে, গাছগুলোর নেই। প্রজাপতি এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যেতে পারে, গাছ তা পারে না—প্রজাপতির গায়ে খোঁচা দিলে সে ছট্‌ফট্ করে, গাছকে কেটে ফেল্লেও সে নড়ে না—প্রজাপতি ফুলের মধু খায়, গাছকে কিছু খেতে দেখা যায় না। আসলে কিন্তু প্রজাপতিটাও যেমন জীবন্ত, গাছগুলোও তেমনি।

একটা আঁবগাছ গরুর মতই ছোট থেকে বড় হয়—ইটের মত যেমন তেমনি থাকে না। সেও গরুর মতই খায় দায়, বাচ্চা করে, মরে যায়। এমন কি সে গরুর মতই নিশ্বাস ফেলে।

গাছ যে ছোট থেকে বড় হয় তা তোমরা সকলেই দেখেছ কিন্তু গাছের খাওয়া বোধ হয় দেখ নি। তাদের খাওয়া চোখে দেখা যায় না। তারা শিকড় দিয়ে মাটির ভিতর থেকে রস টেনে খায়, পাতা দিয়ে বাতাস থেকে গ্যাস ধরে খায়। মাটীর ভিতরকার রস শিকড় দিয়ে গাছের মধ্যে যাচ্ছে কি না, তা বাইরে থেকে দেখবার জো নেই, আর গ্যাসের কোন রং নেই বলে তাও দেখা যায় না। তা ছাড়া মানুষের মত গাছের মুখও নেই দাঁতও নেই যে খাবার সময় মুখ নড়বে। এইজন্যই তারা হাওয়ার মত কি জলের মত জিনিষ ছাড়া কোন শক্ত জিনিষ খেতে পারে না। শক্ত জিনিষ যতক্ষণ না জলে গুলে যায়, কি গলে জলের মত হয়, ততক্ষণ গাছেরা তা খেতে পারে না।

জন্তু জানোয়ারেরাও খায়, গাছেরাও খায়; কিন্তু এদের খাওয়ার সঙ্গে ওদের খাওয়ার একটু তফাৎ আছে। জন্তুরা হয় গাছ পালা খায়, যেমন ঘোঁড়া-গরুরা, না হয় অন্য জন্তু খায়, যেমন বাঘ-সিংহরা, না হয় দু-ই খায়, যেমন মানুষেরা। অর্থাৎ, জন্তুদের

খাবার হচ্ছে জীব—কিন্তু গাছেরা জীবহত্যা করে খায় না। তাদের খাবার হচ্ছে জড়—যেমন জল, গন্ধক, বিষ-গ্যাস *। তাছাড়া জন্তুরা তাদের খাবার জিনিষ খুঁজে নিয়ে খায়, কাছে না পেলে দূরে গিয়ে জোগাড় করে; কিন্তু গাছেরা তা পারে না—তাদের খাবার জিনিষ হাতের গোড়ায় পাওয়া চাই। যে জিনিষ একেবারে তাদের গায়ে এসে না ঠেকে, তা যতই কাছে থাক্, তারা খেতে পারে না। দু'হাত তফাতে হয় ত অনেক খাবার জিনিষ আছে, কিন্তু শিকড় দিয়ে নাগাল পাচ্ছে না বলে একটা গাছ শুকিয়ে মরে যাচ্ছে।

উপরেই বলেছি গাছেরা জীবহত্যা করে খায় না, কিন্তু গোটাকতক গাছ আছে যারা এ দলের বাইরে। তারা জন্তুদের মত হয় মরা গাছ খায়, না হয় জ্যান্ত গাছ খায়, না হয় মরা জন্তু খায়, না হয় জ্যান্ত জন্তু খায়। এদের গাছ বলি এই জন্যে যে, এরাও নড়তে চড়তে পারে না, এদের খাওয়ার ধরণটাও গাছের মত, আর চেহারাতেও গাছের সঙ্গে এদের মিল আছে।

পচা পাতা, পচা কাঠের উপর যে ব্যাঙের ছাতা দেখা যায়, তা ঐ পাতা, কাঠের পচানি খেয়েই বেঁচে থাকে। আঁবগাছ কি কুল-গাছের ডালে অনেক সময় এমন দু'একটা গাছ দেখা যায়, যাদের শিকড় মাটীতে নেই—যাদের পাতা কি ফুল দেখলে মনে হয় কে যেন

* কয়লা পোড়ালে যে গ্যাস হয় তাকেই বলে বিষ-গ্যাস—কেননা সে গ্যাস বেশি টানলে মানুষ মরে যায়। বিষ-গ্যাসের ইংরিজি নাম কার্বন ডাই-অক্সাইড্। এই গ্যাস জলের সঙ্গে মেশালে কার্বনিক এ্যাসিড বলে একরকম এ্যাসিড হয় বলে ইংরিজিতে এর আর এক নাম কার্বনিক এ্যাসিড গ্যাস।

ঐ সব ডালে তাদের কলম বেঁধে দিয়েছে ; কিন্তু তারা কলমের গাছ নয়—তারা ঐ আঁব গাছ কুল গাছের গুঁড়ির মধ্যে শিকড় চালিয়ে দিয়ে তাদের তাজা রসটুকু চুষে খায়। এইসব গাছকে রাক্ষুসে পরগাছা বলে। এরা যারই ঘাড়ে চড়ে তারই ঘাড়ের রক্ত চুষে খায়। রাক্ষুসে পরগাছা না তুলে ফেললে আসল গাছটাই মারা পড়ে। আলোকলতা আর আকাশবেল * যে রাক্ষুসে পরগাছা তা হয় ত তোমরা জান। কিন্তু এ বোধ হয় জাননা যে, চন্দনও একটা রাক্ষুসে পরগাছা। চন্দনের শিকড় মাটির তলা দিয়ে অন্য গাছের শিকড় থেকে রস টানে - তাই আশপাশের দু একটা বড় গাছ কেটে ফেললে চন্দন গাছ একেবারে কাহিল হয়ে পড়ে।

জন্তু-খেকো গাছেরা প্রায়ই ফাঁদ পেতে ঠকিয়ে তাদের শিকার ধরে। কোন কোনটা শিকার করেই খেতে আরম্ভ করে, কোন কোনটা পচিয়ে নিয়ে তবে খায়।

আমাদের বাঙালা দেশের খানা ডোবা কি ধানের খেতে বর্ষাকালে যে ঝাঁঝি জন্মায় তা তোমরা হয় ত দেখে থাকবে, কিন্তু তারা যে জলের পোকা মাকড় খেয়েই বেঁচে থাকে তা বোধ হয় জান না। তাদের পোকা ধরবার ফাঁদ বড় চমৎকার। ফি পাতাটার গোড়ার দিকে গোলমরিচের দানার মত একটি করে থলি থাকে। সেই থলির মুখে ইঁদুর কলের দরজার মত একটি করে ছোট্ট দরজা আছে, যা ঠেলে

* এই দুই রাক্ষুসে পরগাছাই দেখতে অনেকটা একরকম। দুয়েরই পাতা নেই ; দুয়েরই ডাঁটাগুলো তারের বাণ্ডিলের মত অন্যগাছের ডালপালাকে পেঁচিয়ে থাকে—তবে আলোকলতার রঙ শাদাটে-হল্‌দে, আকাশবেলের রঙ ফিকে-সবুজ।

ভিতরে যাওয়া যায় কিন্তু বাইরে আসা যায় না। ছোট ছোট পোকা গুলো বুঝতে না পেরে যেই তার ভিতরে ঢোকে অমনি আট্‌কা পড়ে যায়, আর ছটফট করে মরে। তখন সেই থলির গা থেকে একরকম টক রস বেরিয়ে পোকাগুলোকে গলিয়ে ফেলে; দেখতে দেখতে পোকাগুলো হজম হয়ে যায়।

আসাম অঞ্চলে শিশির-পাতা বলে আর একরকম জন্তু-খেকো গাছ আছে। গাছগুলো মোটে চার পাঁচ আঙুল উঁচু। বর্ষাকালে পাথুরে জায়গায় জন্মায়, শরৎ কালেই শুকিয়ে যায়। এরাও ছোট ছোট পোকা মাছি ধরে খায়। এদের কুচি কুচি পাতার উপর যে চুলের মত শোঁয়া আছে তাই দিয়ে আঠার মত চট্‌চটে একরকম রস বেরোয়—যা দূর থেকে ফোঁটা ফোঁটা শিশিরের মত চিক্‌চিক্ করে। পোকা মাছিরা মধু ভেবে যেই তার উপর উড়ে বসে অমনি আঠায় পা জড়িয়ে যায়; যতই ছাড়াবার চেষ্টা করে ততই আরো জড়িয়ে যায়। শোঁয়াগুলোও চারদিক থেকে ধনুকের মত নুয়ে পড়ে তাদের চেপে ধরে, আর যতক্ষণ না তারা ঐ আঠার রসেই গলে পাতার সঙ্গে মিশে যায়, ততক্ষণ তাদের ছাড়ে না।

এই জাতেরই আর একরকম গাছ ছোটনাগপুরে দেখা যায়। এর ফুলগুলোও হয় লাল, পাতার উপরকার শোঁয়াগুলোও হয় লাল—দূর থেকে দেখলে মনে হয় কে যেন এক গাদা পানের পিক্ ফেলে রেখেছে। এই জন্যেই একে পানের-পিক্ গাছ বলে। এ গাছও শিশির-পাতার মত পাতার আঠা দিয়ে পোকা মাছি ধরে খায়।

অষ্ট্রেলিয়ায় আর একরকম জন্তু-খেকো গাছ আছে যাকে মাছির

ফাঁদ বলে, কেননা তার এক একটি পাতা এক একটি মাছি ধরবার ফাঁদ। পাতাগুলোর উপর পিঠে ছ'টি লম্বা শোঁয়া খাড়া হয়ে থাকে—বোঁটা শিরের এপাশে তিনটি, ওপাশে তিনটি; আর পাতার কিনার দিয়ে চোখের ভোমার মত সরু সরু শোঁয়ার ঘের থাকে। মাছি বা মাছির মত কোন উড়ো পোকা যদি পাতার উপর দিয়ে উড়ে যায়, আর উড়ে যাবার সময় যদি তাদের ডানা কি পা ঐ লম্বা শোঁয়া ছ'টির একটিরও গায়ে লাগে, তাহলে আর রক্ষা নেই—অমনি পাতাটি দু'ভাঁজ হয়ে তাকে মুড়ে ফেলে, যেন চোখের পাতা দুটো দুদিক থেকে এসে জুড়ে গেল। তখন কয়েদী জন্তুটা বেরিয়ে আসবার জন্যে চেষ্টা করে কিন্তু পারে না; কিনারার শোঁয়াগুলো জাঁতিকলের দাঁতের মত এ-ওর ভিতর ঢুকে গিয়ে বেরো-বার পথ বন্ধ করে রেখেছে। পোকা বেচারা পাতার মধ্যেই ধড়ফড় করে মরে যায়। তারপর ঝাঁঝির বেলায় যা বলেছি, এখানেও ঠিক তাই। পোকা হজম হয়ে গেলে, পাতাটা আবার যেমন মেলা ছিল তেমনি মেলিয়ে পড়ে।

মাছির ফাঁদ যে ফাঁদে ডাঙ্গার পোকামাছি ধরে, এদেশের মলাক্কা ঝাঁঝিও সেই ফাঁদে জলের পোকা মাকড় ধরে। মলাক্কা ঝাঁঝির পাতা ঠিক মাছির ফাঁদের পাতার মত; কেবল মাঝখানে ছ'টি শোঁয়ার বদলে অনেকগুলো শোঁয়া।

সুমাত্রা, জাভা, বোর্ণিও এই সব দ্বীপে গেলাস গাছ বলে এক-রকম জন্তু-খেকো গাছ দেখতে পাওয়া যায়। তার দু'চারটে পাতার ডগা ডাঁটার মত সরু হয়ে মাটির দিকে নেবে আসে, মাটির কাছ বরাবর এসে ঢাকনিসুদ্ধ গেলাসের মত হয়ে পড়ে। গেলাসের

ঢাক্নি খোলাই থাকে আর তার ভিতর দিকে কানা দিয়ে মধুর মত একরকম মিষ্টি রস বেরোয়। গেলাসের গায়েও জ্বলজ্বলে লাল আর বেগুণী রঙের ছোপ্। রঙের বাহারে ভুলে অনেক পোকামাছি তাদের গায়ে গিয়ে উড়ে বসে—তারপর মধুর গন্ধে আস্তে আস্তে ভিতরে গিয়ে ঢোকে। গেলাসের ভিতরটা এমনি পিছল যে ঢোকবা-মাত্রই পোকামাছিগুলো হুড়্কে তলায় পড়ে যায়, আর উঠতে পারে না—কেন না, গেলাসটার তলায় শিশির বৃষ্টির জল ত জমে থাকেই, তাছাড়া কতকগুলো শক্ত শক্ত শোঁয়া এমনধারা নীচু মুখ করে বসানো থাকে যে, তা ঠেলে উপরে ওঠা পোকামাছিদের সাধ্যিতে কুলোয় না। গেলাসের জলের সঙ্গে তার গা-চোয়ানো একরকম টক রস মিশে থাকে বলে পোকামাছিগুলো খুব শীগ্গিরই মরে যায়। তখন গেলাসটা তাদের ক্বাথ বের করে নিয়ে গাছের পেটের মতই তাদের হজম করতে থাকে।

মাডাগাস্কার দ্বীপে নাকি একরকম মানুষ খেকো গাছ * বেরিয়েছে যা দেখতে অনেকটা আনারস গাছের মত; কিন্তু উঁচুতে পাঁচ ছয় হাতের কম নয়। এর এক একটা কাঁটা-আলা পাতা সাত আট হাত করে লম্বা, বিঘতখানেক করে চওড়া। এর মাথার উপর সান্কি থালার মত খানিকটা জায়গা আছে যা থেকে একরকম ঘন মিষ্টি রস বেরোয়। ঐ রসের এতই নেশা যে, খেলেই লোক অজ্ঞান হয়ে

* এ গাছের খবর কতটা সত্যি তা এখনো ঠিক্ বলা যায় না। জর্ম্মাণ পণ্ডিত ডাক্তার কাল লিচ্ যিনি দেশবিদেশে বেড়িয়ে বেড়ান, তিনিই এই গাছ দেখে এসেছেন। ১৩২৭ সালের ২রা পৌষের "হিন্দুস্থান" কাগজেও এ গাছের কথা বেরিয়েছে।

পড়ে। ঐ গাছের উপর যদি কাউকে ছুড়ে ফেলে দেওয়া যায় তাহলে অমনি গাছের চটালো পাতাগুলো উঁচু হয়ে উঠে তাকে জড়িয়ে ধরে—আর ডালগুলোও সাপের মত পাকিয়ে পাকিয়ে তাকে পেঁচাতে থাকে—সঙ্গে সঙ্গে গাছের গুঁড়ি থেকে এক রকম হলদে টক রস ভুল্ভু করে বেরিয়ে তাকে হজম করে ফেলে। মাডাগাস্কার দ্বীপে কোডাস্ বলে এক রকম অসভ্য লোক আছে যারা ঐ গাছকে দেবতা বলে মানে—আর মাঝে মাঝে এক একটা মেয়ে-মানুষ দিয়ে পূজো দেয়। গাছটার কিন্তু একটা গুণ এই যে, যখন তার ক্ষিদে না থাকে তখন তার উপর চড়ে বস্‌লেও সে কিছু বলে না।

(৬)

সব গাছের পরমাই সমান নয়। অনেক গাছ আছে যারা এক বছরের বেশী বাঁচে না, যেমন ধান, গম, ভুট্টা। এদের বছুরে গাছ বলে। আর কতকগুলো গাছ আছে যারা দু'বছরের বেলায় ফল দিয়ে মরে, যেমন কলা, মূলো, কপি। এদের দু'বছুরে গাছ বলে। আবার কতকগুলো গাছ আছে যেমন বাঁশ,* শ্রীতাল, সাবু, যারা

* ফুল ফল ধরে মরে গেলেও বাঁশ যে একেবারে মরে তা নয়; তার যে গুঁড়িটা মাটির মধ্যে থাকে তাই থেকে আবার বাঁশ বেরোয় কিন্তু সেগুলো হয় সরু সরু আর বেঁটে—যেন আর তেমন তেজ নেই ফল ফল দিতেই সব তেজটুকু ফুরিয়ে গেছে। সাবেক তেজ ফিরে পেতে তাদের বত্রিশ বছর কেটে যায় এই জন্যে বত্রিশ বছর পরে তারা আবার ফুল ফল দেয়। আর এটাও বড় মজা যে, যে বছর একটা বাঁশ গাছে ফল হয়, সে বছর সে দেশে যত বাঁশ গাছ আছে সকলেরি ফল হয়।

অনেক বছর পরে একবার ফল দেয় কিন্তু দিয়েই মরে যায়। এদের অনেক-বছুরে গাছ বলে। কাঁকড়া, মাকড়সা যেমন বাচ্চা হলেই মরে যায় এ তিন রকম গাছও তেমনি ফল পাকলেই শুকিয়ে যায়। এদের সংস্কৃত নাম হচ্ছে ওষধি।

যে সব গাছ বছর বছর ফল দেয়, অথচ খুব বেশী দিন বাঁচে তাদের অখণ্ড-প্রমাই গাছ বলে। এদের এক একটা এত বেশী দিন বাঁচে যে, কোন জন্তুই অতদিন বাঁচে না।

লাইম বলে একরকম গাছ আছে যার প্রমাই হাজার বছরের কম নয়। স্প্রুস্ গাছ বার শ' বছর বাঁচে। উপরে যে বোবাব্ গাছের কথা বলেছি তার এক একটা হাজার দেড় হাজার বছরের পুরানো। ওক গাছের প্রমাইও বোবাব্ গাছের মত। দু'হাজার বছর টিঁকে আছে এমন চেস্টনাট্ আর সিডার গাছের কথাও শোনা যায়। সাইপ্রেস্ আর ইউ গাছ সব চেয়ে বেশী দিন বাঁচে—আড়াই হাজার বছরেও তারা বুড়ো হয় না। কিন্তু এ সবই বিদেশী গাছ। তা বলে মনে কোরো না এদেশী গাছের প্রমাই কিছু কম। লঙ্কার অনুরাধাপুর গ্রামে একটা অশ্বত্থ গাছ আছে, যার বয়স এখন দু'হাজার দু'শো' পনের বছর। ভারতবর্ষেও এক একটা বটগাছ আছে যা কতদিনের কেউ বল্‌তে পারে না। এই জন্যে লোকে তাদের 'অক্ষয় বট' বলে। বোম্বাই শিমুল তিন হাজার বছর পর্য্যন্ত বাঁচতে পারে।

সব গাছই যে বুড়ো হয়ে মরে তা নয়। জন্তুদের মত তারাও না খেতে পেয়ে মরে, অসুখ বিসুখে মরে। গাছের অসুখ বিসুখ শুনে তোমরা বোধ হয় আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্চ; কিন্তু তাদেরও অসুখ বিসুখ

হয়—হলে তাদেরও বাড় কমে যায়, তারাও আমাদের মত কেকাশে হয়ে পড়ে। আবার আমাদের শরীরে বিষ ঢুকলে আমরা যেমন কাহিল হয়ে পড়ি—গাছেরাও ঠিক তাই। আচার্য্য জগদীশ চন্দ্র বসু দেখিয়েছেন যে চারা গাছের গায়ে তামাকের ধোঁয়া ছেড়ে দিলে তখনি তার বাড় থেমে যায়। যে অসুধ শুঁকিয়ে ডাক্তারেরা রুগীকে অজ্ঞান করে রাখেন সেই ক্লোরোফর্ম্ম দিয়ে গাছকেও অসাড় করে' রাখা যায়। সে তখন না পারে শিকড় দিয়ে রস টানতে, না পারে কিছু করতে; ঠিক আচ্ছন্নের মত পড়ে থাকে।

(৪)

গাছের যেমন খাবার চাই, তেমনি আলো চাই। আলো না পেলে গাছ বাঁচে না। একটা গাছকে তিন দিন অন্ধকার ঘরে পূরে রেখে দাও, দেখবে তার পাতাগুলো হলদে হয়ে মুষড়ে গেছে।

আলো ত গাছের খাবার নয়, তবু গাছ আলো চায় কেন? গাছের শরীরে গাছ-সবুজ বলে এক রকম সবুজ রঙের জিনিষ আছে যার জন্যে গাছের পাতা সবুজ দেখায়। এই গাছ-সবুজই গাছের খাবার রাঁধে। মাটী আর হাওয়া থেকে গাছ যে খাবার খায় তা কাঁচা খাবার—তাকে শরীরের মধ্যে একবার না রেঁধে নিলে গাছ তা হজম করতে পারে না। এই রান্নার জন্যেই সূর্য্যের আলো চাই। গাছ-সবুজ সূর্য্যের আলোর তেজে গাছের কাঁচা খাবারকে রাঁধে।

গাছ-সবুজ আর সূর্য্যের আলো দুই-ই সমান দরকারী। যদি কোন রকমে গাছ-সবুজ নষ্ট হয়ে যায়, তা হলে হাজার আলো

পেলেও গাছ বাঁচে না। গাছের বেশীর ভাগ গাছ-সবুজ থাকে পাতায়, এই জন্যে পাতাই থাকে সব চেয়ে আলোতে।

যে সব গাছ কাঁচা খাবার খায় না, অর্থাৎ—যাদের খাবার হচ্ছে জীব, তাদের কথা আগেই বলেছি। তারা তৈরী খাবার খায় বলে তাদের আর খাবার রাঁধতে হয় না। এই জন্যে তাদের আলোরও দরকার নেই, গাছ-সবুজেরও দরকার নেই। কত সাদা, হলদে, মেটে রঙের ব্যাঙের ছাতা গাছের কোটরে, কুয়োর খোঁদলে গজিয়ে ওঠে, যেখানে আলোর নাম গন্ধও নেই।

গাছের যেমন আলো চাই তেমনি তাত জলও চাই। তাত জল না পেলেও গাছ বাঁচে না। কিন্তু আলোই হোক্, তাতই হোক্, জলই হোক্ সব মাঝামাঝি রকম পেলে গাছ থাকে ভাল। আলো তাত জলের কমতিতেও গাছ যেমন কাহিল হয়ে পড়ে বাড়াবাড়িতেও তেমনি। মরুভূমিতে যেখানে আলো তাত খুব বেশী, আর মেরুর কাছে যেখানে আলো তাত নেই বল্লেই হয়, এ দু'জায়গাতেই গাছপালা খুব কম। যা দু'চারটা আছে তা প্রায় এক জাতেরই—বেঁটে বেঁটে মরাঞ্চে। আমাদের দেশে আলো তাত-জল মাঝামাঝি রকমের বলে এত গাছ পালার ভিড়। দু'এক জাতের গুঁড়ো সেওলা আছে যারা খুব বেশী রকম তাত সইতে পারে—সীতা-কুণ্ডের মত গরম জলের ফোয়ারাতেও তাদের ভাস্‌তে দেখা যায়।

(৫)

আলো জল খাবার নিয়ে গাছেদের মধ্যে রাত দিনই লড়াই চলেছে। দেখতে নিরীহ ভালমানুষ হলেও এদের এক নিয়ম—

'জোর যার মুলুক তার'। সকলেই নিজের কোলে ঝোল টানচে। সকলেই চায় আমিই আগে যা কিছু দরকার নিয়ে নিই, তারপর অন্য কেউ পাক্ আর না-ই পাক্। কেউ বা যেখানে রস সেইখানেই নিজের শিকড় চালিয়ে দিয়ে বসে আছে—আর কাউকে এগোতে দিচ্চে না; কেউ বা যে দিকে আলো সেই দিকেই নিজের পাতা ছড়িয়ে সব আলোটুকু দখল করে বসে আছে—আর কাউকে মাথা তুল্‌তে দিচ্চে না। এমন কি নিজের বাচ্চা চারাটা আওতায় পড়ে মারা যাচ্চে, ধাড়া গাছটা তা চেয়েও দেখ্‌ছে না—উল্টে নিজেই তাকে চেপে মার্‌ছে।

এই লড়াই-এর জন্যে যে কত জাতের গাছ পৃথিবী থেকে একেবারে উজাড় হয়ে গেছে তার ঠিক ঠিকানাই নেই। এর উপর রোদ বৃষ্টি ঝড় ঝাপ্‌টার সঙ্গে লড়াই ত আছেই। পণ্ডিতেরা বলেন যে, এ পর্য্যন্ত যত রকমের গাছ জন্মেছে তার ত্রিশ ভাগের উনত্রিশ ভাগই নেই—এক ভাগ মাত্র টিঁকে আছে।

সব দেশেরই পুরানো বই-এ এমন সব গাছের কথা পড়া যায় যার চিহ্ন পর্য্যন্ত পৃথিবী থেকে মুছে গেছে। আমাদের শাস্ত্রে যে সোমলতা মুক্তালতার কথা আছে তারা এখন কোথায়? নীলপদ্ম শ্বেত-মাকাল, কনক-ধুতরো ত এখন অসুধ করতেও পাওয়া যায় না। বেশী কথা কি, এই জাফরান গাছই রোজ রোজ যা কমে আসছে দিনকতক পরে তারও হয় ত শুধু নামটাই পড়ে থাকবে।

নিজেদের মধ্যে লড়াই-এর জন্যে আর একটা মজার ব্যাপার এই হচ্ছে যে, অনেক গাছ নিজেদের বাঁচাবার জন্যে একজাত বদ্‌লে অন্যজাত হয়ে যাচ্ছে। যে গাছগুলো হয়ত অন্য গাছের আওতায়

পড়ে আলো খাবার ভাল পাচ্ছে না, তারা নিজেদের শরীরকে এমন করে তৈরী করছে যাতে কম আলো খাবার পেয়েও তারা বেঁচে থাকতে পারে।

নিজেদের মধ্যে এই লড়াই ত চলেইছে, তার উপর আবার জন্তুদের শত্রুতা আছে। গাছকে জন্তুরা কেবলই খাচ্ছে। গরু ছাগল থেকে আরম্ভ করে শুয়োর সজারু ফড়িং বাগে পেলে কেউই তাদের ছেড়ে কথা কয় না। গাছেরা কিছুই বলতে পারে না, চুপ্ চাপ্ পড়ে থাকে।

এ সত্ত্বেও গাছ যে এখনো পৃথিবীতে টিঁকে আছে। শুধু টিঁকে থাকা কেন, জন্তুর চেয়েও দলে পুরু—এর মানে কি ?—

এর মানে সব গাছই যে চুপ্ করে পড়ে আছে তা নয়। অনেকেই জন্তুদের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে নানা রকম ফন্দী বের করেছে। তারা তেড়ে গিয়ে জন্তুদের মারে না এই পর্য্যন্ত—নৈলে জন্তুদের দাঁত নখের চেয়ে তাদের অস্ত্র-শস্ত্র বড় কম নয়। কেউ বা সজারুর মত সর্ব্বাঙ্গে এমনি কাঁটা বের করে রেখেছে যে জন্তুদের জো কি তাদের গায়ে মুখ দেয়: যেমন ফণী-মনসা, কুল, বাবলা, শিয়ালকাঁটা, লজ্জাবতী। লজ্জাবতী লতার নধর সবুজ পাতা দেখে দূর থেকে গরুরা ছুটে আসে, কিন্তু যেই পাতাতে মুখ দেওয়া, অমনি পাতাগুলো কোথায় লুকিয়ে পড়ে আর বেরিয়ে থাকে শুধু খোঁচা খোঁচা কাঁটা। কাঁটার খোঁচা খেয়েই গরুরা বেকুব হয়ে ফিরে যায়। কোন কোন গাছের পাতায় এম্‌নি কুট্‌কুটে শোঁয়া যে গায়ে লাগলেই অস্থির করে তোলে—যেমন বিছুটি। এক একটা গাছের আঠা আবার এমনি ভয়ঙ্কর যে, যেখানে লাগে, ঘা হয়ে যায়, যেমন রাঙচিতে, আকন্দ, তেকাটাসীজ। কতকগুলো গাছের পাতায় না হয় ফুলে এমনি

বিশ্রী গন্ধ যে কাছে এগোয় কার সাধ্য,—যেমন গাঁদাল, ঘ্যাটকোল কুকুরশোঁকা। কেউ কেউ আর কিছু করতে না পেরে পাতাগুলোকে তেতো করেই রেখেচে, যেমন—নিম, পাট, পটল।

গাছ আরো টিঁকে আছে এইজন্যে যে, সব জন্তুই গাছের শত্রু নয়। কোন কোন জন্তু বন্ধুর মতই গাছের উপকার করে। ইঁদুর মাটী তুলে জমিকে ক্ষেতের মত চষে ফেলে, আর সেই নরম মাটিতে হু হু করে গাছ গজায়। কেঁচো নীচের মাটি উপরে তুলে গাছের গোড়াতে সার দেবার কাজ করে—কেননা সে মাটী তখনো টাট্‌কা, তখনো রসালো।

আমরাও কেঁচো ইঁদুরের মত অনেক গাছের বন্ধু। তবে আমরা যে বন্ধুতা করি, সে না জেনে শুনে নয়, ইচ্ছা করে। আমরা বেড়া দিয়ে আলু বেগুনের গাছ ঘিরি, ঝারিতে করে গোলাপ বেল গাছে জল দিই, বেছে বেছে ধানগাছের আগাছা তুলে ফেলি। আমরা চাষ করে বাঁচিয়ে রেখেছি বলেই অনেক গাছ এখনো বেঁচে আছে।

এ ছাড়া একটা মস্ত কথা এই, গাছেরা ধাঁ ধাঁ করে বংশ বাড়ায়। এ বছর যেখানে একটা বাঁশ পুতলে, আর বছর গিয়ে দেখ সেখানে বাঁশের ঝাড়। এমাসে যে পুকুরে একটা ক্ষুদে পানা ছাড়লে, আর মাসে গিয়ে দেখ সে পুকুরটা পানায় একেবারে সবুজ। আজ যে উঠানের এক কোণে একটু সেওলা আছে, কাল সেই উঠানে পা দিতেই পারবে না—সমস্তটাই সেওলায় হড়্‌হড়ে। কিন্তু সব চেয়ে তাড়াতাড়ি বংশ বাড়ায় অণু-গাছড়া। একটা অণু গাছড়া যদি ছ'দিন ধরে বংশ বাড়াতে পায়,আর তার বাচ্চাগুলো সব বেঁচে থাকে, তাহলে

ঐ ছ'দিনেই এত অণু-গাছড়া জন্মাবে যে, তা এক জায়গায় জড় করলে, পৃথিবীটার চেয়েও বড় দেখাবে।

কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে গাছের শরীর। গাছের শরীর এমনি মজবুত যে গরু ছাগলে মুড়িয়ে গেলেও টপ্ করে গাছ মরে না, মাঝখান থেকে কেটে ফেল্লেও অনেক সময় ফের গজিয়ে ওঠে।

তবে গাছেরা সব আবহাওয়ার সঙ্গে নিজেদের তেমন মানিয়ে নিতে পারে না, যেমন জন্তুরা পারে—ঠাণ্ডা দেশের গাছ গরম দেশে, জোলো দেশের গাছ শুক্‌নো দেশে নিয়ে গেলে, গাছ প্রায় একটা বাঁচে না ; যদিও তারাই পৃথিবীর সবচেয়ে পুরানো বাসিন্দে। এমন দিন ছিল যখন পৃথিবীতে জন্তু বল্‌তে কিছুই ছিল না, পোকা মাকড়ও নয়—ছিল কেবল গাছপালা।

জন্তুরা যে গাছের পরে পৃথিবীতে এসেছে, তা সহজেই বুঝতে পারবে। এমন একটা জন্তু নেই, গাছের মত মাটীর রস কি বাতাসের গ্যাস খেয়ে বাঁচে। জন্তুরা যা খায়, সে ঐ গাছপালা। ঘোড়া গরু যে গাছপালা খায় তা তোমরা দেখেইছ—আর বাঘ সিংহ গাছপালা খায় না বটে, কিন্তু ঐ ঘোড়া গরু ধরে খায় ; তাহলেই গাছপালা খাওয়া হল। আসল কথা সোজাসুজিই হোক্ আর ঘুরিয়েই হোক্ গাছপালা খাওয়া ছাড়া জন্তুদের উপায় নেই—তা মাছি পিঁপড়েরও নয়। এর থেকেই বোঝা যাচ্চে গাছের আগে জন্তু হয় নি ; আর এ-ও বোঝা যাচ্ছে যে আজ যদি সব গাছ মরে যায়, কাল জন্তুরাও সব উপোস করে মরবে। গাছেরা পাত্‌তাড়ি গুটোলে, জন্তুদেরও পাততাড়ি গুটোতে হবে।

তোমাদের হয় ত ভয় হচ্ছে গাছেরা না পাততাড়ি গুটোয়, কিন্তু

আগে যা বলেছি তার থেকেই বুঝতে পারছ সে ভয় বড় একটা নেই। তবে একথা ঠিক, আগে পৃথিবীতে যত গাছপালা ছিল এখন তার চেয়ে ঢের কমে এসেছে। পণ্ডিতেরা বলেন, আগেকার বাতাসে বিষ গ্যাস আর বাষ্প * বেশী ছিল বলেই গাছেরা খুব তেজের সঙ্গে ঝাঁকে ঝাঁকে গজিয়ে উঠত। যেমন জঙ্গল এখন সুন্দরবনে আছে, সেই রকম জঙ্গলে তখন পৃথিবীটা বোঝাই ছিল। আমরা মাটী খুঁড়ে যে পাথুরে কয়লা বের করি, তা ঐ সব জঙ্গলে গাছের হাড়। গাছগুলো স্রোতের টানে ঘুরপাক খেতে খেতে সমুদ্রে গিয়ে পড়তো—আর সমুদ্রের তলায় কাদা বালিতে পুতে যেত; পোতা থেকে থেকেই আস্তে আস্তে পাথুরে কয়লা হয়ে গেছে।

(৬)

গাছেরা যে কেবল তাদের গায়ের মাংস খাইয়ে আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে তা নয়। তারা আমাদের আরো অনেক উপকার করছে। বাতাসে যে প্রাণ-গ্যাস † আছে তাই টেনে আমরা বেঁচে থাকি, কিন্তু যে গ্যাস ছেড়ে দিই তা বিষ-গ্যাস। কয়লা পোড়ালেও যে বিষ গ্যাস হয় তা আগেই বলেছি। আমরা যতই

* জল যখন উবে গিয়ে বাতাসে মিশে যায় তখন তাকেই বলে বাষ্প। জল ফোটালেও বাষ্প হয়।

† দশ হাজার ভাগ বাতাসে প্রাণ গ্যাস (অক্সিজেন) আছে প্রায় একুশশো ভাগ, বিষ-গ্যাস প্রায় চার ভাগ আর বাদবাকী প্রায় সবই বে-মিশুক গ্যাস (নাইট্রোজেন)। প্রাণ-গ্যাস যেমন কয়লার সঙ্গে মিশ্‌লেই বিষ-গ্যাস হয়, তেমনি হাল্‌কা-গ্যাসের (হাইড্রোজেন) সঙ্গে মিশ্‌লেই হয় জল। প্রাণ-গ্যাসের জন্যেই প্রদীপ জ্বলে, কয়লা পোড়ে।

নিশ্বাস ফেল্‌ছি আর যতই কয়লা পোড়াচ্ছি ততই বিষ-গ্যাস যাচ্ছে বেড়ে, প্রাণ-গ্যাস যাচ্ছে কমে। কিন্তু গাছ বিষ-গ্যাসই টেনে নেয় বেশী আর প্রাণ-গ্যাস টেনে নেয় কম। আবার ছাড়বার সময় সে বিষ-গ্যাসই ছাড়ে কম, প্রাণ-গ্যাসই ছাড়ে বেশী। এইজন্যেই বাতাসে প্রাণ-গ্যাসের মাত্রা এখনো ঠিক আছে—নৈলে কোন্‌কালে বিষ-গ্যাসেই বাতাস ভরে যেত, প্রাণ-গ্যাস একটুও থাকত না; কাজেই দম বন্ধ হয়ে মানুষ গরু ঘোঁড়া সব মরে যেত।

গাছেরা যেমন প্রাণ-গ্যাস ছাড়ে, তেমনি বাষ্পও ছাড়ে। বাষ্প ছাড়ে বলেই গাছতলা এত ঠাণ্ডা। ছায়ার জন্যেও যে গাছতলা ঠাণ্ডা তার কোন ভুল নেই কিন্তু জোলো হাওয়ার জন্যেই বেশী। গরমের দিন দুপুর বেলা যখন ঘরের মধ্যে থেকেও প্রাণ আইঢাই করে, তখন গাছতলায় গেলে গা জুড়িয়ে যায়।

একটু হাওয়া হলেই ধূলো ওড়ে। কিন্তু আরো ঢের বেশী উড়তো যদি ছোট বড় হাজার হাজার গাছ মাটির মধ্যে শিকড় চালিয়ে তাকে না কামড়ে ধরে রাখতো। গাছপালা না থাকলে সহর থাকাই দায় হত। সহরের বড় বড় বাড়ীর কোনটা হয় ত দুদিনেই মাটী চাপা পড়তো কোনটা হয়ত ভিতের মাটি উঠে গিয়ে দুদিনেই ঘাড়মুড় ভেঙে পড়তো। যে সব দেশ সমুদ্রের কাছে, তার বেলে মাটি কেবলই ধসে পড়ে যতদিন না সেই মাটির উপর ঘাসের চাপড়া গজায়। ঘাসের চাপড়া ঝুরো বালিকে এমন শক্ত করে বাঁধে যে সেই শক্ত মাটির উপর তখন বড় বড় গাছও গজিয়ে ওঠে।

এ ছাড়াও গাছেরা যে আমাদের ছোট বড় কত উপকার করে তা বলা যায় না। এক একটা গাছ আমাদের এক একটা রোগের

অসুধ। কুইনিন্, কর্পূর, আফিং সবই গাছ থেকে বের করা হয়। নিম, পল্‌তা, ব্রাহ্মীশাক অসুধও বটে, পথ্যও বটে। আমরা যে চা খাই, তা এক রকম গাছের পাতা, যে সাবু রুগীকে খেতে দিই, তা একরকম গাছের মাথি, যে ধুনো পোড়াই তা এক রকম গাছের আঠা, যে চন্দন মাখি, তা এক রকম গাছের কাঠ, যে দারচিনি গরম মসল্লায় দিই তা এক রকম গাছের ছাল। আমরা যে কাপড় পরি তা কাপাস গাছের তুলো দিয়ে তৈরী, যে চট পেতে শুই, তা পাট গাছের কোষ্টা দিয়ে বোনা। কোন কোন গাছের কাঠ আমরা পোড়াই, কোন কোন গাছের কাঠ চিরে দোর জান্‌লা তৈরী করি, কোন কোন গাছের তক্তায় চেয়ার টেবিল, নৌকো জাহাজ গড়ি। এ ছাড়া গাছের পাতা আমাদের চোখ ঠাণ্ডা রাখে, গাছের ফুল গন্ধ ছড়িয়ে ফূর্ত্তি দেয়, গাছের ফল এমন মিষ্টি সারালো অথচ নির্দ্দোষ খাবার আমাদের সাম্‌নে ধরে—যে তার কাছে কোন খাবারই লাগে না। এখানে এ-ও বলে রাখি, কেননা অনেকে হয় ত না জানতে পারো যে, আমরা যে চাল খাই তা হচ্চে ধান গাছের বীচির শাঁস।

গাছ যেমন আমাদের উপকার করে—তেমনি অপকারও কিছু কিছু করে। আগেই বলেছি অনু-গাছড়া বলে যে সব ছোট ছোট গাছ আছে তারা অনেক শক্ত শক্ত রোগের জড়। এ ছাড়া অনেক বড় গাছও আছে যাদের পাতায় কি শিকড়ে, কি ফলে, কি আঠায় এমন সাংঘাতিক বিষ যে খেলেই মানুষ মরে যায়—যেমন তামাকের পাতা, পটলের শিকড়, ধুতরোর ফল, পোস্তর আঠা। কতলোক না জেনে এই সব খেয়ে মরে যায়।

গাছ আর এক দিক দিয়েও মানুষের বেজায় ক্ষতি করে আসচে।

মানুষ কত মেহনৎ করে, কতদিন ধরে যে সব বড় বড় ইমারৎ গড়ে তোলে, তাদের নষ্ট করতে গাছের জুড়ী আর নেই। ঝড়, বান, ভূমিকম্প, যুদ্ধ এই চার উৎপাতে মিলে এ পর্য্যন্ত যত বাড়ী না নষ্ট করেচে তার তিন গুণ বেশী করেচে গাছের শিকড়।

(৭)

কোন্ গাছ মেয়ে আর কোন্ গাছ পুরুষ এ নিয়ে অনেকের মনেই গোল আছে। কেউ মনে করে ডাঙার গাছগুলো পুরুষ, জলের গাছগুলো মেয়ে। কেউ মনে করে খাড়া গাছগুলোই পুরুষ, লতানে গাছগুলোই মেয়ে। কেউ বা আবার নাম ধরেই ঠিক করে ফেলে কোন্‌টা মেয়ে কোন্‌টা পুরুষ। এদের কাছে চাঁপা মালতী, সূর্য্যমুখী মেয়ে; হিজল, বট, গন্ধরাজ পুরুষ। কিন্তু এর একটাও ঠিক নয়।

একটা জন্তু জন্মাবার সময় হয় মেয়ে হয়ে জন্মায়, না হয় পুরুষ হয়ে জন্মায় কিন্তু গাছ যখন জন্মায় তখন সে না মেয়ে না পুরুষ। ফুল হলেই গাছের মেয়ে পুরুষ ঠিক পাওয়া যায়। যতক্ষণ না ফুল হচ্ছে ততক্ষণ বলবার জো নেই কে কি হবে। ফুল হলে দেখা যায় বেশীর ভাগ গাছই মেয়েও বটে পুরুষও বটে। যে সব গাছের ফুল হয় না, তারা চিরদিনই না-মেয়ে না-পুরুষ।

যে সব গাছের ফুল হয় না তাদের সঙ্গে যে সব গাছের ফুল হয় তাদের অনেক তফাৎ। চেহারা আর ধরণ ধারণ দেখলেই বোঝা যায় এদের এক ধারা, ওদের আর এক ধারা। আমরুল সেওলা

কাঁটানটে আর নকসাপাতা *, এই চার গাছকে যদি এক সঙ্গে রাখা যায় তা হলে আমরা আমরুল আর কাঁটানটেকে ফেলব একদিকে—সেওলা আর নকসা পাতাকে ফেল্‌ব আর একদিকে।

যে সব গাছের ফুল হয়, তাদের মধ্যেও যে দুটো আলাদা আলাদা দল আছে তা তোমরা সকলেই হয় ত নজর করেছ একদল, যেমন তাল নারকোল সুপুরী—আর একদল, যেমন আঁব জাম কাঁঠাল। তাল, নারকোল, সুপুরী সরু হয়ে, সড়িঙ্গে হয়ে ওঠে, আর মাথার উপর গোটাকয়েক বাল্‌তো ছড়ায়—আঁব, জাম, কাঁঠাল প্রায় গোড়া থেকেই ডাল পালা ছড়াতে ছড়াতে উপরে ওঠে, আর যতই উপরে ওঠে ততই গায়ে মোটা হয়।

কোন মানুষের সঙ্গে কোন মানুষের চেহারা যেমন হুবহু মেলে না, কোন গাছের সঙ্গে কোন গাছের তেমনি হুবহু মিল নেই। আঁব গাছের সঙ্গে বেল গাছের হুবহু মিল নেই—তালগাছের সঙ্গে ত নেই-ই। কিন্তু চেহারার গরমিলের চেয়ে গুণের গরমিল আরো বেশী। এক একটা গাছ আছে যারা দেখতে বরং অন্য গাছের সঙ্গে মেলে কিন্তু গুণ একেবারে অদ্ভুত।

লজ্জাবতী লতার কাঁটার কথা অগেই বলেছি—কিন্তু এর পাতা-গুলোই হচ্ছে মজার। দেখতে সেগুলো তেঁতুলপাতা কি আম্‌লকী

* নকসাপাতা (ফার্‌ন্) গাছের মত সুন্দর সুন্দর নকসা-আলা পাতা আর কোন গাছের নেই। অনেকে পোকায় কাটবে না বলে বই-এর পাতার মধ্যে এই গাছের পাতা পূরে রাখে—অনেকে এই পাতা দিয়ে ফুলের তোড়া সাজায়। এক জাতের নকসাপাতা গাছ লোকে খায়, তাকে ঢেঁকী শাক বলে।

পাতার মতই কিন্তু একটার গায়ে আঙ্গুল দাও দেখি, পাতাটি খপ্ করে মুড়ে যাবে আর ডালটি ঝুপ করে নুয়ে পড়বে।

বন-চাঁড়াল গাছের পাতায় বেল পাতার মত তিনটে করে পাতা থাকে। পাতাগুলো সবই লম্বাটে ধরণের—মাঝের পাতাটা বড়, পাশের পাতা দুটো ছোট ছোট। হাওয়া না হলেও পাতাগুলো দিন রাত নাচচে। বড় পাতাটা আস্তে আস্তে কখনো এপাশ ওপাশ করচে কখনো ওঠা নাবা করচে, আর ছোট পাতা দুটো কেবলই একবার করে এসে জোড়া লাগচে, একবার করে খুলে আলাদা হয়ে যাচ্চে—ঠিক যেন দুটো ছোট হাত ঘন ঘন হাততালি দিচ্চে।

দক্ষিণ আমেরিকায় কম্পাস্ গাছ বলে এক রকম গাছ আছে। তার ফি-পাতাটির মুখ উত্তর দিকে; সমুদ্রে দিক্ ঠিক করবার জন্য জাহাজে যে কম্পাস কল থাকে, তারই কাঁটার মত। এই পাতা দেখে অনেক জঙ্গলে-পথ-হারাণো লোক জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসেছে।

ঐ দক্ষিণ আমেরিকার পেরু দেশে আর একরকম গাছ আছে যার পাতা দিয়ে থেকে থেকে বৃষ্টির মত জল পড়ে। এইজন্যে বৃষ্টি হলেও কেউ এগাছের তলায় গিয়ে দাঁড়ায় না। এগাছের নাম বৃষ্টি গাছ। এক এক সময় এ গাছ থেকে এতই জল বৃষ্টি হয় যে, আশে পাশে চারপাঁচ আঙুল জল দাঁড়িয়ে যায়। যে দেশে বৃষ্টি কম—সে দেশের চাষারা যদি ক্ষেতের মধ্যে এই গাছ পোতে—তাহলে আর ভাবনার কিছু থাকে না।

আফ্রিকার মাডাগাস্কার দ্বীপে একরকম গাছ আছে যা দেখতে অনেকটা কলাগাছের মত কিন্তু যাকে জলের-কল গাছ বলা যেতে

পারে। খুব তেষ্টার সময় যদি সে দেশের লোক অন্য কোথাও না জল পায়—ঐ গাছে গিয়ে একটা খোঁচা দেয়—দিলেই কলের জলের মত পরিষ্কার ঠাণ্ডা জল কল্ কল্ করে বেরিয়ে আসে। কলকাতায় ইডেন্ গার্ডেনে এ গাছ দু'একটা দেখতে পাবে।

আমেরিকায় দুধের গাছ বলে আর একরকম গাছ আছে। এ গাছের ডাল ভাঙলেই দুধের মত একরকম গাঢ় শাদা রস বেরোতে থাকে—যা খেতেও অনেকটা দুধের মত আর দুধের মতই পোষ্টাই। গরু পোষার চেয়ে এ গাছ পোতা মন্দ নয়।

পৃথিবীতে আরো অনেক রকমের অদ্ভুত গাছ আছে যেমন মাংস গাছ, মোমের গাছ, ঝড় বোঝানো গাছ—কিন্তু সে সব গাছের কথা আর এক জায়গায় বলবো।

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক

শ্রীযতীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

দাস্যভাব *

——:০:——

আজকাল 'স্লেভ্ মেণ্টালিটি' বলে' একটা কথা যত্রতত্র ধ্বনিত হচ্ছে। অথচ কথাটার অর্থ যে সকলে বুঝতে পেরেছেন তা' তাঁদের কথাবার্ত্তা শুনে মনে হয় না। ধর্‌তাই বুলির বিশেষ ধর্ম্ম এই যে, সে একটা ধ্বনির ধাক্কায় মনের কতগুলো আবেগকে চাগিয়ে তোলে; সুতরাং বুদ্ধির সঙ্গে তা'র অহি-নকুল সম্বন্ধ না হ'লেও যে স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ নয় এটা সুনিশ্চিত। আবার একই বুলি নানা লোকের মনে নানা ভাবের উদ্রেক ক'রতে যে না পারে তা' নয়। বঙ্গভঙ্গের সময় 'বন্দেমাতরং' বুলিটি সন্দীপবাবুর চেলাদের মনে যে-ভাবের সঞ্চার করেছিল, তা'র যে বিপরীত করেছিল ফুলার বা সলিমুল্লার মনে, তা' কুমিল্লার হাটে আর জামালপুরের মাঠে লাঠির দ্বারা প্রমাণিত হ'য়ে গেছে।

গত মাঘের 'সবুজপত্র'-এ দেখলুম একজন লিখেছেন—'দাস-মনোভাব' বস্তুটি যদিও বর্ত্তমানে ভারতবর্ষের নিজস্ব ও ভারতবাসীর খাস দখলে, তবু এটা যে পেয়েছি আমরা ইংরাজ-রাজের কাছ থেকে—তা' অস্বীকার করলে দিনের আলোর মত উজ্জ্বল ও স্পষ্ট সত্যেরও অপলাপ করা হবে।"

* অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রমোহন দাসের সভাপতিত্বে পাটনা 'সবুজ সঙ্ঘে' পঠিত।

এ ধারণাটা যে ভুল তা' যিনি একটু মনস্তত্ত্ব নিয়ে কারবার করেন তাঁর অবিদিত নেই।

আসলে দাস্যভাবের জন্যে যদি কেহ দায়ী হন—তবে তিনি ইস্কুল-কলেজের স্রষ্টা ইংরেজ-রাজ নন,—মানব-মনের স্রষ্টা বিশ্বরাজ। কারণ, ঐ যে দাস্যভাব যা'কে আজকাল হাততালির জন্য এত গালাগালি দেওয়া হচ্ছে তা' মানব-মনের একটি চিরন্তন ভাব।

দাস্যভাবের গোড়াকার ঘরে ফিরে যাওয়ার আগে দাস্যভাব বলতে আমরা কি বুঝি তা' দেখা দরকার। অথচ ঘটনা হচ্ছে এই যে, ঐ বুলিটাকে কোনো একটা নির্দ্দিষ্ট সংজ্ঞার মধ্যে দাঁড় করানো শক্ত। প্রাক্‌সূচিত লেখক মহাশয়ের মতে Habit-টাও দাস্যভাব, আর এ জন্যেই খাঁচার পাখী মুক্ত আকাশ তুচ্ছ করে' খাঁচাতেই থাক্‌তে চায়। কারো মতে অন্যের আইডিয়া মেনে নেওয়াও 'স্লেভ-মেণ্টালিটি'-র লক্ষণ। সে দিন Indian Art-এর পক্ষে একজন ফরাসী সমালোচকের কথা উদ্ধৃত করতে যাচ্ছিলুম, অমনি আমার এক বন্ধুবর চেঁচিয়ে বলে' উঠলেন—"ঐ ত আপনাদের 'স্লেভ মেণ্টালিটি'।" তাঁ'র মতে নিজের কথা ছাড়া পরের কথা মেনে নেওয়া 'স্লেভ মেণ্টা-লিটি'-র একটা মস্ত লক্ষণ। তবে মুস্কিল এই যে, সবাই যদি দাস্যভাব বাদ দিতে গিয়ে স্বভাবকেই পর-ভাবের উপরে চাপিয়ে বসে' থাকেন, তবে জ্ঞানের রাজ্য যে অচিরাৎ ভাব থেকে অভাবের দিকে যাত্রা সুরু করতে হবে তা' আজকের দিনে কারুকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখাবার দরকার নেই।

মোদ্দা কথা, দাস্যভাব সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। যাক্‌,

পূর্ব্বের প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক্। আমি বলছিলুম যে দাস্যভাব মানব-মনের একটা চিরন্তন ভাব। এর স্পষ্ট দৃষ্টান্ত,—যিনি আজ 'স্লেভ মেণ্টালিটি' বলে' চীৎকার করে' নিজের গলা আর পরের কানকে বিদীর্ণ করে' তুলেছেন, তিনিই আবার হয়ত আর একজন লেখকের ভাষায়—"সাদার পোষাক পরা কৃষ্ণদাসের", স্নেহভাজন হওয়ার জন্যে তাঁর চরণে স্নেহ পদার্থের প্রলেপ দিতে কুণ্ঠিত নন্। এমন কি এটাও অভিজ্ঞতার প্রসাদে দেখা গেছে যে, স্বদেশী বক্তৃতা করা হয় এই জন্যে যাতে বিদেশীরা বক্তাকে অন্যান্য তাঁবেদারের চাইতে একটু বেশি খাতির করেন। যিনি ভ্রাতৃভাবের আদর্শ প্রচারে তনুমন নিয়োজিত করেছেন তিনিই আবার একবেলা চাকর না এলে তার প্রতি মনে যে-ভাব পোষণ করেন তা' নিছক প্রেম নয়। আবার যিনি রাজনীতিতে সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার ঘোষণায় ব্যস্ত, তিনিই সমাজ নীতিতে টিকি ও টিক্‌টিকির পক্ষপাতী। আসল কথা, আমাদের মনে প্রভুত্ব ও দাসত্ব এই দুই বিপরীত ভাবই মনের দুইটি বিভিন্ন কোঠায় ঠাসা আছে। আর এই সব বিভিন্ন, বিপরীত ও অসমঞ্জস্ ভাব নিয়েই মানব-মন গঠিত। যাঁরা মনটাকে একটানা একই ধরণের স্রোত বলে' মনে করেন তাঁ'রা মন জিনিষটির স্বরূপ যে বুঝতে পারেন নি, একথা জোর গলায় প্রচার করলে অন্যায় হবে না বোধ হয়। মোট কথা, যে মনোযন্ত্রের সাহায্যে একই পুরুষ দুইটি স্ত্রীলোককে, অথবা একই স্ত্রীলোক দুইটি পুরুষকে একই কালে ভাল বাসতে সক্ষম, সেই মনোযন্ত্রের দ্বারাই একধারে প্রভু ও দাস হওয়াও অসম্ভব নয়। মানব-মনের যতগুলো ভাব আছে তা'র মধ্যে সব চাইতে যে দুটি ভাব সচরাচর নজরে পড়ে তা' হচ্ছে Sadism আর Maso-

chism. অপরকে পীড়িত করে' মনে যে আনন্দ পাওয়া যায় তা'কে Sadism, আর, অপরের দ্বারা পীড়িত হয়ে যে আনন্দ পাওয়া যায় তা'কে Masochism বলা যায়। Sadism যা'কে বাঙলায় 'চণ্ডামি' বলা যায় তা' হচ্ছে প্রভুত্বের গোড়ার কথা; আর Masochism যা'কে দুঃখবুভুক্ষা বলা চলে তা' হচ্ছে দাস্যভাবের মূলসূত্র। প্রতি মানবের মনেই এ দু'টি ভাব বিদ্যমান; তবে যাঁ'র মধ্যে দুঃখ বুভুক্ষা বেশি তিনি দাস্যভাবই পছন্দ করেন, আর যাঁ'র মধ্যে চণ্ডামির মাত্রাটা প্রবল তিনি প্রভু হ'য়েই জন্মগ্রহণ করেন।

বৈষ্ণব রসশাস্ত্র 'উজ্জ্বল নীলমণিকিরণঃ' নামক গ্রন্থে নায়ক নায়িকার নিম্নোল্লিখিত বিভাগ পাওয়া যায়। নায়কের মধ্যে যিনি "ভীমসেনবৎ উদ্ধত আত্মশ্লাঘা-রোষ-কৈতবাদিগুণযুক্তঃ" তাঁকে 'ধীরোদ্ধতঃ' বলা হয়েছে, অর্থাৎ—বিদেশী মনস্তত্ত্ববিদের ভাষায় ইনি Sadistic. আবার যিনি "কন্দর্পবৎ প্রেয়সী বশো নিশ্চিন্তো নবতারুণ্যো বিদগ্ধঃ" তাঁকে 'ধীর ললিত', অর্থাৎ—Masochistic বলা হয়েছে। নায়িকার মধ্যেও তদ্রূপ বিভাগ দৃষ্ট হয়; যেমন, "নিষ্ঠুর তর্জ্জনেন কর্ণোৎপলাদিনা যা কৃষ্ণং তাড়য়তি সা অধীর প্রগল্ভা শ্যামলা"; আবার "মুগ্ধাতিরোষেণ মৌনমাত্র পরা একবিধৈব।"

এমতাবস্থায় একদিনে এক নিশ্বাসে বক্তৃতার দাপটে আর হাত তালির চাপটে দাস্যভাবকে তাড়াতে গেলে গলাবাজী ও তালিবাজার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় সন্দেহ নেই কিন্তু তা' দেখে' দাস্যভাবের হাস্য ছাড়া আর কোনো রসের উদ্রেক হয় না। দাস্যভাবটা যদি ম্যান্‌চেষ্টারের কাপড়ের মত দেহের একটা ভূষণ হ'ত, তবে গোলদীঘির পাড়ে লঙ্কা কাণ্ডের অভিনয় করলেই তা'র দফা রফা হ'ত,

কিন্তু ওটা হচ্ছে মনেরই একটা অংশ। তবে যদি কেহ বৌদ্ধদের মত মনকে নিরোধ করতে চান তবে মনের সঙ্গে সঙ্গে দাস্যভাবটাও নিরুদ্ধ হবে সন্দেহ নেই কিন্তু তা' হবে মাথা কেটে মাথাব্যথা সারানো। এ ব্যাপারটা এ দেশের দর্শনে অনেক দিন থেকে চলে' এসেছে;—শঙ্কর দুঃখকে বাদ দিতে গিয়ে জীবনকে বাদ দিয়ে বস্‌লেন—বল্লেন সব অধ্যাস, সব প্রত্যয়, সব কল্পনা, একমাত্র আত্মা স্বতঃসিদ্ধ, নিরুপাধিক, কালাতীত, নিগুর্ণ। বৌদ্ধরা বললেন, ভিতরেও কিছু নেই বাইরেও কিছু নেই; আছে শুধু নাম আর রূপ—অস্তি শুধু একটা বিরাট নাস্তি!

সুতরাং দাঁড়াল এই যে, মনকে বাদ না দিলে দাস্যভাবকে বাদ দেওয়া যায় না।

এই স্বাভাবিক দাস্যভাবটা প্রথমে Aristotle দেখতে পেয়েছিলেন বলেই লিখেছিলেন—"Some men are by nature free, and others slaves, and that for these latter slavery is both expedient and right."

Nietzsche-ও এ-বিষয়ে একমত। তিনি বলেন, সব মানুষ সমান নয়; ডিমোক্রাসী মানুষকে নীচের দিকে টেনে আনে,—তা'কে মাঝারি ধরণের ও সচরাচর রকমের করে' তোলে। আরো বলেন—"A higher culture can only originate where there are two distinct castes of society, that of the working class, and that of the leisured class who are capable of leisure; or more strongly expressed, the caste of compulsory labour and the caste of free labour.

Slavery is of the essence of Culture." অর্থাৎ—একদল প্রভু আর একদল দাসই যথার্থ কালচারের ভিত্তি।

Bernard Shaw "Socialism"-এর পক্ষপাতী হ'লেও মানবের দাস্যভাবকে অস্বীকার করতে পারেন নি; তাই তিনি বলেছেন—"The savage bows down to idols of wood and stone: the civilized man to idols of flesh and blood."

রবীন্দ্রনাথের সন্দীপও তাই বলেন—"পৃথিবীতে একদল জীব আছে যারা পদতলচর, তাদের সংখ্যাই বেশি: তারা কোনো কাজই করতে পারে না যদি না নিয়মিত পায়ের ধুলো পায়, তা' পিঠেই হোক্ আর মাথাতেই হোক্।"

এই কথাগুলোর মধ্যে যে কিছু সত্য আছে তা' শুধু গোল-দীঘির বক্তা ছাড়া আর সকলেই স্বীকার করবেন। রবীন্দ্রনাথ এজন্যেই 'হালদার গোষ্ঠি'তে মনোহরের চাকর রামচরণের চরিত্র সৃষ্টি করতে গিয়ে লিখেছেন—"পৃথিবীতে একদল লোক জন্মায়, সেবা করাই তাদের ধর্ম্ম।" তাই "যদি সে নিঃশ্বাস লইলে বাবুর নিঃশ্বাস লইবার প্রয়োজনটুকু বাঁচিয়া যায় তাহা হইলে সে অহোরাত্র কামারের হাপরের মত হাঁপাইতে রাজি আছে।"

নৃ-তত্ত্বে দেখতে পাওয়া যায় মানুষ অতি আদিম অবস্থা থেকেই একটা-কিছুর পূজা করে' আসছে। জল, বায়ু, সূর্য্য, গাছ, মাছ, সাপ, কোনোটাই তা'র পূজা থেকে বঞ্চিত হয়নি। এর কারণ আর কিছু নয়—ঐ দাস্যভাব। কারুকে পূজা না করলে তা'র মনের সেই Eternal Slave-টার পরিতৃপ্তি হয় না। এর প্রমাণ, যে বুদ্ধ প্রচার করে' গেলেন নাস্তিকতা—তাঁ'র চেলারা তাঁ'রই মূর্ত্তি

গড়ে' পূজা সুরু করে' দিলেন। প্রত্যেক ধর্ম্মেরই যে ইতরসাধারণের হাতে এ দুরবস্থা ঘটেছে তা কার অজানা ?

সচরাচর দেখা যায় কেউ প্রভু হ'য়েই যেন জন্ম গ্রহণ করেন আর কেউ দাসত্বেই যেন চরম সার্থকতা খুঁজিয়া পান। ইতিহাসে সেকেন্দর শাহ্, নেপোলিয়ান্, শিবাজী, কৈসর উইল্হেল্ম্, এঁরা প্রভু হ'য়েই জন্মেছিলেন। যে কোনো অবস্থায়ই এঁরা প্রভু হ'তে পারতেন। কার্লাইলের মত লোকও যে গেটেকে পূজা করতেন সেই গেটেও Duke of Weimar-এর পারিষদ ছিলেন। কাজেই লোকবিশেষকে তার প্রভুত্বের জন্য গাল দিয়ে কোনো লাভ নেই, কারণ কি, সে সব ক্ষেত্রে অনেক সময় "প্রভু না থাকাটাই সকলের চেয়ে বড় বিপদ।" আসলে প্রভুদের এমন একটা Magnetism আছে যাতে করে' তারা লোকবিশেষকে টেনে আনেন। এর জন্যেই শ্রীকান্ত ইন্দ্রনাথের প্রভাব অতিক্রম করতে পারে নি। প্রভুরা সব সময়েই যে শান্ত শিষ্ট ভালমানুষটি হন, তা' নয় ; তা'রা বেশির ভাগই দানবীয়। কিন্তু এই দানবীয় চরিত্রের এমন একটা ভয়ঙ্কর সৌন্দর্য্য আছে যা'র পরিচয় আমরা পাই সন্দীপের মধ্যে। এই সৌন্দর্য্যের তীব্র মদিরাতেই বিমলার মন মাতাল হ'য়ে উঠেছিল। এ দেখেই নিখিলেশ দুঃখ করে' বলে ছিলেন—"উৎকটের উপরে ওর অন্তরের ভালোবাসা। জীবনের সমস্ত সহজ সরল রসকে সে লঙ্কা মরিচ দিয়ে ঝাল আগুন করে জীবের ডগা থেকে পাকযন্ত্রের তলা পর্য্যন্ত জ্বালিয়ে তুলতে চায়—অন্য সমস্ত স্বাদকে সে একরকম অবজ্ঞা করে।" তবে শেষ পর্য্যন্ত যে এ উৎকটের জয় হয় না তা' রোম রাজত্ব থেকে জর্ম্মান রাজত্ব পর্য্যন্ত ইতিহাসের পাতাগুলোতে

লাল কালিতে লেখা হ'য়ে আছে। প্রাচ্য এটা বুঝেছিল এবং বুঝেছিল ব'লেই প্রাচ্যের ধর্ম্মের গোড়ার কথা দাস্যভাব। খৃষ্ট, চৈতন্য, কবির, সকলেই এই দাস্য ভাবটাকেই একান্ত করে' প্রচার করেছেন। এতে লজ্জিত হবার কিছুই নেই; কেননা ভাবটা তখনই লজ্জার হ'য়ে ওঠে যখন নীচ স্বার্থসিদ্ধি তা'র লক্ষ্য ও ছোট খাট জিনিষ পূজ্য হয়। সাপের পূজা নিন্দনীয় একারণে যে, তা'র লক্ষ্য হচ্ছে সন্তান লাভ, আর তার পূজ্য হচ্ছে একটা সরীসৃপ। কিন্তু এই দাস্যভাবই যখন সত্য, শিব ও সুন্দরের অধিকৃত হয়ে' পড়ে তখন বিশ্বে সে এক অনির্বচনীয় মূর্ত্তিতে প্রকাশ পায়।

এই দুঃখবুভুক্ষা বা দাস্যভাবই বড় আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হ'য়ে মানুষকে জনসেবায় নিয়োজিত করে। মহাত্মাজি জনসেবাকে আদর্শ করতে পেরেছেন বলেই আজ দেশ তাঁকে নেতা বলে, মেনে নিয়েছেন।

Terence Macswiney, Lord Mayor of Cork তাঁর বিচারের সময়ে বলেছিলেন :—"It is not those who can inflict the most, but those who can suffer the most, who will conquer."

ধর্ম্মে ও রাষ্ট্রে যে কথা খাটে আর্টেও তাই। রবীন্দ্রনাথ এই দুঃখবুভুক্ষাকেই সাহিত্যে সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ আসন দিয়েছেন। "ছোট ও বড়"-তে তিনি লিখেছেন—"দুঃখ দেয় যে-মানুষ তার পরাভব হইবে, দুঃখ পায় যে-মানুষ তারই শেষ গৌরব।" ... ..."দুঃখকে আমাদের সহায় করিতে হইবে, মৃত্যুকে আমাদের সহায় করিতে

হইবে, তবে মৃত্যুঞ্জয় আমাদের সহায় হইবেন।" 'গীতাঞ্জলি'-তেও তিনি সে কথাই বলেছেন—

"আরো আঘাত সইবে আমার
সইবে আমারো।
আরো কঠিন সুরে জীবন তারে ঝঙ্কারো।"

এই দুঃখবুভুক্ষা থেকেই দাস্যভাবের সৃষ্টি হয় এবং সেই দাস্য-ভাবই সুন্দরের সঙ্গে মিলিত হ'য়ে আর্টের রসদ যোগায়; যেমন :—

"আসন তলের মাটির পরে লুটিয়ে রব
তোমার চরণ-ধূলায় ধূলায় ধুসর হব।"

এখন দেখা গেল যে, দাস্যভাবটাকে যত খারাপ মনে করা গিয়েছিল ওটা তত খারাপ নয়। দাস্যভাবটার পিছনে যদি একটা স্বাভাবিক প্রীতি ও আত্মসমর্পন না থেকে কেবলমাত্র দায়ই থাকে তবেই সেটা নিছক 'দাসত্ব' আর যদি তা' ভালবাসায় স্নিগ্ধ ও প্রেমে উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে তবেই সেটা মনুষ্যত্ব। ফলকথা, দাস্যভাবটাকে যখন আন্তরিকতায় মধুর, শান্ত ও সুন্দর করে' তোলা যায় তখনই সে নিখিলেশ গড়তে পারে—তা' না হ'লে সে গড়ে সন্দীপের চেলা।

প্রভুত্ব জিনিষটার মধ্যে রাজসিক ভাব যথেষ্ট থাকলেও অনধি-কারীর হাতে তামসিকতায় পরিণত হ'তে বেশি সময় লাগে না; তা ছাড়া 'চণ্ডামি' জিনিষটা আমাদের দেশের ধাতে নেই। ভয় হয় আজকের দিনে ঐ চণ্ডামিকেই সবচেয়ে বেশি। সন্দীপের আত্মকথায় পাই—"আমার চ্যালাদের নিয়ে আমি মাসে মাসে

নিষ্ঠুরের পরীক্ষা করি। একদিন বাগানে চড়ুইভাতি করতে গিয়েছিলুম। একটা ছাগল চরে বেড়াচ্ছিল, আমি সবাইকে বল্লুম, কে ওর পিছনের একখানা পা এই দা দিয়ে কেটে আন্‌তে পারে? সকলেই যখন ইতস্তত করছিল, আমি নিজে গিয়ে কেটে নিয়ে এলুম। আমাদের দলের মধ্যে সকলের চেয়ে যে লোক নিষ্ঠুর সে এই দৃশ্য দেখে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে গেল।"

এ হেন চণ্ড যে, তার চেলারা যে মিস্ গিল্‌বি-দের মাথায় ঢিল ছুড়বে এবং চাই-কি, ষণ্ডাগুণ্ডার মতো দণ্ড হস্তে দেশটাকে লণ্ডভণ্ড করবে, তা'তে আর আশ্চর্য্য কি? আসল কথা, সব সহ্য করা যায় বাদে Philistinism. দেখতে হবে Dyrism-কে গাল দিতে গিয়ে যেন Dyre-এর ছোট সংস্করণ না হয়ে' পড়ি।—এ দুর্দ্দিনে নিখিলেশ কি চন্দ্রনাথ মাষ্টারের একান্তই অভাব, যাঁদের মন শুচি-সুন্দর, হিংসা-দ্বেষ-শূন্য, সত্যের প্রভায় উজ্জ্বল,—যাঁদের প্রতিকাজে—শুধু কথায় নয়—প্রাচ্যের মধুর দাস্যভাব জ্বল্‌জ্বল্ করবে। একথাটা আজ খুব দুঃখের সহিতই বল্‌তে হচ্ছে, কারণ-কি, বরিশালের প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্সে সিংবাহিনীর ছবির পূজা হচ্ছে; আজ নিখিলেশের সঙ্গে বল্‌তে ইচ্ছে হয়—"যে কাজকে সত্য বলে' শ্রদ্ধা করি তাকে সাধন করবার জন্যে মোহকে দলে টানা চল্‌বে না।"

যাক্, আমার শেষ কথা এই যে, আমার এই প্রবন্ধটাকে যদি কেউ—'শ্লেভ্ মেণ্টালিটি' প্রসূত বলে' মনে করবেন তবে তা'র বিরুদ্ধে আমার বক্তব্য এই যে, এই প্রবন্ধ এই-রকম না হ'য়ে অন্য রকম হ'লেও সেই কথাই উঠতে পারত; কাজেই সে বিষয়ের কোনো মীমাংসা হওয়ার সুবিধে নেই। তা' ছাড়া, ইস্কুল কলেজ ও আদা-

লত ছাড়লেই যে প্রীতিহীন সৌন্দর্য্যহীন দাসত্ব থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে এমন যুক্তি আমি মানি নে। সে রকম দাসত্বকে বাদ দিতে হ'লে মানুষের সমাজকে বাদ দিতে হয়। রবীন্দ্রনাথ বড় দুঃখেই লিখেছিলেন—"এত কালের সভ্যতার সাধনার পরেও মানুষের সমাজ আজও দাসের হাতের খাটুনিতে চলিতেছে। এ সমাজে যথার্থ স্বাধীনতা অতি অল্প লোকেই ভোগ করে। রাজ্যতন্ত্রে বাণিজ্যতন্ত্রে এবং সমাজের সর্ব্ববিভাগেই দাসের দল প্রাণপাত করিয়া সমাজ-জগন্নাথের প্রকাণ্ড রথ টানিয়া চলিতেছে। কোথায় লইয়া চলিতেছে তাহাও জানে না, কাহার রথ টানিতেছে তাহাও দেখিতে পায় না। সমস্ত জীবন দিনের পর দিন এমন দায় বহন করিতেছে যাহার মধ্যে প্রীতি নাই সৌন্দর্য্য নাই।"

শ্রীরঙীন হালদার

মন্তব্য :—

লেখক যা বলেছেন তা শুধু মনোবিজ্ঞানের নয় জনবিজ্ঞানেরও কথা। প্রভুত্ব ও দাসত্বের প্রবৃত্তি যে মানুষের প্রকৃতিগত এ ত প্রত্যক্ষ সত্য। তবে আমার মনে হয় যে আমাদের প্রত্যেকের মনে প্রভুবুদ্ধি ও দাসবুদ্ধি দুই-ই আছে। আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রবৃত্তি মানুষের পক্ষে যেমন স্বাভাবিক আত্মোৎসর্গের প্রবৃত্তিও মানুষের পক্ষে তেমনি স্বাভাবিক। এ উভয়ের মধ্যে কার মনে কখন্ কোন্ প্রবৃত্তিটি ঠেলে উঠবে—তা নির্ভর করে কতকটা মানুষের বাইরের অবস্থার উপর, কতকটা তার শিক্ষা-দীক্ষার উপর। এ কথা ব্যক্তিগত হিসেবেও যেমন সত্য, জাতিগত হিসেবেও তেমনি সত্য।

মানব-সমাজ অদ্যাবধি যে-দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে রয়েছে, একদিকে স্বল্পসংখ্যক প্রভু আর একদিকে অসংখ্য দাস, এটা যে নিতান্ত দুঃখের বিষয় তার পরিচয় রবীন্দ্রনাথের উপরোক্ত কথাগুলিতেই পাওয়া যায়। তবে এর চাইতেও বেশি দুঃখের বিষয় এই যে, স্বল্পলোকের প্রভুবুদ্ধির উচ্ছেদ করা যত কঠিন তার চাইতে ঢের বেশি কঠিন বহু লোকের দাসবুদ্ধির উচ্ছেদ সাধন করা। দাসবুদ্ধিই যে রূপান্তরিত হয়ে ভক্তি প্রভৃতি বড় বড় মনোভাবে পরিণত হয়—লেখকের এ কথা সম্পূর্ণ সত্য। কিন্তু তা'হলেও দাসবুদ্ধিকে প্রশ্রয় দেওয়া শ্রেয় নয়। রামানন্দের মুখে দাস্যরসের গুণ বর্ণনা শুনে মহাপ্রভু বলেছিলেন—"এহ বাহ্য আগে কহ আর"।—মহাপ্রভুর এই মহাবাক্য আমাদের কাছে চিরস্মরণীয় হওয়া উচিত।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

সম্পাদকের নিবেদন

—:•:—

সবুজপত্র যে যথাকালে দেখা দেয় না, এ সত্য সবুজপত্রের গ্রাহকদের নিকট অবিদিত নেই। কিন্তু এ বৎসর এ কাগজ কালের হিসেবে যেরকম পিছিয়ে পড়েছে, তা সবুজপত্রের পক্ষেও অপূর্ব্ব।

যে সব কারণে এ বৎসর কাগজ বেরতে এত দেরী হল তার অধিকাংশই নিতান্তই আমার ব্যক্তিগত, অতএব উল্লেখযোগ্য নয়।

আশা করছি আর দু'তিন মাসের পর সবুজপত্র নিয়মিত প্রকাশ করবার সুযোগ ও অবসর আমি পাব। সুতরাং আগামী বৎসরের শ্রাবণ পর্য্যন্ত সবুজপত্র সম্ভবত এই রকম এলোমেলো ভাবেই প্রকাশিত হবে। তার পর থেকে প্রতি মাসে ধার্য্যতারিখে কাগজ বার করবার ভরসা আমি রাখি। আশা করি সবুজপত্রের গ্রাহকেরা আরও কিছুদিন ধৈর্য্য ধরে থাকতে পারবেন। ডাকমাশুল বৃদ্ধি হওয়ার জন্য আমরাও অতঃপর সবুজপত্রের মূল্য আরো ছ'আনা বাড়িয়ে তিন টাকা বার আনা করলুম। ইতি—

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী